গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর
বর্ণাঢ্য জীবন কাহিনী নির্ভর উপন্যাস

মহাকালের
মহানায়ক

আসাদ বিন হাফিজ

জাদুল আসাদির তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। শিরস্ত্রাণ খোলেননি। তাঁবুর বাইরে সশস্ত্র দেহরক্ষীরা পাহারা দিচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য রক্ষী বাহিনীর কমাণ্ডার একটু অন্য দিকে গেলেন। একজন গার্ড পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে উঁকি দিল তাঁবুর ভেতর। দু'চোখ বন্ধ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন সুলতান। গার্ড বাইরে দাঁড়ানো চারজন সঙ্গীর দিকে তাকালো। চোখ বন্ধ করে খুললো একবার। সে চারজন দেহরক্ষী অন্যদের সাথে গল্প জুড়ে দিল।

তাঁবুতে ঢুকলো প্রথম রক্ষী। খঞ্জর হাতে নিল। বিড়ালের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে গেলো ঘুমন্ত সুলতানের দিকে। খঞ্জর বাগিয়ে ধরে হাত উপরে তুললো। আইয়ুবীর বুক লক্ষ্য করে যখন নেমে আসছিল হাত, ঠিক সেই মুহূর্তে পাশ ফিরলেন তিনি। রক্ষীর আঘাত গিয়ে পড়লো সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর শিরস্ত্রাণে।

বিদ্যুৎ গতিতে দাঁড়িয়ে গেলেন সুলতান আইয়ুবী। নিমিষেই ঘটনা আঁচ করে নিলেন। নিজের বাছাই করা দেহরক্ষী আক্রমণ করেছে দেখেও হতবাক হলেন না।

রক্ষী শিরস্ত্রাণের পাশ কেটে মাটিতে গেঁথে যাওয়া খঞ্জর টেনে তুলছিল। পলকে পূর্ণ শক্তিতে রক্ষীর মুখে ঘুসি মারলেন সুলতান সালাহউদ্দিন। মট করে হাড় ভাঙ্গার শব্দ হলো। বিকট শব্দ করে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো রক্ষী।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রক্ষীর হাত থেকে ছিটকে পড়া খঞ্জর নিজের হাতে তুলে নিলেন। চিৎকার শুনে বাইরে থেকে ছুটে এলো দু'জন রক্ষী।

'ওকে বেঁধে ফেলো।' নির্দেশ দিলেন সুলতান।

কিন্তু ওরা সুলতানের আদেশ অমান্য করে উল্টো আইয়ুবীকেই আক্রমণ করে বসলো। একা খঞ্জর দিয়ে দুই রক্ষীর তলোয়ারের মোকাবেলা করতে লাগলেন আইয়ুবী। তাঁবুর ভেতর শুরু হলো অসম এক লোমহর্ষক লড়াই।

দু'এক মিনিটের মধ্যে অন্য গার্ডরাও ভেতরে প্রবেশ করলো। অবাক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত তারা তাকিয়ে রইলো আইয়ুবী ও রক্ষীদের অসম লড়াইয়ের দিকে। সম্বিত ফিরে এলে একজন এগিয়ে এসে আঘাত করলো রক্ষীদের। দেখাদেখি অন্য রক্ষীরাও ঝাঁপিয়ে পড়লো। এতে রক্ষীদের নিজেদের মধ্যেই দুই দলের সৃষ্টি হয়ে গেলো। তাবুর ভেতর দুই দল রক্ষী মারামারি করছে। সেদিকে তাকিয়ে আপন পর পার্থক্য করতে না পেরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

সংঘর্ষ থেমে গেলো। দু'জন নিহত হলো এ সংঘর্ষে। আহত হলো কয়েকজন। পালিয়ে গেলো একজন। তদন্ত শেষে দেখা গেলো, দেহরক্ষীদের সাতজন ছিল ঘাতক

দলের সদস্য। গুমাস্তগীন নামে খলিফা আস সালেহের এক কেল্লাধিপতি আইয়ুবীকে হত্যার জন্য এদের নিয়োগ করেছিল।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যা করার এ ধরনের কয়েকটি প্রচেষ্টা পর পর ব্যর্থ হলো। এ হত্যা পরিকল্পনার হোতা ছিল সাইফুদ্দিন। সাইফুদ্দিন ছিল সালাহউদ্দিনের চাচাতো ভাই এবং খলিফা আস সালেহের একজন আমীর।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন মুসলিম দুনিয়ায় কেন্দ্রীয় শাসন ছিল নামমাত্র। আমীরুল মুমিনীন মুসলিম বিশ্বের প্রধান হলেও কার্যত ইসলামী দুনিয়া ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণররা সুলতান উপাধি ধারণ করে বলতে গেলে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতো।

এ ঘটনার পরদিন ভোরে সাইফুদ্দিনকে লক্ষ্য করে একটি চিঠি লিখলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। তাতে তিনি লিখলেন, 'খাঁচায় বন্দী পাখির মাঝে তুমি চিত্তপ্রসাদ খোঁজ। নারী আর মদের মাঝে খোঁজ জীবনের মানে। কিন্তু জানো না সৈনিকের জীবন মানেই এক বিপজ্জনক খেলা।'

চিঠিটি লিখেছিলেন তিনি ১১৭৫ সালের এপ্রিল মাসে। খলিফা আস সালেহ এবং সাইফুদ্দিন খৃস্টানদের সহযোগিতায় আইয়ুবীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পরাজিত হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেলো সাইফুদ্দিন। তার তাঁবুতে পাওয়া গেলো অগণিত সম্পদ। পাওয়া গেলো খাঁচায় বন্দী রঙবেরঙের পাখি, এক ঝাঁক সুন্দরী তরুণী, নর্তকী, গায়িকা। বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র আর পিপা ভর্তি মদ।

সুলতান সালাহউদ্দিন খাঁচার দুয়ার খুলে দিলেন, পাখিরা উড়ে গেলো উন্মুক্ত আকাশে। নর্তকী, গায়িকা আর তরুণীদের মুক্ত করে দিলেন। চিঠি লিখলেন আমীর সাইফুদ্দিনের কাছে, 'তোমরা বেঈমানী করে খৃস্টানদের সহযোগিতায় আমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছো। একবারও কি ভেবেছো, তোমাদের এ ষড়যন্ত্র ইসলামী বিশ্বের মানচিত্র মুছে দিতে পারে? যদি আমাকেই ঈর্ষা করো, যদি আমিই তোমাদের শত্রু হয়ে থাকি, মেরে ফেলো আমায়। দু'বার সে চেষ্টাও করেছো। সফল হওনি, আবার না হয় চেষ্টা করে দেখো। এবার সফল হলে হতেও পারো।

যদি নিশ্চয়তা দিতে পারো, আমাকে হত্যা করলে ইসলাম আরো গৌরবোজ্জ্বল হবে, তবে আমার মাথা কেটে তোমাদের পায়ের কাছে রেখে দিতে বলবো। মনে রেখো, অমুসলিম কখনো মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। ইতিহাস এর সাক্ষী। ফ্রান্সের খৃস্টান সম্রাট রিনাল্ট এবং ত্রিপোলীর সম্রাট রিমাণ্ডের মতো খৃস্টান শাসককে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা করছো বলে তোমরা ওদের বন্ধু। ওরা সফল হলে ওদের প্রথম শিকার হবে তোমরাই। এরপর পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নামও মুছে যাবে।

বন্ধু, একটি কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া আমি আমার কর্তব্য মনে করি। মনে রেখো, তোমরা যোদ্ধা জাতির সন্তান। সৈন্য হওয়া তোমাদের জাতীয় পেশা। প্রতিটি মুসলমানই আল্লাহর একেকজন নিবেদিত সৈনিক। তার জন্য শর্ত কেবল ঈমান ও সৎ কাজ। খাঁচায় বন্দী পাখির মাঝে তুমি চিত্তপ্রসাদ খোঁজ। নারী আর মদের মাঝে খোঁজ জীবনের মানে। কিন্তু জানো না সৈনিকের জীবন মানেই এক বিপজ্জনক খেলা। অনুরোধ

করি, আমার সাথে সহযোগিতা করো। জিহাদে শরীক হও, না হলে কমপক্ষে বিরোধিতা করো না। আমি তোমাদের কোন শাস্তি দেবো না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।'

–সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

এ সব যুদ্ধের ফলে অজস্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর হাতে এসেছিল। বন্দীর সংখ্যা ছিল অগণিত। তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে তাদের মুক্ত করে দিলেন। এক ভাগ দিলেন সৈন্য এবং গরীবদের। তৃতীয় ভাগ পাঠিয়ে দিলেন নিজামুল মুলক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানেই তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন। নিজের জন্য এবং জেনারেলদের জন্য কিছুই রাখেননি। বন্দীদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। কিছু অমুসলিমও ছিল। সুলতান আইয়ুবীর মহানুভবতায় ওরা তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেলো।

হাসান বিন সাবাহর ফেদাইন গ্রুপ দু'বার সুলতান সালাহউদ্দিনকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করেছিল। ফেদাইনদেরকে ঐতিহাসিকরা ঘাতক দল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দু'বারই তিনি অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন। তৃতীয় আক্রমণ হলো খৃষ্টান এবং সাইফুদ্দিনের সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করার পর। পরাজিত সাইফুদ্দিন পালিয়ে গিয়ে শেষ চেষ্টা হিসাবে গুপ্তঘাতক দলের সাহায্য কামনা করলো।

সুলতান সালাহউদ্দিনের প্রায় একশো বছর আগে হাসান বিন সাবাহ ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন উপদলের জন্ম দিয়েছিল। নিজেদের পরিচয় দিতো মুসলমান হিসেবে। কিছু অলৌকিক কাজ দেখিয়ে মানুষকে অনুসারী বানাতো। সুন্দরী তরুণী, মদ, হিপনোটিজম এবং চাটুকারিতা ছিল ওদের পুঁজি। বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য ছিল বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘাতক দল। ওরা মানুষকে হত্যা করতো গোপনে।

ওরা ছিল সতর্ক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং দুঃসাহসী। ওরা বেশভূষা এমনকি নিজেদের ভাষা পর্যন্ত পরিবর্তন করে বড় বড় জেনারেলদের দেহরক্ষীর চাকরী নিত। সময় সুযোগ বুঝে এমনভাবে সারতো হত্যার কাজ, নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীকে কোনভাবেই খুঁজে পাওয়া যেতো না।

ধীরে ধীরে হাসান সাবাহর দল ঘাতকদল হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠলো। রাজনৈতিক কারণেও ওরা ছিল পারদর্শী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হত্যার কাজে ব্যবহার করতো বিষ। সুন্দরী যুবতীরা মদের সাথে এ বিষ মিশিয়ে দিতো।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে রূপসী নারী দিয়ে বা মদ খাইয়ে হত্যা করা সম্ভব ছিল না। তিনি এ দুটো থেকেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন সতর্কভাবে। ফলে আকস্মিক আক্রমণ ছাড়া তাকে হত্যা করার অন্য কোন পথ ছিল না। কিন্তু বিশ্বস্ত ও নিবেদিতপ্রাণ দেহরক্ষীদের উপস্থিতিতে তাও ছিল অসম্ভব।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ভেবেছিলেন, পরাজয়ের পর আস সালেহ এবং সাইফুদ্দিন আর মাথা তুলে দাঁড়াবে না। সম্মিলিত বাহিনীর অহমিকা চূর্ণ হবার পর আইয়ুবীর সাথে টক্কর দেয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে ওরা নিজেদের সংশোধন করে নেবে। কিন্তু প্রতিশোধের নেশায় ওরা আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি লোপ পেলো ওদের। ওরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আরো নতুন নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো।

এই বিজয়ের পরও সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তার অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখলেন। আরো সামনে এগিয়ে দখল করে নিলেন গাজাসহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী– দুঃসাহসী এক যোদ্ধা, অসাধারণ এক সেনাপতি। ইসলামের শত্রুরা আজো তাকে সম্বোধন করে 'গ্রেট সালাদীন' বলে, মুসলমানরা স্মরণ করে জাতীয় বীর হিসাবে।

মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লেখা রয়েছে তার নাম। খৃষ্টান জগত তার সাহস, বুদ্ধিমত্তা আর রণকৌশলের কথা কোনদিন ভুলতে পারবে না। ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে তার জয়-পরাজয়ের বিস্ময়কর কাহিনী। কিন্তু ক্রুশের ধ্বজাধারীরা মদ আর রূপের মায়াজালে যে ষড়যন্ত্রের বিস্তার ঘটিয়েছিল, নিজেদের সে সব অপকর্মের চমকপ্রদ কাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি।

১১৬৯ সালের ২৩ মার্চ। মিশরের গভর্ণর এবং সেনাবাহিনী প্রধান হয়ে এলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। তিনি ছিলেন শাহী পরিবারের সন্তান। অল্প বয়সেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মনে করতেন, শাসকরা দেশের জনগণ ও সম্পদের মালিক নয়। এ সবের মালিক শুধু একজন, যিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। শাসকের কাজ হলো, সেই মালিকের তাবৎ সহায় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা আর সেই মহামহিম বিশ্বনিয়ন্তার বিধান অনুসারে সমুদয় সম্পদ তাঁর বান্দাদের মধ্যে বন্টনের ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

তিনি আল্লাহর বিধানের হেফাজত করবেন। মিল্লাতের হেফাজত করবেন। সামগ্রিকভাবে তিনি সভ্যতা ও মানবতার হেফাজত করবেন। সেই লোকই শাসক হওয়ার যোগ্য– যিনি ইসলাম, মিল্লাত ও মানবতার রক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনে আন্তরিক।

কিন্তু বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে তিনি কি দেখছেন? দেখছেন মুসলিম শাসকদের অনৈক্য ও অনাহত বিভেদ। শাসকবর্গের মাথা থেকে হারিয়ে গেছে দায়িত্বানুভূতি। সেখানে বাসা বেঁধেছে ক্ষমতার মোহ, শক্তির দাপট ও বিলাসপ্রিয়তা। তিনি বেদনার্ত চিত্তে লক্ষ্য করেছেন, মুসলমান শাসকরা আজ নিজেদেরকে নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। তাদের হেরেমগুলোতে এখন আধিপত্য করে হারাম মেয়েরা। নিষিদ্ধ রমণী ও নিষিদ্ধ তরল পানীয়ের নেশায় আকন্ঠ ডুবে থাকা এইসব শাসকদের দিকে তাকালে তার বুক হাহাকার করে ওঠে। বিলাসপ্রিয় ও ক্ষমতালিপ্সু এইসব শাসকরা আজ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে আছে যে, অন্ধ অবিশ্বাসের কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে মুসলিম মিল্লাতের ভবিষ্যত।

রাষ্ট্রের কর্ণধারদের হারেমের শোভা বর্ধন করছে ইহুদী আর খৃষ্টান যুবতীরা। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব সুন্দরী রমণীদের রূপের আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে মানুষের ইসলামী জোশ আর স্বতন্ত্র জাতিসত্তার জযবা ও আবেগ অনুভূতি।

এ সুযোগে খৃষ্টান শাসকরা একের পর এক ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যগুলো দখল করে নিচ্ছে। মুসলিম শাসকবর্গ প্রজার রক্ত শুষে খৃষ্টানদেরকে বাৎসরিক কর প্রদান

করছে। খৃস্টানদের অনুগত মুসলিম শাসকরাও ওদের সেনা শক্তির ভয়ে সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে। খৃস্টানরা যে মুসলমানদেরকে ভোগবিলাসে বন্দী রেখে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব দখলের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এ কথা বুঝেও না বুঝার ভান করে থাকতে হচ্ছে মুসলিম শাসকদের।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী শিক্ষা লাভ করেছিলেন নিজাম-উল-মুলক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে শিক্ষার্থীদের খালেছ ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার ব্যবস্থা ছিল। আর সে জন্যই ঘাতকদের প্রথম শিকার ছিলেন মহান শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত নিজাম-উল-মুলক। রোমানদের রাজ্যবিস্তারে তিনি ছিলেন বড় বাঁধা। এ বাঁধা দূর করার জন্য তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

সুলতান সালাহউদ্দিন এখানেই সেনা প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। প্রশাসনিক কাজে তাকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী। মুসলিম বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার সকল গুণাবলী তিনি এখান থেকেই অর্জন করেছিলেন।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী খৃস্টান বাহিনীর বিশাল থাবার হাত থেকে মুসলিম বিশ্বকে বাঁচানোর জন্য গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলেন। এ জন্য তিনি গোয়েন্দাবৃত্তি ও কমান্ডো অপারেশনকে সবচে' বেশী গুরুত্ব দেয়া শুরু করলেন। তিনি দেখলেন, গুপ্তচরবৃত্তিতে খৃস্টান জগত অনেক অগ্রসর। মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা আর সাংস্কৃতিক অঙ্গন ওদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী অত্যন্ত ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতার সাথে এর মোকাবিলা করলেন।

তিনি মিশরের গভর্ণর ও সেনাবাহিনী প্রধান হয়ে এলে শুরু হলো ষড়যন্ত্র। বড় বড় জেনারেলরা এ পদের জন্য ছিল লালায়িত। তারা যখন দেখলো তাদের আশার গুড়ে বালি পড়েছে, তখন ক্ষুব্ধ জেনারেলরা ষড়যন্ত্র শুরু করলো তার বিরুদ্ধে।

ওদের ধারণায় সালাহউদ্দিন একজন বালকমাত্র। এ পদের যোগ্যতা তার নেই। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর তৎপরতায় জেনারেলদের সে ধারণা ভেঙে গেলো।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিজে কঠোর নিয়ম শৃংখলা মেনে চলতেন। সৈন্যদের জন্যও তিনি সেনাবাহিনীর শৃংখলাবিধি প্রয়োগে মনোযোগী হলেন। তিনি সৈন্যদের জন্য ভোগবিলাস ও মদ নিষিদ্ধ করলেন। মনোনিবেশ করলেন ওদের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে। ফলে অল্প দিনেই সেনাবাহিনী সুশৃংখল ও সুসংগঠিত হয়ে উঠলো। অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ বালক বলে তাকে যারা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখছিল, টনক নড়ে উঠলো তাদের।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বিশাল খৃস্টান শক্তির মোকাবিলার জন্য একটি শক্তিশালী সেনা বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। মুক্ত ফিলিস্তিনে নিঃশ্বাস নেয়ার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সেনাবাহিনীকে সেভাবে গড়ে তুলতে লাগলেন তিনি। তিনি ঘোষণা করলেন, 'যে খোদা আমাকে মিশরের গভর্ণর করেছেন, অবশ্যই তিনি ফিলিস্তিনও মুক্ত করবেন।' আর এ ঘোষণার জন্য কেবল খৃস্টানরাই নয়, খৃস্টানপন্থী মুসলমান আমীররাও তার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। বাইরের শত্রুর চাইতে ঘরের শত্রুরা হয়ে উঠলো তার জন্য

অধিকতর বিপজ্জনক।

নতুন গভর্ণরের অভ্যর্থনার আয়োজন করা হলো। আয়োজন করলেন জেনারেল নাজি। পঞ্চাশ হাজার ফৌজের অধিনায়ক তিনি। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী ছাড়াও বেসামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত। মুচকি হেসে একে একে সকলের সাথে করমর্দন করলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। কণ্ঠে স্নেহ-ভালবাসার উষ্ণ পরশ। কোন কোন অফিসারের ঠোঁটে কুটিল হাসি। দৃষ্টিতে ঘৃণা আর উপহাস। ওদের ধারণা, নূরুদ্দিন জঙ্গীর সাথে সুসম্পর্ক এবং শাহী পরিবারের সন্তান বলেই সালাহউদ্দিন গভর্ণর হতে পেরেছেন।

এক প্রবীণ অফিসার আরেকজনের কানে কানে বললেন, 'এখনো শিশু, আমরা পেলে পুষে মানুষ করে নেবো।'

বয়সের দিক থেকে অনুষ্ঠানে তাকে শিশুই মনে হচ্ছিল। জেনারেল নাজির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন আইয়ুবী। তাঁর কপাল সামান্য কুঞ্চিত হলো, তবে তা সামান্য সময়ের জন্য মাত্র। তিনি করমর্দনের জন্য হাত প্রসারিত করলেন। নাজি তোষামুদে দরবারীদের মতো সালাহউদ্দিনকে কুর্নিশ করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কপালে চুমো খেয়ে বললেন, 'আপনার জীবন রক্ষার্থে আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও বিলিয়ে দেবো। আপনি আমাদের কাছে মাননীয় জঙ্গীর অমূল্য আমানত।'

'ইসলামের চাইতে আমার জীবনের দাম বেশী নয় সম্মানিত জেনারেল।' আইয়ুবী বললেন, 'প্রতি ফোঁটা রক্ত সংরক্ষণ করে রাখুন। খৃষ্টান ষড়যন্ত্রের ঘনঘটা মুসলিম বিশ্বের আকাশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে আকাশ পরিষ্কার করতে তা কাজে লাগবে।'

জবাবে মৃদু হাসলেন নাজি। যেন তাকে রূপকথার গল্প শোনানো হচ্ছে। নাজি ছিলেন ফাতেমী খেলাফতের সিপাহসালার। পঞ্চাশ হাজার ফৌজের অধিনায়ক। সৈন্যদের সবাই ছিল সুদানের অধিবাসী। তার বাহিনী ছিল আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত। বলতে গেলে এরা ছিল নাজির ব্যক্তিগত সৈন্য। নাজি ছিলেন মুকুটহীন সম্রাট।

মুসলিম দেশগুলোতে কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকায় শাসকরা একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছিল খৃষ্টান জগত। মিশর এবং আশপাশের শাসকদের জন্য নাজি ছিল এক ত্রাস। তার মস্তিষ্ক ছিল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রভূমি। ভেড়া দেখলে নেকড়ের যেমন দাঁত বেরিয়ে আসে, সুলতান সালাহউদ্দিনকে দেখে নাজিরও তেমনি দাঁত বেরিয়ে এসেছিল। আইয়ুবী তার এ ক্রুর হাসির মর্ম না বুঝলেও এটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, এ শক্তিধর জেনারেলকে তার প্রয়োজন।

'হুজুর অনেক দূর থেকে এসেছেন। খানিক বিশ্রাম করে নিন।' নাজি বললেন।

'যে কঠিন দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে, আমি তার যোগ্য নই। এ দায়িত্বভার আমার বিশ্রাম এবং নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে। প্রথমে অফিসে গেলেই কি ভাল হয় না?'

'হুজুর, খানা প্রস্তুত। আগে খেয়ে নিলে কি ভাল হতো না?' বললো এক অফিসার।

একটু ভেবে ওদের সাথে হাঁটা দিলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। বললেন, 'চলুন।'

দু'সারিতে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র গার্ডবাহিনী। ওদের হাতের অস্ত্র এবং পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ দেখে তার চেহারায় দেখা দিল আনন্দের দ্যুতি। দরজার কাছে পৌঁছতেই চেহারার এ আলো হঠাৎ নিভে গেলো। তার বদলে হতাশার আঁধার এসে গ্রাস করলো তাকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চারজন রূপসী তরুণী। তাদের পিঠ জুড়ে ছড়িয়ে আছে রেশম কোমল চুল। পরণে ফিনফিনে পাতলা পোশাক। হাতে ফুলের ঝুড়ি। সুলতানকে দেখেই তাঁর পথে ওরা ফুল ছুঁড়তে লাগলো। সাথে সাথে বেজে উঠলো দফ ও রবাবের সুর ঝংকার।

থমকে দাঁড়ালেন আইয়ুবী। ডানে বাঁয়ে নাজি এবং তার সহকারীরা। ভারতীয় রাজা-বাদশাহর দরবারীদের মতো ওরা নুয়ে তাকে সামনে চলার জন্য অনুরোধ করলো।

'সালাহউদ্দিন ফুল মাড়ানোর জন্য আসেনি।' গমগম করে উঠলো আইয়ুবীর কণ্ঠ। ঠোঁটে শ্লেষের হাসি। যে হাসি দেখতে ওরা অভ্যস্ত নয়।

'হুজুর চাইলে আমরা আকাশের তারা এনে দিতে পারি।' নাজি বললেন।

'আমাকে খুশী করতে হলে একটা জিনিসই আমার পথে ছড়ানো যেতে পারে।'

'আদেশ করুন।' মুখ খুললো নাজির সহকারী, 'কোন্ জিনিস আপনাকে তুষ্ট করতে পারবে?'

'খৃষ্টানদের লাশ।' মৃদু হেসে বললেন সালাহউদ্দিন।

ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেলো অফিসারের। মুহূর্তে বদলে গেলো সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর চেহারা। দু'চোখ থেকে ঠিকরে বেরোতে লাগলো আগুনের হলকা। বললেন, 'মুসলমানদের জীবন ফুলশয্যা নয়। আপনারা কি জানেন না খৃষ্টানরা মুসলিম বিশ্বকে ইঁদুরের মতো কেটে টুকরো টুকরো করে চলছে?'

তার গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি বদলে দিল ঘরের পরিবেশ। প্রতিটি শব্দ থেকে বিস্ফোরিত হচ্ছিল প্রচণ্ড ক্রোধ। 'আমাদের মেয়েদের উলঙ্গ করে ওদের ইজ্জত পদদলিত করেছি বলেই আজ আমরা ফুল মাড়াতে পারছি। শুনুন, আমার দৃষ্টি আটকে আছে ফিলিস্তিনে। আপনারা কি আমার পথে ফুল বিছিয়ে মিশর থেকে ইসলামকে বিদায় দিতে চান?' তিনি চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, 'আমার পথ থেকে ফুল সরিয়ে নাও। এ ফুলে পা পড়লে আমার হৃদয় কাঁটায় ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। সরিয়ে দাও মেয়েদের। আমি চাই না ওদের সোনালী চুলে জড়িয়ে গিয়ে আমার তরবারী গতি হারিয়ে ফেলুক।'

'হুজুরের ইজ্জত সম্মান......।'

'আমাকে আর কখনো হুজুর বলবে না।' ঝাঁঝের সাথে বললেন তিনি। মনে হলো শব্দের তীব্র আঘাতে ওদের দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দেয়া হয়েছে। 'হুজুর তো তিনি যিনি আমাদেরকে আল্লাহর দাসানুদাস বানিয়েছেন। সে হুজুরের আদর্শের জন্য আমার জীবন নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চাই। তার পয়গাম আমার বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। খৃষ্টান জগত ওই পয়গাম ছিনিয়ে নিয়ে রোম উপসাগরে ডুবিয়ে দিতে চাচ্ছে। ডুবিয়ে দিতে চাচ্ছে মদের দরিয়ায়, নারীর রেশমী কোমল চুলের অরণ্যে। আমি বাদশাহ হয়ে এখানে আসিনি, এসেছি জনগণের এক সামান্য খাদেম হিসাবে। আমাকে বাদশাহ

নয়, খাদেমই থাকতে দাও।

নাজির চোখের ইশারায় মেয়েরা ফুল কুড়িয়ে দরজা থেকে সরে গেলো। দ্রুতপায়ে ভেতরে ঢুকলেন সুলতান সালাহউদ্দিন। প্রশস্ত কক্ষ। ফুল দিয়ে সাজানো বিশাল টেবিল। টেবিলে নানা রকম সুস্বাদু খাবার।

খাবারে দৃষ্টি বুলিয়ে তিনি তাকালেন সহকারী সালারের দিকে। 'মিশরের সব মানুষ কি এমন খাবার খেতে পারে?'

'না জনাব।' সহকারীর জবাব, 'গরীবরা তো এসব খাবার স্বপ্নেও দেখে না।'

'তোমরা কোন্ সমাজের লোক? যারা এমন খাবার স্বপ্নেও দেখে না ওরা কি তোমাদের চেয়ে ভিন্ন জাতি?'

সকলেই নির্বাক।

'এখানে যত চাকর-বাকর এবং ডিউটিরত সিপাই রয়েছে সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। এ খাবার ওরা খাবে।'

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী একটা রুটির সাথে ক'টুকরো তরকারী তুলে তড়িঘড়ি খাওয়া শেষ করলেন। এরপর নাজিকে সাথে নিয়ে হাঁটা দিলেন গভর্ণর হাউসের দিকে।

দু'ঘন্টা পর। গভর্ণর হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন নাজি। দ্রুত এগিয়ে গেলেন ঘোড়ার দিকে। এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন তিনি।

রাত নেমেছে। নাজি খাস কামরায় কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে নিয়ে মদের আসর বসিয়েছেন। নাজি বললেন, 'যৌবনের তেজ কয়েক দিনের মধ্যেই ঠাণ্ডা করে দেবো। কমবখ্‌ত বললো কি জানো? বললো, কাবার প্রভুর শপথ! মুসলিম বিশ্ব থেকে খৃষ্টানদের বিতাড়িত করে তবে আমি বিশ্রাম নেবো।'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী? হুহ্!' সহকারী সালারের কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর। 'ইসলামী রাষ্ট্রের দম ফুরিয়ে গেছে সে এ খবরও জানে না। এখনতো সুদানীরা দেশ চালাবে।'

অন্য এক কমাণ্ডার প্রশ্ন করলো, 'পঞ্চাশ হাজার ফৌজের সবাই সুদানী এ কথা তাকে বলেননি। বলেননি যে ওরা আপনার নির্দেশে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না?'

'তোমার কি মাথা খারাপ এডরোস? আমি বরং তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছি। বলেছি, আপনার ইশারা পেলে আমার সৈন্যরা খৃষ্টানদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু .... ' থেমে গেলো নাজি।

'কিন্তু কি?'

'মিশরের লোকদেরকে ফৌজে ভর্তি করার জন্য আইয়ুবী আমাকে নির্দেশ দিয়েছে। কারণ, ফৌজ এক এলাকার থাকা নাকি উচিত নয়। সে মিশরের লোকদেরকে আমার সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছে।'

'আপনি কি বললেন?'

'বলেছি, আপনার নির্দেশ পালন করা হবে। কিন্তু আমি তা করবো না।'

'তার মনমানসিকতা কেমন বুঝলেন?'

'একরোখা, জেদী।'

'আপনার বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার সামনে সে এখনো শিশু। নতুন গভর্ণর হয়ে এলো তো! কদিন পরই পদের নেশায় পেয়ে বসবে।'

'আমি তার এ নেশা দূর করবো না। নেশায় নেশায় তাকে আমি নিঃশেষ করে দেবো।'

ওরা অনেকক্ষণ ধরে আইয়ুবীকে নিয়ে কথা বললো। নতুন গভর্ণর এই মুকুটহীন সম্রাটের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালে কি পদক্ষেপ নেয়া হবে তাও আলোচিত হলো।

অন্যদিকে আইয়ুবী তার সহকারীদের বলছিলেন, 'আমি এখানে রাজা হয়ে আসিনি। কাউকে রাজত্ব করতেও দেবো না।' তিনি আরো বললেন, 'আমাদের সামরিক শক্তির প্রয়োজন। এখানকার সেনাবাহিনীর গঠন পদ্ধতি আমার পছন্দ নয়। পঞ্চাশ হাজার ফৌজের সবাই সুদানী। অথচ সব এলাকার লোকেরই সৈন্য হবার অধিকার আছে। এভাবে ওদের জীবনের মানও উন্নত হতে পারে। সব এলাকা থেকে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করার জন্য আমি নাজিকে বলে দিয়েছি।'

'নাজি কি আপনার নির্দেশ পালন করবে?' এক সহকারী প্রশ্ন করলো।

'কেন, সে কি আমার হুকুম অমান্য করবে নাকি?'

'করতেও পারে। ফৌজের সর্বময় কর্তা তিনি। তিনি কারো নির্দেশ পালন করেন না, বরং অন্যকে তার নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন।'

এ কথায় সালাহউদ্দিন আইয়ুবী চুপ করে গেলেন। তবে তার চেহারায় কোন ভাবান্তর দেখা গেলো না। তিনি কি ভাবছেন তা বুঝে উঠার আগেই আলী বিন সুফিয়ানকে রেখে অন্যদের বিদায় জানালেন তিনি।

আলী মধ্য বয়সী এক চৌকস গোয়েন্দা নেতা। কুশলী, সাহসী এবং অসম্ভব নাকপটু। গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তিনি বিশ্বস্ত ও নিবেদিতপ্রাণ কিছু লোককে ট্রেনিং দিয়ে পারদর্শী করে তুলেছেন। তাদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব গোয়েন্দা দল। আকাশ থেকে তারকা ছিনিয়ে আনতে বললেও যারা পিছপা হবে না। চিন্তা চেতনার দিক থেকে তিনি ছিলেন আইয়ুবীর সমমনা। সুলতান সালাহউদ্দিন তাকে বাগদাদ থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন।

'শুনলে আলী! এরা বললো, কারো হুকুম পালন করতে নয়, নাজি হুকুম দিতে অভ্যস্ত!'

'শুনলাম তো। চিনতে ভুল না করলে বলবো, লোকটি ধুরন্ধর ও বড় ধরনের ক্রিমিনাল। তার ব্যাপারে আগে থেকেও আমি কিছুটা জানি। জনগণের টাকায় লালিত সেনাবাহিনী এখন তার নিজস্ব ফৌজ। তার ষড়যন্ত্রের ফলে প্রশাসনিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। 'সব এলাকার লোকই সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা প্রয়োজন' আপনার এ সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী এবং সঠিক হয়েছে। আমার তো আশংকা হচ্ছে, সুদানী সৈন্যরা প্রয়োজনের সময় আপনার হুকুম অমান্য করে তারই আনুগত্য করবে। বলা যায় না, ফৌজের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করে নাজিকে আপনার অপসারণও করতে হতে পারে।'

'না, নাজির মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিকে এখনই বিরূপ করতে চাই না। এ মুহূর্তে

তাকে অপসারণ করা ঠিক হবে না। নিজেদের রক্ত ঝরানোর জন্য আমি অস্ত্র হাতে নেইনি, আমাদের তরবারী শত্রুর জন্য। আমি আগে ভালবাসা দিয়ে তাকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করবো। তুমি বর্তমান সেনাবাহিনী আমাদের কদ্দুর কাজে আসবে তা-ই বোঝার চেষ্টা করো।'

'আপনার ভালবাসা তাকে শুধরাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

সুলতান সালাহউদ্দিন যা ভেবেছিলেন নাজি ততোটা সহজ ছিল না। ভালবাসা শব্দটি তার অভিধানে ছিল না। তার সব প্রীতি এবং মমতা ছিল ক্ষমতার সাথে। ক্ষমতার প্রশ্নে সে ছিল অত্যন্ত কঠোর। মানুষ হিসাবে ছিল অসম্ভব ধূর্ত। ষড়যন্ত্র ছিল তার হাতিয়ার। কাউকে ফাঁসাতে চাইলে তার সাথে মোমের মতো কোমল ব্যবহার করতো। আইয়ুবীর সাথে তার ব্যবহার ছিল অনুগত দাসানুদাসের মতো। আইয়ুবীর সামনে তিনি কখনো বসতেন না। আইয়ুবীর প্রতিটি কথায় জী-হুজুরের ভূমিকা পালন করতেন। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তিনি মিশরের সকল অঞ্চল থেকেই সেনা ভর্তি শুরু করে দিয়েছিলেন।

সময় এগিয়ে যাচ্ছে। আইয়ুবীও তাকে একটু একটু পছন্দ করা শুরু করেছেন। নাজি তাকে আশ্বাস দিলেন, 'সেনাবাহিনী আপনার নির্দেশের অপেক্ষায়।' ফৌজের পক্ষ থেকে নতুন গভর্ণরকে 'গার্ড অব অনার' দেয়ার প্রস্তাবও দিলেন তিনি। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে আইয়ুবী তার এ আমন্ত্রণ মুলতবী রাখলেন।

রাত নেমেছে। নিজের কক্ষে দু'জন কমাণ্ডার নিয়ে মদ পান করছেন নাজি। মৃদু লয়ে বাজছে সংগীতের সুর মুর্ছনা। তালে তালে নাচছে দু'জন নর্তকী। পায়ে নুপুর নেই। বে আব্রু দেহের ভাঁজে ভাঁজে মাদকতা। প্রহরী ভেতরে এসে নাজির কানে কানে কি যেন বললেন।

মদির আবেশে মত্ত নাজির আনন্দে বিঘ্ন ঘটাবার সাহস কারো ছিল না। কিন্তু এ আসর থেকে তাকে কোন্ সময় তুলে নেয়া যায় প্রহরী তা জানতো।

উঠে দাঁড়ালেন নাজি। প্রহরী তাকে একটি কক্ষে নিয়ে গেলো। সুদানী পোশাক পরে একজন লোক বসে আছে। সাথে এক যুবতী।

নাজিকে দেখে দু'জন উঠে দাঁড়ালো। যুবতীর রূপ মাধুর্য দেখে নাজি খানিক হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন। নাজি নারী শিকারী। শুধু ভোগের জন্যই নয়, বড় বড় অফিসারদের হাতে রাখার জন্যও সুন্দরী যুবতীদের ব্যবহার করতেন নাজি। কসাই যেমন পশু দেখলে গোশত পরিমাপ করতে পারে, তিনিও প্রথম দেখাতেই বুঝতেন কাকে দিয়ে কোন কাজ করানো যাবে। নারী ব্যবসায়ীরা প্রায়ই তার কাছে মেয়ে নিয়ে আসতো।

বিক্রেতা যুবতীর ব্যাপারে বললো, 'দারুণ স্মার্ট। নাচতে পারে, গাইতে পারে, মুখের মধুতে পাথরও গলিয়ে দিতে পারে।'

নাজি ওর ইন্টারভিউ নিয়ে চমৎকৃত হলেন। ভাবলেন, একটু তৈরী করে নিলে যে কোন কাজেই ব্যবহার করা যাবে ওকে।

দামদস্তুর শেষে টাকা নিয়ে চলে গেলো লোকটি। নাজি ওকে নিয়ে চলে এলেন জলসা ঘরে। নাচতে বললেন তরুণীকে। দেহের বাড়তি কাপড় ফেলে দিয়ে দু'পাক

ঘুরতেই হা হয়ে গেলো তিন দর্শক। ফ্যাকাশে হয়ে গেলো আগের দু'নর্তকীর চেহারা। নতুন মেয়েটার সামনে ওরা এখন মূল্যহীন বাসি ফুল। আসর ভেঙে দিলেন নাজি। নতুন মেয়েটাকে রেখে সকলকে বিদায় করে দিলেন কামরা থেকে।

'নাম কি সুন্দরী?'

'আমার নাম জুকি।'

'তোমাকে যে দিয়ে গেল সে বলেছে, তুমি নাকি পাথর গলাতে পারো। আমি তোমার সে যোগ্যতা যাচাই করতে চাই।'

'কে সেই পাথর?'

'মিশরের নতুন গভর্ণর। যিনি একই সাথে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কও।'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী?'

'হ্যাঁ, যদি তাকে বশে আনতে পারো তবে তার ওজন সমান সোনা তোমার পুরস্কার।'

'তিনি কি মদ পান করেন?'

'না, মুসলমান শূকরকে যেমন ঘৃণা করে, সে মদ, নারী, নাচ, গান এবং ভোগবিলাসকে তেমনি ঘৃণা করে।'

'শুনেছি আপনার কাছে এমন সব যুবতী রয়েছে যাদের দেহের যাদু নীল নদের স্রোতকেও রুদ্ধ করে দিতে পারে। ওরা কি ব্যর্থ?'

'এখনো পরীক্ষা করে দেখিনি। আমার বিশ্বাস, তুমি এ কাজ করতে পারবে। সালাহউদ্দিনের বিশ্বাস এবং চরিত্র সম্পর্কে আমি তোমাকে বিস্তারিত বলবো।'

'তাকে কি বিষ খাওয়াতে হবে?'

'এখন নয়। তার সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমি চাই সে তোমার মতো রূপসীর আঁচলে বাঁধা পড়ুক। এরপর তাকে আমার পাশে বসিয়ে মদ খাওয়াবো। মারতে চাইলে তোমার প্রয়োজন নেই, ঘাতক দলকে দিয়ে সহজেই তা করানো যায়।'

'তার মানে আপনি তার সাথে দুশমনি নয়, বন্ধুত্ব চাচ্ছেন?'

জুকির বুদ্ধিমত্তায় নাজি কতোক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'হ্যাঁ জুকি।'

ওর রেশম কোমল চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন নাজি, 'আমি তার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। এমন বন্ধুত্ব, যেন সে আমার কথায় উঠে এবং বসে। এরপর কি করতে হবে তা আমি জানি।' থামলেন নাজি।

একটু থেমে নিয়ে আবার বললেন, 'একটা কথা তোমাকে বলা প্রয়োজন। সালাহউদ্দিনের হাতের একটা চাল আছে। তোমার রূপ যৌবনের ওপর তার চাল বিজয়ী হলে তুমি বাঁচতে পারবে না। সালাহউদ্দিনও তোমায় বাঁচাতে পারবে না। তোমার জীবন আমার হাতে। এ জন্যই তোমার সাথে এত খোলামেলা কথা বলছি। নইলে আমার মতো জেনারেল তোমার মতো এক নর্তকীর সাথে এভাবে আলাপ করতো না।'

'অনাগত ভবিষ্যত বলে দেবে কে ধোঁকা দেয়। এবার বলুন তার কাছে আমি পৌঁছবো কিভাবে?'

'আমি তার সম্মানে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করতে যাচ্ছি। রাতে তার শয়ন কক্ষে

তোমায় ঢুকিয়ে দেবো।'

'ঠিক আছে, এর পরের কাজ হবে আমার।'

সে রাতের পর আরো ক'টা রাত চলে গেছে। প্রশাসনিক কাজ এবং নতুন সৈন্য ভর্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আইয়ুবী নাজির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। এর মধ্যেই নাজি সম্পর্কে আলী বিন সুফিয়ানের আরো রিপোর্ট পাওয়া গেলো। আলীর সে রিপোর্ট পেয়ে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

'আলী! এর অর্থ হলো সে খৃষ্টানদের চাইতেও বিপদজনক!'

'লোকটা মিশরের পোশাকের ভেতর লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত সাপ। প্রশাসনের অনেক বড় বড় লোক তার হাতে। সেনাবাহিনীও আমাদের নয় বরং অন্যের অনুগত। এ ব্যাপারে কি করা যায় কিছু ভেবেছেন?'

'শুধু ভাবিনি, কাজও শুরু করে দিয়েছি। সুদানী সৈন্যদেরকে নতুন সৈন্যদের সাথে একীভূত করে দেবো। তখন এরা না হবে সুদানের, না মিশরের। এরপর নাজিকে সোজা পথে নিয়ে আসা যাবে।'

'আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, সে খৃষ্টানদের সাথে নিজের ভবিষ্যত জুড়ে দিয়েছে। মুসলিম বিশ্বকে এক কেন্দ্রের আওতায় এনে আপনি মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করতে চাচ্ছেন। কিন্তু নাজি আপনার এ ইচ্ছেকে পাগলামী মনে করে।'

'তুমি কি করছো?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তার চারপাশে আমি গুপ্তচরের প্রাচীর তৈরী করে দিয়েছি। মনে করুন সে এখন গোয়েন্দাদের দুর্গে বন্দী। আমি সব বিষয়ই আপনাকে অবহিত করবো।'

আলীর ওপর ছিল সুলতান সালাহউদ্দিনের পূর্ণ আস্থা। তাই তার গোপন তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই তাকে জিজ্ঞেস করলেন না।

'শুনলাম নাজি আপনাকে সম্বর্ধনা দিতে চাচ্ছে। যেতে চাইলে আমি যখন বলবো তখন যাবেন।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কতোক্ষণ ঘরময় পায়চারী করলেন। হঠাৎ কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো ব্যথাভরা 'আহ' শব্দ। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। তাকালেন আলী বিন সুফিয়ানের দিকে।

'আলী, জীবন মৃত্যু তো আল্লাহর হাতে। উদ্দেশ্যহীনভাবে বেঁচে থাকার চাইতে জন্মের সাথে সাথেই কি মরে যাওয়া ভাল নয়? কখনো ভাবি, যাদের মাঝে জাতীয় চেতনাবোধ নেই, নেই কোন মহৎ ভাবনা, সম্ভবতঃ পৃথিবীতে তারাই সুখী। ওরা নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকে, মরেও যায় তেমনি।'

'না, জনাব! ওরা সবচে বেশী হতভাগা।'

'হ্যাঁ, আলী। আমি যখন ওদেরকে ভাগ্যবান মনে করি কে যেন আমার কানের কাছে এসে তোমার কথাটাই উচ্চারণ করে যায়। মনে রেখো আলী, ইতিহাসের বর্তমান ধারা পরিবর্তন করতে না পারলে মুসলিম বিশ্ব হারিয়ে যাবে উপত্যকা আর মরুভূমির সীমাহীন

বিভাগে। খেলাফত এখন তিন ভাগে বিভক্ত। প্রশাসনে নিজের দায়িত্ব কর্তব্য উপলব্ধি করার মতো লোকের সংখ্যা খুবই কম। আমীর ওমরাব দল ভোগসর্বস্ব ও স্বেচ্ছাচারী। ইসলামের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছে। আমার আশংকা হচ্ছে, মুসলমানরা বেঁচে থাকলেও থাকবে খৃষ্টানদের গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ। শুধু বেঁচে থেকেই সন্তুষ্ট থাকবে ওরা। জাতিসত্তা বলে কিছুই থাকবে না, যেন সে শুধু এক যুগের কাহিনী। দেখছো না, অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই আমাদের মানচিত্র কতো সংকীর্ণ হয়ে এসেছে!'

মাথা নুইয়ে আবার তিনি পায়চারী করতে লাগলেন। কুঞ্চিত কপালে চিন্তার ভাঁজ। এক সময় মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে গমগম কণ্ঠে বললেন, 'আলী, নিজের ভেতর থেকে কেউ ক্ষয় হলে তা রোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের খেলাফত এবং আমীররা বর্তমান অবস্থায় থাকলে খৃষ্টানদের আক্রমণ করার প্রয়োজনই পড়বে না। যে আগুন আমাদের ঈমান, আমাদের কর্ম আর জাতিসত্তাকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে খৃষ্টানরা তাতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে মাত্র। ওদের ষড়যন্ত্র আমাদেরকে একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে বাধ্য করছে। হয়তো আমার ইচ্ছে অপূর্ণই থেকে যাবে। আমি পরাজিত হতে পারি, তবুও জাতির কাছে আমি কিছু কথা রেখে যেতে চাই। আমি চিৎকার করে বলতে চাই, খৃষ্টানদেরকে কখনো বিশ্বাস করো না। যুদ্ধ করতে করতে জীবন দেবে, তবু দুশমনের পাতা ফাঁদে পা দেবে না।'

'মনে হচ্ছে আপনি নিরাশ হয়ে গেছেন?' আলীর ব্যাকুল কণ্ঠ।

'না আলী, নিরাশ হইনি। একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।' নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন সুলতান, 'আলী, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের কাছে আমাদের নির্দেশ পৌঁছে দাও। সেনা ভর্তি আরো তীব্রতর করতে বলো। যুদ্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সবসময় প্রাধান্য দিতে বলবে ওদের। সৈন্য ভর্তির বাধ্যতামূলক শর্ত হলো, তাদের মধ্যে ইসলামী আমল আখলাক থাকতে হবে। শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার দিকে বিশেষ নজর দাও। ওদের স্পেশাল গেরিলা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করো। শত্রু এলাকায় গিয়ে কাজ করতে হবে ওদের। ওদের হতে হবে আত্মঘাতি জানবাজদের মতোই নির্ভীক। সুইসাইড স্কোয়াডে নাম লেখানোর জন্য সাহস করে যারা এগিয়ে আসবে তাদের দিকে বিশেষ নজর দাও। তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করো। ওদের থাকতে হবে উটের মতো দীর্ঘসময় ক্ষুৎ পিপাসা সহ্য করার শক্তি। দৃষ্টি হতে হবে ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ, মরু শিয়ালের মতো হতে হবে সতর্ক। চিতাবাঘের মতো ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর ওপর। শক্তি, সাহস আর বুদ্ধিমত্তায় ওরা হবে অনন্য। মদ, হাশিশ বা এ জাতীয় মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে হবে ওদের। ওদেরকে মোকাবেলা করতে হবে সেই সব নারীদের, যৌবনের পশরা সাজিয়ে, দেহে রঙিন নেশা জাগিয়ে যারা আসবে ওদের ছোবল হানতে। এ ব্যাপারে ওদের এমন ট্রেনিং দেবে, যেনো স্বর্গাগত পরী এলেও ওরা থাকতে পারে বরফশীতল।

ভর্তি আরো তীব্রতর করতে বলো আলী! মনে রেখো, আমি আবেগতাড়িত হয়ে লোক ভিড়াতে পছন্দ করি না। সংখ্যায় যত নগণ্যই হোক, আমি যোদ্ধা চাই। সেই সব যোদ্ধা, যাদের হৃদয়ে থাকবে ইসলামী চেতনাবোধ। আপন ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে

তারা এতটা সচেতন থাকবে যেনো কেন যুদ্ধ করছি এ প্রশ্নের জবাব তাদের জানা থাকে। শুরুতেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্য কি তা ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দাও। এ দুর্দিনে জাতি তাদের কাছে কতটুকু ত্যাগ ও কোরবানী দাবী করে এ কথা প্রত্যেকটি সৈনিকের অন্তরে এমন ভাবে গেঁথে দাও, যাতে এটাকে কেউ কেবল চাকরী মনে না করে।'

নাজি তার ক্ষমতা ও প্রাধান্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে একটি দুঃসাহসিক গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে তুলেছিল। ওরা নাজিকে বললো, 'আলী বিন সুফিয়ান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিশেষ উপদেষ্টা। তিনি গুপ্তচরবৃত্তিতে আরব বিশ্বে শ্রেষ্ঠতম। আপনার অস্তিত্বের জন্য তিনি এক মারাত্মক হুমকী স্বরূপ।'

নাজি আলীর পেছনে সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা লাগালো। তাদের রিপোর্টের পর সে আলীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলো। সালাহউদ্দিনকে ফাঁসানোর জন্য জুকিকে তৈরী করেছিল নাজি, কিন্তু সে জানতেও পারেনি, নিজেই সে জুকির ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। শুধু অসাধারণ রূপের জৌলুসই নয়- জুকির মধুমাখা কণ্ঠে ছিল যাদুর ছোঁয়া। ওকে নিজের পাশে বসিয়ে কথা বলতে খুবই তৃপ্তি পেতো নাজি।

নাজির আসরে এখন আর পুরনো নতর্কীদের ডাক পড়ে না। ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো ওরা। এ ঈর্ষার আগুন ওদেরকে ক্ষিপ্ত করে তুললো। একদিন পুরনো দুই নর্তকী জুকীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে বসলো। কিন্তু কার্যতঃ এটা ছিল অসম্ভব। ওর কক্ষের সামনে সারাক্ষণ দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকতো। অন্যদিকে অনুমতি ছাড়া নর্তকীরা বাইরে যেতে পারতো না। অনেক ভেবেচিন্তে ওরা হারেমের এক চাকরাণীকে হাত করে নিল।

গভর্ণরের পুরনো বডিগার্ড বদলে দিলেন আলী। সেখানে নিয়োগ করলেন দুঃসাহসী এবং আত্মত্যাগী নতুন সৈন্য। ওদের প্রত্যেকেই ছিল একেকজন আদর্শ সৈনিক। নাজি এ পরিবর্তন মেনে নিতে না পারলেও আইয়ুবীর সামনে তা প্রকাশ করলেন না। সম্বর্ধনায় হাজির হওয়ার জন্য তিনি আবার আইয়ুবীকে অনুরোধ করলেন। আইয়ুবী বললেন, 'কবে আপনার দাওয়াতে যেতে পারবো দু'য়েক দিনের মধ্যেই আপনাকে তা জানাবো।'

নাজি চলে গেলে তিনি এ ব্যাপারে আলীর পরামর্শ চাইলেন। আলী বললেন, 'যে কোন সময় আপনি নাজির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন।'

পরদিন সালাহউদ্দিন নাজিকে জানালেন, তিনি এখন তার দাওয়াত কবুল করতে প্রস্তুত। নাজি তিন দিন সময় নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার অনুমতি প্রার্থনা করলে আইয়ুবী সানন্দে তাতে সম্মতি দিলেন।

অনুমতি পেয়ে নাজি আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। অনুষ্ঠানটি হবে শহর থেকে দূরে। মশাল জ্বেলে আলোর ব্যবস্থা করা হবে। ব্যবস্থা থাকবে নাচগানের। ঘোড় সওয়াররা তাদের নৈপুণ্য দেখাবে। মশালের আলোয় অনুষ্ঠিত হবে কুস্তি, নেজাবাজি ও তলোয়ারের খেলা। রাতে ওখানেই সবার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৈরী করা হয়েছে আলীশান তাঁবু।

পুরো অনুষ্ঠানমালা জানানো হলো সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে। তিনি মনোযোগ দিয়ে বিস্তারিত কর্মসূচী শুনলেন। কিন্তু নাচগান সম্পর্কে কিছুই বললেন না। এতে নাজি উৎফুল্ল হলো। মনে সাহস সঞ্চয় করে ভয়ে ভয়ে বললেন, 'সেনাবাহিনীর বেশীর ভাগ ফৌজ দুর্বল মুসলিম। ওরা কখনো সখনো মদপান করে, তবে অভ্যস্ত নয়। আপনাকে সম্বর্ধনা জানানোর এ আনন্দঘন অনুষ্ঠানে ওরা সামান্য মদ পানের অনুমতি চাচ্ছে।'

'এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। আপনি আমাকে দাওয়াত করেছেন, আমি সে দাওয়াত কবুল করেছি। ওখানে আপনি কি করবেন তা আপনিই ভাল বুঝবেন। আপনি ওদের কমান্ডার। ইচ্ছে হয় অনুমতি দেবেন, না হয় দেবেন না, আমি এ ব্যাপারে আপনাকে কোন নির্দেশ দেবো না।'

'মিশরের আমীরের জয় হোক।' আনন্দে গদগদ হয়ে মোসাহেবী কণ্ঠে বললেন নাজি, 'যে কাজ আপনি অপছন্দ করেন আমি তার অনুমতি দেয়ার কে? নেহায়েত আপনাকে উপলক্ষ করে ওরা একটু আনন্দ করতে চাচ্ছে, নইলে এ প্রস্তাব আমি কিছুতেই উত্থাপন করতাম না।'

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। শুনলো সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর শুভাকাঙ্খীরা। আইয়ুবী নাচগান এবং মদের অনুষ্ঠানে যাবেন শুনে ওরা হতভম্ব হয়ে গেলো। তাকাতে লাগলো একে অপরের দিকে। কেউ বললো, 'নাজি মিথ্যে বলে লোকদের বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে।' কারো ধারণা, 'নাজি সালাহউদ্দিনকেও হাত করে নিয়েছে।'

এ সংবাদে সবচে বেশী খুশী হলো নাজির লোকেরা। দায়িত্বগ্রহণ করার পরপরই সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ভোগবিলাস এবং নাচগান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সেনাবাহিনীর [illegible] বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এ নিয়ম ভাঙ্গার দুঃসাহস কারো ছিল না।

সালাহউদ্দিন [illegible] এবং মদের অনুমতি দিয়েছেন, কাল নিজেই এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন, এই ভেবে নাজি বড় খুশী। কেবলমাত্র আলী বিন সুফিয়ান জানতেন এর মূল রহস্য। [illegible] কেন নাজিকে অনুষ্ঠানে নাচগান আর মদ [illegible] অনুমতি দেয়া হয়েছে।

রাত নেমেছে। [illegible] জোছনা ঝরে পড়ছে মরুর বালুকারাশির ওপর। হাজার [illegible] উজ্জ্বল মনে হচ্ছে সমগ্র এলাকা।

[illegible] এক পাশে সৈনিক সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। বিপরীত দিকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বসার স্থান। যেন কোন সম্রাটের মসনদ। মসনদের ডানে বায়ে মেহমানদের আসন। একটু দূরে অফিসারদের তাঁবু। আরেকটু সরে গিয়ে বিশাল এক তাঁবু [illegible] সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর অবকাশ যাপনের জন্য।

[illegible] আলী বিন সুফিয়ান এখানে পৌঁছে তাঁবুর চারপাশে কড়া পাহারা বসিয়েছেন। অন্যদিকে নাজি শেষ বারের মতো যুকিকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

[illegible] যুকিকে মনে হচ্ছিল স্বর্গের অপ্সরা। তার দেহ থেকে ছড়িয়ে

পড়ছিল হালকা সুবাস। সে সুবাসে পরিবেশ হয়ে উঠেছিল অপূর্ব মোহনীয় ও মাদকতাময়। তার নিরাভরণ কাঁধে সোনালী চুলের বাহার। শরীরে পোষাকের স্বচ্ছ প্রলে ; সে প্রলেপের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছিল এক অনুপম শিল্প সুষমা। সে সুষমায় ছিল মাখন কোমল এক মোমের পুতুলের জীবন্ত সজীবতা। ঠোঁটে তার অনির্বচনীয় মুচকি হাসি।

গভীর চোখে রুকির দিকে খানিক তাকিয়ে রইলেন নাজি। বললেন, 'তোমার এ মাতাল করা রূপযৌবনও হয়তো তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। তখন চালাবে ভাষার ... এতদিনের ট্রেনিং ভুলে যেয়ো না। দেখো আবার তার বাঁদী না হয়ে যাও। মনে রেখো, তুমি হবে অচিন নগরের সেই ফোটা ফুল, যা ধরতে গেলে ধরা যায় না, আবার সেখান থেকে চোখও ফেরানো যায় না। রুকি, তুমি সেই আলো, যার হাত থেকে কোন পতঙ্গের নিস্তার নেই। তুমি সেই মায়াবিনী, রক্ত মাংসের কোন মানুষের সাধ্য নেই তার আকর্ষণকে উপেক্ষা করে। মনে রেখো, সালাহউদ্দিনও মানুষ। ওকে তুমি তোমার পায়ের কাছে বসতে বাধ্য করবে। ক্লিওপেট্রা তার রূপ যৌবন দিয়ে লৌহমানবকে গলিয়ে মরুর বালির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। সে তোমার চে' বেশী সুন্দরী ছিল না। আমি তোমায় যা শিখিয়েছি তা ক্লিওপেট্রারই পদ্ধতি। নারীর এ চাল কখনো ব্যর্থ হয় না।'

মৃদু মৃদু হাসছিল রুকি। মনোযোগ দিয়ে শুনছিল নাজির কথা। মিশরের বালুকারাশি থেকে জন্ম নিয়েছিল ক্লিওপেট্রার মতো রূপসী নাগিণী। ইতিহাস আরো একবার সে অতীতে ফিরে যাচ্ছিল।

সূর্য ডোবার সাথে সাথে জ্বলে উঠলো হাজার হাজার মশাল। দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। দফ বাজিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করা হলো।

'মিশরের সুলতান সালাহউদ্দিন জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মরুর নিস্তরঙ্গ প্রকৃতি মুখরিত হয়ে উঠলো। নাজি এগিয়ে এসে বললেন, 'আত্মত্যাগী ও ইসলামের রক্ষক সেনাবাহিনী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। খোশ আমদেদ মহান নেতা, ওদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। এই সে সেনাবাহিনী, আপনার ইশারায় যারা জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত।'

তোষামুদে শব্দগুলো নাজির কণ্ঠে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠলো। মসনদে বসলেন সালাহউদ্দিন। ভেসে এলো অশ্বক্ষুরধ্বনি। আলোর নিশানায় চলে এলো ঘোড়াগুলো। দু'দিক থেকে আসছে চারটি করে ঘোড়া। আরোহীরা নিরস্ত্র। ছুটে আসছে মুখোমুখি। যে কোন মুহূর্তে সংঘর্ষ হতে পারে। আরো কাছে এগিয়ে আসতেই সওয়াররা স্যাডলে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়লো। এক হাতে তুলে নিল বলগা। অন্য হাত আড়াআড়িভাবে প্রসারিত করে একে অন্যকে পেরিয়ে গেলো। যাবার সময় অপর আরোহীকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলো ওরা। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য সওয়ারকে জাপটে ধরে ছুটে গেলো সামনে। দু'দল হারিয়ে গেলো দিগন্তের বিস্তৃত মরুতে। সংঘর্ষের স্থানে মাটিতে ডিগবাজি খাচ্ছিল দু'জন সওয়ার।

এভাবে পর পর আটটি দল তাদের নৈপুণ্য দেখালো। এরপর এলো উষ্ট্রারোহী

বাহিনী। তাদের খেলা শেষ হতেই শুরু হলো নেজাবাজি ও অসি চালনা। ওদের সাহস ও নিপুণতা অভিভূত হলেন সালাহউদ্দিন। এমন দুঃসাহসী সৈন্যই তো তার প্রয়োজন। তিনি আলী বিন সুফিয়ানের কানে কানে বললেন, 'ইসলামী জোশ সৃষ্টি করতে পারলে এ ফৌজ দিয়েই সমস্ত খৃস্টান শক্তিকে পরাভূত করা যায়।'

আলী পূর্বের পরামর্শ পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'নাজিকে সরিয়ে দিন, দেখবেন এদের মধ্যে এমনিতেই ইসলামী জযবা ও আবেগ সৃষ্টি হয়ে যাবে।'

কিন্তু সালাহউদ্দিন আইয়ুবী একজন অভিজ্ঞ জেনারেলকে না সরিয়ে তাকে সংশোধন করতে চাচ্ছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখার জন্য যোগ দিয়েছিলেন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। নাজি যখন নাচগান এবং মদপানের প্রস্তাব করেছিল, নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এরা ভোগবিলাসে কদ্দুর ডুবে আছে তা দেখতে নাচগানের অনুমতি দিয়েছিলেন আইয়ুবী।

সাহসিকতা, ঘোড়া সওয়ারী, অসি চালনা এবং মল্লযুদ্ধে সেনা সদস্যরা উতরে গেল। কিন্তু খাবার সময় ওরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়লো। বিশাল এলাকা জুড়ে খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। এক পাশ সেনা সদস্যদের জন্য, অন্য পাশ বিশেষ অতিথিদের।

হরেক রকম খাবারের মনমাতানো গন্ধে মরুভূমির রাতের বাতাস ম-ম করছিল। সিপাইদের সামনে ছিল মদের মশক। খাওয়া শেষ হতেই ওরা মদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন সুলতান সালাহউদ্দিন। কি ভাবছেন তিনি তা তার চেহারা দেখে বুঝা যাচ্ছিল না।

নাজিকে প্রশ্ন করলেন, 'এদের কিভাবে নির্বাচিত করলেন? এরা কি ফৌজের বাছাইকৃত সিপাই?'

'হ্যাঁ, আমীর।' ফিসফিসে কণ্ঠে বললেন নাজি, 'এরা সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ সৈনিক। যুদ্ধের ময়দানে এদের নৈপুণ্য দেখলে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন। ওরা একটু বাড়াবাড়ি হয়তো করছে, কিন্তু আপনার ইশারায় জীবন দিতে প্রস্তুত। আনন্দ উল্লাস করার জন্য মাঝে মধ্যে এদেরকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেই। মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীটাকে খানিক ভোগ করে নিক।'

আইয়ুবী এ যুক্তির কোন জবাব দিলেন না। নাজি অন্য অতিথিদের দিকে ফিরতেই তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, 'যা দেখার আমি দেখেছি। এরা মদ আর উচ্ছৃঙ্খলতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তুমি বলেছিলে এদের চেতনায় কোন আবেগ নেই, আমি দেখছি কোন চরিত্র নেই। এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে জীবন নিয়ে পালাবে। লুট করবে নাগরিক সম্পদ। বিজিত এলাকার মেয়েদের সাথে পশুর মতো ব্যবহার করবে।'

'এর অর্থ হলো', আলী বললেন, 'আপনি বিভিন্ন এলাকার লোক দিয়ে যে ফৌজ তৈরী করেছেন, এদেরকে ওদের সাথে একীভূত করে দিন। ভাল সিপাইদের সাথে মিশলে এদের স্বভাব সংশোধন হয়ে যেতে পারে।'

মৃদু হেসে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি আমার মনের কথা জানতে পেরেছো। এতোক্ষণ আমিও তাই ভাবছিলাম। আর কারো কাছে এ কথা প্রকাশ করো না।'

আলী কিছু বলতে যাচ্ছিল, সামনে কয়েকটি মশাল জ্বলে উঠলো, বেজে উঠলো সানাই আর সারিন্দার সুমধুর সুর। সমাবেশে নেমে এলো অখণ্ড নীরবতা। এক দিকে দেখা দিল নর্তকীর দল। পরণে ঝলমলে নাচের পোশাক। আধখোলা দেহ, নগ্ন কাঁধে ছড়ানো চুল।

হু হু করে বয়ে যাচ্ছে মরুভূমির উচ্ছল রাতের বাতাস। সে বাতাসে ওদের চুল উড়ছে। পতাকার মতো পতপত করছে ঢেউ খেলানো জরীন পোশাক। মনে হচ্ছে বাতাসে ভর করে উড়ে আসছে এক ঝাঁক সোনালী পরী। প্রসারিত দুই বাহু মেলে দেয়া দুই উড্ডু ডানা। সেই ডানায় বাঁধা রেশমী রুমাল। সেই রুমালে আঁকা বিচিত্র বর্ণালী রঙ। সেই রঙের ভেতর একেকটি মুখ ফুটে আছে রক্তপদ্মের মতো। কোমল, পেলব। মসৃন উন্মুক্ত বাহুলতায় অপার্থিব জ্যোতির পরাগ। পা নড়ছে না ওদের, কিন্তু বাদ্যের তালে তালে ছন্দোবদ্ধভাবে সামনে এগিয়ে আসছে।

দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো সালাহউদ্দিনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো যুবতীরা। মাথা নোয়াল কুর্ণিশ করার জন্য। সোনালী চুল পিছলে সামনে চলে এলো।

দেখা গেলো দূর থেকে দৈত্যের মতো এক হাবশী দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। পরণে চিতাবাঘের চামড়ার তৈরী পোশাক। হাতে বিশাল এক ডালা, ডালা ভর্তি অর্ধফোটা ফুল। তরুণীদের সামনে এসে ওটা নামিয়ে রাখলো সে। বেড়ে গেলো বাদ্যের আওয়াজ। বন্য মোষের মতো গজরাতে গজরাতে আবার ফিরে গেলো কাফ্রী।

নড়ে উঠলো দ্বিতীয়ার চাঁদ। চাঁদের খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে এলো অনিন্দ্য এক চাঁদবদনী। মনে হলো ধূসর মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ। যেন এ যুবতী এ গ্রহের কেউ নয়। ঠোঁটে তার মৃদু হাসির ঝিলিক। হাসি তো নয়, যেনো অনবদ্য এক খাপখোলা তলোয়ার।

অবাক বিস্ময়ে মোহগ্রস্থের মতো তাকিয়ে রইলো দর্শকবৃন্দ। দৃষ্টি তাদের পলকহীন। স্মিত হেসে সালাহউদ্দিনের দিকে তাকালেন আলী বিন সুফিয়ান, আইয়ুবীর ঠোঁটেও মুচকি হাসি।

'ও এতোটা সুন্দরী, ধারণা করিনি।' আলীর কানে কানে বললেন তিনি।

'মিশরের আমীরের জয় হোক' বলতে বলতে এগিয়ে এলো নাজি। 'ওর নাম জুকি।' বললো সে, 'আপনার জন্য ইস্কান্দারিয়া থেকে আনিয়েছি। ও নর্তকী বা দেহপসারিণী নয়। কখনো সখনো শখের বশে নাচে বটে, তবে কোন জলসায় যায় না। ওর পিতা আমার পরিচিত, বড় ব্যবসায়ী। এ মেয়েটা আপনার খুব ভক্ত। আপনাকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবাসে না বলে বরং নবীর মতো সম্মান করে বলাই ভাল। ঘটনাচক্রে হঠাৎ ওর বাবার সাথে দেখা। একটা কাজে ওদিকে গিয়েছিলাম। মেয়েটা বললো, 'শুনেছি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মিশরের গভর্ণর হয়ে এসেছেন? মেহেরবানী করে আমাকে তার সাথে দেখা করিয়ে দেবেন? তাকে দেখার মতো আমার জীবন আর নাচ ছাড়া কিছুই নেই। মাননীয় গভর্ণর, এ মেয়েটাকে আপনার সামনে হাজির করার জন্যই নাচগানের অনুমতি চেয়েছিলাম।'

'আপনি কি ওকে বলেননি, মেয়েদের অর্ধনগ্ন দেহ বা নাচগান আমি পছন্দ করি না।

আপনি যাদের পোশাক পরা বলছেন ওরাতো সবাই উলঙ্গ।'

'মহামান্য সুলতান', ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন নাজি, 'আপনি নাচ গান পছন্দ করেন না এ কথা আমি ওকে বলেছি। ও বললো, আমার নাচ তিনি পছন্দ করবেন। কারণ, আমার নৃত্যে পাপের আহবান নেই। দেহ নয়, সুলতানকে আমি শালীনভাবে নৃত্যের শৈল্পিক কলাকৌশল দেখাবো। আমি পুরুষ হলে তার নিরাপত্তার জন্য জীবন বিলিয়ে দিতাম।'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?'

'ওকে কাছে ডেকে একটু ধন্যবাদ জানালে ও খুব খুশী হবে।'

'আপনি চাচ্ছেন আমি তাকে ডেকে বলি, হাজার হাজার মানুষের সামনে তোমার নগ্ন দেহটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছো, পুরুষের ঘুমন্ত পশু সত্ত্বাকে উসকে দিতে তোমার জুড়ি নেই, এ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ!'

'ছি! ছি! তা কেন করবেন মাননীয় সুলতান। আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম, এখানে এলে ওকে আপনার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবো। মেয়েটা অনেক আশা নিয়ে এসেছে। দেখুন ওর নৃত্যে পাপের আহবান নেই, আছে নীরব আত্মসমর্পণ। দেখুন না কেমন করে ও আপনার দিকে তাকিয়ে আছে! ও তার নৃত্যের কলাকৌশল, ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং মাদকতাময় দৃষ্টি দিয়ে আপনার উপাসনা করছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওকে আপনার তাঁবুতে আসার অনুমতি দিন। আগামী দিন যারা হবে ইসলামের রক্ষক, ও হবে সে বীরপ্রসূ মায়েদের একজন। নিজের সন্তানদের কাছে গর্ব করে বলতে পারবে, আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে একান্তে কথা বলেছি।'

'ঠিক আছে ওকে আমার তাঁবুতে পাঠিয়ে দেবেন।'

অপূর্ব দেহবল্লরীতে কম্পন তুলে নাচছে জুকি। মদির কটাক্ষ হেনে তাকাচ্ছে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দিকে। ঠোঁটে মধুমাখা মিষ্টি হাসির ঝিলিক। অন্য মেয়েরা প্রজাপতির মতো বিরতিহীন করে উড়ে বেড়াচ্ছে। মশালের ক্ষীণ আলোয় মনে হচ্ছে [illegible] স্বচ্ছ পানিতে [illegible] দল বেঁধে সাঁতার কাটছে।

নিপুণ [illegible] আইয়ুবী। নাজির চেহারায় [illegible]। মরুভূমির সেই খোলা [illegible] এক অপার্থিব সুর শিহরণ। ছন্দের তালে [illegible] ধ্বনি।

[illegible] নাজি [illegible] খুশী। [illegible] চলছে, ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর [illegible]।

[illegible] তাঁবুতে প্রবেশ করলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। মেঝেতে দামী কার্পেট। [illegible] রেশমী পর্দা। [illegible] চামড়ার তৈরী আচ্ছাদন। কক্ষে মরু [illegible] আলোর ফুলঝুরি। বাতাসে মোহনীয় আতরের [illegible]। নাজি তাঁবুতে ঢুকে বললেন, 'ওকে কিছু সময়ের জন্য পাঠিয়ে দেবো মহামান্য সুলতান? [illegible]'

'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও।'

ধূর্ত শিয়ালের মতো লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেলো নাজি। খানিক পর দেহরক্ষীরা দেখলো এক নর্তকী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই তরুণীকে চিনতে পারলো ওরা, এখনো নাচের ফিনফিনে পোশাক পরে আছে। রক্ষীরা ওর পথ আটকে দাঁড়ালো। ও বললো, 'মহামান্য সুলতান আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।'

কমান্ডার বললো, 'যেসব আমীর বাজে মেয়েদের সাথে রাত কাটায় সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাদের মতো নন।'

'তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখো না, না ডাকলে কোন্ সাহসে আমি এখানে আসবো?'

'কার মাধ্যমে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'সেনাপতি নাজি আমাকে বললেন, সুলতান তোমায় ডাকছেন। আপনারা বললে আমি ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু এর সব দায়দায়িত্ব আপনাদের।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এক নর্তকীকে শোবার ঘরে ডাকবেন, রক্ষীদের কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হলো। তারা জানতো, তিনি কেমন প্রকৃতির মানুষ। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, নাচগানের সাথে যারা সম্পর্ক রাখবে তাদের একশত বেত্রাঘাত করা হবে।

সমস্যায় পড়লো রক্ষী কমান্ডার। সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে ভয়ে ভয়ে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর তাঁবুতে প্রবেশ করে দ্বিধাকম্পিত কণ্ঠে বললো, 'বাইরে এক নর্তকী দাঁড়িয়ে আছে, আপনি নাকি তাকে ডেকেছেন।'

'হ্যাঁ, ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

কমান্ডার বেরিয়ে গেলো। তাঁবুতে প্রবেশ করলো জুকি। রক্ষীদের ধারণা ছিল, গভর্ণর তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাঁবু থেকে বের করে দেবেন। আইয়ুবীর বজ্র হুংকার শোনার জন্য ওরা কান পেতে রইলো। কিন্তু এমন কিছুই ঘটলো না।

রাত এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁবুর ভেতর শোনা যাচ্ছে অনুচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ। কমান্ডার সীমাহীন উদ্বেগ নিয়ে বাইরে পায়চারী করতে লাগলো। এক রক্ষী বললো, 'বাজে মেয়েদের সাথে সম্পর্ক রাখা নিষেধ শুধু আমাদের জন্য।'

'হ্যাঁ', অন্যজন বললো, 'অধীনস্ত আর প্রজাদের জন্যই শুধু আইনের কড়াকড়ি। গভর্ণরকে তো আর বেত মারা যাবে না!'

'রাজা বাদশাদের কাজই এমন।' কমান্ডারের কণ্ঠে ঝাঁঝ। 'হয়তো তিনি মদও পান করেন, উপরের গাম্ভীর্য কেবল আমাদের প্রভাবিত করার জন্য।'

একটিমাত্র ঘটনায় সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সম্পর্কে ওদের এতদিনকার সকল ধারণা নিঃশেষ হয়ে গেল। ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক বিলাসপ্রিয় চরিত্রহীন রাজকুমারের ছবি।

নাজির খুশীর অন্ত নেই। সালাহউদ্দিন টোপ গিলেছে। তাকে সন্তুষ্ট করার অস্থিরতায় আজ তিনি মদ পর্যন্ত স্পর্শ করেননি। হৃদয়ভরা আনন্দ নিয়ে এডরোসসহ তাঁবুতে ঝিমুচ্ছিলেন তিনি।

এডরোস বললো, 'ও অনেকক্ষণ হয় গেছে। সম্ভবত আমাদের নিক্ষিপ্ত তীর সালাহউদ্দিনের হৃৎপিণ্ডে বিঁধে গেছে।'

'আমার নিক্ষিপ্ত তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নাজি।

'তীরের নিশানা ভুল হলে এতোক্ষণে ও ফিরে আসতো। তুমি ঠিকই বলছো, জুকি মায়ারূপী এক যাদুকন্যা। নয়তো সালাহউদ্দিনের মতো পাথর গলাতে পারতো না।'

'আমি যে ট্রেনিং তাকে দিয়েছি, ঘাতকদল তা কল্পনাও করতে পারবে না। সালাহউদ্দিনকে এখন শুধু মদ খাওয়ানোটা বাকী।'

বাইরে কারো পদশব্দে নাজি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁবুর পর্দা তুলে তাকালেন বাইরে। না, জুকি নয়, একজন সৈনিক যাচ্ছে। নাজি দৃষ্টি ছুঁড়লেন আইয়ুবীর তাঁবুর দিকে। বাইরে রক্ষীরা টহল দিচ্ছে। ফিরে এসে এডরোসকে বললেন, 'এবার আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, আমার জুকি পাথর ভেঙেছে।'

রাতের শেষ প্রহর। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো জুকি। নাজির তাঁবুর দিকে না গিয়ে হাঁটা দিল অন্য দিকে। পথে আপাদমস্তক ঢাকা এক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটি জুকিকে ইশারায় কাছে ডাকলো। এগিয়ে গেলো জুকি। লোকটি তাকে অন্য এক তাঁবুতে নিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর নাজির তাঁবুর দিকে হাঁটা দিল ও।

নাজির চোখে ঘুম নেই, ও একবার তাঁবুর ভেতর ঢুকছিল, আবার বেরিয়ে আসছিল অস্থিরভাবে। কখনো হৃদয়ে তোলপাড় করা আনন্দ নিয়ে তাকাচ্ছিল আইয়ুবীর তাঁবুর দিকে। ভাবছিল, আকাশের উদার বিস্তার থেকে সালাহউদ্দিনকে তার পায়ের কাছে নামিয়ে এনেছে জুকি।

'মহামান্য, রাত তো শেষ হয়ে এলো, এখনো যে ও ফিরল না?'

'ও আর কখনো ফিরে আসবে না। গভর্নর তাকে সাথে নিয়ে যাবে। কোন রাজপুত্রই এমন হীরের টুকরো ফেলে দিতে পারে না, এদিকটা ভেবেছো কখনো?'

'না তো! এদিকটা চিন্তা করিনি।'

'সুলতান তাকে বিয়ে তো করে নিতে পারেন! তাহলে মেয়েটা আমাদের কোন কাজেই আসবে না।'

'এ চিন্তাই সত্য।'

'অতুল এক সম্রাটকে অন্ধ বিশ্বাস করা যায়! নিজে অভিজ্ঞ পেশাদার নাচিয়ে। মা-ও নর্তকী ছিল। আসলেই সে আমাদের ধোঁকা দিতে পারে।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো ওরা।

তাঁবুতে ঢুকলো জুকি। হেসে বললো, 'এবার আমাকে আমার দেহের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিন।'

'কি হয়েছে আগে বলবে তো!' নাজির কণ্ঠে অস্থিরতা।

'আপনি যা চাইছিলেন, তাই। আপনাকে কে বললো সালাহউদ্দিন পাথর? খোদার কসম! ঠিক এক পাক্কা মুমীন' মাটিতে পা ঠুকে বললো জুকি, 'সে মরুভূমির বালুর চাইতেও বেশী অসহায়, সামান্য বাতাসেই তাকে উড়িয়ে নেয়ার জন্য যথেষ্ট।'

'তোমার রূপের জৌলুস আর কণ্ঠের মধু তাকে উতলা করে দিয়েছে।' এডরোস বললো, 'নয়তো হারামিটা এক দুর্গম পাথুরে পর্বত।'

'পাথুরে পর্বত ছিল, এখন বালিয়াড়িও নয়।'

'আমার ব্যাপারে কোন কথা হয়েছে?' নাজির প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করলো, নাজি লোকটা কেমন? আমি বলেছি, মিশরে আপনার বিশ্বস্ত এবং অনুগত কেউ থাকলে একমাত্র নাজিই রয়েছে।'

'আমার সাথে পরিচয় কিভাবে জানতে চায়নি?'

'চেয়েছে। বলেছি তিনি আমার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাদের বাড়ী গিয়ে আব্বাকে বললেন, আমি সালাহউদ্দিনের নফর। তিনি যদি আমায় সাগরে ঝাঁপ দিতে বলেন, তাও আমি দেবো।'

'বাহবা, বেশ বলেছো।'

'আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'তুমি তো ভদ্রঘরের এক সম্ভ্রমশীলা তরুণী।' আমি তাকে বললাম, 'অন্যের কাছে আমি যাই হই, আপনার কাছে আমি নগন্য এক দাসীমাত্র। আপনার ইশারাই আমার জন্য নির্দেশ।'

'তারপর?'

'আমার এ কথায় প্রভাবিত হয়ে তিনি বললেন, 'তুমি খুব ভাল মেয়ে। আরে অত দূরে কেন, আরেকটু কাছে এসে বসো।' আমি খুব লজ্জিতভাবে জড়তা ও দ্বিধার ভাব নিয়ে তার পাশে গিয়ে বসলাম। আগে তিনি পাথর থাকলেও আমার দেহের স্পর্শে বলা যায় মোমের মতো গলে গেছেন। বিদায়ের সময় আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, 'জীবনে এই প্রথম পাপ করেছি।' আমি বললাম, 'আপনি কোন পাপ করেননি, প্রতারণা বা জোরাজুরিও করেননি। অন্যান্য শাসকদের মতো জোর করেও ধরে আনেননি। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি, আপনার অনুমতি পেলে আবারো আসবো, বার বার আসবো।'

নিজের নগ্ন দেহের মতো অনেক নগ্ন মিথ্যা অবলীলায় বলে গেল জুকি। আনন্দের আতিশয্যে জুকিকে জড়িয়ে ধরলো নাজি। এডরোস দু'জনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলো।

রহস্য ঘেরা মরুরাতের জঠর থেকে জন্ম নিল একটি প্রভাত, তবে অন্য প্রভাতের চেয়ে ভিন্ন। এ ভোরের আলো মরুরাতের আঁধার বুকে এমন এক নিগূঢ় তথ্য লুকিয়ে রাখলো, যার মূল্য সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সমান। গত রাতে ঘটে যাওয়া রহস্যের দুটি দিক ছিল। একটি জানতো নাজি এবং এডরোস। দ্বিতীয়টি আইয়ুবীর দেহরক্ষীরা। আর দু'টি দিকই জানতেন আলী বিন সুফিয়ান, আইয়ুবী এবং জুকি।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এবং তার সঙ্গীদের অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে বিদায় দিয়েছিল নাজি। দুই সারিতে দাঁড়িয়ে ছিল সুদানী ফৌজ। 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী জিন্দাবাদ'-এর ধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো আকাশ বাতাস। কিন্তু আইয়ুবী মৃদু হাসি বা হাত নেড়ে এ অভিবাদনের কোন জবাব দিলেন না।

নাজির সাথে হাত মিলিয়ে দ্রুত ঘোড়ায় চেপে বসলেন তিনি। তাকে অনুসরণ করলো অন্য সঙ্গীরা। অফিসে গিয়ে আলী এবং একজন সহকারীকে নিয়ে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। দিন কাটালেন রুদ্ধদ্বার কক্ষে।

সূর্য ডুবে গেলো। রাতের অন্ধকার গ্রাস করলো পৃথিবী। কিন্তু তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষের

দরজা খুললেন না। কক্ষে খাবার বা পানি দেয়ারও সুযোগ দিলেন না কাউকে। অনেক রাতে তিনজন কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ ঘরের দিকে হাঁটা দিলেন।

আলী বিন সুফিয়ান একা হতেই কমান্ডার তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'জনাব,' অভিমানে ভরা কমান্ডারের কণ্ঠ, 'নির্দেশ পালন করা এবং মুখ বন্ধ রাখা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু আমার সিপাইদের মধ্যে অসন্তুষ্টি আর নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়েছে। আমারও একই অবস্থা।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'রক্ষীরা বলছে, সুদানী বাহিনীর জন্য মদ বৈধ হলে আমরা কি অপরাধ করেছি? আমার অনুযোগকে অপরাধ মনে করলে যে কোন শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করবো। গভর্ণরকে আমরা একজন সৎ, চরিত্রবান এবং খোদাভীরু লোক বলে জানি। হাসিমুখে জীবন বিলিয়ে দিতে পারি তার সামান্য ইশারায়।'

'কিন্তু গত রাতে তার তাঁবুতে এক নর্তকী প্রবেশ করেছিল, এইতো!' কমান্ডারের মুখের কথা টেনে নিলেন গোয়েন্দা প্রধান। 'না, তুমি কোন অপরাধ করোনি। রাজা করুক আর প্রজা করুক, পাপ সে পাপই। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, গভর্ণরের সাথে নর্তকীর গোপন সাক্ষাতের মধ্যে পাপের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের মধ্যে কি কথা হয়েছে এ মুহূর্তে বলা যাবে না। কয়েকটা দিন যাক, সব নিজেরাই বুঝতে পারবে।'

কমান্ডারের কাঁধে হাত রেখে তিনি আবার বললেন, 'আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন আমের বিন সালেহ, তুমি অভিজ্ঞ সৈনিক। ভাল করেই জানো ফৌজ এবং ফৌজি কর্মকর্তাদের এমন কিছু গোপন ব্যাপার থাকে যার গোপনীয়তা রক্ষা করা সকলের কর্তব্য। নর্তকী আইয়ুবীর তাঁবুতে গিয়েছিল তাও এক গোপন ব্যাপার। কাউকে সন্দেহের মধ্যে রেখো না, কারো সামনে ভুলেও প্রকাশ করোনা সে রাতে কি ঘটেছিল।'

আলীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কমান্ডার অবহিত ছিল। সে নিশ্চিন্ত ও নিঃসন্দেহ হয়ে গেলো। সন্দেহের অবসান ঘটলো সিপাইদেরও।

দুপুরের খানা খাচ্ছিলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, তাকে নাজির আগমনের সংবাদ দেয়া হলো। খাওয়া শেষে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। নাজির চেহারায় শংকা এবং ক্রোধের অভিব্যক্তি। কম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'মহামান্য সুলতান! পঞ্চাশ হাজার সুদানী ফৌজকে দলে দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজের সাথে একীভূত করার নির্দেশ কি আপনি দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, অনেক চিন্তা ভাবনার পরে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মিশরের সেনাবাহিনীতে সর্বোচ্চ ১০ জন থাকবে সুদানী সেনা। আপনাকে হেডকোয়ার্টারে বদলী করা হয়েছে, এখন থেকে আপনি আর সুদানী বাহিনীর প্রধান নন।'

'মহামান্য সুলতান, এ আমার কোন অপরাধের শাস্তি?'

'সেনাবাহিনীর সামরিক স্বার্থেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সৈনিক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণে হেডকোয়ার্টার আপনার সেবা নিতে চাচ্ছে, এ-তো আপনার জন্য খুশীর খবর। কেবল একটি বাহিনী নয়, আপনি কি চান না আপনার অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হোক আমাদের সকল সৈনিক?'

'সুলতান, আমার আশংকা হচ্ছে, সম্ভবতঃ আমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র চলছে।

আপনার মহান ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে একটু যাচাই বাছাই করবেন। আমার মনে হয় কেন্দ্রে আমার কোন শত্রু রয়েছে।'

'দেখুন, সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনের ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জনাই এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। অফিসার হোক কি সাধারণ সিপাই, এখন থেকে সকলের জন্য মদ নিষিদ্ধ। কোন অনুষ্ঠানে নাচগান চলবে না।'

'কিন্তু মাননীয় সুলতান! আমি তো আপনার অনুমতি নিয়েই সবকিছু করেছিলাম।'

'আপনি যাদেরকে মুসলিম মিল্লাতের সেনাবাহিনী বলছেন, তাদের আসল চরিত্র দেখার জন্য নাচ গানের অনুমতি আমি দিয়েছিলাম। পঞ্চাশ হাজার সৈনিককে তো চাকুরীচ্যুত করতে পারছি না, এ জন্য মিশরের ফৌজের সাথে একীভূত করে ওদের সংশোধন করতে চাচ্ছি। মনে রাখবেন, আমরা কেউ সুদানী, মিশরী বা সিরীয় নই। আমরা সবাই মুসলমান। আমাদের ধর্ম এক, পতাকাও এক।'

'আমার অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কি একবারও ভেবেছেন?'

'দেখুন, এ সিদ্ধান্ত আপনার মনপুত না হলে আপনি সেনাবাহিনী থেকে ইস্তফা দিতে পারেন। আপনার ওপর আমি কোন কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না।'

'মহামান্য আমীর, এ অন্যায়, এ জুলুম!'

'কোনটা অন্যায় আর জুলুম তা বুঝার সাধ্যি কি আপনার আছে? নিজের অতীত একটু নিজেই তলিয়ে দেখুন গিয়ে, আমার মুখে শোনার প্রয়োজন হবে না।'

'মহামান্য সুলতান, এ সিদ্ধান্ত আরেকবার একটু বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি।'

'অনেক ভেবেচিন্তেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফিরে গিয়ে সব কিছু প্রস্তুত করুন। কোনরকম হটকারিতার আশ্রয় নেবেন না। মনে রাখবেন, আমার মনোনীত ব্যক্তির কাছে সাত দিনের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে।'

নাজি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার মুখ খোলার আগেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

জুকি গভর্ণরের তাঁবুতে রাত কাটিয়েছে, নাজির গোপন হারেমেও এ সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। ও এসেছে এই সেদিন, অথচ নাজি প্রথম দিন থেকেই অন্য সবার চাইতে ওকে বেশী ভালবাসে। এক মুহূর্তের জন্যও অন্য নর্তকীদের কক্ষে তাকে যেতে দেয়া হয়নি। জুকির জন্য ছিল আলাদা কক্ষ। নর্তকীরা প্রতিহিংসার আগুনে পুড়তে লাগলো।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে ফাঁসানোর জন্য জুকিকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে ওরা তা জানতো না। ওদের ধারণা, জুকি নাজিকে এককভাবে দখল করে নিয়েছে। নর্তকী দু'জনের প্রতিহিংসা চরমে পৌঁছলে ওরা জুকিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

গভর্ণরের তাঁবুতে জুকির রাত কাটানোর সংবাদে ওরা আরো পাগল হয়ে উঠলো। কিভাবে তাকে হত্যা করা যায় ভাবতে গিয়ে ওদের মাথায় দুটি চিন্তা আসে। এক, তাকে বিষ প্রয়োগ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ ভাড়াটে খুনী দিয়েও খুন করানো যায়। কিন্তু বাস্তবে দুটোর একটাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, জুকির খাওয়া দাওয়া সবকিছু ছিল ওদের থেকে আলাদা, অন্যদিকে প্রহরী ছাড়া সে তার রুম থেকে বেরোতোই না।

ওরা হারেমের এক চতুর বাদীকে হাত করলো। জুকিকে শেষ করতে পারলে প্রচুর ধন সম্পদ দেয়ার লোভ দেখালো তাকে। চাকরানীটা ছিল লোভী এবং জঘন্য প্রকৃতির। হেরেমের অসংখ্য অপকর্মের হোতা ছিল সে।

প্রস্তাব শুনে সে বললো, 'মুনীবের কক্ষে গিয়ে ওকে বিষ খাওয়ানো সম্ভব নয়। সুযোগমত খঞ্জর ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে এ জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন।'

'কতদিন সময় প্রয়োজন তোমার?'

'জুকির তৎপরতার ওপর নজর রাখতে হবে। হয়তো শীঘ্রই সুযোগ এসে যাবে।'

'কিন্তু তাড়াতাড়ি যদি সুযোগ না আসে?'

'তাহলে ঘাতক দলের সহযোগিতা নিতে হবে। তবে ওরা এ জন্য অনেক টাকা দাবী করবে।'

'যত টাকা লাগে দেবো, তবু আমরা চাই কাজটা তুমি তাড়াতাড়ি শেষ করো।' বললো নর্তকীরা।

ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় নাজি কামরায় পায়চারী করছিল। জুকি তাকে শান্ত করার অনেক চেষ্টা করেছে। নাজির রাগ কমেনি।

'আমাকে তার কাছে যেতে দিন।' এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো বললো জুকি, 'আমি তাকে সোজা পথে নিয়ে আসবো।'

'কোন লাভ নেই। বেটা কমবখত হুকুম দিয়ে ফেলেছে, বাস্তবায়নও শুরু হয়ে গেছে। আমার আর কিছুই রইলো না। তোমার যাদু ওকে ধরেনি। আমার বিরুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করছে জানি। ওরা আমার উন্নতি সইতে পারছে না। আমিই হতাম গভর্ণর। একজন সাধারণ সেনাপতি হয়েই সব শাসকদের শাসন করেছি আমি। আর এখন আমি একজন সামান্য কমাণ্ডারও নই।'

নাজি প্রহরীকে ডেকে বললো, 'জলদি এডরোসকে আসতে বলো।'

এডরোস এলে দু'জন নতুন নির্দেশনামার ব্যাপারে আলাপ করলো। এডরোসের কাছে এ খবর নতুন না হলেও সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে এ ব্যাপারে এডরোস কোন পরামর্শ দিতে পারলো না। নাজি বললো, 'কি করবো আমি ভেবে নিয়েছি।'

'কি ভেবেছেন?'

'বিদ্রোহ করবো।'

হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলো এডরোস।

'কি ব্যাপার, হতবাক হয়ে গেছো মনে হচ্ছে? বলতো পঞ্চাশ হাজার সুদানী ফৌজ আমাদের পক্ষে থাকবে, না সালাহউদ্দিনের পক্ষে? আমি ওদেরকে বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দিতে পারবো, মিশর তোমাদের কিন্তু তোমরা এখন হবে ওদের দাসানুদাস।'

দীর্ঘশ্বাস টেনে এডরোস বললো, 'এ নিয়ে এখনো ভাবিনি। চোখের পলকেই তো বিদ্রোহ ঘটানো যায়। কিন্তু মিশরের নতুন ফৌজ আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এবং যথেষ্ট শক্তিশালী। ইচ্ছে করলেই ওরা বিদ্রোহ দমন করতে পারবে। সরকারের সাথে সংঘর্ষে যাবার আগে সবদিক ভেবে দেখা উচিত।'

'ভাবাভাবির কাজ শেষ। আমি খৃস্টান সম্রাটদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকবো। দূত তৈরী করো, অনেক দূর যেতে হবে ওদের। এবার মন দিয়ে আমার পরিকল্পনার কথা শোন। জুকি তুমি নিজের ঘরে যাও।'

জুকি ফিরে গেলো নিজের কক্ষে। সারারাত দু'জন দরজা বন্ধ করে বিদ্রোহের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলো।

দুই ফৌজ একীভূত করার জন্য আইয়ুবী সাতদিন সময় দিয়েছিলেন। কাগজপত্র তৈরী হতে লাগলো। পূর্ণ সহযোগিতা করছিল নাজি। চারদিন পার হয়ে গেছে, এর মধ্যে গভর্নরের সাথে আরো একবার দেখা করেছে নাজি, কিন্তু কোন অনুযোগ করেনি। কাজের বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়ে আইয়ুবীকে আশ্বস্ত করেছে। গভর্নরের সহকারীও তাকে আশাব্যঞ্জক সংবাদ দিচ্ছিল, কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের দেয়া তথ্য ছিল উদ্বেগজনক।

গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বলা হলো, 'সুদানী সৈন্যদের মাঝে অসন্তোষ বিরাজ করছে। গুজব ছড়ানো হচ্ছে, মিশরের সেনাবাহিনীর সাথে একত্রিত করে সুদানী সৈন্যদেরকে তাদের দাস দাসীতে রূপান্তর করা হবে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে সুদানীদের কোন অংশ থাকবে না। বিশেষ করে কাউকে মদ পানের অনুমতি দেয়া হবে না।'

রিপোর্ট শুনে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বললেন, 'অনেক দিনের বদ অভ্যাস, আমার এসব নীতি ওদের পছন্দ না হওয়ারই কথা। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নতুন পরিবেশে এলে কিছুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ওই মেয়েটার সাথে আর দেখা হয়েছে আলী?'

'না, দেখা করা সম্ভব হচ্ছে না। আমার পাঠানো লোকটাকে নাজি আটকে রেখেছে।'

দিন পেরিয়ে কালো নেকাব পরে প্রকৃতিতে নেমে এসেছে রাত। এডরোসের সাথে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসেছিল নাজি। জুকি তার নিজস্ব কামরায়। ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে এলো ওর। পর্দা তুলে বাইরে তাকালো জুকি।

দু'জন ঘোড়সওয়ার। পোশাক আশাকে ব্যবসায়ী মনে হচ্ছে।

ঘোড়া থেকে নেমে নাজির কক্ষের দিকে হাঁটা দিল ওরা। ওদের চালচলন জুকির কাছে ব্যবসায়ীর মতো মনে হলো না।

ততোক্ষণে এডরোস বেরিয়ে এসেছে। থমকে দাঁড়ালো আরোহী দু'জন। সামরিক কায়দায় স্যালুট করলো। এডরোস ওদের পোশাক দেখে বললো, 'প্রমাণ দাও।'

ওরা পোশাকের নীচে লুকানো অস্ত্র বের করলো। ছোট তলোয়ার এবং খঞ্জর।

ওদের ভেতরে নিয়ে গেলো এডরোস। প্রহরী দাঁড়িয়ে রইলো একপাশে।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো জুকি। কক্ষ থেকে বেরিয়ে নাজির কক্ষের দিকে হাঁটা দিল ও। পথরোধ করে দাঁড়ালো প্রহরী। বললো, 'কারো ভেতরে যাবার অনুমতি নেই।'

সে বুঝে নিল কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। দু'তিন রাত আগের কথা মনে পড়লো তার। নাজি এডরোসকে বলেছিল, 'আমি খৃস্টান শাসকদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকবো। তুমি দু'জন দূত তৈরী করো। ওদেরকে অনেক দূর যেতে হবে।' এর পর জুকিকে বিদেয় করে বিদ্রোহের ব্যাপারে আলাপ করেছিল ওরা।

নিঃশব্দে নিজের কক্ষে ফিরে এলো ও। নাজির খাস কামরার সাথে সংযুক্ত জুকির কক্ষের কপাট আঁটা। ও চুপিসারে দরজায় কান লাগিয়ে দাঁড়ালো। ওপাশের কক্ষে অস্ফুট শব্দ। কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না।

একটু পর ভেসে এলো নাজির কণ্ঠ, 'পরিষ্কার জনবসতি থেকে দূরে থাকবে। ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে এ চিঠি নষ্ট করে ফেলবে। পথে কেউ বাঁধার সৃষ্টি করলে হত্যা করবে নির্দয়ভাবে। চার দিনের সফর তিন দিনে অতিক্রম করতে হবে। মনে রেখো, তোমাদের রোখ থাকবে উত্তর পূর্ব দিকে।'

নাজির কক্ষ থেকে সেই দুই ব্যক্তি বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এলো জুকিও। এদের বিদায় দিতে নাজি এবং এডরোস আগেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। লোক দুটো ঘোড়ায় চেপে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। জুকির দিকে চোখ পড়তেই নাজি বললো, 'আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমি গিয়ে বিশ্রাম করো। একা একা ভাল না লাগলে হারেমে ঘুরাফিরা করতে পারো।'

'ঠিক আছে।' জুকি বললো।

ও এখানে আসার পর থেকে একবারের জন্যও বেরোতে পারেনি।

নাজি এবং এডরোস চলে যেতেই ও নিজের কক্ষে ফিরে গাউন পরলো। কোমরে একটা খঞ্জর গুঁজে হাঁটা দিল হারেমের দিকে।

হারেমের মেয়েরা অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকাতে লাগলো। এখানে ওর এই প্রথম আসা। সবাই আন্তরিকতার সাথে স্বাগতঃ জানালো ওকে। সেই দুই নর্তকী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। কথা বললো হেসে হেসে।

একটু পর বেরিয়ে এলো জুকি। হারেম আর নাজির বসত বাড়ীর মাঝখানটা নির্জন এবং এবড়ো থেবড়ো। নাজির বাড়ীর দিকে না গিয়ে ও অন্যদিকে চলে গেলো।

এদিকে ছিল একটা পায়ে চলা পথ। সে পথ ধরে হাঁটতে লাগলো জুকি। ওর পনর বিশ কদম পেছনে এক ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি তার চেহারা আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিল তার পিছু পিছু।

কিন্তু সতর্ক জুকি টের পেয়ে গেলো। সে তার চলার গতি বাড়িয়ে দিল, বেড়ে গেলো ছায়ামূর্তির গতিও। সামনে ঘন ঝোপঝাড়। জুকি ঝোপের আড়ালে ঢুকে গেলো, পেছনে ঢুকলো ছায়ামূর্তি। সেখান থেকে শ'তিনেক গজ দূরে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বাসগৃহ। আশপাশে সেনা অফিসারদের বাস ভবন।

জুকি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আইয়ুবীর বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগলো। বায়ে উদয় হলো ছায়ামূর্তি। ঝকঝকে জ্যোৎস্নায়ও তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। বিড়ালের মতো নিঃশব্দে এগোচ্ছিল সে।

ছায়ামূর্তির হাত উপরে উঠলো, বিদ্যুৎ গতিতে একটা খঞ্জর নেমে এলো জুকির বাম কাঁধ এবং ঘাড়ের মধ্যখানে।

আঘাত খেয়ে জুকিও কোমর থেকে খঞ্জর বের করলো। ছায়ামূর্তি আরেকটা আঘাত করলো ওকে। পাশ কেটে নিজেকে বাঁচিয়ে ডান হাতের খঞ্জর ছায়ামূর্তির বুকে আমূল বসিয়ে দিল জুকি। ভেসে এলো এক মরণ চিৎকার। চিৎকারটা নারী কণ্ঠের। জুকি এবার

আঘাত করলো ছায়ামূর্তির পেটে। মাটিতে পড়ে গেলো সে।

আক্রমণকারীর দিকে না তাকিয়েই দৌড়াতে লাগলো জুকি। রক্ত ঝরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ও।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বাড়ীর অর্ধেক পথ এখনো বাকী, মাথা ঘুরতে লাগলো ওর। গতি শ্লথ হয়ে এলো। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে শরীর। সে এখন টলছে, পা পড়ছে এলোমেলো। ভয় হলো, সে আর কখনো আইয়ুবীর বাড়ী পৌঁছতে পারবে না।

এবার ও চিৎকার করতে লাগলো। 'আলী, আলী, সুলতান।'

রক্তে ভিজে গেছে ওর পোশাক। পা টেনে টেনে এগিয়ে চলছে ও। অনেক কাছে চলে এলেও মনে হচ্ছে আইয়ুবীর বাড়ী পর্যন্ত ও আসলেই পৌঁছতে পারবে না। ও আলী এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে ডেকেই যাচ্ছিল। ওর ডাকাডাকির শব্দ কানে যেতেই ছুটে এলো এক পাহারাদার। টলতে টলতে জুকি তার গায়ের উপরই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। পাহারাদারকে বললো, 'আমাকে এক্ষুণি গভর্ণরের কাছে পৌঁছে দাও। জলদি। তাড়াতাড়ি করো।'

রক্তক্ষরণের অবস্থা দেখে পাহারাদার তাকে কাঁধে তুলে নিল।

শোবার ঘরে বসে আলীর নিকট থেকে রিপোর্ট নিচ্ছিলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। পাশে দু'জন পদস্থ কর্মকর্তা। আলীর রিপোর্ট অনুযায়ী সুদানী বাহিনীতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা রয়েছে। এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা চলছিল।

আতংকিত প্রহরী ভেতরে প্রবেশ করলো। কক্ষের চোখগুলো এক সংগে ঘুরে গেল তার দিকে। প্রহরী বললো, 'পাহারাদার একজন আহত মেয়ে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা গভর্ণরের সাথে দেখা করতে চাচ্ছে।'

তীরের মতো কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন আলী। পেছনে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। জুকিকে ভেতরে নিয়ে আসা হলো। একজনকে পাঠিয়ে দেয়া হলো ডাক্তারের জন্য। আইয়ুবী নিজের পালংকে শুইয়ে দিলেন ওকে। রক্তে ভিজে গেলো বিছানার চাদর।

'কাউকে ডাকতে হবে না।' ক্ষীণ কণ্ঠে বললো জুকি, 'আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি।'

'জুকি, তোমাকে কে আহত করেছে?' আলী প্রশ্ন করলেন।

'আগে জরুরী কথা শুনুন। এখনি উত্তর-পূর্ব দিকে লোক পাঠিয়ে দিন। দেখতে পাবেন দু'জন অশ্বারোহী দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। দু'জনের পরণেই বাদামী পোশাক। দেখতে ব্যবসায়ী মনে হবে। একজনের ঘোড়া ধূসর, অন্যেরটা কালো। খৃষ্টান সম্রাট ফ্রাঙ্কের কাছে নাজির লেখা চিঠি আছে ওদের কাছে। নাজি সুদানী বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহ করবে। আমি আর কিছুই জানি না। আপনাদের দেশ ভয়ংকর সংকটের মুখে। অশ্বারোহী দু'জনকে পথেই ধরে ফেলতে হবে। ওরা সবকিছু জানে।' বলতে বলতে থেমে গেলো জুকি। জ্ঞান হারিয়েছে ও।

দু'জন ডাক্তার দ্রুত ঘরে ঢুকলেন। রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন ওরা। ওষুধ খাওয়ানোর কয়েক মিনিট পর জ্ঞান ফিরে এলো ওর।

জ্ঞান ফিরতেই জুকি নাজির সাথে এডরোসের কথাবার্তা থেকে শুরু করে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলো। এরপর বললো, 'আততায়ীকে আমি চিনি না, আঘাত পেয়ে পাল্টা আঘাত করেছিলাম। তার চিৎকার শুনে মনে হয়েছে মহিলা। তবে এখন পর্যন্ত বেঁচে নেই হয়তো।'

সাথে সাথে আক্রমণ স্থলে লোক পাঠিয়ে দেয়া হলো। জুকির রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না। ও সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর হাতে চুমো খেয়ে বললো, 'আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার দেশকে অবশ্যই নিরাপদে রাখবেন। আপনি পরাজিত হতে পারেন না। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ঈমান কত দৃঢ় আমারচে বেশী কেউ জানে না।'

এরপর আলী বিন সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি তো দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিনি। যে জিম্মা আমাকে দিয়েছিলেন আমি তা পূর্ণভাবে পালন করেছি।'

'তুমি অনেক বেশী পালন করেছো জুকি।' আলী বললেন, 'নাজি এতটা বিপজ্জনক আমি কল্পনাও করিনি, যার জন্য তোমায় জীবন দিতে হলো। আমি শুধু তথ্য সংগ্রহের জন্য তোমাকে ওখানে পাঠিয়েছিলাম।'

'হায়! আমি যদি মুসলমান হতাম।' বেদনা ঝরে পড়লো জুকির কণ্ঠ থেকে। সাথে সাথে বেরিয়ে এলো অশ্রুর বন্যা।

'আমাকে যে বিনিময় দেয়ার কথা ছিল তা আমার অন্ধ পিতা আর চির রোগা মাকে পাঠিয়ে দেবেন। তাদের অপারগতাই বার বছর বয়সে আমাকে নর্তকী হতে বাধ্য করেছিল।'

ফ্যাকাশে হয়ে এলো জুকির। হঠাৎ মাথা একদিকে ঢলে পড়লো। অর্ধনিমিলিত চোখ আর ঈষৎ ফাঁক করা ঠোঁট দেখে মনে হচ্ছিল ও মৃদু হাসছে। ডাক্তার ওর নাড়িতে হাত রাখলেন। করুণ চোখে চাইলেন আইয়ুবীর দিকে।

'ও যে নর্তকীই হোক, সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হবে ওকে।' বললেন আইয়ুবী, 'ইচ্ছে করলে ও আমাদের ধোঁকাও দিতে পারতো। কিন্তু তার পরিবর্তে ও ইসলামের জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছে।'

একজন এসে বললো, 'একজন মহিলার লাশ নিয়ে আসা হয়েছে।'

[illegible] মধ্যবয়সী এক অপরিচিতা মহিলা। আঘাতের স্থানে দুটো খঞ্জর পাওয়া গেলো। [illegible] জানা গেলো, মহিলা ছিল নাজির হারেমের চাকরানী। নর্তকীদের [illegible] জুকিকে হত্যা করতে এসেছিল, যার জন্য কেউ তাকে চিনতে পারেনি।

[illegible] সম্পূর্ণ [illegible] মর্যাদায় জুকিকে সমাহিত করা হলো। মাটি খুঁড়ে পুঁতে [illegible] হলো।

রাতেই সালাহউদ্দিন আইয়ুবী পলাতক অশ্বারোহীদের ধরে আনার জন্য আটজন [illegible] করলেন। জুকির নির্দেশিত পথ ধরে ধাওয়া করে ছুটলো ওরা। [illegible] আলী বিন সুফিয়ানের নেতৃত্বে।

জুকি ছিল [illegible] এক নর্তকী। তার ধর্ম সম্পর্কে কেউ জানতে পারেনি। নাজি

শত্রুর বিরুদ্ধে সুন্দরী যুবতী এবং হাশিশ ব্যবহার করে একথা জানতেন আলী। তাই তিনি এক বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে মরক্কো থেকে জুকিকে আনিয়েছিলেন। এরপর নারী ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে নিজেই ওকে নাজির কাছে বিক্রি করেছিলেন।

মেয়েটার মধ্যে ছিল যাদুর চমক। নাজি ওকে সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে গেলো। নাজির গোপন বৈঠকে হাজির থাকতো জুকি। সম্বর্ধনার রাতে ওকে আইয়ুবীর তাঁবুতে পাঠিয়ে নাজি ভীষণ খুশী হয়েছিল। এতদিনে পাথর গলানো যাবে, মেয়েটা তাকে মদ খাওয়াবে, এরপর তাকে নিজের ইচ্ছে মতো গড়ে নিতে কতোক্ষণ– এই ছিল নাজির ভাবনা।

কিন্তু নাজি জানতো না জুকি আইয়ুবীরই চর। সে রাতে ও সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর তাঁবুতে তার ওপর অর্পিত কাজের রিপোর্ট দিয়েছিল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখা করেছিল আলীর সাথে। আলী ওকে পরবর্তী নির্দেশ দিয়েছিল। এরপর নাজির বাড়ী থেকে আর বের হওয়ার সুযোগ পায়নি ও। সুযোগ যখন পেলো, ঘাতকের খঞ্জর কেড়ে নিল ওর প্রাণ। জুকির মৃত্যুর পর প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক, নাজির কাছ থেকে নেয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং আইয়ুবীর দেয়া উপহার সামগ্রী মরক্কোয় পাঠিয়ে দেয়া হলো ওর বাপ-মার কাছে।

মৃত্যুর আতংক জড়ানো বিষণ্ন রাতের আঁধার কেটে গেছে। গা জ্বলা তীব্রতা নিয়ে উঁকি দিয়েছে মরু সূর্য। আলী বিন সুফিয়ান তখন জনবসতি থেকে অনেক দূরে। সাথে আটজন সশস্ত্র অশ্বারোহী। যাচ্ছিল উত্তর-পূর্ব দিকে। সম্রাট ফ্রাঙ্কোর রাজধানীর পথ আলীর চেনা। ক্লান্ত হলেও আরবী ঘোড়াগুলো এখনো সপ্রতিভ। দূরদিগন্তে দৃষ্টি ছুঁড়লেন আলী। খর্জুর বীথির পাশ ঘেঁষে এগিয়ে যাচ্ছে দু'জন অশ্বারোহী।

পথ পরিবর্তন করে পাহাড়ের আড়াল নিয়ে এগুতে লাগলেন তিনি। আলী ছিলেন মরুভেদী। পথ হারানোর সম্ভাবনা ছিল না। সওয়ার দু'জন এখনো মাইল চারেক দূরে, গতি বাড়িয়ে দিলেন আলী।

অবসন্ন হয়ে পড়েছে ঘোড়া। খর্জুর বীথির কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সওয়ার দু'জন আরো মাইল দুয়েক এগিয়ে গেছে। চলছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। ওদের ঘোড়াও সম্ভবতঃ ক্লান্ত। ঘোড়া থেকে নেমে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলো লোক দুটো। আলী আবার পথ পরিবর্তন করলেন। দু'দলের মধ্যে দূরত্ব কমে এলো। এখন মাত্র কয়েকশ গজের ব্যবধান।

লোক দুটো অশ্ব ক্ষুরের শব্দে বেরিয়ে এলো। আলীদের দেখে দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে পালাতে লাগলো ওরা। সামনে বালিয়াড়ি। ভয় পেয়ে ওরা একবার ডানে একবার বায়ে যাচ্ছিল। একজন তীরন্দাজ চলতি ঘোড়া থেকে তীর ছুঁড়লো। একজনের ঘোড়ার পায়ে বিঁধতেই লাফিয়ে উঠলো ঘোড়াটা। টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়লো আরোহী। আলী ওদের ঘিরে ফেললেন। দু'জনকেই বেঁধে ফেলা হলো।

আলীর প্রশ্নের জবাবে ওরা নিজেদের ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচয় দিল। তল্লাশীর পর পাওয়া গেলো নাজির লেখা চিঠি। আলী খানিক বিশ্রাম করে বন্দীদের নিয়ে রাজধানীর পথ ধরলেন।

চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুণছিলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। দিন শেষে রাত এলো। গভীর হয়ে এলো রাতও। অনেক রাতে বিছানায় পিঠ লাগালেন আইয়ুবী। ভোর রাতে দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দে জেগে উঠলেন তিনি। তড়িঘড়ি দরজা খুলে দেখলেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আলী। পেছনে আটজন সওয়ার এবং দু'জন বন্দী। আইয়ুবী সকলকে ভেতরে ডেকে নিলেন। নাজির চিঠি এগিয়ে দিলেন আলী।

চিঠি খুললেন আইয়ুবী। কয়েক লাইন পড়তেই ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল তাঁর চেহারা। তারপর আবার পলকেই আনন্দের ঝিলিক খেলে গেলো চোখে মুখে। নাজি তার দীর্ঘ চিঠিতে খৃষ্টান সম্রাট ফ্রাঙ্কোকে আক্রমণের জন্য দিনক্ষণ ঠিক করে দিয়েছে। লিখেছে, রোম উপসাগর উপকূলে নৌবহর থেকে খৃষ্টান সৈন্যরা নেমেই মিশর আক্রমণ করবে। এদিকে বিদ্রোহ করবে পঞ্চাশ হাজার সুদানী ফৌজ। সালাহউদ্দিনের নতুন সেনারা এক সঙ্গে দুই ফৌজের মোকাবিলা করতে পারবে না। এর বিনিময়ে নাজি সমগ্র মিশর অথবা মিশরের একাংশ ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছে।

জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো বন্দী দু'জনকে। নাজি এবং তার সঙ্গীদের নিজস্ব বাসগৃহে নজরবন্দী করা হলো। নাজির হারেমের মেয়েদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো। বাজেয়াপ্ত করা হলো নাজির স্থাবর সম্পত্তি। এ সব কিছুই করা হলো অত্যন্ত গোপনে ও সতর্কতার সাথে। নাজির লিখিত চিঠি দু'জন দূত মারফত শুধু আক্রমণের তারিখ পরিবর্তন করে ফ্রাঙ্কোর কাছে পাঠিয়ে দিলেন আইয়ুবী। দুই সেনাবাহিনীর একত্রীকরণ সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেয়া হলো।

দূত ফিরে এলো আট দিন পর। নাজিকে জবাব লিখেছেন ফ্রাঙ্ক। সালাহউদ্দিন যেন [illegible] করতে না পারে এ জন্য আক্রমণের দুদিন আগেই বিদ্রোহ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ সংবাদ গোপন রাখার স্বার্থে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর অনুমতি নিয়ে আলী দূত দু'জনকে [illegible] করে রাখলেন।

[illegible] নির্দিষ্ট স্থানের আশপাশে আইয়ুবী নিজের সৈন্যদের লুকিয়ে রাখলেন। আক্রমণের এখনো [illegible] বাকী। নজির নির্দেশ মতো খৃষ্টান হামলার [illegible] সুদানী ফৌজ বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। শক্তি প্রয়োগ না করে কৌশল [illegible] আইয়ুবী এ বিদ্রোহ দমন করলেন। সেনাপতির অনুপস্থিতি ছিল [illegible]।

[illegible] বিদ্রোহ দমনের দু'দিন পর নির্দিষ্ট তারিখে দেখা গেলো খৃষ্টানদের [illegible] এগিয়ে আসছে। এর মধ্যে ফ্রান্স, গ্রীস, রোম এবং সিসিলির যুদ্ধ জাহাজ ছিল [illegible]। এদের জাহাজের মধ্যে ১২টি ছিল খুবই বিশাল। এ জাহাজগুলো মিশরে [illegible] সৈন্য বহন করছিল।

খৃষ্টানদের এ বাহিনীতে কেবল কমান্ডোই ছিল এক লাখ। রসদ এবং অস্ত্র বোঝাই [illegible] সংখ্যা ছিল অগণিত। জাহাজগুলো এগিয়ে আসছিল দুই সারিতে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিজে মিশর বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে গেলেন এর মোকাবেলা করতে।

[illegible] উপকূলের কাছে আসার অপেক্ষায় রইলেন তিনি। সবচে বড় জাহাজটি

কিনারে এলো। হঠাৎ জাহাজ লক্ষ্য করে অগ্নি গোলা নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। কামানের গোলায় আগুন ধরে গেলো পালে। আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো মুসলমানদের যুদ্ধ জাহাজ। ওদের জাহাজগুলো ছিল কাঠের তৈরী। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো সাগর বক্ষে। মনে হচ্ছিল আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নিচ্ছে সমগ্র রোম উপসাগর।

খৃষ্টান জাহাজগুলো পালাতে গিয়ে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ বাঁধালো। এতে আগুন আরো ছড়িয়ে পড়লো। সৈন্যদের অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো সাগর বক্ষে। যারা সাঁতরে তীরে উঠার চেষ্টা করলো আইয়ুবীর তীরন্দাজদের নিশানা হলো ওরা।

ওদিকে নূরুদ্দিন জঙ্গী ফ্রাঙ্ক সম্রাটের রাজধানী আক্রমণ করলেন একই সময়ে। ‘মশরের দিকে এগিয়ে আসা স্থলবাহিনী এ সংবাদ পেয়ে স্বদেশের দিকে ফিরে যেতে চাইলো। কিন্তু সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাড়াশী আক্রমণের ফলে রোম উপসাগরে সলিল সমাধি হলো ওদের। এ যুদ্ধে সম্মিলিত খৃষ্টান নৌশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলো। আগুনে পুড়ে এবং সাগরে ডুবে নিহত হলো অসংখ্য নৌ সেনা।

খৃষ্টান বাহিনীর কমাণ্ডার এসমার্ক আত্মসমর্পণ করে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেয়া হলো। গ্রীস এবং সিসিলির কিছু যুদ্ধ জাহাজ বেঁচে গিয়েছিল। আইয়ুবী তাদের ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু হঠাৎ সাগরে ঝড়ের কবলে পড়ে সব কটি জাহাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। ১১৬৯ সনের ১৯ ডিসেম্বর কর প্রদানের শর্তে খৃষ্টানরা সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলো। বলতে গেলে এ বিজয়ের মূল কৃতিত্ব ছিল গোয়েন্দা সংস্থার।

এ ছিল দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী ক্রুসেডের প্রথম লড়াই। ইতিহাসের পাতায় খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত অসংখ্য লোমহর্ষক ক্রুসেডের যে কাহিনী ছড়িয়ে আছে তা আরো চমকপ্রদ, আরো ঘটনাবহুল।

ঐতিহাসিকরা বলেন, এতো কেবলমাত্র শুরু। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রমেই প্রবেশ করলেন জীবনের বিপজ্জনক সব অধ্যায়ে। যে সব অধ্যায় অতিক্রম করে তিনি হয়েছিলেন গাজী সালাহউদ্দিন। তাঁর সে বিপজ্জনক জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘর্ষ এবং রহস্য ও রোমাঞ্চের ভয়াবহ সব জটিল ও কুটিল অধ্যায়।

খৃষ্টানদের সম্মিলিত নৌশক্তি বিধ্বস্ত হয়েছে সাতদিন আগে। উপকূল ছেড়ে যাননি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। এখনো সাগর বক্ষে ঢেউয়ের দোলায় দুলছে দু'একটি পালছেঁড়া জাহাজ, মাল্লাহীন নৌকা। জ্বলন্ত জাহাজ থেকে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচতে চেয়েছে অনেক সৈন্য। ঢেউয়ের তালে ভেসে বেড়ানো জাহাজ এবং নৌকা তল্লাশীর জন্য সালাহউদ্দিন আইয়ুবী লোক লাগিয়ে দিলেন। অক্ষত নৌকা এবং জাহাজ তীরে নিয়ে আসছিল ওরা। অকেজো জাহাজ থেকে মালপত্র বের করা হচ্ছিল। বেশীর ভাগই অস্ত্র এবং খাদ্য সামগ্রী।

ঢেউয়ের আঘাতে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছিল অর্ধদগ্ধ অথবা মাছে খাওয়া লাশ। জাহাজের ভাঙা কাঠ আঁকড়ে সাগরে ভাসছিল কিছু জীবন্ত মানুষ। ঢেউ ওদের তীরে ঠেলে দিচ্ছিল। সমগ্র বেলাভূমিতে পাহারা দিচ্ছিল মুসলিম ফৌজ। আহত খৃষ্টান সৈন্যদের

কুড়িয়ে এনে চিকিৎসা করা হচ্ছিল তাদের। ঘোড়ায় চড়ে উপকূল ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন সুলতান আইয়ুবী।

ঘুরতে ঘুরতে ছাউনি থেকে দু'মাইল দূরে চলে এলেন তিনি। সামনে পার্বত্য এলাকা। পাহাড়ের একদিকে সাগর, অন্যদিকে খেজুর, নানা রকম গাছগাছালি এবং লতাগুল্ম ঘেরা প্রান্তর। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে তিনজন সেনাপতি ও চারজন দেহরক্ষী।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন তিনি। ঘোড়ার বাগ রক্ষীদের হাতে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। সেনাপতি তিনজনও ঘোড়া থেকে নেমে তার সঙ্গ নিল। এদেরই একজন বন্ধু বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ। যুদ্ধের একদিন আগে মাত্র তিনি এখানে এসেছেন।

শীত মওসুমের শান্ত সাগর। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে এলেন তিনি। রক্ষীরা অনুসরণ করছে তাঁকে।

সামনে পেছনে ছোট ছোট টিলা আর বালিয়াড়ি। বাঁয়ে পাহাড়। ডানে বেলাভূমির দিগন্ত বিস্তৃত বালুকারাশি। চার পাঁচ হাত উঁচু এক বালিয়াড়িতে উঠে দাঁড়ালেন আইয়ুবী। দৃষ্টি ছুঁড়লেন রোম উপসাগরের নীল জলরাশিতে। মনে হলো সাগরের সব নীল জমা হয়ে আছে তার চোখে। বিজয়ের আনন্দে চেহারা উদ্ভাসিত। নাক কুঞ্চিত করে বললেন, 'ভীষণ দুর্গন্ধ।'

সৈকতে আছড়ে পড়লো সব ক'টি চোখ। আকাশে ওড়াউড়ি করছে কতগুলো শকুন। ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল ওরা। সুলতান বললেন, 'ওখানে মড়া আছে।'

টিলি থেকে নেমে চারজনই সেদিকে এগিয়ে গেলেন। পনের বিশগজ দূরে এক ঝাঁক শকুন লাশের মাংস খাচ্ছে। একটা শকুন এক মড়ার মাথার খুলি নিয়ে আকাশে উড়লো। কিন্তু পাঞ্জা থেকে ছুটে গেলো মুণ্ডটা, পড়লো এসে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সামনে। তিনি মাথাটার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে রইলেন। মাথাটার খোলা চোখ আইয়ুবীর দিকে তাকিয়ে আছে যেন।

সালারদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি বললেন, 'এ মাথাটা মুসলমানদের মাথা থেকে অনেক ভাল। এ মস্তিষ্কের জোরেই ওরা নারী আর মদে মাতাল করে দিচ্ছে সমগ্র মুসলিম খেলাফত।'

'ওরা ইঁদুরের মতো মুসলিম বিশ্বকে কুরে কুরে খাচ্ছে সুলতান।' বললেন এক সেনাপতি।

আরেকজন বললেন, 'আমাদের সুলতানরা ওদের নিয়মিত কর দিয়ে যাচ্ছে।'

বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ বললেন, 'ফিলিস্তিন ওদের দখলে সুলতান। আমরা কি কোন দিন তা পুনরুদ্ধার করতে পারবো না?'

'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না শাদ্দাদ।

'আল্লাহর রহমত থেকে না হলেও আমরা আমাদের ভাইদের দিক থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছি।'

'তুমি ঠিকই বলেছো। বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। একবারও কি ভেবেছো, কি করে খৃষ্টানদের এতবড় নৌশক্তি আমরা নিঃশেষ করে দিলাম? খোলা

ময়দানে নয়, শুধু কমাণ্ডো হামলার মাধ্যমে। ওদের ফৌজ সমগ্র মিশর ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বন্ধুরা, ভেতরের আক্রমণ এত সহজে ঠেকানো সম্ভব হতো না। ভাই আক্রমণ করলে তুমি ভাববে, সত্যিই কি ভাই আক্রমণ করেছে! যখন তার বিরুদ্ধে তরবারী তুলবে, দুশমন সুযোগ নেবে তার, নিঃশেষ করবে দু'জনকেই।'

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে চললেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। কিছু দূর এগিয়ে কি দেখে থমকে দাঁড়ালেন। নুয়ে মাটি থেকে জিনিসটা তুলে দেখালেন সবাইকে।

একটা ক্রুশ, তাগায় বাঁধা। ছড়িয়ে থাকা লাশগুলোর দিকে তাকালেন আবার। আগের সেই খুলিটা নিয়ে ঝগড়া করছে তিনটে শকুন।

দ্রুত মাথাটার কাছে গেলেন তিনি। ক্রুশটা সেই মাথার ওপর রেখে ফিরে এলেন সঙ্গীদের কাছে। বললেন, 'আমি এক বন্দী খৃষ্টান অফিসারের সাথে কথা বলেছি। ও বলেছে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার সময় সকলকেই ক্রুশের ওপর হাত রেখে শপথ করতে হয়। জীবনবাজি রেখে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শপথ নেয়ার পর সব সৈনিকের গলায় একটি করে ক্রুশ ঝুলিয়ে দেয়া হয়। জানি না কুড়িয়ে পাওয়া এ ক্রুশটি কার? ক্রুশের জন্যই এরা জীবন দিয়েছে। খুলিটার ওপর ক্রুশটা রাখলাম, একজন সৈনিকের শপথের অমর্যাদা যেন না হয়।'

'সুলতান', শাদ্দাদ বললেন, 'জেরুজালেমে খৃষ্টানরা মুসলমানদের কি মর্যাদা দিচ্ছে আপনি জানেন? ওখান থেকে স্ত্রী পরিজন নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে মুসলমানরা। লুণ্ঠিত হচ্ছে আমাদের মেয়েদের ইজ্জত। এখনো আমাদের বন্দীদের ওরা ছেড়ে দেয়নি। মুসলমানরা ওখানে পশুর মতো জীবন যাপন করছে। আমরা কি এর প্রতিশোধ নেবো না?'

'প্রতিশোধ নয় শাদ্দাদ, আমরা ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার করতে চাই। কিন্তু আমাদের শাসকরাই এ পথের বড় বাঁধা। ওরা ক্রুশ স্পর্শ করে মুসলিম বিশ্বকে নিঃশেষ করার শপথ নিয়েছে, আমিও আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে শপথ করে বলছি, অবশ্যই ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার করবো। কিন্তু বন্ধুরা, আমাদের ভবিষ্যত ইতিহাস এখনো নিকষ আঁধারে ছেয়ে আছে।

এক সময় ওরা শাসক ছিল, আমরা ছিলাম যোদ্ধা। এখন মুসলমান শাসক হচ্ছে ওরা দখল করে নিচ্ছে যুদ্ধের ময়দান। আমার মনে হয় মুসলমানরা শাসক হলেও নেতৃত্ব থাকবে খৃষ্টানদের হাতে। শাসক হতে পেরেই ওরা সন্তুষ্ট থাকবে। আমি ফিলিস্তিন জয় করবো কিন্তু ওরা তা রক্ষা করতে পারবে না।

খৃষ্টানদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত উর্বর। পঞ্চাশ হাজার সুদানী ফৌজ কারা লালন করছে? আমাদের খেলাফতের পোশাকে লুকিয়ে আছে নাজির মতো কালকেউটে। এরা দেশের জন্য বিপজ্জনক। আমিই প্রথম গভর্ণর যে এ সত্যটা বুঝতে পেরেছি। নাজির চিঠি আমাদের হাতে না এলে এতোক্ষণে আমাদের রক্ত মিশে যেতো মরুর বালুকারাশির সাথে, নয়তো হতাম ওদের হাতে বন্দী।'

আইয়ুবী আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কথা বলে যাচ্ছেন, অকস্মাৎ পেছন থেকে শনশন শব্দে ছুটে এলো একটা তীর। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দু'পায়ের ফাঁকে বালিতে গেঁথে গেলো

তীরটা। আতংকিত দৃষ্টিতে পিছন ফিরে পাহাড়ের দিকে তাকালেন সবাই। আরও তীর আসতে পারে ভেবে দৌড়ে এক পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়ালেন।

শীস দিলেন শাদ্দাদ। দূর থেকে ছুটে এলো রক্ষীরা।

'ঘোড়াগুলো এখানে রেখে তোমরা পাহাড়ের ওপাশে চলে যাও।' রক্ষীদের বললেন সুলতান, 'ওদিক থেকেই তীর এসেছে। কাউকে দেখলে গ্রেফতার করবে।'

যেদিক থেকে তীরটা ছুটে এসেছিল সাবধানে সেদিকে এগুতে শুরু করলো রক্ষীরা। সেনাপতিরা দ্রুত পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। ওদের নিষেধ উপেক্ষা করে তাদের সাথে এগিয়ে চললেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিজেও।

পাহাড়ে উঠে দাঁড়ালেন সুলতান আইয়ুবী। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত পর্বতমালা। কোনটা উঁচু, কোনটা নীচু। সালারদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলেন চারদিক। জনমানুষের চিহ্নও নেই। রক্ষীরা ঘোড়া ছুটিয়ে বিভিন্ন পাহাড় খুঁজে দেখলো। কেউ নেই। যেন হাওয়া থেকে ছুটে এসেছে তীরটা।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ফিরে এলেন তীরের কাছে। হাত লাগতেই পড়ে গেলো ওটা। তীরটা হাতে নিলেন সুলতান। বললেন, 'অনেক দূর থেকে এসেছে, এ জন্য হালকা ভাবে বিঁধেছে। তবে তীরটা গুপ্তঘাতকদের নয়, খৃষ্টানদের।'

'সুলতানের জীবন বিপন্ন।' বললেন এক সেনাপতি।

হেসে উঠলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, 'এবং সব সময় ঝুঁকিপূর্ণই থাকবে।' বললেন তিনি, 'খৃষ্টানদের যেসব নৌকা মাঝি মাল্লা ছাড়া ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে, আমি তা দেখতে বেরিয়েছি। কিন্তু বন্ধুরা, ওদের সব তরীই মাল্লাহীন নয়। ওরা আবার আসবে, আসবে ঝড়ের গতিতে। আঘাত করবে মাটির নীচ থেকে, পিছন থেকে। যুদ্ধের স্বাভাবিক নিয়মে ওদের সাথে মোকাবিলা করা যাবে না। আমি যুদ্ধ পলিসিতে এক নতুন পদ্ধতি সংযোজন করবো। এ পলিসি সম্পূর্ণ আনকোরা, নতুন। গেরিলা অপারেশন যুদ্ধে আনবে নতুন মাত্রা। কমাণ্ডো এবং গোয়েন্দাদেরই থাকবে এতে প্রধান ভূমিকা।

তীরটা হাতে নিয়েই ঘোড়ায় চাপলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। এগিয়ে গেলেন শিবিরের দিকে। ডান, বাঁ এবং পেছন থেকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন সেনাপতি তিনজন।

বলতে গেলে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। কিন্তু তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠাহীন। যেন কিছুই হয়নি।

তাঁবুতে ফিরে সালারদের নিয়ে বসলেন। তাদের সামনে তুলে ধরলেন গেরিলা আক্রমণ এবং কমাণ্ডো হামলার বিভিন্ন দিক। বললেন, 'আমি আলী বিন সুফিয়ানকে শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী গঠন করার নির্দেশ দিয়েছি। তোমরা সেনাবাহিনী থেকে স্বাস্থ্যবান এবং মেধাবী যুবকদের বাছাই করো। ওরা হবে দূরদর্শী, বুদ্ধিমান। ওদের থাকবে উটের মতো দীর্ঘ সময় ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য করার ক্ষমতা। গতি হবে চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র। ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং খরগোশ ও হরিণের মতো দ্রুতগামী হবে ওরা। এদের থাকবে সশস্ত্র শত্রুর সাথে খালি হাতে লড়াই করার ক্ষমতা, নেশা ও

পরনারীর প্রতি আসক্ত হবার লোভ থেকে মুক্তির দুর্জয় শক্তি।

খৃষ্টানরা আমাদের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে চায়। সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করছে গোয়েন্দা কাজে। ওরা নিঃশেষ করে দিতে চাচ্ছে আমাদের ঈমানী আবেগ। আমি দেখেছি, মুসলমানরা নারীদের ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল। আমি গোয়েন্দাগিরি বা অন্য কোন কাজে কোন মেয়ে ব্যবহারের পক্ষপাতি নই। আমরা নারীর ইজ্জত আব্রুর রক্ষক। নারীর ইজ্জতকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা আমাদের কাজ নয়। আলী গোয়েন্দা কাজে কয়েকটি মেয়ে ব্যবহার করছে। ওরা না মুসলিম না খৃষ্টান। কিন্তু কোন ধর্মাধর্ম নয়, আমি নারীকে নারী হিসেবেই সম্মান করি।'

তাঁবুতে ঢুকলো রক্ষী দলের কমাণ্ডার। বললো, 'রক্ষীরা কয়েকজন মেয়ে ও পুরুষকে ধরে এনেছে।'

বেরিয়ে এলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। তার পিছু নিলেন তিন সেনাপতি। বারো জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচজন পুরুষ, সাতজন মেয়ে। মালপত্র দেখে মনে হচ্ছে ব্যবসায়ী। মেয়েগুলো অপূর্ব সুন্দরী। রক্ষীরা বললো, 'তীর নিক্ষেপকারীকে খুঁজতে গিয়ে এদের পাওয়া গেছে। তিনটি উটসহ একটা তাঁবুতে অপেক্ষা করছিল ওরা।'

'এদের কি তল্লাশী নেয়া হয়েছে?' এক সেনাপতি প্রশ্ন করলেন।

'জ্বী, ওদের দেহ এবং মালপত্র তল্লাশী নেয়া হয়েছে। খঞ্জর ছাড়া কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি।'

রক্ষীরা পাঁচটি খঞ্জর সুলতান আইয়ুবীর সামনে রাখলো।

'আমরা মরক্কোর ব্যবসায়ী।' ওদের একজন বললো, 'যাবো ইস্কান্দারিয়া পর্যন্ত। দু'দিন আগে আমরা যখন দশ ক্রোশ পেছনে তখন এ মেয়েগুলো আমাদের কাছে আসে। ভেজা কাপড়, বিধ্বস্ত চেহারা। বললো, বাড়ী সিসিলি। এদিকে আসার পথে এক খৃষ্টান কমাণ্ডার ওদেরকে উপকূল থেকে ধরে নিয়ে আসে। ওরা আমাদের সাহায্য চাইলো। অসহায় মেয়েগুলোর জন্য মায়া হলো আমাদের। সেই থেকে ওরা আমাদের সঙ্গে।'

'এদের সম্পর্কে আর কি জানো তুমি?'

'এরা বলেছে, এরা গরীব ঘরের সন্তান। জাহাজে এনে অফিসাররা এদের সতীত্ব নষ্ট করেছে। যুদ্ধের সময় গোলার আঘাতে হঠাৎ ওদের জাহাজে আগুন ধরে গেলে সবাই সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। সাঁতার জানে না বলে এদেরকে একটা ছোট নৌকায় তুলে দিল সৈন্যরা। এরা নৌকা বাইতে জানে না। ঢেউয়ের ধাক্কায় একসময় নৌকা কিনার স্পর্শ করলো। আমরা তখন উপকূল থেকে সামান্য দূরে বিশ্রাম করছিলাম। তখনই ওরা আমাদের কাছে আসে।'

'তারপর?'

'প্রথমে ভেবে পেলাম না কি করবো, ওদের সাথে নেয়া ঠিক হবে কিনা। পরে অসহায় ভেবে আশ্রয় দিলাম, সাথে নিয়েই এগিয়ে চললাম। পেছনের তাঁবুতে আপনার লোকেরা আমাদের তল্লাশী নিতে লাগলো। কারণ জিজ্ঞেস করায় বললো, মিশরের গভর্ণর সুলতান আইয়ুবীর নির্দেশ। আমরা অনুনয় বিনয় করে বললাম, 'আমাদেরকে সুলতানের কাছে পৌঁছে দাও।'

'কেন তোমরা সুলতানের কাছে আসতে চাইলে?'

'এ মেয়েগুলোকে আশ্রয় দেয়ার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করবো। আমরা ব্যবসায়ী, কোথা থেকে কোথায় যাই তার তো ঠিক নেই। এদের আমরা কতোক্ষণ বয়ে বেড়াবো?'

মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো। ওরা কথা বললো সিসিলির ভাষায়, দু'তিনজন এক সংগে। আতংকিত চোখ।

সুলতান ব্যবসায়ীদের দিকে চাইলেন। বললেন, 'তোমরা কি এদের ভাষা বোঝো?'

একজন এগিয়ে এলো। 'জ্বী, কেবলমাত্র আমিই বুঝি। ওদের আশ্রয় দেয়ার জন্য মহানুভব সুলতানকে অনুরোধ করছে ওরা। ওরা বলছে, ব্যবসায়ীদের সাথে ওরা যাবে না। চারদিকে যুদ্ধ চলছে। ভয় আছে চোর ডাকাতের। ওরা আরো বলছে, খৃষ্টান সৈন্যদের ওরা ভীষণ ভয় পায়। অপহরণের সময় ওরা সবাই কুমারী ছিল। জাহাজে ওদের সতীত্ব হরণ করা হয়েছে।'

অন্য একটি মেয়ে কিছু বললো। দোভাষী বললো, 'মেয়েটি বলছে, আমাদেরকে মুসলমানদের রাজার কাছে নিয়ে চলো। হয়তো তিনি আমাদেরকে আশ্রয় দেবেন।'

অপর একটি মেয়ে কান্নাভেজা কণ্ঠে বললো, 'আমাদেরকে খৃষ্টান সৈন্যদের কাছে ফিরিয়ে দিও না। আমরা মুসলমান হয়ে যাবো।'

'হাঁ, হাঁ, আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। কোন মুসলমান দয়া করে আমাদের বিয়ে করলে আমরা আর দেশেও ফিরে যাবো না, আমরা এখানেই থেকে যাবো।' বললো আরেক মেয়ে।

তার কথা শুনে চোখে মুখে আতংক নিয়ে দু'তিনটে মেয়ে মুখ লুকানোর চেষ্টা করছিল, যেন ওরা লজ্জায় মরে যাচ্ছে।

সুলতান বললেন, 'এদেরকে খৃষ্টান সৈন্যদের কাছে তুলে দেয়া হবে না। মুসলমান হওয়ার জন্যও ওদের বাধ্য করবে না কেউ। ওরা যদি আমাকে বিশ্বাস করে মুসলিম মেয়েদের মতোই ওদের আশ্রয় দেবো। জেরুজালেমের খৃষ্টান ফাদার বা পাদ্রীর কাছে পাঠিয়ে দেবো রাজধানীতে গিয়ে। অথবা খৃষ্টানদের সাথে বন্দী বিনিময়ের সময় ওদেরকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ওদের প্রয়োজন এবং মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। কিন্তু কেউ বিয়ে করলে মুসলমান হবে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি কোন মুসলমানের সাথে ওরা মিশতেও পারবে না।'

ব্যবসায়ী সুলতানের কথা মেয়েদের বুঝিয়ে বললো। স্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো ওদের চেহারায়। সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ফিরে গেলো ব্যবসায়ীরা।

মেয়েদের জন্য আলাদা তাঁবু টানাতে বললেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। প্রয়োজনীয় পাহারা এবং তাঁবুর স্থান নির্দেশ করতে না করতেই রক্ষীরা দু'জন আহত বন্দীকে নিয়ে এলো। জীর্ণ বিধ্বস্ত চেহারা। রক্ত ও পানিতে ভেজা পোশাক। লাশের মতো ফ্যাকাশে।

জানা গেলো মাইল দেড়েক দূরে এক নৌকায় ছিল বাইশ জন লোক। এ দু'জন কোনমতে বেঁচে গেছে, বাকী সবাই মারা পড়েছে। কিনারে এসে নৌকা ডুবে গেলে অনেক কষ্টে সাঁতরে তীরে উঠেছে ওরা।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সামনে ধপাস করে মাটিতে বসে পড়লো ওরা। ব্যথায় কোঁকাচ্ছে।

ওদের একজনকে সাধারণ সৈনিক বলে মনে হলো না। কাপড়ে রক্তের দাগ নেই, তবে কাতরাচ্ছে অন্যদের চেয়ে বেশী। মাঝে মাঝে মেয়েদের দিকে মুখ বিকৃত করে তাকাচ্ছে।

একে একে সবার ওপর দৃষ্টি বুলালেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। শেষ বন্দীর দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। সেনাপতিদের দিকে ফিরিয়ে আনলেন দৃষ্টি।

'আলী এখনো এলো না!' বললেন আইয়ুবী, 'এ পর্যন্ত যতো জন ধরা পড়েছে তাদের এখনি জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।'

শেষ বন্দীর দিকে তাকালেন আবার। বললেন, 'মনে হয় কমাণ্ডার। আলী এলে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলবে। সম্ভবত ভেতরে হাড়গোড় ভেঙেছে।'

রক্ষীদের দিকে ফিরে বললেন, 'এদেরকে এখনি আহত বন্দী শিবিরে পৌঁছে দাও। চিকিৎসা এবং খাওয়া দাওয়ার দিকে খেয়াল রেখো।'

বন্দীদের পৌঁছে দেয়া হলো আহত শিবিরে। মেয়েরা তাকিয়ে রইলো ওদের গমন পথের দিকে।

সেনা ছাউনি থেকে একটু দূরে মেয়েদের জন্য তাঁবু তৈরী হচ্ছিল। তার একটু দূরেই আহত বন্দীদের তাঁবু। মেয়েরা তাদের জন্য যে তাঁবু বানানো হচ্ছিল তার পাশে গিয়ে বসলো। তাকিয়ে রইলো আহত বন্দীদের তাঁবুর দিকে। নির্নিমেষ নয়নে ওরা দেখছিল নতুন বন্দীকে।

তাঁবু তৈরী হলো। ওরা চলে গেলো যে যার তাঁবুতে। বাইরে সশস্ত্র পাহারা। খাওয়া দাওয়ার পর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। তাকাতে লাগলো অন্য তাঁবুর দিকে। ভয়শূন্য স্বাভাবিক দৃষ্টি। সেন্ট্রি তাকালো ওর দিকে। সেন্ট্রির চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে হাসলো মেয়েটা। ইশারায় বুঝালো ওই তাঁবুতে যেতে চায়। মাথা নেড়ে নিষেধ করলো প্রহরী। দূরে কোথাও যাওয়া নিষেধ।

দু'টো তাঁবুর মাঝে গাছগাছালি, বাঁয়ে ঝোপঝাড়ে ভরা উঁচু বালিয়াড়ি ও ছোট ছোট পাহাড়।

সূর্য ডুবে গেছে। বোরকা পরা রাত নেমেছে আঁধার হয়ে। তাঁবুর ভেতরে কোলাহলের কণ্ঠ আঁকড়ে ধরেছে ক্লান্তি ও ঘুম। মরুভূমির বাতাসে রাতের স্তব্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আহতদের করুণ কাৎরানি অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হচ্ছে। বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে রোম উপসাগরের আন্দোলিত জলরাশি ও ঢেউয়ের মৃদুমন্দ ধ্বনি। প্রহরী এবং আহতরা ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে গেল এক সময়।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর তাঁবুতে আলো জ্বলছে। রক্ষীরা টহল দিচ্ছে তাঁবুর বাইরে। তাঁবুর ভেতর সেনাপতি তিনজনকে নিয়ে বসে আছেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। চেহারায় উদ্বেগ।

'আলী এখনো এলো না!' আইয়ুবীর কণ্ঠে স্পষ্ট উদ্বেগ। 'ওখানে বিদ্রোহের সম্ভাবনা

ছিল বলে আলীকে রেখে এসেছিলাম। তার খোঁজ নিতে যাকে পাঠিয়েছিলাম, সেও তো এখনো ফিরে এলো না!'

'কোন সমস্যা হলে এতোক্ষণে নিশ্চয়ই সংবাদ পেতাম। হয়তো ওখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক।' বললো এক সেনাপতি।

'আমরা তো তাই কামনা করি। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহী সৈন্যকে সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। ওখানে আমাদের মাত্র দেড় হাজার ঘোড়সওয়ার এবং দু'হাজার সাতশো পদাতিক সৈন্য রয়েছে। ওদের তুলনায় সুদানী ফৌজ কেবল সংখ্যায়ই বিপুল নয়, অভিজ্ঞতা এবং সমরাস্ত্রেও ওরাই শক্তিশালী।

'নাজি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের দমন করার পর ওখানে প্রকাশ্যে কেউ বিদ্রোহ করবে বলে মনে হয় না। নেতৃত্ব ছাড়া বিদ্রোহ সম্ভব নয়।' বললো অন্য এক সেনাপতি।

'তবুও আমাদের পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এ পরিস্থিতিতে কি করা যায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।'

ছাউনিতে নিশুতি রাতের ভূতুরে নীরবতা। কিন্তু মেয়ে সাতটির চোখে ঘুম নেই। পর্দা তুলে তাঁবুর ভেতরে উঁকি দিল প্রহরী। প্রহরীর পদশব্দে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো মেয়েগুলো। তাঁবুর ভেতর প্রদীপের আলো। গুণে দেখলো প্রহরী, সাতজন। পর্দা ছেড়ে সরে এলো সে।

প্রকৃতির সবকিছু নীরব, নিস্তব্ধ। সবকিছু সুস্থ স্বাভাবিক। একটানা একঘেয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে প্রহরী।

একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্য তাঁবুর একপাশে হেলান দিয়ে বসলো প্রহরী। তাঁবু ঘেঁষে শুয়েছিল যে মেয়েটি সে তার পাশের জনের কানে কানে বললো, 'বসে পড়েছে।' এক কান দু'কান করে সাতজনের কাছেই পৌঁছলো খবরটা। দরজার কাছে শুয়েছিল যে মেয়েটা সে এবার উঠে বসলো। নিজের বিছানায় কম্বল ভাঁজ করে বিছিয়ে তার ওপর চাদর ছড়িয়ে দিল। এরপর সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে।

প্রহরী জানতো এ তাঁবুতে কয়েকজন অসহায় মেয়ে আছে মাত্র। যাদেরকে সাগর থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। এদের কাছ থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই ভেবে বসে বসে ঝিমুতে লাগলো সে।

বিপরীত দিক দিয়ে মেয়েটা বেরিয়ে এলো তাঁবুর বাইরে। সতর্ক পায়ে এগিয়ে গেল টিলার দিকে। টিলার কাছে পৌঁছে আহত বন্দীদের তাঁবুর দিকে হাঁটা দিল।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে যাচ্ছিল ও। প্রহরীটি এখন বেশ দূরে। ওকে আর দেখে ফেলার ভয় নেই।

তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছে একটা ঝোপের আড়ালে বসে এদিক ওদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখলো। গভীর সাবধানী দৃষ্টি। দেখলো, এখানকার প্রহরী তখনো টহল দিচ্ছে। কালো একটা সচল ছায়া চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে তাঁবুর চারদিক। সে সচল ছায়ার ওপর স্থির হয়ে রইলো মেয়েটার চোখ।

এখন ও দু'সেন্ট্রির মাঝখানে মাটিতে শুয়ে আছে। প্রহরীটি হাঁটতে হাঁটতে সরে

গেলো তাঁবুর ওপাশে। ও হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছলো তাঁবুর কাছে। অন্ধকারে পর্দা একটু ফাঁক করে ঢুকে গেলো তাঁবুর ভেতরে। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যন্ত্রণায় আহতদের অনেকেই ঘুমোতে পারছে না। ব্যথায় কাৎরাচ্ছে কেউ কেউ। পর্দা ফাঁক করে কেউ একজন ভেতরে প্রবেশ করছে দেখে পাশের জন ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, 'কে?'

'রবিন কোথায়?' ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে ফিসফিসিয়ে বললো মেয়েটা।

'এদিক থেকে তৃতীয়।'

মেয়েটা হাতড়ে হাতড়ে তৃতীয় ব্যক্তির পা স্পর্শ করলো।

'কে?' বললো সে।

'আমি মুবি।'

উঠে বসল রবিন। হাত বাড়িয়ে মুবিকে বিছানায় টেনে নিল। শুইয়ে দিল নিজের পাশে। ওর গায়ে চাদর তুলে দিতে দিতে বললো, 'আমার সাথে লেগে থাকো। প্রহরী এসে যেতে পারে।'

রবিন মুবিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বললো, 'আমি আশ্চর্য হচ্ছি মুবি, কিভাবে আমাদের দেখা হলো! এতে বুঝা যায়, পবিত্র যিশু আমাদের সাফল্য চাচ্ছেন। আমরা পরাজিত হয়েছি এ কথা ঠিক নয়।'

'তুমি কি আহত, হাড়গোড় ভাঙেনি তো!'

'ধুর, আমার কিছু হয়নি। একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি কোথাও।'

'এখানে এসেছো কেন?'

'সুদানী সেনাবাহিনীর কাছে যাবো। চারদিকে মুসলিম ফৌজ। অনেক চেষ্টা করেছি, যেতে পারিনি। দেখলাম ওরা আহত বন্দীদের চিকিৎসা দিচ্ছে। আহত হওয়ার ভান করে ওদের দলে ভিড়ে গেলাম।'

'এখন কি করবে?'

'সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাবো। কিন্তু এ মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। আইয়ুবী বড় বজ্জাত আদমী, চারদিকে ওর চোখ কান খোলা।'

'ভালই প্যাঁচাকলে আটকেছো দেখছি।'

'টিটকারী মারবে না।' হঠাৎ খেপে গেলো রবিন। ক্রোধের সাথে বললো, 'বলতো আইয়ুবী এখনো বেঁচে আছে কেন? তীর কি শেষ হয়ে গিয়েছিল, না ওই বদমাশটা ভয় পেয়েছে? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, তোমরা সাতজন একত্রে ধরা পড়লে কিভাবে? ওই পাঁচটা পাঠা কি মরে গেছে, না পালিয়েছে?'

'ওরা সবাই বেঁচে আছে রবিন। তুমি তো বললে যিশু আমাদের বিজয় চাচ্ছেন, আমি বলছি, ঈশ্বর আমাদের কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। আইয়ুবী বেঁচে আছে, কারণ তীর তার গায়ে লাগেনি। তীর বিঁধেছে তার দু'পায়ের ফাঁকে, মাটিতে।'

'কোন মেয়ে তীর ছুঁড়েছিল?' রবিনের কণ্ঠে ঝাঁঝ, 'ক্রিস্টোফার কোথায় ছিল তখন?'

'ও-ই তীর ছুঁড়েছে। কিন্তু ......'

'ক্রিস্টোফারের তীর লাগেনি!' রবিনের কণ্ঠে বিস্ময়। 'লক্ষ্য ভেদের জন্য সম্রাট অগাস্টাস নিজের তরবারি দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করেছেন। এখানে এসে ছ'ফুট দীর্ঘ আর

তিন ফুট চওড়া সালাহউদ্দিনের গায়ে ও তীর লাগাতে পারলো না! তীর ছোঁড়ার সময় ভয়ে হারামিটার হাত কাঁপছিল নাকি?'

'দূরত্ব ছিল বেশী। ক্রিস্টোফার বলেছে, তীর ছোঁড়ার সময় বাম চোখে একটা মাছি এসে বসায় লক্ষ্য স্থির থাকেনি।'

'তারপর কি হলো?'

'যা হবার তাই। সালাহউদ্দিনের সাথে ছিল তিনজন সেনাপতি এবং চারজন দেহরক্ষী। ওরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ভাগ্য ভাল, পাহাড়ী এলাকা বলে বেঁচে গেছি। তীর বালির নীচে লুকিয়ে ফেলেছিলাম। সিপাইরা এলে ক্রিস্টোফার বললো, 'আমরা পাঁচজন মরক্কোর ব্যবসায়ী। এ মেয়েদেরকে সাগর থেকে উদ্ধার করেছি।' আমাদের মালপত্র তল্লাশী নেয়া হলো। ব্যবসায়িক সামানাদি ছাড়া কিছুই পাওয়া গেলো না। আমাদেরকে আইয়ুবীর সামনে নেয়া হলো। বোঝালাম আমরা সিসিলি ভাষা ছাড়া কিছুই জানি না। দোভাষীর কাজ করলো ক্রিস্টোফার।'

মুবি পুরো ঘটনা শোনালো রবিনকে। ব্যবসায়ীরূপী পাঁচ ব্যক্তি এবং এই সাতটি মেয়ে ছিল খৃষ্টানদের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। গোয়েন্দা কাজ ছাড়াও মেয়েদের দায়িত্ব ছিল মুসলিম সেনাপতি, কমাণ্ডার এবং দায়িত্বপূর্ণ লোকদের ফাঁসানো। রবিন এ গ্রুপের কমাণ্ডার।

'তুমি আইয়ুবীকে রূপের জালে জড়াতে পারো না মুবি?'

'কেবল তো প্রথম রাত। আমাদেরকে আরো অপেক্ষা করতে হবে। বুঝতে হবে কোন পথে এগোনো যায়। আমাদের ব্যাপারে সে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তা যদি তার মনের কথা হয়, তবে বুঝতে হবে, সে মানুষ নয়, পাথর। সে জানে আমরা অসহায়। চাইলেই সে আমাদের পেতে পারে। অথচ একজনকেও সে তার তাঁবুতে ডাকেনি।'

'তাকে হত্যা করাও সহজ নয়। সব সময় সে থাকে সেনাপতি আর রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে। মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সশস্ত্র প্রহরী।'

'শুনেছি ওই পাজিটা নাকি মদও স্পর্শ করে না।'

'তোমাদের সঙ্গী পাঁচজন এখন কোথায়?'

'ওরা কাছেই আছে। ওদের নিয়ে তুমি ভেবো না, ওরা এখানেই থাকবে।'

'মুবি, পরাজয় আমাকে পাগল করে দিয়েছে। এর জন্য আমিই দায়ী। সকল সৈনিকই ক্রুশ হাতে নিয়ে শপথ করে। কিন্তু আমার আর তাদের শপথে আসমান জমিন ফারাক। পেছন থেকে আক্রমণ করে আমরা অর্ধেক বিজয় ছিনিয়ে আনি। কিন্তু আমরা কেউ আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি।'

গলায় ঝুলানো ক্রুশ হাতে নিয়ে রবিন বললো, 'এ ক্রুশ আমার কাছে জবাব চাচ্ছে। একে আমি বুক থেকে সরাতে পারি না।'

নিজের ক্রুশ ছেড়ে রবিন মুবির জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল। ওর বুকের সাথে লেপ্টে থাকা ক্রুশ বের করে বললো, 'তুমি তোমার পিতা মাতাকে ধোঁকা দিতে পারো, কিন্তু এ পবিত্র ক্রুশের সাথে প্রতারণা করতে পারো না। ঈশ্বর তোমায় ক্লিওপেট্রারচে

বেশী রূপ দিয়েছেন। তোমার দেহের মাদকতা, রূপের জৌলুস পাহাড় কেটে তোমার জন্য পথ খুলে দেবে। আমাদের এ অযাচিত সাক্ষাতে মনে হচ্ছে, আমরা পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচতে পারবো। আমরা ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারলে আমরাই বিজয়ী হব। রোম উপসাগরের ওপারে আমাদের ফৌজ জমা হচ্ছে। যারা মরেছে, মরেছে। বেঁচে আছে যারা তাদের বিশ্বাস, প্রতারণার শিকার হয়ে আমরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি ঠিক, কিন্তু এ আমাদের চূড়ান্ত কোন পরাজয় নয়। নিজের তাঁবুতে ফিরে যাও। অন্য মেয়েদের বলো, তাঁবুতে পড়ে ঘুমানো ওদের কাজ নয়। বার বার আইয়ুবীর সাথে দেখা করবে। সাক্ষাৎ করবে সেনাপতিদের সাথে। প্রেমের অভিনয় করবে। লোভ দেখাবে দেহের। যৌবনের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে ওদের ঈমানের আগুন। আর একবার যদি এতে সফল হতে পারো সবকিছু আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।'

'সবার আগে আসল ঘটনা জানতে হবে, জানতে হবে কেন এমনটি ঘটলো। সুদানীরা কি আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে?'

'নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছি না। যুদ্ধের আগে আমাদের গোয়েন্দাদের রিপোর্ট ছিল সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মিশরের গভর্ণর এবং ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়ে এসেছেন। নতুন ফৌজ গঠন করছেন মিশরীদের দিয়ে। নাজির পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সে সাথে যোগ দেয়নি। নাজি আমাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়। নাজির সে চিঠি আমি নিজে দেখেছি। তার লেখা আমি চিনি, ওটা যে তারই চিঠি ছিল এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কি করে এমনটি ঘটলো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এটা যদি প্রতারণা হয় তবে বলবো, ইতিহাসের সবচে জঘন্য প্রতারণা করা হয়েছে আমাদের সাথে।'

'রবিন, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে লাভ নেই। সবার আগে আমাদের জানতে হবে এসব কি করে হলো? কে করলো?'

'মুবি, মনে করো না এ রহস্য না জেনেই আমি এখান থেকে যাবো। সম্রাট অগাস্টাস গর্ব করে বলেছিলেন, মুসলমানদের ভেতরের খবর সংগ্রহ করে ওদের নিশ্চিহ্ন করে দেবো। ভেবে দেখো মুবি, সম্রাটের হৃদয়ে এখন কি ঝড় বইছে। আমরা যা করেছি তাতে মৃত্যুদণ্ডই আমাদের প্রাপ্য। আমাদের কারণেই ক্রুশের এ বিপর্যয়। আমি ক্রুশের অভিশাপকে ভয় পাচ্ছি।'

'আমি সব জানি রবিন। আবেগের কথা নয়, এখন কাজের কথা বলো। আমাদের এখন কি করতে হবে, কোন পথে এগুবো আমরা তাই বলো শুনি।'

পরাজয়ের গ্লানি রবিনের স্নায়ুগুলো বিকল করে দিয়েছিল। মুবির মতো সুন্দরী যুবতী তার বুকের সাথে লেপ্টে আছে। তার রেশম কোমল চুল রবিনের গালের অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছে। কিন্তু তার অনুভূতি যেন ভোতা হয়ে গেছে।

মুবির চুলে বিলি কেটে রবিন বললো, 'তোমার এ মায়াময় চুলের শৃংখলে আইয়ুবীকে বাঁধতে পারো না! মুবি, আমি জানি তুমি একটু চেষ্টা করলেই তোমার ধ্যানভাঙ্গা রূপ আইয়ুবীকে তোমার দাসে পরিণত করবে। তোমার প্রথম কাজ হলো, ক্রিস্টোফারকে বলবে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশেই সে যেন নাজির কাছে পৌঁছে রহস্য

উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে। নাজি যদি আইয়ুবীর সাথে মিশে গিয়ে থাকে, আমাদের যুদ্ধের পলিসি পাল্টাতে হবে। আমি বুঝতে পারছি, সংখ্যায় কম হলেও মুসলমানদের সহজে পরাজিত করা যাবে না। আগে ওদের জোশ ও ইসলামী জযবা ধ্বংস করতে হবে। বিজয়ের জন্য এটাই প্রথম শর্ত। আর এ জন্যই আমরা তোমাদের মতো রূপসী তরুণীদের দিয়ে আরবের হারেমগুলো ভরিয়ে রেখেছি। তোমরা এতে সফল না হলে আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।'

'আবার কথা বাড়াচ্ছো? আমরা নিজের ঘরে নয়, শত্রুর তাঁবুতে বসে কথা বলছি। চারপাশে কড়া প্রহরা। ওদিকে রাতও শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মিশন ধ্বংস হয়ে গেছে। এ পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে হবে। এ জন্য এখান থেকেই শুরু করতে হবে কাজ।'

'হ্যাঁ, সে কাজের কথাই বলছি। সবার আগে আমার দরকার নাজির খবর।'

'সংবাদ সংগ্রহ করে তোমাকে কোথায় পাবো?'

'আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবো। তাঁর আগে আইয়ুবীর ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও তার সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবো।'

'আমারও মনে হয় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এ একটা লোকই ক্রুশের জন্য বিপজ্জনক।'

'তাই। আর এ জন্যই আইয়ুবীকে হত্যা করা জরুরী। আর ও বেঁচে থাকলে থাকবে আমাদের বন্দীশালায়।'

'কিন্তু কিভাবে?'

'শোন, প্রথমেই তাঁবুতে গিয়ে ওদের বলবে, যে করেই হোক আলী বিন সুফিয়ানকে ফাঁসাতে হবে। আলী এবং আইয়ুবীর মাঝে তুলে দিতে হবে ঘৃণার দেয়াল। এরপর যাবে ক্রিস্টোফারের কাছে। বলবে, লক্ষ্য ভেদ না করে যে পাপ করেছো, দায়িত্ব পালন করে এবার তা মোচন করার চেষ্টা করো।'

'ঠিক আছে রবিন। দোয়া করো প্রভু যিশু যেন আমার সহায় হোন।'

রবিন মুবির চুলে চুমো খেয়ে বললো, 'ক্রুশের জন্য তোমাকে তোমার ইজ্জত বিলিয়ে দিতে হবে। তবে মনে রেখো, যিশুর কাছে তুমি থাকবে মা মেরীর মতোই পবিত্র কুমারী। ইসলামের মূল উপড়ে ফেলে আমরা জেরুজালেম দখল করেছি, এবার মিশরও আমাদের হবে।'

রবিনের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো মুবি। তাঁবুর পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে তাকালো বাইরে। কোথাও কেউ নেই।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো মুবি। তাঁবুর সাথে সেঁটে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বুলাল চারদিকে। দূর থেকে কারো গুনগুন শব্দ ভেসে আসছে। সম্ভবতঃ প্রহরী।

হাঁটা দিল মুবি। গাছের আড়ালে আড়ালে গা বাঁচিয়ে পৌঁছলো টিলার কাছে। টিলা পার হয়ে চলতে লাগলো নিজের তাঁবুর দিকে।

তাঁবুর কাছাকাছি চলে এসেছে মুবি, দু'জন লোকের অনুচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো। থমকে দাঁড়ালো মুবি, উৎকর্ণ হয়ে তাকালো সামনে। শব্দ আসছে তাঁবুর দিক থেকে।

ও তাঁবুতে নেই হয়তো ওরা জেনে গেছে, এ জন্য ডেকে এনেছে কমান্ডার বা অন্য কাউকে। ধরা পড়লে চলবে না। ব্যবসায়ী সঙ্গীদের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। এতে অন্য মেয়েগুলো বিপদে পড়তে পারে ভেবে দাঁড়ালো আবার। কয়েক পা এগিয়ে গেলো লোক দুটোর কথা শোনার জন্য। কিন্তু ও কাছে পৌঁছার আগেই কথা থামিয়ে দিয়েছে ওরা। এখন কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

একপা দু'পা করে হাঁটছে ও, হঠাৎ বামে শব্দ হলো। চমকে সেদিকে তাকালো মুবি। গাছের একটা ছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ও টিলার কাছে ফিরে এলো। উঠে দাঁড়ালো টিলার ওপর। সাগর পাড়ের জোৎস্না ধোয়া রাত। এখন ওকে দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

ডিউটি পরিবর্তনের সময় হয়ে এসেছে। প্রহরীদের অবস্থা দেখার জন্য বেরিয়ে গেলেন কমান্ডার। টিলার ওপর একটা ছায়া দেখতে পেলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন কমান্ডার।

ছায়াটা তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। দু'হাতে সামনে আসা চুল ঠিক করলো। দেহের গঠনে মেয়ে মনে হচ্ছে। কমান্ডার অপেক্ষা করছেন।

জ্বীন ভূত হলে অদৃশ্য হয়ে যাবে, কিন্তু ছায়াটা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো। কমান্ডার বুঝে ফেললেন, এ জ্বীন নয়, মানুষ। সুলতান আইয়ুবীর সতর্কবাণী তার মনে পড়লো। তাদের বলা হয়েছে, খৃষ্টানরা গুপ্তচর হিসেবে মেয়েদের ব্যবহার করছে। কখনো বেদুঈন আবার কখনো ভিক্ষুক সেজে ওরা আসবে। নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে আশ্রয় চাইবে। আজও তাকে বলা হয়েছে, সুলতান সন্দেহভাজন সাতজন মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন। অপেক্ষা করছেন গোয়েন্দা প্রধান আলীর জন্য। তিনি এলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে।

প্রহরীদের ডিউটি পরিবর্তনের সময় কমান্ডার ফখরুল মিশরি তাঁবুর পর্দা তুলে দেখলেন সাতটা মেয়েই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কম্বল সরালে দেখা যেতো সপ্তম মেয়েটা বিছানায় নেই। টিলার ওপরই যে ওই মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে কমান্ডার তা বুঝতে পারেনি।

মেয়েটা হাঁটা শুরু করতেই কমান্ডার টিলার দিকে এগিয়ে গেলো। বললো, 'কে তুমি, নীচে নেমে এসো।'

চঞ্চল হরিণীর মতো মেয়েটা দ্রুত টিলার অন্যদিকে নেমে গেলো।

কমান্ডার এক লাফে টিলার ওপর উঠে এলো। রাতের নীরবতা ভেঙ্গে তীব্রগতিতে ছুটছে মেয়েটা। তাকে ধরার জন্য তার পিছনে ছুটলো কমান্ডার।

দু'জনের মাঝে বেশ খানিকটা দূরত্ব। দু'জনেই ছুটছে তীব্র গতিতে। কিন্তু ফখরুল একজন সৈনিক, ছুটছে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা নিয়ে। অসমতল মাটি, শুকনো ঝোপঝাড় আর গাছগাছালি মাড়িয়ে নিশুতি রাতে মরুদ্যানের বুকে ছুটছে দু'জন। দূরত্ব কমে আসছে দু'জনের মাঝে। সামনে খণ্ড খণ্ড অনেকগুলো এলোপাথারি ঝোপঝাড়।

মুবি মেয়ে হলেও একজন গোয়েন্দা। শত্রুর চোখে ধুলো দেয়ার হাজারো কায়দা কানুন শিখেছে দীর্ঘদিনের অনুশীলনে। তার সে ট্রেনিং কাজে লাগানোর সময় এসেছে। দ্রুত ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলো মুবি। কমান্ডার কিছু দূর এগিয়ে দেখলো সামনে কেউ নেই। মেয়েটার পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক

জানাতে লাগলো সে। গতি কমিয়ে অনির্দিষ্টভাবে এগিয়ে গেল সামনে।

গাছের আড়ালে লুকিয়ে কমাণ্ডারকে এগিয়ে যেতে দেখলো মুবি। কমাণ্ডার এগিয়ে যেতেই ও আবার ছুটতে লাগলো। হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনে কমাণ্ডারও ছুটলো পিছন ফিরে। আবার কোন শব্দ নেই। অনুমানে করে ছুটছে কমাণ্ডার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পেছন থেকে আবার ভেসে এলো পদশব্দ। ঘুরে দৌড় লাগালো কমাণ্ডার। থেমে গেলো পদশব্দ। লুকোচুরি খেলার ট্রেনিং ভালই কাজে লাগাচ্ছে মুবি।

এভাবে চললো কিছুক্ষণ। মেয়েটা যেন তার সাথে কানামাছি খেলছে। হারিয়ে যাচ্ছে, আবার দৌড়াচ্ছে। ক্রোধে ফুঁসতে লাগলো কমাণ্ডার।

ঝোপঝাড় আর গাছের ফাঁকে ফাঁকে এভাবে লুকোচুরি খেলতে খেলতে মাইল খানেক দূরে চলে এসেছে ওরা। সামনে দেখা যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের তাঁবু।

মেয়েটা তাঁবুর কাছে পৌঁছে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো ওদের। আলো জ্বেলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো ব্যবসায়ীরা। তরবারী হাতে কমাণ্ডারও পৌঁছে গেলো ওখানে। ব্যবসায়ীদেরকে মুসলমান মনে হচ্ছে। মেয়েটা তাদের একজনের পা জড়িয়ে ধরে আছে। আতংকে বিবর্ণ চেহারা, হাঁফাচ্ছে।

'এ মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দাও।' নির্দেশের ভঙ্গীতে বললো কমাণ্ডার।

'তা হবে না,' বললো এক ব্যবসায়ী, 'আমরা সাতজনকেই তোমাদের সুলতানের কাছে দিয়ে এসেছি, একেও নিয়ে যেতে পারো।'

'না!' আরও জোরে লোকটার পা আঁকড়ে ধরল মুবি। বললো, 'আমি ওর সাথে যাবো না। মুসলমানরা খৃস্টানদের চাইতেও জানোয়ার। ওদের সুলতান একটা ষাঁড়, একটা পশু। সে আমার ইজ্জতের পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছে। আমি কোন রকমে পালিয়ে এসেছি।'

'তোমরা মুসলমান?' কমাণ্ডারের প্রশ্নবোধক কণ্ঠ।

'আমরা তোমাদের সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর লোক।'

'মেয়েটা কিসের কথা বলছে? ওর সাথে তোমাদের এর সম্পর্ক কি?'

'ব্যাপার এতো বড় নাইবা হলো, তরবারী খাপে ঢুকাও। কোন ভয় নেই, আমরা ব্যবসায়ী। মেয়েটি কি বলছে কিছু বুঝছি না। আমরা তোমাদের সুলতানকে ভাল মানুষ জেনেছিলাম। কিন্তু সুন্দরী যুবতীদের প্রেম নিবিড় ঈমান আমার দুইতে বসেছেন। অন্য দুটি মেয়ের কি অবস্থা করেছে কে জানে।'

'অন্য মেয়েটাকে এবং কমাণ্ডাররা ওদের শেষ করে দিয়েছে।'-মুবি বললো, 'ওদেরকে সবাই ধরে নিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে খানিক আগে। এখন ওরা তাঁবুতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।'

কমাণ্ডার তরবারি কোষবদ্ধ করে তাঁবুতে প্রবেশ করলো। কফি তৈরী করতে লাগলো এক ব্যবসায়ী। কমাণ্ডারের অলক্ষ্যে কি যেন মেশালো তাতে। অন্য একজন জানতে চাইলো তার পদমর্যাদা।

আলাপচারিতায় ব্যবসায়ীরা বুঝলো লোকটা সেনাবাহিনীর উঁচু পর্যায়ের কেউ নয়, একজন সাধারণ গ্রুপ লিডার মাত্র। তবে লোকটা মেধাবী এবং সাহসী।

অন্য মেয়েদের ব্যাপারে সুলতানকে বলা গল্পটাই কমাণ্ডারকে পুনরায় শোনালো।

নানালো এদের ব্যাপারে সুলতানের সিদ্ধান্ত। যোগ্য বর পেলে এরা মুসলমান হবে, দেশে ফিরবে না কখনো, তাও কমাণ্ডারকে বলা হলো।

অন্য একজন বললো, 'এ মেয়েটার সাথে তোমাদের প্রিয় সুলতান কি কাণ্ড ঘটিয়েছে তাতো ওর মুখেই শুনলে।'

কমাণ্ডার মেয়েটির দিকে তাকালো।

মুবি বলতে লাগলো, 'একজন দেবদূতের আশ্রয় পেয়েছি মনে করে আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। সূর্য ডোবার সাথে সাথে সুলতানের নাম করে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো। অন্যদের তুলনায় আমি একটু বেশী সুন্দরী। বুঝতে পারিনি তোমাদের আইয়ুবী আমাকে খারাপ উদ্দেশ্যে ডাকছে। আমি গেলাম। সুলতান মদের সোরাহী খুলে বসলো। গ্লাস ভরে রাখলো আমার সামনে। আমি খৃষ্টান, মদপানে অভ্যস্ত।

আইয়ুবী আমাকে ভোগ করতে চাইলো। পুরুষ নতুন নয় আমার জন্য। আমি যাকে দেবদূত মনে করি এ অপবিত্র দেহ থেকে তাকে দূরে রাখতে চাইলাম। কিন্তু সে জাহাজের খৃষ্টানদের চাইতেও নিকৃষ্ট। দেহের প্রতিটি জোড়া ব্যথা করছে। হাড়গুলো মনে হয় ভেঙেই ফেলেছে।' কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

একটু পর আবার শুরু করলো, 'ঈশ্বর আমায় রক্ষা করেছেন। নিষ্কৃতি দিয়েছেন দেবদূতরূপী পশুর হাত থেকে। সুলতান আমাকে বলেছে, অন্যান্য কমাণ্ডাররা বাকী মেয়েদের নিয়ে আনন্দ করছে। আমি সুলতানের পা ধরে মিনতি করলাম বিয়ে করার জন্য। সুলতান বললো, 'বিয়ে ছাড়াই তুমি আমার হারেমে থাকবে।'

অত্যধিক মদপান করায় সুলতান বেহুশ হয়ে পড়লো। এ সুযোগে আমি পালিয়ে এসেছি। বিশ্বাস না হলে তার দেহরক্ষীদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

মুবির কথার মাঝেই কফি পরিবেশন করা হলো। কফির মধ্যে হাশিশ মেশানো ছিল জানতো না কমাণ্ডার। কফি পান করলো কমাণ্ডার, হাশিশের ক্রিয়া শুরু হলো মগজে। মেজাজের ভারসাম্য হারিয়ে অট্টহাসি দিয়ে বললো, 'আমাদের জন্য নির্দেশ, মদ এবং নারী থেকে দূরে থাকো। নিজে মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করছে আর মদপান করছে, হা. হা. হা।'

হাশিশের প্রভাবে ও বুঝতেই পারলো না মেয়েটা নির্জলা মিথ্যে বলেছে তার সাথে। কল্পনায় এখন সে নিজেই সম্রাট। মুবির চেহারায় মশালের আলো। চুলে কালো আর সোনালী রঙের মিশেল। যৌবন উপচে পড়ছে অপরূপা অঙ্গ থেকে। চোখে নেশা ধরানো দীপ্তি। কমাণ্ডারের মনে হলো, পৃথিবীর সবচে রূপবতী নারীটি বসে আছে তার সামনে।

সে চঞ্চল হয়ে বললো, 'তুমি চাইলে আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে পারি।'

'না!' ভয়ে পেছনে সরে গেলো মুবি। 'তুমিও আমার সাথে সুলতানের মতোই আচরণ করবে। তোমার তাঁবুতে নিয়ে গেলে আবার আমি আইয়ুবীর হাতে গিয়ে পড়বো।'

'ইজ্জত রক্ষার জন্য ওদেরকে তোমাদের হাতে দেয়া ভুল হয়ে গেছে। ভাবছি অন্য মেয়েদেরকেও কালই গিয়ে ফেরত নিয়ে আসবো।' বললো এক ব্যবসায়ী।

মুবির দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল ফখরুল মিশরী। তার দেহলতা ও শরীরের

প্রতিটি অঙ্গ থেকে উপচে পড়ছে যৌবন। এমন অপরূপা অঙ্গশোভার অধিকারী সুন্দরী নারী সে জীবনেও দেখেনি।

ব্যবসায়ীর কথার পিঠে কেউ কোন কথা বললো না। তাঁবুতে নেমে এলো নীরবতা। চুপচাপ কেটে গেলো কিছু সময়।

নীরবতা ভাঙল ক্রিস্টোফার। বললো, 'তুমি আরবী না মিশরী?'

'মিশরী। আমি সাধারণ একজন সৈনিক হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলাম। যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় আমাকে কমাণ্ডার পদে প্রমোশন দেয়া হয়েছে।'

'সুদানী ফৌজকে দেখছি না, ওরা কি এ যুদ্ধে অংশ নেয়নি?'

'সুদানী কোন ফৌজ এখানে আসেনি, এ যুদ্ধে অংশ নেয়নি ওরা।'

'কি ব্যাপার, যুদ্ধে ওরা অংশ নিল না কেন?'

'মনে হয় সুদানীরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে গ্রহণ করেননি।' জবাব দিল আরেক ব্যবসায়ী।

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। সুদানীরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে গ্রহণ করেনি। তাদের কমাণ্ডার সুলতানকে মিশর ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। এ জন্য আইয়ুবী মিশরীয়দের দিয়ে নতুন ফৌজ গঠন করেছেন। ওরাই এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।'

গল্প জমে উঠেছে। যেন খোশগল্প করছে সবাই এভাবেই একজন জানতে চাইলো, 'যুদ্ধ তো তোমরা জিতেছো, গনিমতের মাল কি কি পেলে?'

'গনিমতের মাল কি আর গরীবের ভাগ্যে জোটে!' টিপ্পনি কাটল অন্যজন।

'গনিমতের মালের খবর জানি না, এখনো ভাগবন্টন হয়নি বোধ হয়।' বললো কমাণ্ডার।

'[illegible] সুলতান তোমাদেরকে মদ ও নারী থেকে দূরে [illegible] নিজে কোন বিলাসে মত্ত থাকেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের খবর [illegible] না, অথচ ব্যবসায়ী হিসাবে আমরা জানি, খৃষ্টান [illegible] সেখানে। অনেকে চুরি চোরাই করে এসব মাল কায়রো [illegible]। কায়রো থেকে সে সব চলে যাবে দামেশক এবং [illegible]। সুদানী ফৌজকে [illegible] করতে চাচ্ছেন। আরবের সৈন্য এসে [illegible]।'

[illegible] হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছিল [illegible] পরিস্থিতি খুনির পক্ষে চলে গেছে। তাকে ধরতে [illegible]।

[illegible] কমাণ্ডার। খুনি নিজের ভাষায় সব ঘটনা [illegible] নির্দেশ। বললো, 'পরাজয়ের কারণ [illegible]।'

[illegible] ক্রিস্টোফার বললো, 'ও বলছিল, তুমি আইয়ুবীর ফৌজে না হলে ও তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হতো। এ জন্য ও মুসলমান

হতেও প্রস্তুত। কিন্তু এখন সে কোন মুসলমানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।'

কমাণ্ডার কি ভেবে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো। মুবির হাত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বললো, 'খোদার শপথ, তোমার জন্য আমি সিংহাসন ত্যাগ করি এই যদি হয় তোমার ইচ্ছে, এই রইলো তরবারী। এখন থেকে তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।'

কমাণ্ডার খাপসহ তার তরবারী রেখে দিল মুবির পায়ের কাছে। 'এখন আমি আইয়ুবীর সৈনিক নই, কমাণ্ডারও নই।'

মুবি হাত ধরে টেনে ওকে পাশে বসালো। নিজেও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো তার পাশে। বললো, 'তুমি যদি সত্যি আমাকে চাও তোমার জন্য আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করবো। তবে আমাকে পেতে হলে তোমাকে একটা শর্ত পালন করতে হবে, যে পাযাণ্ড পশু আমার ওপর আজ এ বর্বর আচরণ করেছে, তার প্রতিশোধ নিতে হবে তোমাকে।'

'খোদার কসম, সুলতান আমার হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। ওকে আমি খুন করব।'

মুবি ব্যবসায়ীদের দিকে তাকালো। ক্রিস্টোফার বললো, 'এক আইয়ুবী মরলে বা বাঁচলে কিছু যায় আসে না। যে আসবে সেও এমন হবে। আজ হোক, কাল হোক মিশরীরা ওদের দাসই হবে। তুমি বরং নাজির কাছে যাও। মুবি থাকবে তোমার সংগে। তোমরা দু'জন সালাহউদ্দিনের আসল রূপ তার কাছে প্রকাশ করে তার সাহায্য চাইতে পারো। এ ছাড়া এর বদলা নেয়ার আর কোন রাস্তা দেখি না আমি।'

নাজি এবং তার সঙ্গীদের যে গোপনে হত্যা করা হয়েছিল এ কথা জানতো না এরা। মুবি চাচ্ছিল দ্রুত নাজির কাছে পৌঁছতে, কিন্তু এক যুবতীর পক্ষে একা মিশর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ছিল না। অপ্রত্যাশিত ভাবে ফখরুলকে পাওয়ায় তার জন্য বরং সুবিধেই হলো। ওরা সিদ্ধান্ত নিল, মিশর যাওয়ার পথে ওকেই ব্যবহার করা হবে।

খৃস্টান গোয়েন্দাদের দল প্রধান রবিন রয়েছে আহতদের তাঁবুতে। ব্যবসায়ীরাও সিদ্ধান্ত নিল এখানেই থাকবে। আইয়ুবীকে ছোঁড়া তীর একবার ফসকে গেছে, আবার চেষ্টা করবে ওরা।

মুবির রূপের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে ফখরুল। হাশিশ তাকে বিবেকশূন্য করে দিয়েছে। ফখরুল আর নিজের তাঁবুতে ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

মুবিকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ার জন্য তাকে পরামর্শ দিল ক্রিস্টোফার। ব্যবসায়ীরা একটা উট দিল তাকে। উটের সাথে দেয়া হলো পানির মশক ও প্রয়োজনীয় খাবার। হাশিশ মেশানো খাবারের থলিটা ধরিয়ে দিল মুবির হাতে। ফখরুল পরলো ঢাউস জুব্বা ও ব্যবসায়ীদের মতো টুপি। উটের পিঠে চাপলো মুবি ও কমাণ্ডার।

উট চলতে শুরু করেছে। আশপাশের কোন খেয়াল নেই কমাণ্ডারের। সমস্ত অতীত তার হারিয়ে গেছে। হৃদয়ের কার্নিশে এখন শুধু ঝুলে আছে বিশ্বের সেরা এক সুন্দরীর ছবি। সুলতানকে বাদ দিয়ে যে রূপসী তাকে পছন্দ করেছে। কি সৌভাগ্য তার, মুবিকে বাহুবেষ্টন করে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরল ও।

'খৃস্টান কমাণ্ডার আর তোমাদের সুলতানের মতো পশুর ন্যায় আচরণ করবে না

তো?' কপট কটাক্ষ হেনে বললো মুবি।

'মুবি, আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি সে কথা কি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে?'

'না ফখরুল, এ তো আমি রহস্য করে বলেছি। তোমার ভালবাসার ওপর আমার আস্থা না থাকলে কি তোমার সাথে এভাবে একাকী বেরিয়ে পড়তাম? এ দেহ-মন আমি তোমাকেই সঁপেছি। এখন থেকে আমি শুধুই তোমার। আমাকে নিয়ে তোমার যা ইচ্ছে করতে পারো। তবে আইয়ুবীর পশুত্ব ভুলতে পারছি না বলেই ওভাবে বলেছি তোমায়। ধৈর্যহীনদের আমি ঘৃণা করি, যেমন ঘৃণা করি তোমাদের সুলতানকে।'

'তার মানে তুমি আমাকে ধৈর্যহীন বলতে চাচ্ছো? দেখ মুবি, তুমি চাইলে আমি উট থেকে নেমে যাবো।' মুবিকে বাহুবন্ধন থেকে ছেড়ে দিল ফখরুল।

'ছি! কি বলছো তুমি? তোমাকে আমার ভাল লেগেছে বলেই তো তোমার জন্য আমার ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করেছি। ইচ্ছে করলে আমি ব্যবসায়ীদের কাছেও তো থাকতে পারতাম।'

মুবির আবেগপূর্ণ কথায় আরো দুর্বল হয়ে পড়লো কমাণ্ডার। গল্পে গল্পে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

সাধারণভাবে চললে ওদের পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু ফখরুল এক পালিয়ে আসা সৈনিক। মুবিও পালিয়ে এসেছে মুসলিম তাঁবু থেকে। তাই সাধারণ পথ ছেড়ে দুর্গম পথে এগিয়ে চললো ওরা।

গভীর হয়ে এলো রাত। ঘুমে ভারী হয়ে এলো মুবির চোখ। ফখরুলের বুকে মাথা রেখে ও ঘুমিয়ে পড়লো। আকাশের অগণিত তারার সাথে জেগে রইলো এক পলাতক সৈনিক। উট এগিয়ে চলছে মিশরের দিকে।

সবেমাত্র ফজরের নামাজ শেষ করেছেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, প্রহরী তাঁবুতে প্রবেশ করে জানালো, 'আলী বিন সুফিয়ান এসেছেন।'

তাঁবু থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন সালাহউদ্দিন। আলীর সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও দিকের কি খবর?'

'এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক। তবে ওদের উৎকণ্ঠা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের গোয়েন্দারা বলেছে, নেতৃত্ব দেয়ার মতো কোন কমাণ্ডার এগিয়ে এলে ওরা বিদ্রোহ করবে।'

কথা বলতে বলতে দু'জন তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। 'নাজি এবং তার সঙ্গীদের আমরা শেষ করেছি, কিন্তু সুদানীদের ভেতর মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যে বিষ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তার প্রভাব এখনো কমেনি। সেনাপতির অন্তর্ধান তাদের উৎকণ্ঠার বড় কারণ। আমাদের গোয়েন্দারা প্রচার করছে, নাজি যুদ্ধের ময়দানে। আমার মনে হয় ওরা একথা বিশ্বাস করছে না।'

'ওরা বিদ্রোহ করলে আমাদের ওখানকার ফৌজ কি অভিজ্ঞ পঞ্চাশ হাজার ফৌজের মোকাবিলা করতে পারবে?'

'আমি তার ব্যবস্থাও করে এসেছি। সব জানিয়ে দু'জন ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে দিয়েছি

নূরুদ্দিন জঙ্গীর কাছে। বিদ্রোহ দমন করার জন্য কিছু সাহায্য পাঠাতে অনুরোধ করেছি তাঁকে।'

'ওদিক থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা কম। গত পরশু দূত মারফত জেনেছি, জঙ্গী সম্রাট ফ্রাঙ্কের এলাকা আক্রমণ করেছেন। খৃষ্টানদের বিশাল এক বাহিনী মিশরের দিকে আসছিল। আক্রান্ত হয়ে পিছনে সরে গেছে ওরা। জঙ্গী কিছু এলাকা দখলও করেছেন। কিন্তু একটা সংবাদে আমি দারুণ উদ্বিগ্ন।'

'ওরা আবার হামলা করেছে?'

'ওদের আক্রমণে আমি ভীত নই। আমার উদ্বেগের কারণ হলো, শত্রুকে যারা বাঁধা দেবে তারা মদের পিয়ালায় আকণ্ঠ ডুবে আছে। ইসলামের রক্ষকরা হারেমে বন্দী। যুবতী নারীর মোহনীয় চুল ওদের পায়ে শৃংখল পরিয়ে রেখেছে। হায়, আমার চাচা শেরে কোহ আজ যদি বেঁচে থাকতেন!'

স্বগতকণ্ঠে তিনি বললেন, 'চাচাই আমাকে যুদ্ধের ময়দানে টেনে এনেছিলেন। আমি দেখেছি, সামান্য সৈন্য নিয়েই বিশাল শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি জানতেন না, তার বাহিনীতে লুকিয়ে আছে মুসলিম নামধারী কতিপয় বেঈমান। এই বেঈমানের দল শত্রুর সাথে মিশে গিয়েছিল। তারা তার সামনে তৈরী করেছিল দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর। তবু চাচা সাহস হারাননি। তুমিতো তার সব ইতিহাসই জানো।'

'আমার সব কিছু মনে আছে সুলতান। সে সব যুদ্ধ এবং রক্তঝরার পর আশা করেছিলাম মিশর এবার সোজা পথে আসবে। কিন্তু এক গাদ্দারের মৃত্যু হলে এগিয়ে আসে অন্য গাদ্দার। আসলে গাদ্দার দুর্বল খেলাফতের সৃষ্টি, ফাতেমী খেলাফত হারেমের বিলাসে হারিয়ে না গেলে খৃষ্টানদের সাথে আপনার যুদ্ধ এখানে নয়, ইউরোপে হতো। আমাদের বন্ধুরাই আমাদেরকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না। শাসক যখন ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে, প্রজারা তখন সিংহাসনের স্বপ্ন দেখে, সাহায্য চায় শত্রুর কাছে। ক্ষমতার লোভ তাদের স্ত্রী কন্যার ইজ্জত আব্রুর কথাও ভুলিয়ে দেয়।'

'এদের আমি ভীষণ ভয় করি আলী। ইসলাম নিশ্চিহ্ন হলে এসব নামধারী মুসলমানের হাতেই হবে। আমাদের ইতিহাস এখন বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস, ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। আমার মন বলছে, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ নামে থাকবে মুসলমান, কিন্তু চিন্তা করবে শত্রুর মস্তিষ্ক দিয়ে। মসজিদের চেয়ে পতিতালয় বেশী থাকবে, অথবা ওদের ঘরগুলোই হয়ে উঠবে এককেটা পতিতালয়।

অমুসলিমরা মুসলমানকে সে পথেই নিয়ে এসেছে। মিশরে দেখা যাচ্ছে ঝড়ের পূর্বাভাস। তোমার সংস্থাকে আরও শক্তিশালী করো। শত্রুর এলাকায় গিয়ে কমাণ্ডো হামলা এবং সংবাদ সংগ্রহের জন্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বুদ্ধিমান যুবকদের বাছাই করো। গুপ্তচরবৃত্তির ময়দানে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও আলী।'

'আপনি দোয়া করুন, নতুন করে যে সব যুবক ভর্তি হচ্ছে তাদের মধ্যে আমি প্রাণের স্পন্দন দেখতে পাচ্ছি। তাদের নিষ্ঠা ও আগ্রহ আমাকে আশাবাদী করে তুলছে। এখানকার খবর কি?'

'বেলাভূমিতে কুড়িয়ে পাওয়া বন্দীদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। তুমি ওদের সাথে

একবার দেখা করো।'

প্রহরীকে ডাকলেন আইয়ুবী। বললেন, 'আমাদের নাস্তা দাও।'

নাস্তা নিয়ে এলো প্রহরী। খেতে খেতে কথা বলছিলেন আইয়ুবী, 'গতকাল আরো কিছু আহত খৃষ্টান সৈনিককে এখানে আনা হয়েছে। এদের একজনকে আমার সন্দেহ হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে সাধারণ সৈনিক নয়। এছাড়া ঘটনাচক্রে একদল মেয়েকেও এখানে আশ্রয় দিতে হয়েছে। ওদের নিয়ে এসেছে পাঁচজন ব্যবসায়ী। ওদের সাথেও একটু দেখা করো।'

'মেয়েরা এখানে কিভাবে এলো?'

মেয়েদের ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা যা বলেছিল সুলতান আইয়ুবী আলীকে তা শোনালেন। বললেন, 'আসলে ওদের আশ্রয় দিয়ে আমার আওতায় নিয়ে এলাম। ওরা নাকি গরীব, দীর্ঘদিন জাহাজে ছিল। কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। ওদের আলাদা তাঁবুতে রাখা হয়েছে। তুমি নাস্তা সেরে আগে ওদের সাথেই দেখা করো।'

এরপর মৃদু হেসে বললেন, 'কাল উপকূলে হাঁটছিলাম। হঠাৎ কোত্থেকে একটা তীর এসে দু'পায়ের ফাঁকে বালিতে গেঁথে গেলো। রক্ষীরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, কোন তীরন্দাজ পায়নি। ওরা ওই এলাকা থেকে পাঁচজন ব্যবসায়ীকে ধরে নিয়ে এসেছিল। ওরাই মেয়েগুলোকে এখানে রেখে গেছে।'

ওদের চলে যেতে দেয়া হয়েছে শুনে অবাক বিস্ময়ে সুলতানের দিকে তাকিয়ে রইলেন আলী।

'আপনি তাদের যেতে দিলেন! রক্ষীরা ওদের মালপত্তর তল্লাশী নিয়েছে? সন্দেহ করা যায় এমন কিছু পাওয়া যায়নি ওদের কাছে?'

গভীর মনোযোগ দিয়ে তীরটা দেখলেন আলী। বললেন, 'এক গোয়েন্দার দৃষ্টি আর সুলতানের দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য। সবার আগে ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করার চেষ্টা করবো।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন আলী বিন সুফিয়ান। একজন প্রহরী সালাম দিয়ে বললো, 'আপনার সাথে একজন কমাণ্ডার কথা বলতে চাচ্ছেন।'

'কি ব্যাপার?'

কমাণ্ডার এগিয়ে এসে বললো, 'কালকের সাতজন মেয়ের মধ্যে একজন পালিয়ে গেছে। এ ছাড়া কাল রাতের ডিউটি কমাণ্ডার ফখরুল মিশরীকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রহরীরা বলছে, ডিউটি বদলের সময় তিনি তা চেক করতে বেরিয়েছিলেন। এরপর তিনি আর ফিরে আসেননি। সুলতানকে এ খবরটা দেয়া জরুরী।'

গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন আলী বিন সুফিয়ান। কমাণ্ডার তার কাছে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, 'একটা খৃষ্টান মেয়ে চলে যাওয়ার ঘটনা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ?'

খানিকটা ভেবে নিয়ে আলী বললেন, 'শোন, সুলতানকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। ফখরুল যখন টহল দিতে বেরিয়েছিল তখনকার সব প্রহরীদের ডেকে নিয়ে এসো। কাল যেসব রক্ষী সুলতানের সাথে সাগর পারে গিয়েছিল তাদেরও ডাকবে।'

খবর পেয়ে চারজন প্রহরী এসে হাজির হলো। আলী বললেন, 'কাল যেখানে

ব্যবসায়ী এবং মেয়েদের পেয়েছো সেখানে যাও। ব্যবসায়ীরা না গিয়ে থাকলে আমি না যাওয়া পর্যন্ত যেতে দেবে না ওদের। না পেলে জলদি ফিরে এসো।'

রক্ষীরা চলে গেলো। মেয়েদের তাঁবুর কাছে পৌঁছলেন আলী বিন সুফিয়ান। তাঁবুর বাইরে বসে আছে মেয়েরা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে পাহারাদার। আলী মেয়েদের মুখোমুখি হয়ে আরবীতে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা এখানে ছ'জন কেন, আরেকজন কোথায়?'

ওরা পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলো। আলীর দিকে তাকিয়ে মাথা এপাশ ওপাশ করে বোঝালো তারা আরবী জানে না।

'তোমরা সবাই আমার ভাষা বোঝ।'

ওরা হতবাক দৃষ্টিতে আলীর দিকে তাকিয়ে রইলো। ওদের সহজ সরল চেহারা দেখে দ্বিধায় পড়লেন গোয়েন্দা প্রধান। এরপর মেয়েদের পেছনে গিয়ে আরবী ভাষায় বললেন, 'এদের উলঙ্গ করে বারজন কাফ্রী সিপাই ডেকে নিয়ে এসো।'

ওরা সবাই এক সঙ্গে পেছনে ফিরল। আতংকিত কণ্ঠে দু'তিনজন বলে উঠলো, 'মেয়েদের সাথে তোমরা এমন ব্যবহার করতে পারো না। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।'

হেসে ফেললেন আলী বিন সুফিয়ান। 'তোমাদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করবো। এক ধমকেই আরবী বলতে শুরু করেছো। এবার ধমক ছাড়াই বলো সপ্তম মেয়েটা কোথায়?'

ওরা অজ্ঞতা প্রকাশ করলে আলী বললেন, 'এ প্রশ্নের জবাব অবশ্যই তোমরা দেবে। একটু আগেও তোমরা বলেছো আরবী জানো না, এখনতো দিব্বি আরবীতে কথা বলতে পারছো। ঠিক আছে, প্রশ্নের জবাব কি করে পাওয়া যায় আমি দেখছি। সেন্ট্রি, ওদের তাঁবুর ভেতরে নিয়ে যাও।'

রাতের প্রহরীরা এলো। ওদের অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা প্রধান। মেয়েদের তাঁবুর প্রহরী বললো, 'আমাকে দাঁড় করিয়ে তিনি বন্দীদের তাঁবুর দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ পর একটা শব্দ শুনলাম, 'কে তুমি, নেমে এসো।' মনে হলো টিলার ওপর একটা ছায়াও দেখেছি। তবে খুবই অস্পষ্ট।'

টিলার কাছে গেলেন গোয়েন্দা প্রধান। বালিতে পায়ের ছাপ সুস্পষ্ট। একটা সৈনিকের বুটের ছাপ, অন্যটা মেয়েলী জুতো। মেয়েলী জুতার চিহ্ন ধরে আহত বন্দীদের তাঁবু পর্যন্ত চলে এলেন আলী। তাঁবুর পর্দা তুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। শুয়ে আছে পাঁচজন, একজন বসা। আলীকে দেখেই সে শুয়ে কাৎরাতে লাগলো। আলী তার কাঁধ খামচে ধরে বাইরে নিয়ে এলেন।

'রাতে একটা মেয়ে তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু কেন?'

রবিন বোকার মতো তাকিয়ে রইলো, যেন এসব কথা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। আলী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তোমার ভাষা বুঝি। কিন্তু তোমাকে আমার ভাষাতেই কথা বলতে হবে।'

রবিন তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। 'ওকে এখানে বসিয়ে রাখো।' প্রহরীকে

এ কথা বলে আবার তাঁবুর ভেতর ঢুকলেন আলী। বন্দীদের বললেন, 'কাল রাতে মেয়েটা কতোক্ষণ এখানে ছিল? নিজেদের যন্ত্রণার মধ্যে ফেলো না, জলদি জবাব দাও ও কার কাছে এসেছিল?'

সাগরের উত্তাল তরঙ্গের সাথে লড়াই করে ওরা বেঁচে আছে। দেখেছে মৃত্যুর বিভীষিকা। অথচ গোয়েন্দা প্রধানের একটা কড়া ধমক খেয়েই একজন বলে উঠলো, 'ও এসেছিল রবিনের কাছে। শুয়েছিল কি বসেছিল অন্ধকারে দেখা যায়নি। কি বলেছে তাও শুনিনি। মেয়েটা যে কে তাও জানি না। রবিনের পদমর্যাদা সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ, আমরা শুধু তার নাম শুনেছি। এখানে আসার আগমুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল ও। আমরা সবাই সাধারণ সৈনিক। আমাদের ওপর রহম করুন।'

এদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে বললেন প্রহরীদের। ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছলেন তিনি। রক্ষীরা ওদেরকে তাঁবুর সামনে বসিয়ে রেখেছে। এক রক্ষী বললো, 'কাল দু'টো উট দেখেছি, আজ একটা নেই।'

গোয়েন্দা প্রধানের জন্য এটা একটা মূল্যবান সংবাদ। ওদের তিনি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলো না ওরা। উটের পায়ের চিহ্ন পাওয়া গেলো। আলী বললেন, 'তোমরা সাধারণ চুরির অপরাধে অপরাধী নও। তোমরা একটা দেশ এবং একটা জাতির জন্য বিপজ্জনক। ক্ষমা তোমাদের করা যায় না। তোমরা কি ব্যবসায়ী?'

'হ্যাঁ।' সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল। 'আমরা ব্যবসায়ী, আমরা নিরপরাধ।'

'সবাই হাতের উল্টো পিঠ দেখাও।'

হাত উল্টে এগিয়ে ধরলো ওরা। বাঁ হাতের তর্জনী এবং মধ্যমার মাঝখানটা দেখলেন আলী। একজনের হাতের কব্জি ধরে বললেন, 'তীর কোথায় লুকিয়ে রেখেছো?'

ওরা না জানার ভান করলো। সুলতানের এক দেহরক্ষীকে ডাকলেন আলী। উল্টো করলেন তার হাত। বললেন, 'এ লোকটি আমাদের তীরন্দাজ। ওর দু আঙ্গুলের ফাঁকে তীরের ঘর্ষণের চিহ্ন রয়েছে। ধনুকে তীর জুড়ে নিক্ষেপের সময় তর্জনী এবং মধ্যমার ফাঁক দিয়ে তীর ছুটে যায়। তীরন্দাজ ছাড়া অন্য কারো এ চিহ্ন থাকে না। পাঁচজনের মধ্যে কেবল তোমার আঙ্গুলে এই চিহ্ন রয়েছে। এবার বলো তীর কোথায়?'

পাঁচজনই নীরব। ওদের একজনকে ধরে রক্ষীকে বললেন, 'একে ওই গাছের সাথে বেঁধে দাও।'

তারপর অন্য এক রক্ষীকে ডেকে কানে কানে কিছু বললেন। রক্ষী লোকটাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। বিঁধল ডান চোখে। তড়পাতে লাগলো লোকটা।

'ক্রুশের জন্য এভাবে আর কে জীবন দিতে পারো? ওকে দেখো, তড়পাচ্ছে। রক্ত ঝরছে চোখ থেকে। কথা দিচ্ছি, তোমাদের সসম্মানে সাগরের ওপারে পাঠিয়ে দেবো। বলো দ্বিতীয় উটে কে গেছে? কোথায় গেছে?'

'তোমাদের এক কমাণ্ডার আমাদের একটি উট ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

'সাথে একটা মেয়েও।' আলীর কণ্ঠে বিদ্রূপ।

শেষতক স্বীকার করলো ওরা। শোনাল সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সম্পর্কে

মেয়েটার বলা মিথ্যা কাহিনী। কিন্তু তাঁবু থেকে পালিয়ে আসাটা চেপে গেলো।

আলীর ঠোঁটে শ্লেষের হাসি।

'আশ্চর্য! একজন মাত্র লোক তোমাদের মতো পাঁচজন সৈনিকের কাছ থেকে একটা উট এবং একটা মেয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো?'

অবশেষে মুখ খুলতে বাধ্য হলো ওরা। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তীর ধনুক বের করা হলো বালির নীচে থেকে। ততোক্ষণে তড়পাতে তড়পাতে মারা গেলো তীর খাওয়া লোকটা।

দশজন অশ্বারোহী ডেকে দ্রুত উটের পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে যেতে বললেন গোয়েন্দা প্রধান। মুবি ও ফখরুল মিশরী রওনা হওয়ার পনেরো ঘন্টা পর তাদের পিছু ধাওয়া করে ছুটলো আলীর কমান্ডো বাহিনী।

খাওয়া এবং বিশ্রাম ছাড়া উট একনাগাড়ে ছ'সাত ঘন্টা চলতে পারে। ধরা পড়ার ভয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল ফখরুল। মরু জাহাজ উটও তাদের সহযোগিতা করছিল।

পথে দু'জায়গায় উট বসার চিহ্ন পাওয়া গেলো। পাশে খেজুরের বীচি, ফলের খোসা। আরো কিছুটা এগিয়ে আলী খাবার রাখার দুটো থলে কুড়িয়ে পেলেন। একটা খালি, অন্যটাতে তখনো বেশ কিছু খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট ছিল। খাবারগুলো নাকের কাছে নিতেই পরিচিত একটা গন্ধ নাকে লাগলো। আলী বললেন, 'এ খাবারে হাশিশ মেশানো।'

থলে দুটো নিয়ে আবার চলতে লাগলো কাফেলা। বিচক্ষণ আলী সময় নষ্ট না করে কাফেলাকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললেন।

ফখরুল মিশরী এবং মুবি ধরা পড় ও কিছু যায় আসে না। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সুদানী সেনাবাহিনীকে নতুন করে প্ররোচিত করার কিছু ছিল না। মুবির প্ররোচনা ছাড়াই আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষে ভরা ছিল ওদের হৃদয়গুলো। এ বিষ ওদের পান করিয়েছিল নাজি। ফাতেমী খেলাফতের সেনাপতিরা ছিল নামেমাত্র জেনারেল। ওরা ছিল নিষ্কর্মা ও বিলাসপ্রিয়। আইয়ুবীকে অথর্ব প্রমাণ করতে চাচ্ছিল ওরাও।

মুসলিম শাসকরা খৃষ্টান এবং ইহুদী তীদের রূপের হারেমে বন্দী। সরকারের উপদেষ্টাদের বেশীর ভাগই ইহুদী বা খৃষ্টানদের চর। আমীররা ভোগ আর সুরার অন্ধকারে হারিয়ে ফেলেছে ওদের বিবেক।

ওদেরকে হারেমের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবেন আইয়ুবী, [illegible] তুলবেন জাতির বিবেক, জেগে উঠবে মানবতা, এ অসহ্য। শেরে কোহ এর শাসন থেকে ওরা বুঝেছিল, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাদেরকে ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।

তাই তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে চাচ্ছিল ওরা। এ জন্য সাহায্যের আশায় হাত বাড়ালো খৃষ্টানদের কাছে। ওরা ময়দান উর্বর করছিল খৃষ্টান গোয়েন্দাদের জন্য।

নূরুদ্দিন জঙ্গী না হলে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখতে হতো। বিশ্বের মানচিত্রে তখন খুঁজে পাওয়া যেতো না এতগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের

আতঙ্ক। আলীর চিঠি পেলেন নূরুদ্দিন জঙ্গী। ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক মিলে দু'হাজার সৈন্য পাঠালেন আইয়ুবীর সাহায্যে।

নাজির মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে গেলো সুদানী সেনা শিবিরে। সুলতান যুদ্ধের ময়দানে, মিশরে রয়েছে অল্প ক'জন সৈন্য, আক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ। মিশরের সেনা ছাউনিতে হঠাৎ আক্রমণ করা হবে এ সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

মিশরে পৌঁছলো আলীর ক্ষুদ্র কাফেলা। মুবি এবং ফখরুলকে পাওয়া যায়নি। সুদানী হেড কোয়ার্টারে নিয়োজিত গোয়েন্দাদের ডেকে পাঠালেন তিনি এক গোপন আস্তানায়। ওদের একজন বললো, 'গতরাতে একটা উট এসেছে। আরোহী একজন পুরুষ ও এক যুবতী।'

'কোথায় উঠেছে ওরা?'

ওরা কোথায় উঠেছে গোয়েন্দা তার বিশদ বর্ণনা দিল। সুদানীরা মুসলিম ফৌজেরই অংশ, ইচ্ছে করলে আলী যে কারো বাসায় তল্লাশী নিতে পারেন। এতে আগুনে ঘি ঢালা হবে। আরও ক্ষেপে যাবে সুদানী ফৌজ। মুবিকে গ্রেফতার করা তার আসল উদ্দেশ্য নয়, তার উদ্দেশ্য ওদের পরিকল্পনা জানা। নতুন নির্দেশ দিয়ে গোয়েন্দাদের ফেরত পাঠালেন তিনি।

চারদিন পর্যন্ত রাজধানীর বাইরে ঘোরাঘুরি করলেন আলী। পঞ্চম রাতে খোলা আকাশের নীচে বসে আছেন তিনি। বিশ্রাম করছেন আর ফাঁকে ফাঁকে শুনছেন গুপ্তচরদের রিপোর্ট।

এক গোয়েন্দা একটা লোককে ধরে নিয়ে এলো। পা কাঁপছিল লোকটির, পড়ে যাচ্ছিল বার বার। গোয়েন্দা বললো, 'ওর নাম নাকি ফখরুল মিশরী, জড়ানো কণ্ঠে ও শুধু বলছে আমাকে আমার সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছে দাও।'

ফখরুল গোয়েন্দা প্রধানের সামনে বসল।

'একটা মেয়ে নিয়ে যে পালিয়ে এসেছে তুমি কি সেই কমাণ্ডার?'

'আমিই সুলতানের রক্ষী বাহিনীর সেই পলাতক আসামী। মৃত্যুদণ্ডই আমার প্রাপ্য। তবে আমাকে মারার আগে আমার কথা শুনুন, নয়তো আপনারা সবাই মারা পড়বেন।'

আলী বুঝলেন, কমাণ্ডারের এখনো নেশা কাটেনি। তাকে অফিসে নিয়ে গেলেন। পথে পাওয়া খাবারের থলে দেখিয়ে বললেন, 'এটা কি তোমার? এখান থেকে খেয়েছো?'

'হ্যাঁ, ও আমাকে এ থেকে খাইয়েছে।'

আলী থলে খুললেন। গুড়ের মতো একটা টুকরা বেরিয়ে এলো। এক ঝটকায় টুকরাটা হাতে তুলে নিল ফখরুল। মুখে দেয়ার আগেই আলী তার হাত ধরে ফেললেন।

'দোহাই আপনার, ছেড়ে দিন। এর ভেতর আমার জীবন, আমার আত্মা।'

'আগে সব কথা খুলে বলো। এরপর এর সবই তোমার।'

কমাণ্ডারকে এন্টি ড্রাগ খাওয়ানো হলো। কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলে গোটা কাহিনী বললো সে।

'ব্যবসায়ীরা আমাকে কফি পান করাল। মনে হলো অন্য পৃথিবীতে পৌঁছে গেছি আমি। মেয়েটা আমাকে ভালবাসার কথা বললো, লোভ দেখালো বিয়ের। আমরা দু'জন

উটে সওয়ার হলাম।

পথে ধরা পড়ার ভয়ে বিশ্রাম করেছি কম। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতো। আমার পাশবিক সত্তা জেগে উঠলে বলতো এখন নয়, বিয়ের পর ওসব হবে। উটের সাথে খাদ্যের দুটো ব্যাগ, একটা থেকে ও খেতো, আমাকে দিত অন্যটা থেকে। পথে থলে দুটো কোথাও পড়ে গেলো। খোঁজ করার জন্য পীড়াপীড়ি করলো ও, আমি রাজি হইনি। বলেছি সময় নষ্ট হলে ধরা পড়ে যাবো। খাবারের অভাব হলো, কিন্তু বসতি থেকে দূরে থাকতে চাইত ও।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় আমরা এক সুদানী কমাণ্ডারের কাছে পৌঁছলাম। আমার মাথায় অসংখ্য কীটের দংশন। কেন জানি না, ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হলাম। মেয়েটা আমার সামনেই কমাণ্ডারকে সব কথা বললো। প্ররোচিত করতে লাগলো বিদ্রোহ করার জন্য। বললো, আলী এবং আইয়ুবীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করতে হবে। তাদের দীর্ঘ আলোচনায় বিদ্রোহের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। ততোক্ষণে আমি পুরোপুরি সুস্থ।

আবার মাথায় যন্ত্রণা, আবার সুস্থ, এভাবে চলতে লাগলো। মেয়েটা কমাণ্ডারকে বললো, আইয়ুবী নেই, এখনি বিদ্রোহ করার উপযুক্ত সময়। ও আরো বললো, কিছু দিনের মধ্যেই খৃষ্টান সৈন্যরা আবার আক্রমণ করবে। তখন আইয়ুবীকে এখানকার ফৌজও ডেকে নিতে হবে। কমাণ্ডার তার কথায় সম্মত হয়ে বললো, ছ'সাত দিনের মধ্যেই তারা বিদ্রোহ করবে।

মাঝ রাতে আমাকে অন্য এক কামরায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। দু'কক্ষের মাঝে ছোট একটি দরজা। দরজাটি ওপাশ থেকে বন্ধ।

কমাণ্ডার এবং মেয়েটির হাসির শব্দ ভেসে আসছিল ওপাশ থেকে। আমার ঘুম আসছিল না। উঠে দরজায় কান লাগিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। মেয়েটা বললো, 'ওকে হাশিশ খাইয়ে এদ্দুর এনেছি। একা এতদূর আসা সম্ভব ছিল না বলে পথে ছিলাম ওর প্রেমিকা। পথে হাশিশের পুটলিটা পড়ে গেছে। সকালে এক পুরিয়া না পেলে বিরক্ত করবে।'

এরপর বুঝলাম, মদপানের সাথে সাথে ওরা পাপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। অনেক পরে কমাণ্ডারের কণ্ঠ ভেসে এলো, 'ওর এখন আমাদের প্রয়োজন নেই। ওকে কি জেলে পাঠিয়ে দেবো, না মেরে ফেলবো?'

'বরং তাকে মেরেই ফেলো।' মেয়েটার কণ্ঠ, 'থাকলে ঝামেলা করতে পারে।'

তাদের কথা শুনে বুঝলাম মাথার ওপর খড়গ ঝুলছে। দ্রুত পালানোর চিন্তা করলাম। রাতের শেষ প্রহরে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ভোরের আলো ফোটার আগেই অনেক দূরে চলে এলাম। কিন্তু ভয় আমাকে তখন তাড়া করে ফিরছে। দু'দিক থেকেই ধাওয়া খাওয়ার ভয়। খৃষ্টান বা সুদানীরা পেলেও আমাকে হত্যা করবে। আমাদের ফৌজও আমাকে পেলে মৃত্যুদণ্ডের আসামী গণ্য করবে। তাই দিনে লুকিয়ে থাকতাম কোন পড়োবাড়ীতে, পাহাড়ের গুহায় বা বালিয়াড়ির আড়ালে। পথ চলতাম রাতে।

দেহ এবং মস্তিষ্ক দুটোই দুর্বল। কখনো ইচ্ছে হতো, ফিরে গিয়ে খৃষ্টান মেয়েটাকে হত্যা করি। আবার ভাবতাম, সুলতানের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইবো। কিন্তু কিছুই

স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারছিলাম না। এভাবে হাঁটছি, হঠাৎ পথে এ লোকের সাথে দেখা হয়ে গেলো। সে আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে।'

সুদানীরা আক্রমণ করবে এখন এ আর আশংকা নয়, নিশ্চিত হওয়া গেলো। সুলতানকে সংবাদ দিতে হবে, নষ্ট করার মতো সময় নেই হাতে। কি করে দ্রুত সুলতানকে খবর দেয়া যায় ভাবতে লাগলেন আলী। একজন অফিসার এসে বললো, 'সুলতান আপনাকে স্মরণ করেছেন।'

'সুলতান!' আলীর অবাক কণ্ঠ, 'তিনি তো যুদ্ধের ময়দানে! এলেন কখন?'

সাথে সাথে সুলতানের সাথে দেখা করলেন তিনি। সুলতান বললেন, 'সংবাদ পেলাম যুদ্ধের ময়দানে এবং এদিকে ওদের অনেক গুপ্তচর ছড়িয়ে পড়েছে। ওখানে আমার কাজ নেই। এ দিক নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি, তাই চলে এলাম।'

সব ঘটনা খুলে বললেন আলী। 'সুলতান, আপনি বললে জঙ্গীর ফৌজ আসা পর্যন্ত বিদ্রোহ মুলতবী করার চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমাদের সৈন্য কম, ওদের আক্রমণ ঠেকাতে পারবো না।'

সুলতান পায়চারি করতে লাগলেন। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। আলী অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন সুলতানের দিকে। কক্ষে নীরবতা। হঠাৎ পায়চারী থামিয়ে সুলতান বললেন, 'হ্যাঁ। আলী, এবার তোমার ভাষা ব্যবহার করো, আক্রমণের বিপক্ষে নয়, পক্ষে। ওরা আক্রমণ করবে রাতে, যখন ঘুমিয়ে থাকবে আমাদের ফৌজ।'

আলীর চোখে অবাক বিস্ময়। সুলতান মুখ খুললেন, 'সব কমান্ডারদের ডেকে নিয়ে এসো। মনে রেখো, আমি এখনো যুদ্ধের ময়দানে। আমি এসেছি কেউ যেন জানতে না পারে।'

তিন রাত পর। গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে সমগ্র কায়রো। একদিন পূর্বে ফৌজকে শহরের বাইরে যেতে দেখা গেছে। বলা হয়েছে সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে যাচ্ছে ওরা। নীলনদের পাড়ে বালিয়াড়ি আর টিলা।

টিলা এবং নদীর মাঝখানে ছাউনি ফেললো ওরা। পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য।

মাঝ রাতে অশ্বক্ষুরের শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠলো কায়রোবাসী। শহরের বাইরে যেন রোজ কিয়ামত। ওরা মনে করলো সামরিক মহড়া। শব্দগুলো এগিয়ে আসছে। বাড়ীর ছাদে উঠে এলো উৎসুক জনতা। দিগন্তের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। দেখা গেলো নীলের শান্ত বুক থেকে উঠে আসছে অগ্নিগোলক। ছাউনি লক্ষ্য করে রাতের বুক চিরে এগিয়ে আসছে তীব্র গতিতে।

বিদ্রোহ করেছে সুদানী ফৌজ। তারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। মধ্যরাতে এক ভাগ মার্চ করলো রোম উপসাগরের দিকে, যেখানে পরাজিত হয়েছে খৃস্টান বাহিনী। অন্য ভাগ আইয়ুবীর ছাউনিতে আক্রমণ করলো। সূর্যোদয়ের পূর্বেই রাজধানী দখল করবে ওরা। দ্রুততার সাথে সুদানী বাহিনী সুলতানের ফৌজের ছাউনি দখল করলো।

আচমিত তাঁবুতে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো আগুনের গোলা। নীল থেকেও ছুটে আসছিল অগ্নিগোলক। তাঁবুতে আগুন ধরে গেলো। অবাক হয়ে সুদানীরা দেখলো, আইয়ুবীর

একজন সৈন্যও নেই তাঁবুতে। আর তখনি শহরময় ছড়িয়ে পড়লো অশ্বক্ষুরধ্বনি। মানুষ জানলো না, সুদানী ফৌজের বেশীর ভাগ সৈন্য জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। সুলতান আইয়ুবীর কৌশল আবারো অভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। নীল আর পাহাড়ের মাঝের বালিয়াড়িতে তাঁবু ফেলা তার ক্ষুদ্র বাহিনী পঞ্চাশ হাজার সুদানী সৈন্যের বিদ্রোহ করার স্বপ্ন পুড়ে ছারখার করে দিচ্ছে।

রাতের প্রথম প্রহরেই সৈন্যদের সরিয়ে নিয়েছিলেন আইয়ুবী পাহাড়ে এবং নদীতে। ওদের দিলেন বহনযোগ্য কামান মিনজানিক। যাওয়ার আগে তারা তাদের তাঁবুগুলো ভরে দিয়ে গেল তেলে ভেজা খড় এবং শুকনো ঘাস দিয়ে।

সুদানী সৈন্যরা শূন্য তাঁবু দেখে যখন হতভম্ব তখনি পাহাড় এবং নদী থেকে ছুটে এলো মিনজানিকের অগ্নিগোলা। আইয়ুবীর সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত তোপের আগুনে জ্বলে উঠলো তাঁবুতে রেখে আসা শুকনো খড়। সুদানী ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে ছুটতে লাগলো দিকবিদিক। তাদের ঘোড়সওয়াররা পদাতিকদের পিষে ফেলতে লাগলো। চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা। সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরোতে না পেরে জীবন্ত পুড়ে মরলো অনেক সৈন্য। যারা বেরিয়ে এলো তারা পড়লো আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনীর তীরের আওতায়।

সুদানী ফৌজের অন্য দল এগিয়ে যাচ্ছিল রোম উপসাগরের দিকে। তাদের ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন সুলতান আইয়ুবী। পাহাড়ের ফাঁকে লুকিয়ে থাকা কমাণ্ডো বাহিনীর কবলে পড়লো ওরা। কমাণ্ডো বাহিনী সুদানী ফৌজের পেছন থেকে আক্রমণ করতো। কখনো আক্রমণ করতো পাশ থেকে। সুদানী সৈন্যরা কিছু বুঝার আগেই টপাটপ লাশ পড়তো মাটিতে। অন্ধকারে কোত্থেকে ছুটে আসছে তীর কিছুই ওরা দেখতে পেতো না। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে বাঁচার আশায় ওরা ছুটে যেতো সামনের দিকে। কিন্তু কমাণ্ডো বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণ ওদের পথরোধ করে দাঁড়াতো। আবার এগিয়ে যেতো সুদানী বাহিনী, আবার থামতে বাধ্য হতো। আচমকা আবার পেছন থেকে আক্রান্ত হতো।

অন্ধকার রাত। এ অন্ধকারে কমাণ্ডোদের ধাওয়া করা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। ভোর পর্যন্ত তিনবার আক্রান্ত হলো ওরা। ভয় পেয়ে থেমে গেল ফৌজ। আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস হারিয়ে ফেললো।

দিনের বেলা সুদানী অফিসার ও কমাণ্ডাররা তাদের সৈন্যদের সাহস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো। কয়েকটা গ্রুপ আশপাশের এলাকা ঘুরে তালাশ করলো আইয়ুবীর সৈন্য। কিন্তু কোথাও তাদের ছায়াও দেখতে পেলো না।

রাতে আবার আক্রমণ হলো। অদৃশ্য শত্রুর তীরের আঘাতে মারা পড়লো তাদের অসংখ্য সৈন্য। হঠাৎ তারা দেখতে পেলো, তাদের মাল বোঝাই উটগুলো দিকবিদিক ছুটতে শুরু করেছে। যেখানে ওগুলো ছিল সেখানে জ্বলছে আগুন।

মাত্র দু'রাতের কমাণ্ডো আক্রমণে সুদানী বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে পড়লো। সৈন্যদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দিল আলীর গোয়েন্দারা। তারা খবর রটিয়ে দিল, আইয়ুবীর সাহায্যে আরব থেকে আসছে বিশাল বাহিনী। এ সংবাদে ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো ওদের। পরদিন ভোরে দেখা গেলো, কমান্ডারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।

এভাবেই নিঃশেষ হয়ে গেলো সুদানী বাহিনী। থেমে গেলো বিদ্রোহের ঝড়।

ওদিকে নূরুদ্দিন জঙ্গীর পাঠানো ফৌজ কায়রো এসে পৌঁছলো।

ইচ্ছে করলে সুলতান আইয়ুবী সুদানীদের নির্বিচারে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। সুদানী কমাণ্ডাররা বুঝেছিল তারা অপরাধী, নিঃশেষ হয়ে গেছে ওদের সামরিক শক্তি। ওরা যে অপরাধ করেছে তাতে একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই ওদের প্রাপ্য। কিন্তু সুলতান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। সৈন্যদেরকে সরকারী জমি দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হলো। এরপর ঘোষণা করা হলো, মিশরের সেনাবাহিনীতে ভর্তিচ্ছুদের স্বাগত জানানো হবে।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর পাঠানো সৈন্য, মিশরের ফৌজ এবং সুদানী বাহিনীর নতুন ভর্তি হওয়া লোক নিয়ে সুলতান আইয়ুবী এক সুশৃংখল এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন। আলী বিন সুফিয়ান তৈরী করলেন দুঃসাহসী কমাণ্ডো এবং গোয়েন্দা বাহিনী।

কিন্তু তাতে বিপদ কাটলো না, বরং আরো কঠিন বিপদের সংকেত ধরা পড়তে লাগলো আলীর তথ্যভাণ্ডারে। তিনি খবর পেলেন, খৃষ্টানরা অপরূপা সুন্দরী তরুণী এবং গুপ্তচর দিয়ে ভরে ফেলছে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব। আইয়ুবীর বিরুদ্ধে আরো ব্যাপক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ওরা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, দু'পক্ষেরই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন প্রায়।

সুলতান এসব সুন্দরী তরুণীদের বিষাক্ত ছোবল কিভাবে মোকাবেলা করবেন আর খৃষ্টানরাই বা কিভাবে মোকাবেলা করবে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সুশৃঙ্খল বাহিনীর– উভয় পক্ষ তা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলো। কিন্তু এ পায়তারা শেষ হতে বেশী দিন সময় লাগলো না। অল্পদিনের মধ্যেই ভয়ংকর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লো ওরা।

রোমের এক উপশহর। জরুরী সম্মেলনে যোগ দিতে এখানে এসেছেন বিশ্বের খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ। এর মধ্যে রয়েছেন সম্রাট অগাস্টাস, সম্রাট রিমাণ্ড, এসমার্ক, সপ্তম লুইয়ের ভাই রবার্ট। এদের মধ্যে সবচে' ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল এসমার্ককে। খৃষ্টানদের সম্মিলিত নৌবাহিনীর প্রধান তিনি। সুলতান সালাহউদ্দিনের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে মেজাজ বিগড়ে গেছে তার। বিজয় দূরে থাক, উপকূলের কাছেও ঘেঁষতে পারেনি তার বাহিনী। যারাই মিশর উপকূলে পা রাখার দুঃসাহস দেখিয়েছে, তারা হয়েছে বন্দী, নয়তো নিহত।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোলন্দাজদের তোপের আঘাতে পুড়ে গেছে জাহাজের পাল এবং মাস্তুল। ভাগ্য ভাল যে, সিপাইরা তার জাহাজের আগুন নিভাতে সক্ষম হয়েছিল।

পাল ছেঁড়া জাহাজ ঢেউয়ের দোলায় এগিয়ে গিয়ে পড়লো সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে। অনেক জাহাজ এবং নৌকা ঝড়ে ডুবে গেলো। তার জাহাজের মাঝি মাল্লারা সাহসিকতার সাথে ঝড়ের মোকাবিলা করলো। একদিন পৌঁছলো সমুদ্র উপকূলে। তীরে নেমেই মাঝি মাল্লাদের পুরস্কৃত করলো এসমার্ক।

খৃষ্টান নেতারা তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য, পরাজয়ের কারণ নিয়ে পর্যালোচনা করা। কেউ কি তাদের সাথে প্রতারণা করেছে? কে সে, নাজি?

তার চিঠি পেয়েই নৌসেনা পাঠানো হয়েছিল। নাজির চিঠি তাদের কাছে নতুন নয়। আগের লেখাগুলোর সাথে এ লেখার হুবহু মিল আছে। ওরা আবার চিঠি খুলে বসলো। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। কায়রো থেকে গোয়েন্দারা কোন সংবাদ দেয়নি। নাজি কোথায় তাও ওরা জানে না।

রাগে কাঁপছিল এসমার্ক। আইয়ুবীকে হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে নিয়ে আসবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল সে। তার দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে। এসমার্ক পরাজিত, ক্লান্ত।

বৈঠকে অনেক আলোচনা হলো। কিন্তু কোন সমাধান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলো না ওরা। সম্মেলন পরদিনের জন্য মুলতবী ঘোষণা করা হলো।

রাতে মদের আসর চলছে। এক অপরিচিত মুখ ভেতরে এলো। শুধু রিমাণ্ড চেনে তাকে। বিশ্বস্ত গোয়েন্দা। আক্রমণের দিন সন্ধ্যায় তাকে মিশরের উপকূলে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। তার চোখের সামনেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে খৃষ্টানদের নৌবহর।

রিমাণ্ড গোয়েন্দার সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিল। ভিড় জমে উঠলো তার চারপাশে। গোয়েন্দা বললো, 'আহত হওয়ার ভান করে রবিন আইয়ুবীর ছাউনিতে পৌঁছে গেছে। রবিনের সহযোগী পাঁচজন ছিল ব্যবসায়ীর পোশাকে। তাদের একজন ক্রিস্টোফার। সে তীর ছুঁড়েছিল আইয়ুবীকে লক্ষ্য করে। লাগেনি।

ধরা পড়েছে পাঁচজনই। সাথে সাতটা মেয়ে। ওরা চমৎকার গল্প ফেঁদেছিল। আইয়ুবী মেয়েগুলোকে রেখে ছেড়ে দিয়েছিল বাকী পাঁচজনকে। কিন্তু ওদের গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান এসে সবাইকে গ্রেফতার করলো। কথা আদায় করতে গিয়ে অত্যাচার করে মেরে ফেললো একজনকে। অপরাধ স্বীকার করলো অন্যরা।

আমি নিজেকে ডাক্তার পরিচয় দিয়েছিলাম। সুলতান আমাকে আহতদের চিকিৎসার দায়িত্ব দিলেন। শুনেছি সুদানীদের বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। বড় বড় অফিসারদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিনসহ এগারজনকে বন্দী করা হয়েছে। সুবিনা আর তালাশকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একদিন দেখা গেলো মুসলিম ছাউনিতে আইয়ুবী নেই, নেই আলী বিন সুফিয়ানও। সুযোগ পেয়ে অনেক টাকার বিনিময়ে একটা নৌকা জোগাড় করে আমি পালিয়ে এসেছি।

রবিন এবং অন্যদের উদ্ধার না করলে মারা পড়বে। ছেলেদের না হলেও মেয়েগুলোকে মুক্ত করা জরুরী। ওরা শুধু সুন্দরী ও যুবতীই নয়, মুসলমান আমীর ওমরাদের ফাঁসানোর জন্য ওদেরকে দীর্ঘদিন ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। এরকম সাতটা চৌকস মেয়ে তৈরী করতে অনেক সময় ও কাঠখড় পোড়াতে হবে আমাদের। মুসলমানরা তাদের কি অবস্থা করেছে কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'এ ধরনের সেক্রিফাইস তো আমাদের করতেই হবে।' সম্রাট অগাস্টাস বললেন, 'মেয়েদের মেরে ফেলা হবে এ নিশ্চয়তা তোমাকে কে দিল?'

রিমাণ্ড বললো, 'কিন্তু তাই বলে মুসলমানরা ওদের সাথে পশুর মতো আচরণ করবে আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো? না, তা হয় না। আমি ওদের মুক্ত করার চেষ্টা করবো।'

রবার্ট বললো, 'ভাল ব্যবহার করে মুসলমানরা ওদেরকে আমাদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার

করতে পারে। ওদের মুক্ত করা আমাদের দায়িত্ব। আমার অর্ধেক সম্পদ এর জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত।'

'ওরা মেয়ে বলেই এত দামী তা নয়।' গোয়েন্দাটি বললো, 'ওরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাছাড়া এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার জন্য এমন মেয়ে ক'টাই বা পাওয়া যায়? আপনাদের যুবতী মেয়েরা কি এমনভাবে শত্রুর হাতে নিজেকে তুলে দিতে পারবে? পারবে কি শত্রুর ভোগের সামগ্রী হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে? মৃদু হাসির যাদু দিয়ে পারবে বড় বড় দুশমনকে পদানত করতে?'

'যদি শত্রুরা ওদের পরিচয় জানতে পারে তবে ওদের মৃত্যু অনিবার্য।'

'হ্যাঁ, প্রচুর টাকার বিনিময়ে আমরা ওদের নিয়েছি। ট্রেনিং দিয়েছি, বিভিন্ন ভাষা শিখিয়েছি। এমন অভিজ্ঞ মেয়েগুলোকে হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না।'

সম্রাট অগাস্টাস গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি মনে করো ওদের বের করে আনা সম্ভব?'

'জ্বী। শুধু ক'জন সাহসী লোক প্রয়োজন। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।' গোয়েন্দা বললো, 'অচিরেই ওদেরকে কায়রো পাঠিয়ে দেবে মুসলমানরা। একবার কায়রো নিয়ে গেলে তখন উদ্ধার করা কঠিন হবে। সময় নষ্ট না করলে ক্যাম্পেই ধরতে পারবো ওদের। আমাকে কয়েকজন সাহসী এবং ত্যাগী লোক দিন, আমি ওদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো।' কথা শেষ করলো গোয়েন্দা।

'অবশ্যই মেয়েদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে।' ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বললো এসমার্ক। পরাজয়ের অপমান তার চোখে মুখে। কখনো টেবিলে ঘুষি মেরে, কখনো নিজের উরু চাপড়ে কথা বলছিল সে। বললো, 'আমি মেয়েদের ফিরিয়ে আনবো, হত্যা করবো আইয়ুবীকে। এই রূপসী যুবতীদের দিয়েই আমি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ছিন্নভিন্ন করে দেবো।'

'এসমার্ক!' রিমাণ্ড বললেন, 'আমি তোমার আবেগকে শ্রদ্ধা করি। ট্রেনিংপ্রাপ্তা মেয়েদেরও সহজে হাতছাড়া করতে পারি না। তুমি তো জানোই আমাদের মেয়েরা সিরিয়ার হারেমগুলো জমিয়ে রেখেছে। আমীর ওমরারা এখন ওদের হাতের পুতুল। নারী এবং সুরার গুণে মুসলিম বিশ্ব এখন তিন ভাগে বিভক্ত। ঐক্য ভেঙে গেছে ওদের। শুধু দুটো লোক আমাদের জন্য বিপজ্জনক। একজন নুরুদ্দিন জঙ্গী, অন্যজন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। এদের একজন বেঁচে থাকলেও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হবে না। আইয়ুবী সুদানী বিদ্রোহ দমন করেছে, তার মানে লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত। তার ওপর আরো তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে আমাদের।'

'নিয়মিত যুদ্ধের পরিবর্তে কূটনৈতিক লড়াই এবং গোপন যুদ্ধে হারাতে হবে তাদেরকে। মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে আমাদের তাবেদার। এই তাবেদার সৃষ্টি এবং মুসলিম সমাজের ঐক্য নষ্ট করতে হলে ট্রেনিংপ্রাপ্তা এসব মেয়েদের সেবা আমাদের প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন।'

রবার্ট বললো, 'হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা আমাদের তাই বলে। মুসলমানরা নারী দেহের গন্ধ পেলে সব কিছু ভুলে যায়। এ যুদ্ধে ওদের হারাবার সহজ পথ হলো, ওদের হাতেই

ওদেরকে মারতে হবে। বিনোদনের বিভিন্ন পথ উন্মুক্ত করে দাও ওদের জন্য, ওরা দ্বীন ঈমান ভুলে যাবে। শুধু যুবতী দেহের রূপ ও সৌন্দর্যের বিনিময়ে আরবের অনেক আমীর ও বাদশাহ এখন আমাদের হাতের পুতুল।'

মুসলমানদের দুর্বলতাগুলো নিয়ে ওদের মধ্যে অনেকক্ষণ কথা হলো। সিদ্ধান্ত হলো, মেয়েদের মুক্ত করার জন্য অভিযান চালানো হবে। দুঃসাহসী ক'জন কমাণ্ডো পাঠানো হবে এ অভিযানে। একজন বললো, 'আমরা আগে থেকেই দুঃসাহসী কমাণ্ডো ফোর্স তৈরী করে রেখেছি। ওদেরকেই এ অভিযানে ব্যবহার করা যাবে।'

'কিন্তু ওদেরকে বিশ্বস্ত হতে হবে।' অগাস্টাস বললেন, 'ওরা কাজ করবে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। কিছু না করেও এসে বলবে, অনেক কিছু করেছি।'

'শুনে আশ্চর্য হবেন, ওদের অনেককে আমরা কারাগার থেকে সংগ্রহ করেছি। ওরা ছিল চোর, ডাকাত এবং খুনী। কেউ কেউ যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী। স্বতস্ফুর্তভাবেই ওরা আমাদের বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। মেয়েদের উদ্ধার করার জন্য আমি এমন তিনজন লোক দিতে পারবো, কুখ্যাত খুনী হিসাবে যাদের ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল।'

একটু পর। পাঁচজন কমাণ্ডো অফিসারকে ডেকে আনা হলো। ওরা এলে বিস্তারিত পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়া হলো ওদের। দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ওরা চলে গেলো কাজে। সকাল হওয়ার আগেই বিশজনের এক বাহিনী তৈরী করে ফেললো ওরা।

এই বিশজনেরই একজন মেগনামা মারইউস। সে ছিল রোমের জেলখানার এক দাগী কয়েদী। পেশায় ডাক্তার হলেও খুনের আসামী বলে ওর মাথার ওপর ঝুলছিল ফাঁসির দড়ি। তাকে গোয়েন্দা হওয়ার প্রস্তাব দিলে সে সানন্দে লুফে নেয় এ প্রস্তাব। জেলখানা থেকে বের করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। দীর্ঘ প্রশিক্ষণ শেষে তার মেধা ও দক্ষতা দেখে তাকে কমাণ্ডো বাহিনীর গ্রুপ কমাণ্ডার বানিয়ে দেয়া হয়। বিশজনের এ বাহিনীর উপপ্রধান করা হলো তাকে। অন্য এক অফিসারকে করা হলো কমাণ্ডার। তাদের বলা হলো, 'তোমাদের প্রথম কাজ মেয়েদের মুক্ত করা। রবিন এবং তার সঙ্গীদের মুক্ত করতে না পারলে ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই। দ্বিতীয় কাজ হলো সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যা করা।'

প্রয়োজনীয় অস্ত্রসহ সেদিনই তাদেরকে নৌকায় তুলে দেয়া হলো।

সুদানীরা ব্যর্থ হয়েছে। দমন করা হয়েছে ওদের সেনা বিদ্রোহ। অনেক অফিসার ওদের নিহত হয়েছে। সুলতান আইয়ুবীর অফিসের সামনে তখনো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। পরাজিত ও বিধ্বস্ত চেহারা। অস্ত্র সমর্পণ করে ওরা আনুগত্য মেনে নিয়েছে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর।

আইয়ুবী নিজের কমাণ্ডারদের বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সাথে গোয়েন্দা প্রধান। এ বিজয়ে তার ভূমিকা অসামান্য। বলতে গেলে গোয়েন্দা যুদ্ধেই ওদের পরাজিত করা হয়েছে।

হঠাৎ আলীর দিকে তাকালেন সুলতান। বললেন, 'আলী! ব্যস্ততার কারণে সাতটি

মেয়ে এবং তার সঙ্গীদের নিয়ে কিছু ভাবতে পারিনি। ওরা এখনো সাগর পারের ছাউনিতে। যত শীঘ্র সম্ভব ওদের এখানে নিয়ে এসো।'

'এখনি লোক পাঠিয়ে ওদের আনানোর ব্যবস্থা করছি। সুলতান! সম্ভবতঃ সপ্তম মেয়েটার কথা আপনি ভুলে গেছেন। ও এসেছিল সুদানী কমাণ্ডার বালিয়ানের কাছে। বালিয়ান বন্দী হয়নি, নিহত ও আহতদের মধ্যেও নেই। মেয়েটা সম্ভবতঃ বালিয়ানের সাথে পালিয়ে গেছে।'

'আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছো। শোন, এখানে এখন তুমি না হলেও চলবে। বালিয়ান হয়তো রোম উপসাগরের দিকেই পালিয়েছে। খৃষ্টান ছাড়া কে আর ওদের আশ্রয় দেবে? যেখানেই পাও, ওকে এনে জেলে পুরে দাও। আর গোয়েন্দাদের একটা দল সাগরের ওপারে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।'

'নিজের দেশেই গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দেয়া বেশী জরুরী।' নুরুদ্দিন জঙ্গীর পাঠানো সেনা কমাণ্ডার বললো, 'খৃষ্টানদের চাইতে মুসলমান আমীররা আমাদের জন্য বেশী ক্ষতিকর। গোয়েন্দাদেরকে ওদের হারেমে ঢুকিয়ে দিতে পারলে অনেক ষড়যন্ত্রই প্রকাশ হয়ে পড়বে। সুলতান জঙ্গী সব সময় উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন, বাইরের হামলা ঠেকাবেন, না ঘরের শত্রু প্রতিরোধ করবেন।'

কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন সুলতান আইয়ুবী। বললেন, 'যাদের হাতে অস্ত্র আছে তারা যদি বিশ্বস্ত এবং দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয় তবে ভেতরের ষড়যন্ত্র এবং বাইরের আক্রমণ কোনটাই আমাদের কিছু করতে পারবে না। একটা কথা মনে রেখো, মুসলিম বিশ্বের কোন সীমানা নেই। যখনই ইসলামকে সীমার সংকীর্ণতায় আবদ্ধ করা হয়েছে তখনই বিপর্যয় এসেছে। দৃষ্টিকে প্রসারিত করে তোমার দৃষ্টি নিয়ে যাও রোম উপসাগরের ওপারে, দেখবে বিশাল জলরাশিও তোমার পথ রুখতে পারবে না। ঘরের যে আগুনকে ভয় পাচ্ছো তা এক ফুঁতে নিভে যাবে, সেখানে জ্বলবে দ্বীন এবং ঈমানের আলো।'

'আমরা বেঈমানদের মোকাবেলা করার কথা বলছি সুলতান! আমরা নিরাশ হইনি।' বললো কমাণ্ডার।

'বন্ধুরা, তোমরা দুটো শব্দ থেকে দূরে থেকো 'হতাশা' এবং 'মানসিক বিলাস'। মানুষ প্রথমে নিরাশ হয়, এরপর মানসিক বিলাসিতার মাধ্যমে দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়ায়।'

আলী বিন সুফিয়ান বেরিয়ে গেলেন। একজন দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে দিলেন সাগরপারের ছাউনিতে। তাকে বললেন, 'রবিন এবং মেয়েগুলোকে ঘোড়া বা উটে করে সেনা প্রহরায় রাজধানীতে নিয়ে এসো।'

ওদের পাঠিয়ে দিয়ে দু'জন সিপাইকে সাথে নিয়ে তিনি নিজে বেরোলেন বালিয়ানের খোঁজে। হেড কোয়ার্টারের বাইরে দাঁড়ানো সুদানী কমাণ্ডাররা বালিয়ান সম্পর্কে কিছু তথ্য দিল। ওরা বললো, 'বালিয়ানকে যুদ্ধের ময়দানে দেখা যায়নি। উপসাগরের ছাউনিতেও যায়নি সে।'

আলী পৌঁছলেন তার বাড়ীতে। দু'জন বৃদ্ধা চাকরানী ছাড়া কেউ নেই। ওরা বললো,

'এখানে পাঁচজন যুবতী মেয়ে ছিল। কারো রূপ একটু ম্লান হলেই তাকে সরিয়ে দিত বালিয়ান। নিয়ে আসতো তরতাজা উজ্জ্বল যুবতী। বিদ্রোহের আগে একটা ফিরিঙ্গী মেয়ে এসেছিল। ভীষণ সুন্দরী এবং সতর্ক। আমাদের মালিক ছিল তার হাতের পুতুল। বিদ্রোহের পর সুদানীরা যেদিন আত্মসমর্পণ করলো সে রাতে তিনি সাতজন ঘোড়সওয়ারসহ মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে যান। উনি চলে যাবার পর হারেমের অন্যান্য মেয়েরা হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে ভেগেছে।'

আলী ফিরে আসার জন্য ঘুরলেন, এক দ্রুতগামী সওয়ার তার সামনে এসে লাফিয়ে পড়লো ঘোড়া থেকে। সওয়ারের নাম ফখরুল মিশরী।

হাঁফাতে হাঁফাতে সে বললো, 'আমি আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি। বালিয়ান এবং সে মেয়েটাকে আমি খুঁজে পেয়েছি। ওরা কোন দিকে গেছে আমি জানি। ওদের পিছু নিয়েছিলাম আমি। কিন্তু ওদের সাথে সাতজন সশস্ত্র প্রহরী থাকায় আমি ফিরে এসেছি। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। ওদের দু'জনকে নিজের হাতে হত্যা করতে না পারলে আমি শান্তি পাবো না। আমি একা, খোদার দিকে চেয়ে আমার সাথে কয়েকজন সিপাই দিন।'

'ওরা কোথায়?'

'ওরা রোম উপসাগরের দিকে যাচ্ছে। তবে ওরা পথ চলছে খুব সাবধানে। সাধারণতঃ তারা বড় রাস্তা এড়িয়ে পার্শ্ববর্তী সরু রাস্তা মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।'

ফখরুল মিশরী দ্রুত নুয়ে আলীর পায়ে হাত রেখে অনুনয় করে বললো, 'আমি ওদের পিছু নেবো, হত্যা করবো ওদের। দয়া করে আমার সাথে মাত্র চারজন সিপাই দিন।'

আলী তাকে শান্ত করলেন। 'চারজন নয় বিশ জন সওয়ার দেবো। ওরা এত শীঘ্র সাগর পারে পৌঁছতে পারবে না। আমরা ওদের পিছু নিচ্ছি, তুমিও থাকবে আমাদের সাথে।' ওদের খোঁজ পেয়ে আলী এবার নিশ্চিন্ত মনে ওদের পিছু নিলেন।

অনেক পথ অতিক্রম করেছে বালিয়ান এবং মুবি। সাধারণ রাস্তা ছেড়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। এসব পথঘাট বালিয়ানের চেনা থাকায় পথ চলতে ওদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন তা জানতো না বালিয়ান। ভয়ে পালাচ্ছে সে। মুবির মতো সুন্দরী যুবতীকে হাতছাড়া করার ইচ্ছে নেই তার। ওর ধারণা ছিল, মিশর এবং সুদানেই রয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সুন্দরীরা। কিন্তু ইটালীর এ যুবতীর রূপ তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। তার জন্য উচ্চপদ, ধর্ম এবং দেশ ছাড়তেও কুণ্ঠিত হয়নি সে।

ও জানতো না, মুবি তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবার ফন্দি আঁটছে। সে যে উদ্দেশ্যে দ্বিগুণ বয়েসী এ লোকের কাছে নিজের হৃদয়, নিজের ইজ্জত বিকিয়ে দিয়েছে তা বরবাদ হয়ে গেছে।

মুবির মতো যুবতীর ভালবাসা পেয়ে বালিয়ান ছিল তৃপ্ত। কিন্তু এখন মুবি তাকে ঘৃণা করছে। একজন নারীর পক্ষে একা পথ চলা সম্ভব নয় বলেই বাধ্য হয়ে তার সাথে যাচ্ছে

সে। রবিনকে খুঁজে বের করাই এখন তার প্রধান কাজ। ওকে না পেলে সে ফিরে যাবে সাগরের ওপারে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বালিয়ানের ভোগের সামগ্রী হতে হচ্ছে। ও কয়েকবারই বলেছে, 'বিশ্রাম কম করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলো।' কিন্তু বালিয়ান একটু ভাল জায়গা পেলেই থেমে যেতো।

এক রাতে বালিয়ানকে মদ ঢেলে দিচ্ছে মুবি। ইচ্ছে করেই বেশী খাওয়ালো। নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো বালিয়ান। প্রহরীরাও শুয়ে আছে।

ধীর পায়ে এক প্রহরীর কাছে গেলো ও। যুবক বয়স। সাহসী। বালিয়ানের বিশ্বস্ত। আলতো স্পর্শে তাকে জাগাল মুবি। নিয়ে গেলো খানিক দূরে। বললো, 'তুমি তো জানো আমি কে? কেন এসেছি।' যুবক কোন কথা না বলে মাথা নাড়লো।

'তোমাদের জন্য সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে এসেছিলাম। চেয়েছিলাম সালাহউদ্দিনকে সরিয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতায় বসাবো। কিন্তু তোমাদের এ কমাণ্ডার অপদার্থ। বিদ্রোহের পরিকল্পনা করবে তা নয়, প্রতি রাতে মাতাল হয়ে আমাকে ভোগ করা শুরু করলো। আমি হলাম তার হারেমের বন্দিনী।'

সামান্য বিরতি নিয়ে মুবি আবার বলতে শুরু করলো, 'কোন চিন্তা ভাবনা না করেই ফৌজকে দু'ভাগে ভাগ করলো ও। আক্রমণ করলো বুদ্ধিহীনের মতো। যার ফলে তোমাদের এক বিশাল বাহিনী শেষ হয়ে গেলো। তোমাদের পরাজয়ের জন্য এ লোকটা সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এখনো সে আমাকে ভোগ করে চলছে। আমাকে বলছে, দেশে নিয়ে আমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু ওকে আমি ঘৃণা করি।

বিয়ে করতে হলে কাকে করবো সে সিদ্ধান্ত আমার। তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি যুবক, সাহসী এবং বুদ্ধিমান। প্রথম দেখার দিন থেকেই তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। এ বুড়ো হাবড়াটার হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করো। তোমাকে আমি সাগরের ওপারে নিয়ে যাবো। সেনাবাহিনীর বড় পদ এবং ধন সম্পদ থাকবে তোমার পদতলে। কিন্তু একে শেষ না করলে তা সম্ভব নয়। ও ঘুমিয়ে আছে। ওকে হত্যা করে চলো আমরা দু'জনে পালিয়ে যাই।'

সৈনিকটার গলা জড়িয়ে ধরল মুবি। মুবির মাতাল করা রূপ তাকে পাগল করে তুললো। কিছুক্ষণ জড়িয়ে রেখে তাকে ছেড়ে সরে বসলো ও। যুবক এগোলো তার দিকে। আচমকা একটা বর্শা এসে বিঁধলো যুবকের পিঠে। 'আঃ!' শব্দ করে লুটিয়ে পড়লো সে। বর্শা টেনে তুললো একজন। বললো, 'নেমকহারামের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

আতংকিত চিৎকার বেরিয়ে এলো মুবির কণ্ঠ থেকে। দাঁড়িয়ে বললো, 'তোমরা লোকটাকে মেরে ফেললে!'

পেছন থেকে কেউ তার বাহু খামচে ধরলো। ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে নিয়ে চললো বালিয়ানের কাছে।

'আমরা এ ব্যক্তির পালিত বন্ধু। তার সাথেই আমাদের জীবন মরণ। আমাদের কাউকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপাতে পারবে না। নিমকহারাম তার শাস্তি পেয়েছে।'

'তোমরা কোথায় যাচ্ছো ভেবেছো একবারও?'

'সাগরে ডুবতে যাচ্ছি। তোমার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। বালিয়ান যেখানে যাবে, আমরাও সেখানে যাবো।'

বালিয়ান তখনো মাতাল হয়ে পড়ে আছে। ওরা দু'জন শুয়ে পড়লো আবার। পরদিন বালিয়ানকে সব ঘটনা খুলে বলা হলো। মুবি বললো, 'লোকটা আমাকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।'

রক্ষীদের ধন্যবাদ জানালো বালিয়ান। আবার পথ চলতে শুরু করলো ওরা। মুবি আবারও দ্রুত চলার জন্য তাগাদা দিতে লাগলো। বললো, 'যত শীঘ্র সম্ভব এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

বালিয়ান চললো তার নিজস্ব গতিতে। মুবির রূপ যৌবন তাকে বিবেকশূন্য করে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি সম্পর্কেও সে ছিল সজাগ। চারদিক দেখেশুনে সাবধানে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল তার। মুবি বুঝেছে, বালিয়ানের হাত থেকে মুক্ত হওয়া এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। প্রয়োজনে এরা বন্ধুকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

বালিয়ানের খোঁজে বিশজনের এক বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন আলী বিন সুফিয়ান। পথে খবর পেলেন, বিদ্রোহ পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য সুলতান আইয়ুবী আলী বিন সুফিয়ানকে নিজের কাছে রাখা জরুরী মনে করছেন। এ খবর পেয়ে আলী বিন সুফিয়ান পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে ওদের পিছু নেয়া বাদ দিয়ে ছুটে এলেন আইয়ুবীর কাছে। এসেই তিনি এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, ওদের কথা আর খেয়ালই রইলো না তার। পনেরো জনের বাহিনীটি বালিয়ানের খোঁজে এগিয়ে গেল রোম উপসাগরের দিকে।

রবিন ও ছয়টি মেয়েকে পনেরো জন সেন্ট্রির পাহারায় কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বন্দীরা চলছে উটের পিঠে, প্রহরীরা ঘোড়সওয়ার।

স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলেছে ওরা। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছে। নির্ভয়ে চলছে কাফেলা। কোন দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের ভয় নেই। কয়েদীরা নিরস্ত্র। ছ'টা মেয়ে আর মাত্র একজন পুরুষ। ওরা পালিয়ে যাবে এমন আশংকাও নেই প্রহরীদের মনে। কিন্তু প্রহরীরা জানে না এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। মেয়েরাও অবলা নয়, ওদেরও সামরিক প্রশিক্ষণ রয়েছে। ওদের রূপ যৌবন, মাদকতাময় দেহ এবং যে কাউকে প্রেমের ফাঁদে জড়ানোর মতো অস্ত্র তো ওদের সাথেই রয়েছে।

এই কাফেলার কমাণ্ডার একজন মিশরী। একটা মেয়ে তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়লেই হাসছে মিষ্টি করে। হৃদয় গলানো সে হাসি।

কমাণ্ডারের মনে তোলপাড় শুরু হলো। বিশ্রামের সময় খাবার দেয়া হলো। মেয়েটা খাবার নিল না। কমাণ্ডারকে জানানো হলো এ কথা। কমাণ্ডার মেয়েটাকে ডেকে না খাওয়ার কারণ জানতে চাইলো। মেয়েটা কিছুই বললো না, কেবল মায়াময় চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। কমাণ্ডার বললো, 'কি ব্যাপার, তুমি খাচ্ছো না কেন?'

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমার খালি মায়ের কথা মনে পড়ে।'

মায়ের কথা শুনে কমাণ্ডারের মনটা কেমন নরম হয়ে গেলো। অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে

খেতে পাঠালো তাকে। যাবার সময় মেয়েটা বললো, 'কেবল আপনাকে খুশী করার জন্যই আমি এখন খাবো, নইলে খাওয়ার প্রতি আমার কোন রুচি নেই।'

'কিন্তু না খেলে যে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

তীর্যক কটাক্ষ হেনে মেয়েটা বললো, 'আমি অসুস্থ হলে আপনার কি? আমি কি আপনার হয়ে...' বলেই লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওখান থেকে সরে পড়লো। মেয়েটার এই কটাক্ষ গেঁথে রইলো ওর মনে।

নিশুতি রাত। সবাই ঘুমিয়ে আছে। আলগোছে উঠলো কমাণ্ডার। মেয়েটার কাছে গিয়ে আলতো করে টোকা দিল তার গায়ে। চোখ মেলে ওকে দেখেই হাসলো মেয়েটা। ওরা সরে এলো নিরিবিলি জায়গায়।

মেয়েটা বললো, 'আমি এক অসহায় তরুণী। ভাগ্য খারাপ বলে আজ এই করুণ পরিণতি। খৃষ্টান সৈন্যরা আমাকে অপহরণ করে নিয়ে তুলেছে জাহাজে। অন্য মেয়েদের সাথে জাহাজেই পরিচয় হয় আমার। তাদেরকেও অপহরণ করা হয়েছে। হঠাৎ জাহাজে আগুন লাগলো। আমাদের তুলে দেয়া হলো একটা নৌকায়। নৌকা তীরে ভিড়লো। গোয়েন্দা ভেবে আমাদেরকে বন্দী করলো সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্যরা।'

কমাণ্ডার জানতো না, সুলতানকেও এ কল্পকাহিনীই শুনিয়েছে ওরা। কমাণ্ডারকে শুধু বলা হয়েছে, 'এরা অত্যন্ত বিপজ্জনক বন্দী। কায়রোর গোয়েন্দা সংস্থার কাছে ওদের হস্তান্তর করতে হবে।'

কমাণ্ডার তাকে তার অপারগতার কথা জানিয়ে বললো, 'এ ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারছি না।'

মেয়েটা তুনীরের মাত্র একটা তীর ছুঁড়েছে। এখনো অনেক তীর বাকী। বললো, 'আমি তোমার কাছে কোন সাহায্য চাই না। তুমি সাহায্য করতে চাইলেও আমি বাঁধা দেবো। জানি না তোমাকে কেন এতো ভাল লাগে। আমার জন্য তুমি কোন বিপদে পড়বে, তা আমি হতে দেবো না। আমার সমব্যথী কেউ নেই। মেয়েরা আমার আপন কেউ নয়, পুরুষদের চিনি না। মনে হলো, তোমার মনটা বড় ভাল। এ জন্য তোমার কাছে আমার দুঃখের কথা বলে মনটা হালকা করছি।' যুবতী কমাণ্ডারের আরো কাছে সরে এলো।

কাজ হলো এতে। যুবতীর কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির সুরে বললো কমাণ্ডার, 'তোমাদের জন্য আমার কষ্ট হয়। কিন্তু এ অবস্থায় তোমার জন্য আমি কিইবা করতে পারি।'

আরেকটা তীর ছুঁড়ল ও। বললো, 'তোমাদের সুলতানকে আমার এ দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তিনি দয়া করে আমাদের দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তিনি আমাকে তার তাঁবুতে ডেকে নিলেন। মদে মাতাল হয়ে সারারাত আমার দেহ নিয়ে খেলা করলেন। ও আস্ত একটা জানোয়ার। মদ খেলে সে আর মানুষ থাকে না। আমার হাড়গোড় সব ভেঙে দিয়েছে।'

কমাণ্ডারের রক্তে আগুন লাগলো, জেগে উঠলো তার পশু শক্তি। মিশরীয় পৌরুষ

নিয়ে সমবেদনার সুরে তার গায়ে, মুখে হাত বুলাতে বুলাতে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, 'আমাদের বলা হয়েছে আইয়ুবী একজন খাঁটি মুমিন। একজন ফেরেস্তা। মদ এবং নারীকে তিনি ঘৃণা করেন। অথচ.....'

মেয়েটা তার দেহের ভার কমাণ্ডারের বুকে ছেড়ে দিতে দিতে বললো, 'আমাকে তো এখন তার কাছেই নিয়ে যাচ্ছো। বিশ্বাস না হলে রাতে দেখো আমি কোথায় থাকি? আমাকে সুলতান জেলে দেবে না, রাখবে তার নিজস্ব হারেমে। ভয়ে এখনি আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।'

এ ধরনের কথায় সুলতানের ওপর কমাণ্ডারের মন বিষিয়ে উঠলো। কমাণ্ডার জানতো না, যুবতী গোয়েন্দারা এ হাতিয়ার দিয়েই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে। মেয়েটার প্রেমে হাবুডুব খেতে লাগলো সে।

'যদি তুমি আমাকে এ অপমানকর জীবন থেকে মুক্তি দাও, আমি চির জীবনের জন্য তোমার হয়ে যাবো। আমার পিতা বিত্তশালী। আমাকে এ অপমানকর জীবন থেকে উদ্ধার করেছো জানতে পারলে তিনি তোমাকে আনন্দের সাথেই গ্রহণ করবেন। চলো আমরা সাগরের ওপারে পালিয়ে যাই।'

'কিন্তু........'

'শোন, কোন কিন্তু নয়। দেশে গিয়ে আমি তোমাকে বিয়ে করবো। বাবা তোমায় বাড়ী দেবেন, সম্পদ দেবেন। তুমি নিশ্চিন্তে ব্যবসা করে হেসেখেলে জীবনটা পার করতে পারবে।'

কমাণ্ডার বললো, 'কিন্তু আমি আমার ধর্মত্যাগ করতে পারবো না।'

মেয়েটা কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললো, 'আমি আমার ধর্ম ছেড়ে দেবো।'

এরপর ওরা বিয়ের পরিকল্পনা করতে লাগলো। মেয়েটা বললো, 'আমি তোমাকে বাধ্য করছি না। ভাল করে ভেবে দেখো কি করবে। আমি শুধু একটা কথা জানতে চাই, আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমিও তেমনটি বাসো কিনা। যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও, তবে কায়রো যেতে দেরী করো। একবার কায়রো গেলে তুমি আমার গন্ধও পাবে না।'

মেয়েটা সফর দীর্ঘ করতে চাচ্ছিল। কারণ পালানোর পরিকল্পনা করেছিল রবিন। সুযোগ খুঁজছিল। সুযোগ তৈরীর জন্য সময়ের দরকার। তিন দিনে সফর শেষ হয়ে গেলে তা সম্ভব নয়। ঘুমন্ত প্রহরীদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের হত্যা না করলে পালানো যাবে না। এ জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়ের। বন্দীদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে পাহারায় ঢিল দিলেই কেবল এমন সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

এ জন্য মেয়েটাকে কমাণ্ডারের পেছনে লাগিয়েছে রবিন। প্রথম সাক্ষাতেই মেয়েটা সফল হলো। যৌবন পুষ্ট দেহটা কমাণ্ডারকে উজাড় করে দিয়েছে সে। কমাণ্ডার উচ্চপদস্থ কোন অফিসার নয়। এমন সুন্দরী যুবতী সে কখনো দেখেনি। কল্পনা দেবী তার হাতের মুঠোয়। ভুলে গেলো সে আপন কর্তব্য এবং ধর্ম।

সকালে কমাণ্ডার ঘোষণা করলো, 'পশুগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওদের বিশ্রাম দরকার। তাই আজ আর সফর করবো না।'

ঘোষণা শুনে সবাই খুশী। ময়দানের কঠিন নিয়ম কানুনে হাঁপিয়ে উঠেছিল সৈন্যরা। কায়রো পৌঁছার কোন তাড়া নেই ওদের কারো। বিশ্রাম আর গল্পগুজবে কেটে গেলো দিনটা। কমাণ্ডারের সময় কাটে মেয়েটার কাছে।

রাত নামলো। ঘুমিয়ে পড়লো সবাই। মেয়েটাকে নিয়ে দূরে সরে গেলো কমাণ্ডার। সুখের অতলে হারিয়ে গেলো দু'জন।

ভোরে আবার কাফেলা রওনা হলো। পথ পরিবর্তন করলো কমাণ্ডার। বললো, 'এদিকে যাত্রা বিরতির জন্য সুন্দর জায়গা পাওয়া যাবে। খাওয়ার জন্য পাশের গ্রাম থেকে ডিম এবং মুরগীও আনতে পারবো।'

কমাণ্ডার তাদের বিনোদনের সুযোগ দিচ্ছে ভেবে প্রহরীরা ভীষণ খুশী। কিন্তু দু'জন প্রহরী কমাণ্ডারের এসব কাজে খুশী হতে পারেনি। ওরা তাকে বললো, 'আমরা বিপজ্জনক বন্দীদের নিয়ে যাচ্ছি। ওদের সবাই গুপ্তচর। যত শীঘ্র সম্ভব ওদেরকে সংস্থার হাতে পৌঁছে দেয়া উচিত। অকারণে সফর দীর্ঘ করা ঠিক হবে না।'

'তাড়াতাড়ি পৌঁছব কি দেরীতে পৌঁছব সে দায়িত্ব আমার। এ ব্যাপারে তোমাদের না ভাবলেও চলবে। জবাবদিহী করতে হলে আমি করবো।'

ধমক খেয়ে চুপ হয়ে গেলো প্রহরী দু'জন। তারপরও দু'জন আড়ালে আবডালে শলাপরামর্শ করতে লাগলো।

দুপুর। দূর আকাশে এক ঝাঁক শকুন উড়ছে। হয়তো লাশ আছে আশপাশে। এলাকাটা বালিয়াড়ি হলেও ছোট ছোট টিলায় মরুবৃক্ষ আছে।

কাফেলা একটা টিলায় পৌঁছলো। চড়াই পেরিয়ে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠে শকুনের ভিড়। ওরা তাকিয়ে দেখলো প্রান্তর জুড়ে অসংখ্য লাশ। সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনীর আক্রমণে নিহত সুদানী ফৌজ। সুদানীরা লাশ তুলে নিতে পারেনি, পালিয়ে গেছে জীবন নিয়ে। লাশের পাশে পড়ে আছে অস্ত্র। ঢাল, তলোয়ার, নেযা, বল্লম।

ময়দানের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চললো ওরা। পড়ে থাকা অস্ত্রের দিকে জুলজুল চোখে তাকালো রবিন। কথা বললো সঙ্গীদের সাথে।

ডান দিকে সবুজের সমারোহ। সুপেয় ঝরণা। চোখের ইশারায় কমাণ্ডারকে ডাকলো মেয়েটা। এগিয়ে এলো মিশরী। মেয়েটা বললো, 'চমৎকার জায়গা, চলো না বিশ্রাম করি।'

কাফেলাকে থামতে হুকুম দিল কমাণ্ডার। ঝরণার পাশে থামলো ওরা। আরোহীরা নেমে পড়লো উট এবং ঘোড়া থেকে। পশুগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। রাতে থাকার জন্য তাঁবু খাটানো হলো দুই টিলার ফাঁকে সবুজ ঘাসে ভরা প্রশস্ত মাঠে।

মরুভূমিতে নেমে এসেছে অন্ধকার রাত। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু কমাণ্ডারের চোখে ঘুম নেই। কখন মেয়েটার কাছে পৌঁছবে এ ভাবনায় অস্থির সে। জেগে আছে মেয়েটা'ও। 'আজ কমাণ্ডারকে মাতাল করতে হবে' মনে মনে বললো ও।

নীরব রাতে প্রহরীদের নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে। মিশরী উঠলো। পা টিপে টিপে পৌঁছলো মেয়েটার কাছে। টিলার ওপাশে চলে গেলো ওরা। হাঁটতে হাঁটতে চলে

এলো অন্য টিলায়। গাছের ছায়ায় গাঢ় অন্ধকার। ওরা একটা গাছের য়ে হেলান দিয়ে বসলো।

ছাউনিতে কমাণ্ডার নেই। প্রহরীরা সবাই ঘুমিয়ে আছে। কোন সেন্ট্রি নেই। এ অপূর্ব সুযোগকে কাজে লাগালো রবিন। নিঃশব্দে সঙ্গীদের জাগালো। হামাগুড়ি দিয়ে দূরে সরে গেলো একে একে সবাই। টিলার আড়াল হয়ে দৌড়াতে লাগলো ওরা। পৌঁছলো লাশের কাছে। তীর, ধনু এবং বর্শা নিয়ে ফিরে এলো।

ঘুমন্ত প্রহরীদের পাশে এসে দাঁড়ালো রবিন। বর্শা তুললো মারার জন্য, অন্য চারজনও তৈরী। ঘুমের মধ্যে একসঙ্গে পাঁচজনকে শেষ করতে পারছে এ আনন্দে উদ্ভাসিত ওদের চেহারা।

নিহতদের চিৎকার সঙ্গীদের কানে পৌঁছার আগেই বাকীদেরও নিরস্ত্র অবস্থায়ই হত্যা করতে হবে। রবিন পেছনের দিকে তাকালো একবার। দেখলো, একটু দূরে ঘুমিয়ে আছে উট চালক তিনজন। কমাণ্ডারকে নিয়ে মেয়েটা সরে গেছে দূরে।

রবিন একজন সৈনিকের বুক লক্ষ্য করে বর্শা নামিয়ে আনতে শুরু করেছে, হঠাৎ একটা তীর এসে তার বুকে বিঁধে গেলো। অন্য একটা তীর লাগলো তার সঙ্গীর গায়ে। ওরা কিছু বুঝে উঠার আগেই আরও দুটো তীর ওদের দুই সঙ্গীর বুকে এসে বিঁধলো।

এগিয়ে এলো তীর নিক্ষেপকারী সৈনিক দু'জন। কমাণ্ডারের সাথে এদেরই কথা কাটাকাটি হয়েছিল দিনের বেলা।

শুয়েছিল ওরাও। বন্দীরা ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখ খুলে গেলো একজনের। তাকিয়ে দেখলো বন্দীরা পালিয়ে যাচ্ছে। ওরা একটু দূরে যেতেই পাশের জনকে জাগালো সে। ফিসফিস করে বললো, 'ওরা পালাচ্ছে।'

'কারা?'

'বন্দীরা।'

'কই? কোন দিকে গেছে?' দ্রুত উঠে বসলো সে। প্রথম সৈনিকটি হাত ইশারায় বন্দীদের গমনপথের দিকটি দেখালো ওকে। প্রথম সৈনিকটি উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'চলো, ওদের পিছু নিতে হবে।'

সাবধানে বন্দীদের অনুসরণ করে এগিয়ে চললো দু'জন। দেখলো বন্দীরা অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসছে।

টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো দু'জন। বন্দীরা ঘুমন্ত প্রহরীদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হতেই ওরা তীর ছুঁড়লো। ওরা পড়ে যেতেই কমাণ্ডারকে ডাকতে ডাকতে ছুটে এলো সৈনিক দু'জন।

তাদের ডাক-চিৎকারে জেগে উঠলো মেয়েগুলো। সাথে সাথে প্রহরীরাও। মেয়েগুলো লাশের দিকে তাকালো ভয়-বিস্ফারিত নয়নে। প্রত্যেকের বুকে একটা করে তীর বিঁধে আছে।

রবিনদের পরিকল্পনা মেয়েরা জানতো। হতাশা ফুটে উঠলো ওদের চেহারায়। এদিক ওদিক তাকালো ওরা। দেখলো মিশরী কমাণ্ডার ও একটা মেয়ে সেখানে নেই।

যখন বন্দীদের বুকে তীর বিঁধেছে ঠিক সে মুহূর্তে পাশের টিলায় একটা খঞ্জর

কমাণ্ডারের পিঠে আমূল প্রবেশ করলো। টিলার ওপর পড়ে রইলো তার লাশ। সৈন্যদের ডাক-চিৎকারে তাই তার কোন সাড়া পাওয়া গেলো না।

মেয়েটাকে নিয়ে টিলার ওপর বসেছিল কমাণ্ডার। ওরা জানতো না তার খানিক দূরে বালিয়ানের তাঁবু। ঘোড়াগুলো একটু দূরে। মুবিকে নিয়ে এদিকে এসেছিল বালিয়ান, রক্ষীদের চোখের আড়ালে। হাতে মদের বোতল, চাদর বিছিয়ে বসলো মুবিকে নিয়ে।

রাতের নীরবতা ভেঙে ভেসে এলো অস্ফুট শব্দ। চমকে উঠলো ওরা। উৎকর্ণ হয়ে রইলো। সতর্ক পা ফেলে দু'জন এগিয়ে গেলো শব্দ লক্ষ্য করে। দেখলো, গাছের নীচে দুটো ছায়ার অস্পষ্ট অবয়ব দেখা যাচ্ছে।

মুবি আরও এগিয়ে গিয়ে ওদের কথা শুনতে লাগলো। মেয়েটার কথা শুনে সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো, এ তার সঙ্গিনীদের একজন। কমাণ্ডারের তৎপরতা স্পষ্ট। বদমায়েশী করার জন্য অসহায় মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে।

পিছিয়ে এলো সে। বালিয়ানকে বললো, 'লোকটা মিশরী। আমার সঙ্গিনী একটা মেয়েকে ভোগ করার জন্য নিয়ে এসেছে। ওকে রক্ষা করো। মিশরী তোমায় শত্রু, মেয়েটা বন্ধু। ও আমারচে বেশী সুন্দরী। ওকে এনে তোমার হারেমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করো।'

বালিয়ান মদ পান করছিল, মুবির কথায় উঠে দাঁড়ালো। খাপ থেকে খঞ্জর বের করে শিকারী বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলো। কামাণ্ডার কিছু বুঝে উঠার আগেই তার পিঠে আমূল বসিয়ে দিল খঞ্জর। টেনে নিয়ে আবার আঘাত করলো।

আকস্মিক এ আক্রমণে ভয় পেয়ে মেয়েটা উঠে দাঁড়ালো। ওকে দূর থেকে ডাকলো মুবি। ও ছুটে গিয়ে মুবিকে জড়িয়ে ধরলো।

'অন্যরা কোথায়?' মুবির প্রশ্ন।

সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বললো মেয়েটা। বললো, 'ওরা এখন পনরো জন সৈনিকের পাহারায় রয়েছে।'

বালিয়ান দৌড়ে গিয়ে সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে এলো। সাথে অস্ত্র।

কমাণ্ডারকে ডাকতে ডাকতে টিলার দিকেই এগুচ্ছিল এক প্রহরী। বালিয়ানের এক সঙ্গী তীর মেরে তাকে হত্যা করলো। মেয়েটা ওদের নিয়ে এগিয়ে চললো ক্যাম্পের দিকে।

টিলার নীচে আলো জ্বলছে। বালিয়ান টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলো মাটিতে গাঁথা লাঠির মাথায় দুটো মশাল। প্রহরীরা লাশগুলো ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েগুলো জড়ো হয়ে আছে পাশে। তা দেখে মুবি এবং মেয়েটা কাঁদতে লাগলো নিঃশব্দে।

বালিয়ান সঙ্গীদের বললো, 'তীর ছোঁড়।'

এক সঙ্গে দুটো তীর নিক্ষিপ্ত হলো। লুটিয়ে পড়লো দু'জন প্রহরী। ওরা তখনো বুঝে উঠতে পারছে না কি ঘটছে, আরো দুটো তীরে পড়ে গেলো আরো দু'জন সৈনিক। একজনের দেহে বিধল তিনটে তীর।

উট চালকরা অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লো। মুবি মেয়েদের কাছে ছুটে এলো। হঠাৎ ওদের কানে ভেসে এলো অশ্বক্ষুরের শব্দ।

'এখানে আর দেরী করা যাবে না।' বালিয়ান বললো, 'ওদের একজন পালিয়ে যাচ্ছে কায়রোর দিকে। এখুনি আমাদের পালানো উচিত।'

প্রহরীদের ঘোড়াগুলো নিয়ে নিজের ক্যাম্পের দিকে চললো বালিয়ান। তার একটা ঘোড়া নেই। আহত মিশরী সিপাইটি তাদের একটা ঘোড়া নিয়েই পালিয়েছে। নিজের ঘোড়া পর্যন্ত যেতে পারেনি সে।

চৌদ্দটি ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানো হলো। মালামাল চাপালো দুটোর পিঠে। রওনা হলো কাফেলা।

মেয়েরা মুবিকে সব ঘটনা খুলে বললো। কিন্তু রবিনদের মৃত্যুর রহস্য বলতে পারলো না। মুবি বললো, 'আইয়ুবীর ক্যাম্পে রবিনের সাক্ষাত যেমন অযাচিতভাবে পেয়েছিলাম, তোমাদেরও পেলাম তেমনি আকস্মিকভাবে। এতে বলবো না, পবিত্র যীশু আমাদের সফল করবেন। যে কাজেই আমরা হাত দিয়েছি, ব্যর্থ হয়েছি। রোম উপসাগরের পাড়ে আমাদের সৈন্যরা পরাজিত হয়েছে। মিশরে পরাজিত হয়েছে আমাদের বন্ধু সুদানী ফৌজ। রবিনের মতো লোক নিহত হলো। জানি না কি হবে আমাদের পরিণতি। মনে হয় যীশু আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।'

'আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের গায়ে কেউ হাত তুলতে পারবে না।' বালিয়ান বললো, 'আমার সিংহদের কাজ কি দেখোনি?'

রোম উপসাগরের তীরে এসে লাগলো একটি নৌকা। নেমে এলো তিনজন লোক, পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো মুসলিম সেনা ক্যাম্পের দিকে। কথা বলছে ইটালীর ভাষায়।

ক্যাম্পে পৌঁছলো ওরা। ওদের কথা শুনে ইটালীর খৃষ্টান বন্দীদের ডেকে আনা হলো। ওরা বললো, 'এরা ইটালী থেকে এসেছে হারিয়ে যাওয়া বোনের খোঁজে। সেনাপতির সাথে দেখা করতে চাচ্ছে।'

ক্যাম্পের অধিনায়ক বাহাউদ্দিন শাদ্দাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হলো ওদের।

তিনজনের একজন আধ বয়েসী, দু'জন যুবক। দোভাষী বললো, 'ওদের যুবতী বোনকে খৃষ্টান সৈন্যরা তুলে নিয়ে এসেছে। এরা শুনেছে ওদের বোনেরা এখন আইয়ুবীর ক্যাম্পে আছে। বোনদের খোঁজে সাগর পাড়ি দিয়ে এদ্দুর এসেছে এরা।'

তাদের বলা হলো, মেয়েরা এসেছে তিনজন নয় সাতজন। সবাই গুপ্তচর। তিনজনই বললো, 'আমরা গরীব। গুপ্তচরীর সাথে আমাদের বোনদের কোন সম্পর্ক নেই। সাতজনকে আমরা জানি না। আমাদের বোনদের খোঁজে আমরা এসেছি।'

শাদ্দাদ বললেন, 'যে সাতজন আমাদের কাছে এসেছে, তার মধ্য থেকে পালিয়ে গেছে একজন। বাকী ছ'জনকে আজই কায়রো পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমরা বরং ওখানে যাও। আমাদের সুলতান ভাল মানুষ।'

'বিশ্বাস করুন, আমাদের বোনেরা গোয়েন্দা নয়। আপনারা যাদের পেয়েছেন তারা গোয়েন্দা হলে ওরা আমাদের বোন নয়। আমাদের হতভাগী বোনেরা তাহলে হয়তো

সাগরে ডুবে মরেছে। না হয় খৃষ্টানদের কাছেই আছে।'

শাদ্দাদের মনটা ছিল নরম। তিনজন গ্রাম্য লোকের দুঃখে তিনিও ব্যথিত হলেন। খাতির যত্ন করে বিদায় করলেন ওদের। চলে গেলো ওরা। কোথায় গেলো কেউ জানলো না। হাঁটতে হাঁটতে ওরা নিরাপদ এলাকায় পৌঁছলো। এক পাহাড়ের কোলে সতেরোজন কমাণ্ডো ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

তিনজনের মধ্যে বয়েসী লোকটি মেগনামা মারইউস। এসেছে মেয়েদের মুক্ত করতে এবং সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করতে। সাগর থেকে পাহাড়ের ভেতর দিকে চলে গেছে এক সংকীর্ণ চ্যানেল। পাড়ে নেমে ওখানে নৌকা লুকিয়ে রেখেছিল ওরা।

ওরা কায়রো যাবে, কিন্তু কোন বাহন নেই। ক্যাম্পের ঘোড়া চুরি করাও সহজ নয়। সূর্য উঠার এখনো অনেক দেরী, ওরা হাঁটা ধরলো। পথে কোন সওয়ারী পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। বন্দীদেরকে পথেই ধরতে হবে, তা না হলে কায়রো গিয়ে ওদের মুক্ত করা কঠিন হবে।

মৃত্যু হাতে নিয়েই ওরা অভিযানে এসেছে। সফল হলে পুরস্কার পাবে। তা দিয়ে জীবন ভর বসে বসে খেতে পারবে। তিরিশ বছর মেয়াদের জেল খাটছিল মেগনামা মারইউস। ডাকাতির আসামী। আরো একটা কেস ছিল খুনের। ওটার রায় বেরোলে তার ফাঁসি হয়ে যেতো।

তার সাথের দু'জনের শাস্তি ছিল চব্বিশ বছরের। কারাগারের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ওরা মৃত্যু কামনা করতো। এদের শাস্তি মওকুফ করে এ অভিযানে পাঠানো হয়েছে।

এক পাদ্রীর হাতে শপথ করেছে ওরা। পাদ্রী বলেছেন, 'যত মুসলমান হত্যা করবে, ঈশ্বর তার দশগুণ পাপ মোচন করবেন। সালাহউদ্দিনকে হত্যা করলে ক্ষমা করা হবে সারা জীবনের পাপ। পরকালে পবিত্র যীশুর সাথে এক সঙ্গে স্বর্গে থাকবে।'

জেল থেকে মুক্তি আর স্বর্গপ্রাপ্তি ও পুরস্কারের লোভে ওরা এসেছে এ দলে। ওদের ভেতর ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা।

জীবন বাজি রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা। হয়তো আইয়ুবীকে হত্যা করবে, নয়তো জীবন বিলিয়ে দেবে। বাকী সতেরোজন পরাজিত বাহিনীর সেনা সদস্য। ওদের হৃদয়ে জ্বলছিল প্রতিশোধের আগুন। প্রজ্জ্বলিত আবেগ নিয়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল কায়রোর দিকে।

দ্বিপ্রহর। সুলতান আইয়ুবীর হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে থামলো এক ঘোড়সওয়ার। ঘোড়ার গা ঘামে জবজবে। ক্লান্তিতে আরোহীর মুখে কথা সরছে না। নেমে পড়লো আরোহী। কেঁপে উঠলো ঘোড়ার শরীর। মাটিতে পড়ে মরে গেলো ঘোড়াটা। টানা দেড় দিন একনাগাড়ে দৌড়িয়েছে। এর মধ্যে পেটে দানাপানি পড়েনি, বিশ্রামও জোটেনি কপালে।

সুলতান আইয়ুবীর রক্ষীরা সওয়ারকে ঘিরে ধরলো। পানি পান করালো। কথা বলার উপযুক্ত হতেই সে বলে উঠলো, 'কোন সালার অথবা কমাণ্ডারের সাথে কথা বলবো।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিজেই বেরিয়ে এলেন। আগন্তুক দাঁড়িয়ে সালাম করে বললো, 'আমি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।'

সুলতান তাকে ভেতরে নিয়ে বললেন, 'এবার বলো।'

'বন্দী মেয়েরা পালিয়ে গেছে। আমাদেরও সবাই নিহত। আমি আহত, তবে কোন রকমে আমি বেঁচে গেছি। ওদের পুরুষ বন্দীদের আমরা হত্যা করেছি। আক্রমণকারী কে জানি না। আমরা ছিলাম মশালের আলোয়। আক্রমণকারী অন্ধকার থেকে তীর ছুঁড়েছে।'

সুলতান একজন কমাণ্ডার এবং গোয়েন্দা অফিসারকে ডেকে আনালেন। বললেন, 'ও কি বলছে শোন।'

সিপাইটি ঘটনা শোনালো। বললো, বন্দী মেয়ের সাথে কমাণ্ডারের সম্পর্কের কথা। আইয়ুবী বললেন, 'তার মানে মিশরেও তাদের কমাণ্ডো বাহিনী রয়েছে?'

'হতে পারে।' আলী বললেন, 'আবার মরু ডাকাত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এমন সুন্দরী যুবতী তো ওদের জন্য মহা মূল্যবান।'

'ওর কথা মন দিয়ে শোননি তুমি। বন্দীরা লাশের অস্ত্র তুলে এনে আক্রমণ করেছিল ঘুমন্ত প্রহরীদের। আমাদের যে দু'জন প্রহরী এটা দেখেছে তারা তীর মেরে ওদের হত্যা করার পরপরই আক্রান্ত হয়েছে আমাদের প্রহরীরা। এতে মনে হয় কমাণ্ডো বাহিনী ওদের অনুসরণ করছিল।'

'মহামান্য সুলতান, এই মুহূর্তে ওদের ধাওয়া করার জন্য বিশটি ঘোড়া এবং এই সৈনিককে প্রয়োজন। আক্রমণ কে করেছে পরে দেখা যাবে।' বললো এক কমাণ্ডার।

'আমার একজন সহকারীকে সাথে পাঠাবো।' আলী বললেন, 'একে খাবার দাও। খাওয়ার পর ও বিশ্রাম করবে। প্রয়োজনে বিশের অধিক ঘোড়া নিতে পারো।'

আগন্তুক বললো, 'আমি যেখান থেকে ঘোড়া নিয়েছি ওখানে ঘোড়াটা বাঁধা ছিল, কিন্তু কোন লোক ছিল না। সম্ভবতঃ ওরাই আক্রমণকারী। ওখানে আমি আটটি ঘোড়া দেখেছি। নিশ্চয়ই ওরা আটজন ছিল।'

'কমাণ্ডো বাহিনীতে বেশী লোক থাকে না। ইনশাআল্লা আমরা ওদের গ্রেপ্তার করতে পারবো।' কমাণ্ডার বললো।

আলী বললেন, 'মনে রেখো, ওরাও কমাণ্ডো সেনা।'

সুলতান বললেন, 'মেয়েগুলোও গোয়েন্দা। ওদের একজন সৈন্য অথবা একটা মেয়েকে ধরতে পারলে মনে করবে এক হাজার শত্রু সৈন্য পাকড়াও করেছো। এক নারী কারো তেমন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এক গুপ্তচর মেয়ে একটা দেশ এবং জাতি ধ্বংস করে দিতে পারে। ওরা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ওরা একবার মিশরে ঢুকে গেলে গোটা সেনাবাহিনী অকর্মন্য হয়ে পড়বে।'

সুলতান আরো বললেন, 'একজন পুরুষ বা মেয়ে গোয়েন্দাকে ধরার জন্য আমি একশ সিপাই কোরবানী দিতে প্রস্তুত। কমাণ্ডোরা ধরা না পড়লে কিছু যায় আসে না। কিন্তু যে কোন মূল্যেই হোক মেয়েগুলোকে গ্রেফতার করতে হবে। জীবিত ধরতে না পারলে তীর মেরে শেষ করে দিও।'

এক ঘন্টা পর বিশজন দুঃসাহসী সৈনিক রওনা হলো। পথ দেখাচ্ছিল পালিয়ে আসা

প্রহরী। সঙ্গে আছে গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানের সহকারী কমাণ্ডার জাহেদীন। বিশজনের একজন ছিল ফখরুল মিশরী। আলী জানতেন না, ওরা মুবি এবং বালিয়ানকেই ধাওয়া করতে যাচ্ছে।

কাফেলার বিশতম ব্যক্তি এক কমাণ্ডো কমাণ্ডার। যাচ্ছেন মেয়েদের পাকড়াও করতে। ওদিকে খৃষ্টান কাফেলার বিশতম ব্যক্তিও এক কমাণ্ডো কমাণ্ডার। তার উদ্দেশ্য মেয়েদেরকে মুক্ত করা। ওরা যাচ্ছিল পায়ে হেঁটে। একদল যাচ্ছিল কায়রোর দিকে, আরেকদল কায়রো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল রোম উপসাগরের দিকে। যাদের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে তারা, তাদের কারো জানা নেই, মেয়েরা এখন কোথায় আছে।

তখনো সূর্য ডুবেনি। অনেক দূর এগিয়ে এসেছে খৃষ্টান কাফেলা। সামনে চড়াই। উপরে উঠলো ওরা। দূরে প্রশস্ত মাঠ, মাঠ পেরিয়ে মরুদ্যান। খেজুর গাছ ছাড়াও বিভিন্ন বৃক্ষে ঘেরা। অনেকগুলো উট দেখা যাচ্ছে। ওদের পিঠ থেকে মাল নামানো হচ্ছে। ঘোড়া রয়েছে বার-চৌদ্দটি।

পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। এখন ওদের ঘোড়ার ভীষণ প্রয়োজন।

কমাণ্ডার কাফেলা থামালো। বললো, 'আমরা ক্রুশে হাত রেখে সত্যিকার শপথ নিয়েছিলাম। দেখলে তো ক্রুশের মহিমা। ঈশ্বর আকাশ থেকে এ সওয়ার পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরপুত্র তোমাদের সাহায্যের জন্য নেমে এসেছেন আকাশ থেকে।'

ক্লান্তির চিহ্ন মুছে গেলো ওদের চেহারা থেকে। এখনো চিন্তা করছে না এগুলো হাত করবে কিভাবে?

শ'খানেক উট সেনাবাহিনীর জন্য রেশন নিয়ে যাচ্ছিল। দেশের অভ্যন্তরে শত্রুর ভয় নেই, এ জন্য পাহারা তেমন জোরালো নয়। দশজন ঘোড়সওয়ার পাঠানো হয়েছে সাথে। উট চালকরা নিরস্ত্র।

ডাকাতরা ছোটখাট কাফেলা লুট করলেও সামরিক কনভয় আক্রমণ করে না কখনো। আগেও এভাবে সামরিক ঘাঁটির জন্য রসদ পাঠানো হয়েছে। নির্ভয়ে চলেছে রসদবাহী কাফেলা। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছে।

খৃষ্টান কমাণ্ডার অভিযাত্রীদের নিয়ে গেলো পাহাড়ের আড়ালে। বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত ওরা। আবেগ এবং সাহসেরও অভাব নেই। গভীর রাতে দু'জন গিয়ে দেখে এলো। ঘুমিয়ে আছে রসদবাহী কাফেলার লোকজন। সশস্ত্র মাত্র দশজন।

ভোর হওয়ার সামান্য আগে রওনা দিল ওরা। সাবধানে এগিয়ে গেলো মরুদ্যানের দিকে। ঘুমন্ত দশজন প্রহরীকে হত্যা করলো ওরা। উট চালকরা বুঝতেই পারলো না কি হচ্ছে। চিৎকার দিল প্রহরীদের কেউ, সে চিৎকার থেমে গেলো তরবারীর আঘাতে।

ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্য এবার খৃষ্টানরা দল বেঁধে চিৎকার করতে লাগলো। জেগে উঠলো সব উট চালক। শুরু হলো হত্যাযজ্ঞ। কমাণ্ডার মেগনাম মারইউস গলা চড়িয়ে বললো, 'এগুলো মুসলিম বাহিনীর রেশন। নিশ্চিহ্ন করে দাও সব। মেরে ফেলো উটগুলো। উটচালকদের হত্যা করো।'

খৃষ্টানরা নির্বিচারে তরবারী চালাতে লাগলো। বারোটা ঘোড়া দখল করলো খৃষ্টান

কমাণ্ডোরা। ভোরের আলো ফুটলো। উট এবং মানুষের লাশে ভরে গেছে মাঠ। কেউ কেউ তড়পাচ্ছে তখনো। পালিয়ে গেছে কেউ। প্রতিরোধ করার মতো কেউ নেই সেখানে।

ঘোড়া নিয়ে সরে পড়লো খৃস্টান অভিযাত্রীরা। ওদের বাহনের প্রয়োজন মিটেছে। এখন ওরা ছুটছে পরবর্তী শিকারের উদ্দেশ্যে।

বালিয়ানের সমগ্র সত্তায় জড়িয়ে আছে মুবি। মদ বিকল করে রেখেছে স্নায়ুগুলো। এখন তার কাছে সাত সাতটা রূপসী যুবতী। তাই দেখে সে ভুলে গেছে বিপদের কথা।

মুবি বার বার বলছে, 'কোথাও বিশ্রাম নেয়া ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি সাগর তীরে পৌঁছার চেষ্টা করো। আমাদের পেছনে শত্রু ধেয়ে আসছে।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। নিঃশঙ্কচিত্ত মহারাজা সে। হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে মুবির কথা।

মেয়েদের মুক্ত করার পরের রাতে এক জায়গায় বিশ্রাম করছিল ওরা। বালিয়ান মুবিকে বললো, 'তোমরা সাত যুবতী। আমরা সাতজন পুরুষ। দেখেছো আমার বন্ধুরা কত বিশ্বাসী। আজ ওদের পুরস্কার দেবো। আজ আমার ছয় বন্ধুর সাথে থাকবে তোমার ছয় বান্ধবী। তুমি থাকবে আমার সাথে। আজ আমরা আনন্দ করবো।'

'অসম্ভব!' ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বললো মুবি, 'আমরা বাজারের মেয়ে নই। ওরা তোমার কেনা বাঁদী নয় যে, ওদের নিয়ে তুমি যা ইচ্ছে তা করবে। বাধ্য হয়ে আমি তোমাকে দেহ দিয়েছি। এরা কারো ভোগের সামগ্রী হবে না।'

'আনন্দ তুমি একাই লুটবে তা তো হয় না সুন্দরী। তোমার বান্ধবীদেরও কিছু ভাগ দাও।' বালিয়ানের কণ্ঠে তরল রসিকতা।

'বালিয়ান, তুমি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো।' রাগে ফেটে পড়লো মুবি।

'তোমরা কতটুকু ভদ্র তা জানা আছে আমার। আমাদের জন্য তো মরা দেহের উপঢৌকন নিয়ে এসেছো। এরা কতজনের শয্যাসঙ্গী হয়েছে তার হিসেব দিতে পারো? তোমরা কেউ মেরী নও, এ কথা কে না জানে।'

'কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আমরা দেহের উপঢৌকন পেশ করেছি, ভোগের সামগ্রী হওয়ার জন্য পুরুষদের সঙ্গ দেইনি। আমাদের জাতি ও ধর্ম আমাদের ওপর এক গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমরা দেহ, যৌবন, রূপলাবণ্য এবং সতীত্বকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করি। আমরা দেহ দিয়েছি আমাদের ওপর অর্পিত কর্তব্য ও দায়িত্বের অংশ হিসাবে, ভোগের জন্য নয়। এখন তুমি যা বলছো তা ভোগ বিলাস ছাড়া কিছুই নয়। যেদিন আমরা ভোগ বিলাসে জড়িয়ে পড়বো সেদিন থেকে শুরু হবে খৃস্টানদের পতন। ক্রুশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

'মুবি, আমার বন্ধুরা জীবন পণ করে ক্রুশের জন্য লড়ছে। ওদের উজ্জীবিত করা তোমাদের দায়িত্ব।'

'ট্রেনিং দেয়ার সময় আমাদের বলা হয়েছে, এক মুসলিম নেতাকে করায়ত্ত করার জন্য দশ জনের শয্যাসঙ্গী হওয়া শুধু বৈধ নয় বরং পূণ্যের কাজ। মুসলমান ধর্মীয় গুরুকে

দেহ দান করাকে আমরা সেরা পূণ্য মনে করি।'

'তাহলে তুমি খৃষ্টানদের স্বার্থে আমাকে ব্যবহার করছো?'

'কেন, এখনো সন্দেহ আছে?'

'কিন্তু আমি তো খৃষ্টান নই।'

'তা নও। কিন্তু খৃষ্টানদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্বকে কি অস্বীকার করবে? বলতো খৃষ্টানদের সাথে তোমাদের এ বন্ধুত্ব কেন?'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, খৃষ্টানদের রক্ষার জন্য নয়। আমি মুসলমান, কিন্তু প্রথমে একজন সুদানী।'

'আর আমি সর্বপ্রথম একজন খৃষ্টান। এর পর যে দেশে জন্ম নিয়েছি সে দেশের সন্তান।'

বালিয়ানের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে মুবি বললো, 'শোন, ইসলাম কোন ধর্ম নয়, এ জন্য তুমি দেশকে প্রাধান্য দিচ্ছো। আমার সাথে চলো সাগরের ওপারে। দেখবে আমাদের মহান ধর্ম। তখন নিজের ধর্মকে ভুলে যাবে।'

'যে ধর্ম নিজের মেয়েদের অন্যের শয্যাসঙ্গী হওয়াকে পূণ্যের কাজ মনে করে, সে ধর্মকে শত ধিক।' আচম্বিত জেগে উঠলো বালিয়ানের ঈমানী চেতনা। তার কণ্ঠ গমগম করে উঠলো, 'তুমি নিজের সতীত্ব হারাওনি– আমার ইজ্জত লুণ্ঠন করেছো। আমি নই, তুমিই আমাকে ভোগ করেছো এতদিন।'

'এক মুসলমানের ঈমান ক্রয় করার জন্য সতীত্ব এমন বড় কিছু নয়। আমি তোমার ইজ্জত লুণ্ঠন করিনি, তোমার ঈমান কিনে নিয়েছি। ভয় নেই, তোমাকে এ অবস্থায় পথে ছেড়ে যাবো না। তোমাকে আমি নিয়ে যাবো ঝলমলে আলোর কাছে। তোমার ভবিষ্যত এবং পরকাল হীরার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।'

'আমি তোমার সে আলোর কাছে যাবো না।'

'দেখো বালিয়ান, পুরুষরা যোদ্ধা। ওরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। তুমি আমার পণ্য গ্রহণ করেছো। আমি তোমার ঈমান সুরার পাত্রে ডুবিয়ে দিয়েছি। তোমার ঈমান ক্রয়ের জন্য আমি দিয়েছি চড়া মূল্য। তোমার বাঁদী হয়ে, রক্ষিতা হয়ে থেকেছি আমি। হয় আমার সতীত্ব ফিরিয়ে দাও, নয় তোমার ঈমান দাও। তুমি এ ক্রয়-বিক্রয় থেকে মুখ ফেরাতে পারো না। প্রতারণা করতে পারো না এক দুর্বল মেয়ের সাথে।'

'যে আলো সাগরের ওপারে দেখাতে চাচ্ছো তুমি, তা আমি এখানেই দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি, হীরকের মতোই জ্বলজ্বল করছে আমার ভবিষ্যত।'

মুবি কিছু বলতে যাচ্ছিল, গর্জে উঠলো বালিয়ান, 'খামোশ বদমাশ মেয়ে! সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আমার দুশমন হতে পারে কিন্তু আমি আমার রাসূলের দুশমন নই। যে নবীর জন্য আমি সমগ্র মিশর এবং সুদান বিলিয়ে দিতে পারি সে পবিত্র নামের স্বার্থে আমি আইয়ুবীর কাছেও অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তুত।'

'কতোবার বলেছি, মদ কম খাও। অত্যধিক মদপান, রাত জাগা এবং প্রতিদিন আমার সাথে এইসব করে তোমার মাথাটাই বিগড়ে গেছে। আমি যে তোমার স্ত্রী তাও ভুলে গেছো?'

'খবরদার, আমি কোন বেশ্যার স্বামী নই।'

মদের বোতল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো বালিয়ান। বন্ধুদের ডাকতেই ওরা ছুটে এলো।

'এ মেয়েরা এখন তোমাদের বন্দী। ওদের কায়রো ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

'কায়রো?' একজনের হতচকিত প্রশ্ন, 'আপনি কায়রো ফিরে যেতে চাচ্ছেন!'

'হ্যাঁ, কায়রো। হতবাক হচ্ছো কেন? এ মরুভূমিতে আর কতকাল ঘুরে মরবো? যাও, জলদি ঘোড়া তৈরী করো। আর প্রতিটি ঘোড়ার পিঠে একটি করে মেয়ে বেঁধে নাও।'

বালিয়ানের তাঁবু থেকে আধমাইল দূরে থাকতেই থেমে গেলো খৃষ্টান কমাণ্ডার। বিশ্রাম নেয়ার চমৎকার এলাকা। আশপাশে আরো কেউ তাঁবু ফেলেছে কিনা খোঁজ নেয়ার জন্য রাতে তিনজন উষ্ট্রারোহীকে পাঠিয়ে দিল। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হয়, উট চলে নিঃশব্দে। তিন আরোহী ছড়িয়ে গেলো তিনদিকে।

বালিয়ান যখন মুবির সাথে কথা বলছিল, একটা উট এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে। বালিয়াড়ির আড়ালে। দূর থেকে মশালের আলো দেখে এগিয়ে এসেছিল আরোহী। উটের পিঠে বসে সে মেয়েদের দেখতে পাচ্ছিল। গল্প করছে বালিয়ানের সাথে। দূরে কটা ঘোড়া বাঁধা।

উষ্ট্রারোহী ফিরে এলো সঙ্গীদের কাছে। বললো, 'শিকার তোমাদের পাশেই রয়েছে।'

সময় নষ্ট করলো না কমাণ্ডার। হেঁটেই রওনা হলো। ওরা যখন পৌঁছলো বালিয়ান তখন মেয়েদের বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছে। সঙ্গীরা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে। নেতার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তর্ক জুড়ে দিল ওরা। সময় নষ্ট হতে লাগলো। বালিয়ান অনেক কষ্টে বুঝালো, কায়রো গেলেই ওদের ভাল হবে।

বিস্ফারিত চোখে বালিয়ানের দিকে তাকাচ্ছিল মেয়েরা। ঘোড়ার পিঠে জিন চড়িয়ে ওরা মেয়েদের ধরে ফেললো।

আচমকা আক্রমণ হলো। সুলতান আইয়ুবীর ফৌজ ভেবে বালিয়ান চিৎকার দিয়ে বললো, 'আমরা অস্ত্র সমর্পন করবো। মেয়েদের কায়রো নিয়ে যাবো।'

একটা খঞ্জর এসে বুকে বিঁধল তার। নিঃস্তব্ধ হয়ে গেলো বালিয়ান চিরদিনের জন্য। তার সঙ্গীরা এত লোকের মোকাবেলা করতে পারলো না। নিহত হলো সবাই। মুক্ত হলো মেয়েরা। কমাণ্ডারকে চিনতে পেরে খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো মুবি। রাতে কাফেলার চারপাশে দাঁড় করানো হলো সশস্ত্র সেন্ট্রি।

সুলতান আইয়ুবীর পাঠানো সওয়াররা তখনো ওখান থেকে অনেক দূরে। রাতেও পথ চলছিল ওরা। সময় নষ্ট করতে চাইলো না কেউ। সাথে পথ প্রদর্শক। পথ ভোলেনি সে।

কাফেলাকে সে আক্রমণের স্থানে নিয়ে গেলো। মশাল জ্বেলে দেখালো শৃগাল শকুনের আধ খাওয়া রবিন এবং অন্যদের লাশ।

সওয়ারীদের দেখে শেয়ালগুলো পালিয়ে গেলো। রক্ষীদের লাশ একত্রিত করে দ্রুত দাফন সারলো কমাণ্ডার। এরপর ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চললো। রাতে ট্র্যাক পেতে কষ্ট হচ্ছিল। বাধ্য হয়ে ছাউনি ফেললো ওখানে।

খৃষ্টানদের সবাই জেগে আছে। ওরা আনন্দিত। ভোরেই বেলাভূমির পথ ধরার সিদ্ধান্ত নিল খৃষ্টান কমাণ্ডার। মেগনামা মারইউস বললো, 'এখনো উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বেঁচে আছে সালাহউদ্দিন।'

এক কমাণ্ডো বললো, 'মেয়েদের অনুসরণ করে কায়রো পৌঁছতে পারলে তা সম্ভব হতো।'

'কায়রো অনেক দূরে। এ জন্য এ পরিকল্পনা আপাতত বাতিল করাই ভাল। মেয়েদের দেশে পৌঁছে দিয়ে দরকার হলে আমরা আবার আসবো।' বললো অন্য এক কমাণ্ডো।

'না। মৃত্যু ছাড়া এ পরিকল্পনা কেউ বাতিল করতে পারবে না।' মেগনামার ঝাঁঝালো কণ্ঠ, 'আমরা ক্রুশ ছুঁয়ে তাকে হত্যা করার জন্য শপথ নিয়ে এসেছি। কেউ না গেলে আমি একা যাবো। শুধু একটা মেয়ে এবং একজন সঙ্গী প্রয়োজন আমার।'

'কি করতে হবে সে সিদ্ধান্ত আমি দেবো।' কমাণ্ডার বললো, 'তোমাদের কর্তব্য হলো আমার নির্দেশ পালন করা।'

'আমি কারও হুকুম পালন করতে বাধ্য নই। আমরা সবাই ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ।'

কমাণ্ডার তাকে ধমকাতে লাগলো। মেগনামা মারইউস তরবারী কোষমুক্ত করে কমাণ্ডারের মাথার ওপর তুলতেই অন্যরা মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেলো।

'আমি পাপী, আমি অভিশপ্ত। পাপ এবং অবিচারের মাঝে ধুঁকে ধুঁকে মরছিলাম আমি। তোমরা কি জানো আমার ত্রিশ বছরের শাস্তি কেন হয়েছিল?' চিৎকার করে বলতে লাগলো মারইউস, 'পাঁচ বছর আগে আমার এক যুবতী বোনকে অপহরণ করা হয়। বোনটি ছিল ষোড়শী। আমি দরিদ্র। পিতা নেই, মা অন্ধ। সন্তানরা অবুঝ শিশু। গতর খেটে জীবিকা নির্বাহ করি। গির্জায় যীশুর মূর্তির কাছে অনেক দিন প্রশ্ন করেছিলাম, কেন আমি গরীব? কোন পাপ তো আমি করিনি। আন্তরিকতার সাথে পরিশ্রম করেও কেন ভুখা থাকি। আমার মা কেন অন্ধ? যীশু কোন জবাব দেননি। বোন অপহৃত হবার পর গির্জায় গিয়েছি। মা মেরীকে প্রশ্ন করেছি, আমার বোনের ওপর তুমি এত ক্রুদ্ধ কেন। ও তো নিষ্পাপ। ওকে রূপ দিয়ে ঈশ্বরই জুলুম করেছেন। যীশুর মতো মা মেরিও কোন জবাব দেননি।

একদিন এক আমীরের চাকর বললো, 'তোমার বোন এক আমীরের ঘরে। আমীরটা বদমাশ। সুন্দরী মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। কয়েকদিন আমোদ স্ফূর্তি করে। স্বাদ ফুরিয়ে গেলে গায়েব করে দেয়। তার উঠাবসা রাজা বাদশাহর সাথে। মানুষ তাকে সমীহ করে, আইন তার হাতে বন্দী।'

আমি গেলাম সেই আমীরের কাছে। তার কাছে আমার বোনকে ফেরত চাইলাম। সে গলা ধাক্কা দিয়ে মহল থেকে বের করে দিল আমাকে। আবার গির্জায় গেলাম। যীশু এবং মেরীর মূর্তির সামনে কাঁদলাম। ঈশ্বরকে ডাকলাম। কেউ সাড়া দিল না। আমি

গির্জায় একা ছিলাম। পাদ্রী এলো, বের করে দিল ঘাড় ধাক্কা দিয়ে। বললো, 'এখান থেকে মূর্তি চুরি হয়েছে। ভাগ, নইলে পুলিশের হাতে তুলে দেব।'

আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'এটা কি ঈশ্বরের ঘর নয়?'

সে বললো, 'আমার কাছে না বলে ঈশ্বরের ঘরে আসার সাহস তোকে কে দিয়েছে? পাপের স্খলন চাইলে আমার কাছে আয়। পাপের বর্ণনা দে। আমি ঈশ্বরকে বললে তিনি তোকে ক্ষমা করে দেবেন। তুই সরাসরি ঈশ্বরের সাথে কোন কথা বলতে পারিস না। ভাগ এখান থেকে।' বন্ধুরা! এরপর খোদার ঘর থেকে আমাকে বের করে দেয়া হলো।'

তার বলার ভঙ্গীতে মরু রাতের নিথর প্রকৃতি বিষণ্ণতায় ছেয়ে যাচ্ছিল। মেয়েদের চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছিল অশ্রু। প্রতিটি যাত্রী মোহাবিষ্টের মতো শুনছিল তার বেদনার্ত করুণ বর্ণনা।

ও বলে চললো, 'আমি পাদ্রীকে অবিশ্বাস করলাম। সন্দেহ জাগল যীশু, মরিয়ম এবং অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতি। বাড়ী ফিরে এলাম। আমার অন্ধ মায়ের প্রশ্ন, 'আমার মেয়ে আসে নি বাবা?'

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় আমার বোন?'

যীশু ও মেরীর নির্বাক ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। কিন্তু আমার ভেতরে তৈরী হচ্ছিল এক ঝড়। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সারাদিন ঘুরলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। সন্ধ্যায় একটা খঞ্জর নিয়ে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগলাম।

রাতের আঁধারে ছেয়ে গেলো প্রকৃতি। অপেক্ষা করলাম। আরও গভীর হলো রাত। যে বাড়ীতে আমার বোনকে আটকে রাখা হয়েছিল, এবার আমি সেদিকে চললাম। এক সময় আমি চলে এলাম মহলের পেছনে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। আমি পেছনের দরজা দিয়ে মহলের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। একটা কক্ষে হৈ-হুল্লোড় চলছিল। সম্ভবত সুরার আসর। আমি অন্য একটি কক্ষে ঢুকলাম। একটা চাকর আমাকে বাঁধা দিল। খঞ্জর তার বুকে ঠেকিয়ে বোনের নাম বলে জিজ্ঞেস করলাম, 'সে কোথায়?'

সে আমাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে গেলো। একটা কক্ষ দেখিয়ে বললো, 'ওখানে।'

আমি দ্রুত রুমে প্রবেশ করলাম। শিকল টানার শব্দে চকিতে পিছনে ফিরে দেখলাম দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কক্ষ শূন্য। কেউ নেই।

খানিক পর দরজা খুললো। এক সংগে অনেকে ভেতরে ঢুকলো। ওদের কাছে তরবারী এবং লাঠি। আমি কক্ষের জিনিসপত্র তছনছ করতে লাগলাম, অনেক ভাঙলাম।

ওরা আমাকে ধরে পিটাতে লাগলো। এক সময় আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরতে দেখি আমার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা। আমার বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ আনা হলো। সাথে রাজার দরবারীর বাড়ীর আসবাবপত্র নষ্ট করা এবং হত্যার উদ্দেশ্যে তিনজনকে আহত করা। কেউ আমার কথা শুনলো না। ত্রিশ বছরের শাস্তি দিয়ে কারাগারের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলো আমাকে।

সেই শাস্তির মাত্র পাঁচ বছর শেষ হয়েছে। আমি এখন মানুষের মধ্যে নেই। তোমরা 'কারা নির্যাতন' দেখোনি। দিনে জানোয়ারের মতো খাটতে হয়, রাতে কুকুরের মতো

গলায় শিকল পরিয়ে এক কক্ষে আটকে রাখা হয়। জানি না আমার অন্ধ মা বেঁচে আছেন কিনা। স্ত্রী ও সন্তানরা কোথায় তাও জানা নেই। আমি এক বিপজ্জনক ডাকাত। এ জন্য কাউকে আমার সাথে দেখা করতে দেয়া হতো না। সব সময় ভাবতাম, ঈশ্বর সত্য, না আমি সত্য। শুনেছি খোদা নিষ্পাপদের শাস্তি দেন না। তিনি আমায় কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছেন? কি অপরাধ করেছিল আমার অবোধ শিশুরা?

পাঁচ বছর মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগেছি। কিছু দিন পূর্বে কারাগারে এলেন দু'জন ফৌজি অফিসার। বিশেষ কাজের জন্য লোক খুঁজছেন। আমি রাজা বাদশাহর ব্যক্তিগত যুদ্ধে নিজেকে জড়াতে চাইনি। রাজার প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। কিন্তু যখন শুনলাম ক'জন মেয়েকে মুসলমানদের বন্দীখানা থেকে মুক্ত করতে হবে, বোনের কথা মনে পড়লো আমার। আমাদের বলা হলো, মুসলমানরা ঘৃণ্য জাতি। সিদ্ধান্ত নিলাম মেয়েদের মুক্ত করবো। তাহলে ঈশ্বর যদি সত্য হন আমার বোনকে জালেম খৃষ্টানের কজা থেকে মুক্তি দেবেন।

ফৌজি অফিসার পুরস্কারের বিনিময়ে একজন মুসলমান রাজাকে হত্যা করার কথা বললো। আমি রাজি হলাম। বললাম, 'টাকার পরিমাণ এমন হতে হবে যাতে আমার পরিবারকে ভাবতে না হয়।'

ওরা কথা দিল। বললো, 'তুমি সাগরের ওপারে নিহত হলে সরকার তোমার পরিবারের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেবে।'

এরপর মারইউস দু'জন লোককে দেখিয়ে বললো, 'এরাও আমার সাথে কারাগারে ছিল। এ দলে শরীক হতে রাজি হলো ওরাও। অনেক প্রশ্ন করা হলো আমাদের। জবাবে আশ্বস্ত করলাম। বললাম, আপন ধর্ম এবং জাতির সাথে প্রতারণা করবো না। আসলে পরিবারের ভরণ পোষণের জন্যই আমার জীবন আমি বিক্রি করে দিয়েছি।

কারাগার থেকে বের করে এক পাদ্রীর কাছে নেয়া হলো আমাদের। তিনি বললেন, 'একজন মুসলমানকে হত্যা করলে জীবনের সব পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। মেয়েদেরকে মুক্ত করতে পারলে স্বর্গ নিশ্চিত।'

পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'খোদা কোথায় থাকেন?'

তার জবাব আমার মনঃপুত হয়নি। ক্রুশে হাত রেখে শপথ নেয়ার পর ছাড়া পেলাম। বাড়ী গেলাম। ওরা আমার পরিবারকে প্রচুর অর্থ সম্পদ দিল। আমি চিন্তামুক্ত হলাম। বন্ধুরা, আমার শপথ পূর্ণ করতে দাও। দেখতে চাই খোদা কোথায় আছেন? একজন মুসলমান বাদশাহকে হত্যা করলে কি আমি খোদাকে দেখতে পাবো?'

'তুমি একটা পাগল।' কমাণ্ডার বললো, 'এতোক্ষণ যা বলেছো তা নিরেট পাগলের প্রলাপ।'

'ও অনেক মূল্যবান কথা বলেছে।' একজন বললো, 'আমি তার সাথে থাকবো।'

'আমার একটা মেয়ে প্রয়োজন।' মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললো মারইউস। 'ওর জীবন এবং ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব আমার। মেয়ে ছাড়া আইয়ুবী পর্যন্ত পৌঁছা যাবে না। আসার সময় থেকে তার সাথে একা দেখা করার কথা ভাবছি।'

মুবি দাঁড়ালো। মারইউসের পাশে গিয়ে বললো, 'আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

'তোমাকে অনেক কষ্টে মুক্ত করেছি।' কমাণ্ডার বললো, 'এমন বিপজ্জনক অভিযানে যাবার অনুমতি আমি তোমাকে দেবো না।'

'আমি সতীত্ব হারিয়েছি। এর প্রতিশোধ আমি নেবো। আইয়ুবীর শোবার ঘরে ঢোকা আমার জন্য সহজ। মুসলমান যত ক্ষমতাবানই হোক, সুন্দরী নারী দেখলে ওদের মাথা ঘুরে যায়। ও কল্পনাও করতে পারবে না, আমি হবো তার জীবনের শেষ নারী।'

অনেক তর্কবিতর্কের পর মারইউস একজন সঙ্গী এবং মুবিকে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী হলো। সবাই প্রার্থনা করলো তাদের সাফল্যের জন্য। রওনা হলো তিনজনের কাফেলা। সাথে দুটো উট। একটাতে মুবি, অন্যটাতে দু'জন পুরুষ।

ওদের কাছে ছিল মিশরের দিরহাম এবং স্বর্ণমুদ্রা। পরণে জুব্বা। মারইউসের দীর্ঘ দাড়ি। অত্যধিক পরিশ্রমে শরীরের রং কিছুটা কালো। দেখলে ইটালীর লোক মনে হয় না, ইউরোপীয় বলে সন্দেহ করবে যে কেউ। কিন্তু সমস্যা ছিল একটি, আরবী জানতো না মারইউস। মুবি এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি মিশরের ভাষায় পারদর্শী।

রাতে রওনা হলো ওরা। মুবির পরিচিত পথ। ওড়না দিয়ে নেকাব বানিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে ও।

ভোরে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পাওয়া গেলো ট্র্যাক। ঘোড়ার পায়ের পরিচিত চিহ্ন। অনেকগুলো ঘোড়া গেছে এ পথে।

খৃষ্টানদের কাফেলা দ্রুত চলছিল। মাঝ রাত পর্যন্ত থামেনি খৃষ্টানরা। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে ভোর রাতে আবার যাত্রা শুরু করেছে।

মারইউস ঘোড়া নেয়নি। উট দীর্ঘপথের ক্লান্তি সইতে পারে। না খেয়ে থাকতে পারে অনেক দিন।

ট্র্যাক না পাওয়ায় রাতে পথ চলতে পারেনি মুসলমানরা। দিনের বেলা তাই যতদূর সম্ভব দ্রুত ছুটছিল। সূর্য ডোবার এখনো সামান্য বাকী, সামনে দেখা গেলো লাশের সারি।

বালিয়ানকে চিনতে পারলো আলী বিন সুফিয়ানের সহকারী। পাহাড়ী জন্তু তার সঙ্গীদের লাশের বেশীর ভাগ গোশত খেয়ে ফেললেও তার চেহারা ছিল অক্ষত। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো ওরা। বুঝতে পারছিল না কি হয়েছে। রক্ত বলছে বেশী দিন আগে নিহত হয়নি। বিদ্রোহের দিন মৃত্যু হলে রক্তের দাগ থাকতো না।

ট্র্যাক ধরে আবার এগিয়ে চললো কাফেলা। আধমাইল পর উটের পায়ের চিহ্নও দেখা গেলো। সূর্যাস্ত পর্যন্ত চললো ওরা। সামনে উঁচুনীচু টিলা। এঁকে বেঁকে চলে গেছে পাহাড়ী পথ। অন্য কোন রাস্তা নেই। এ পথেই গেছে খৃষ্টান কাফেলা।

পাহাড় শ্রেণী পেরিয়ে এলো ওরা। সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বাধ্য হয়ে ওদের থামতে হলো।

ভোরেই রওনা হলো আবার। খানিক চলার পর সাগরের নির্মল বাতাসের স্পর্শ পেল ওরা দেহে। বুঝলো, সাগরের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। কিন্তু খৃষ্টানদের দেখা যাচ্ছে না এখনো।

এক জায়গায় দেখা গেলো খাবারের উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে। রাতে এখানে কেউ বিশ্রাম

করেছে।

ট্র্যাক ধরে আবার ঘোড়া ছুটালো কমাণ্ডোরা। সূর্য মাথার ওপর থেকে সামান্য নুয়ে পড়লে ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দেয়ার জন্য থামলো ওরা। কিন্তু একটু পরই আবার রওনা হলো। সাগরের বাতাস জোরালো হচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে কাফেলা। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সাগর পাড়ের টিলা আর বালিয়াড়ি।

ট্র্যাক দেখে মনে হচ্ছে অনেকগুলো ঘোড়া এগিয়ে গেছে। টিলার প্রায় কাছে এসে পড়েছে ওরা। টিলার ওপর দু'জন লোক। এদিকেই তাকিয়ে আছে। ওদের দেখে দ্রুত বেলাভূমিতে নেমে গেলো লোক দু'টি।

ঘোড়ার গতি আরও তীব্রতর করলো কমাণ্ডোরা। পাহাড়ের কাছে এসে থামলো দলটি। ওপাশে যাওয়ার কয়েকটি পথ দেখা গেলো। একজনকে পাঠানো হলো ওপাশের অবস্থা দেখার জন্য।

পাহাড়ের উপর উঠে এলো লোকটা। শুয়ে সামনে তাকালো। তারপর পেছনে সরে এসে সঙ্গীদের ইশারা করলো পাহাড়ে উঠার জন্য। ঘোড়া থেকে নেমে উপড়ে উঠে এলো সবাই।

কমাণ্ডার সবার সামনে। বেলাভূমির দিকে একনজর তাকিয়েই দ্রুত পেছনে সরে এলো। সঙ্গীদের হুকুম দিল দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি। এখানেই সাগর থেকে একটা খাল ভেতরের দিকে ঢুকে গেছে। খৃষ্টানদের লুকিয়ে রাখা নৌকাটি ছিল সেই খালে।

খৃষ্টানরা লুকিয়ে রাখা নৌকায় উঠছে। অনেক বড়ো নৌকা। মেয়েরা এরই মধ্যে উঠে পড়েছে। বাকীরাও উঠছে। ঘোড়াগুলো ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

হঠাৎ টিলার ওপর থেকে শুরু হলো তীর বৃষ্টি। কমাণ্ডার সকলকে হত্যা না করে জীবন্ত ধরতে চাচ্ছিল। লাফিয়ে যারা নৌকার চড়তে পেরেছিল তারা দাড় টানতে শুরু করলো। যারা উঠতে পারেনি তারা তীরের আঘাতে নিহত হলো।

চওড়া খাল বেয়ে নৌকা চলছে। কমাণ্ডার ওদের ভয় দেখালো, কিন্তু নৌকা থামলো না। নৌকার সামনে তীর বৃষ্টি হলো, তাতেও কাজ হলো না। নৌকা দ্রুত সাগরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে আরোহীদের ওপর তীর চালানোর হুকুম দিল কমাণ্ডার। মুহূর্তে লাশে ভরে গেলো নৌকা। নৌকা চালাবার মতো কেউ যখন অবশিষ্ট রইলো না তখন ঢেউয়ের ধাক্কার নৌকা পাড়ের দিকে আসতে লাগলো। এক সময় কিনারে এসে ঠেকলো নৌকা। কমাণ্ডোরা লাফিয়ে পানিতে নেমে ধরে ফেললো নৌকাটি। নৌকায় কেউ বেঁচে নেই। কারো গায়ে একাধিক তীরও লেগেছে।

নৌকা বেঁধে কাফেলা এগিয়ে চললো ছাউনির দিকে। সাগর পারের মুসলিম সেনা ছাউনি ওখান থেকে বেশী দূরে ছিল না।

মিশরের এক সরাইখানায় অবস্থান করছিল মেগনামা মারইউস। সরাইখানায় দুটো ভাগ। এক ভাগ সাধারণ মুসাফিরদের জন্য। অন্য ভাগে থাকেন বড় লোক এবং আমীর ওমরার দল। ব্যবসায়ীরাও এ ভাগেই থাকেন। এখানে মদ এবং নর্তকীর ব্যবস্থা আছে।

মারইউস এখানেই এসে উঠলো।

মুবি এখন তার স্ত্রী। সঙ্গীটি বিশ্বস্ত চাকর। মুবির অনবদ্য রূপ সরাইখানায় মারইউসের মর্যাদা বাড়িয়ে দিল। এমন সুন্দরী স্ত্রী যার ঘরে সে নিশ্চয় অনেক বড়লোক। সরাইখানার লোকেরা তার বিশেষ যত্ন নিতে লাগলো।

নিজেকে আরবের মুসলমান বলে পরিচয় দিল মুবি। মারইউস বেশ ধরলো আরবী শেখের। সরাইখানার খাদেমদের কাছ থেকে সুলতান আইয়ুবীর অফিস এবং বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিল ওরা। সুদানীরা পরাজিত এবং সুলতান তাদের ক্ষমা করেছেন এ খবরও পেলো ওরা। আরও শুনলো সুদানী সেনাপতির হারেম এখন যুবতী শূন্য। সুলতান আইয়ুবী তাদের মধ্যে কৃষি জমি বিতরণ করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন।

মিশরের ভাষা জানে না মারইউস। শাসকদের কাছে পৌঁছার ট্রেনিংও পায়নি সে। তাই মানসিক দিক দিয়ে সে বেশ বিপর্যস্ত। যদিও সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যা করার বিপজ্জনক মিশন নিয়ে এসেছে সে কিন্তু সুলতানের কাছে পৌঁছার পথ তার জন্য রুদ্ধ হয়ে আছে। সে এবং মুবি জানে, সুলতানের চারপাশে থাকে সশস্ত্র প্রহরা। পাহারার দেয়াল ভেদ করে তার কাছে পৌঁছা সহজ নয়। এ মিশনে আসার সময় কমাণ্ডার তাকে পাগল বলেছিল। এখন তার মনে হচ্ছে, আসলেই সে পাগল। মুবি বললো, 'ঘাবড়াচ্ছো কেন? পৃথিবীর তাবৎ নামী লোকদের হত্যাকারীরা সবাই ছিল আধ পাগল, নয়তো ছিল বিকৃত মানসিকতার অধিকারী।'

মারইউস ভাবলো, হ্যাঁ, আমি এদেরই একজন। তবে আমার কাছে আছে এক শক্তিশালী অস্ত্র– যার নাম মুবি। আরবী ভাষা ও সভ্যতা সংস্কৃতির ওপর তার আছে যথেষ্ট দখল। এসব ব্যাপারে রীতিমতো ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তাকে। ও জানে মুসলমানদের মনমানসিকতা, অভ্যাস ও চালচলন। গুপ্তচরবৃত্তি এবং অভিনয়ে পারদর্শী মুবি পুরুষ নাচাতে পারে চোখের ইশারায়। তার মদির কটাক্ষ আর পেলব শরীরের আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারে এমন পুরুষ নিশ্চয়ই জন্মেনি এ ধরায়।

সরাইখানার বন্ধ কক্ষে তাদের কেটে গেলো তিন দিন। ভেতরে তিন জন। মুবি, মারইউস এবং সঙ্গীটি। কেউ জানে না কামরার ভেতর কি করছে ওরা। মুবি দুটো ঘোড়া এবং কিছু কাপড় কিনিয়েছে সরাইখানার লোকদের মাধ্যমে। চার দিন পর বেরিয়ে এলো মারইউস ও মুবি। মারইউসের দাড়ি সুন্দর করে আঁচড়ানো। আরবী শেখের মতোই দামী জুব্বা পরণে, মাথায় পাগড়ি।

মুবির দেহ কাল বোরকায় ঢাকা। চোখ, কপাল এবং নাক উন্মুক্ত। ঠোঁটের ওপর স্বচ্ছ কাপড়ের নেকাব ঝুলানো। তার চোখ ধাঁধানো রূপে চোখ আটকে যায়। সঙ্গীটির নগণ্য পোশাক। চাকরদের মতো। বাইরে এসে একটা ঘোড়ায় চাপলো মারইউস, অন্যটায় মুবি। চাকরের মতো তাদের পেছনে চললো সঙ্গীটি।

তারা জানে, জঙ্গীর পাঠানো সৈন্যদের সাথে নিয়ে জেরুজালেম আক্রমণ করবে সালাহউদ্দিন, তার আগেই তাদের আরাধ্য কাজ শেষ করতে চায় ওরা। তারা সুলতানের দূরদর্শিতা দেখে অবাক হলো। লোকটার চোখ কেবল যুদ্ধের মাঠেই নয়, সবদিকেই খোলা। অভিযানের আগেই সুদানীদের জমি দিয়ে তিনি পুনর্বাসন করতে চাচ্ছেন, যাতে

তার প্রতি তারা কৃতজ্ঞ হয়। আর কোন কাজে জড়িয়ে ফেলতে পারলে বিদ্রোহ করার সুযোগ পাবে না কোন সুদানী।

সেনাবাহিনীর সংস্কার এবং পুনর্বাসনের কাজ খুব সহজ নয়। প্রশাসন এবং ফৌজে সুলতানের বিরোধী লোকজন চুপ মেরে গেলেও তারা মারা যায়নি এবং নিজেদের সংকল্প থেকে সরেও দাঁড়ায়নি। অবস্থার কারণে ঘাপটি মেরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে মাত্র। সুদানীরা আত্মসমর্পণ করলেও গোয়েন্দাদের রিপোর্ট বলছে, এখনো তাদের কারো কারো ভেতর জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন।

প্রশাসন এবং ফৌজের কিছু লোক সুদানীদের পরাজয়ের চেয়ে খৃষ্টানদের পরাজয়ে কষ্ট পেয়েছে বেশী। ওরা ভেবেছিল সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিহত হবে। সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যাবে ওদের জন্য। এরা বিশ্বাসঘাতক জেনেও সুলতান এদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেননি। কখনো প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেননি। ভাল ব্যবহার করেছেন ওদের সাথে। প্রায়ই বলতেন, 'কাউকে নিজের ঈমান বিক্রি করতে দেখলে বাঁধা দিও। তাকে বলো সে মুসলমান। তার সাথে মুসলমান বন্ধুর মতো ব্যবহার করো।'

কিন্তু আলীর গোয়েন্দারা নিয়মিত ওদের তৎপরতার সংবাদ পৌঁছে দিত সুলতানের কাছে।

রসদবাহী কাফেলা লুণ্ঠিত হয়েছে, প্রহরীদের হত্যা করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বন্দীদের। সুলতান আইয়ুবী এ খবর শুনে বললেন, 'এতে বুঝা যায়, সমগ্র মিশরে ওদের কমান্ডো বাহিনী ছড়িয়ে আছে। তাদের আশ্রয় দিচ্ছে বিশ্বাসঘাতকরা।'

গোয়েন্দা বিভাগকে আরও সম্প্রসারিত এবং শক্তিশালী করার নির্দেশ দিলেন তিনি। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন, মুসলিম বিশ্বকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি যতোই পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন ততোই তার বিরুদ্ধে ঝড়ো হাওয়ার তাণ্ডব বাড়তে শুরু করেছে। এ জন্য তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন।

কি করে তিনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন এই ছিল তাঁর উদ্বেগের কারণ। কারণ মুসলমানের তলোয়ারই আজ স্বজাতির কণ্ঠে ধরা। দিন দিন বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ছড়ানো ষড়যন্ত্রের জালে ক্রমেই ফেঁসে যাচ্ছে ওরা। টাকা এবং নারী সব তছনছ করে দিচ্ছে।

তিনি জানতেন, তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তবে এ জন্য কখনো তাকে বিচলিত দেখা যায়নি। তিনি বলতেন, 'আমার জীবন আল্লাহর হাতে। এ ভূখণ্ডে আমার প্রয়োজন না হলে তিনি তুলে নেবেন।'

এ জন্যই নিজেকে রক্ষার জন্য তিনি চিন্তিত হননি কখনো। প্রশাসন তাঁর চারপাশে গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিল। আলী ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক, আইয়ুবীকে তিনি তার মুর্শিদ মনে করতেন।

একদিন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী অফিসার এবং কমান্ডারদের বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। হেড কোয়ার্টারের গেটে দুটো ঘোড়া এসে থামলো। আরোহীদের একজন মধ্য বয়সী পুরুষ, অন্য জন যুবতী।

ভেতরে ঢুকতে বাঁধা দিল সেন্ট্রিরা। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো আরোহী দু'জন।

যুবতী এগিয়ে এসে কমাণ্ডারকে বললো, 'আমার পিতা। সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

কমাণ্ডার পুরুষ আরোহীকে সুলতানের সাথে দেখা করার কারণ জিজ্ঞেস করলো। না শোনার ভান করলো সে।

যুবতী বললো, 'বাবা বধির। কানেও শোনেন না।'

'কি জন্য দেখা করতে চাচ্ছেন?'

'সে কথা আমরা সুলতানকে বলবো।

বাইরে পায়চারী করছিলেন আলী বিন সুফিয়ান। এগিয়ে এলেন তিনি। সালাম দিলেন। জবাব দিল যুবতী।

কমাণ্ডার বললো, 'এরা সুলতানের সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন।'

আলী পুরুষটিকে সাক্ষাতের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যুবতী বললো, 'আমার পিতা বধির। কানেও শোনেন না।'

'সুলতান ভীষণ ব্যস্ত। আপনাদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য বলুন। সুলতানের সাথে দেখা না করেও তো আপনাদের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। ছোটখাট অভিযোগগুলো সুলতানের কাছে বলার দরকার কি? এ জন্য আলাদা বিভাগ রয়েছে।'

'এক নির্যাতিতা মুসলিম মেয়ের ফরিয়াদ শোনার সময় কি সুলতানের হবে না? আমার যা বলার তাকেই বলবো।'

'আমাকে বলুন। আমিই আপনাদের ফরিয়াদ সুলতানের কাছে পৌঁছে দেবো। প্রয়োজন মনে করলে তিনি আপনাদের ডেকে পাঠাবেন।'

আলী ওদের নিজের কক্ষে নিয়ে গেলেন।

যুবতী বলতে লাগলো, 'উত্তর সীমান্তে আমাদের বাস। বছর দু'য়েক আগে সুদানী ফৌজ সে এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল, অন্য মেয়েদের সাথে আমিও সৈন্যদের দেখার জন্য বেরিয়ে এলাম। এক কমাণ্ডার ঘোড়া ঘুরিয়ে আমার কাছে এলো। সে আমার নাম এবং পরিচয় জানতে চাইলো। আমি নাম বললাম। ও বললো, 'তোমার আব্বাকে ডাকো।'

আমি আব্বাকে ডেকে আনলাম। সে আড়ালে নিয়ে আব্বাকে কিছু বললো। আমি এগিয়ে তাকে বললাম, 'আব্বা কথা বলতে পারেন না।' কমাণ্ডার চলে গেলো।

সন্ধ্যার পর চারজন সিপাই এসে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলো। সেই কমাণ্ডারের নাম বালিয়ান। আমি তার হারেমে বন্দী হলাম। ওখানে আরও চারটি মেয়ে ছিল। কমাণ্ডারকে বললাম, 'আমাকে বিয়ে করো।' কিন্তু বিয়ে ছাড়াই সে আমাকে ভোগ করতে লাগলো। দু'বছর ছিলাম তার কাছে। সুদানীরা বিদ্রোহ করে পরাজিত হলো। পালিয়ে গেলো বালিয়ান। জানি না মারা গেছে না বন্দী আছে। আপনাদের সৈন্যরা তার বাড়ীতে গিয়ে আমাদের মুক্ত করে দিল।

আমি বাড়ী গেলাম। বাবা আমাকে বিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু কেউ আমাকে বিয়ে করতে রাজি হলো না। বললো, 'আমি হারেমের বেশ্যা।' ওখানে আমার থাকাটাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়লো। আমরা একটা সরাইখানায় উঠেছি। শুনেছি সুলতান সুদানীদের জমি এবং বাড়ী দিচ্ছেন। বালিয়ানের রক্ষিতা বা স্ত্রী মনে করে তিনি যদি আমাকে কিছু জমি

দেন তাহলে ওখান থেকে চলে আসবো। তা না হলে হয় আত্মহত্যা করবো নয়তো হবো বারবনিতা।'

'সুলতানের সাথে দেখা করা ছাড়াই যদি জমি পেয়ে যাও তবে কি তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন আছে?'

'হ্যাঁ, আমার শ্রদ্ধা এবং আবেগ তাকে জানানো দরকার। আমি শুধু তাকে বলবো, আপনার দেশে নারীরা পুরুষের ভোগের সামগ্রী। আমীর ওমরা এবং বিত্তশালীদের মধ্যে বিয়ের প্রথা ভেঙে গেছে। মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করুন। ওদের সম্মান ওদের ফিরিয়ে দিন। সুলতানকে এ কথা বলতে পারলে হয়তো আমি মনে শান্তি পাবো।'

মেয়েটির বাপ নির্বাক বসেছিল। আলী মেয়েটিকে বললেন, 'সুলতান অফিসারদের নিয়ে মিটিং করছেন। তোমরা অপেক্ষা করো। মিটিং শেষ হলে তোমাদের ডেকে পাঠাবো।'

ওদেরকে ওখানে বসিয়ে রেখেই বেরিয়ে গেলেন আলী। সরাইখানায় গিয়ে ওদের কক্ষ তল্লাশী নিলেন। লোকদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, ওরা সরাইখানায় স্বামী-স্ত্রী হিসাবে উঠেছে। আলী সরাইখানার কর্মচারীদের কথা শুনে নিশ্চিত হলেন, এরা খৃষ্টানদের গুপ্তচর। চাকরটাকে সরাইখানাতেই পাওয়া গেলো। তাকে বন্দী করে জেরা শুরু করলেন তিনি। জেরার জবাবে চাকর বললো, 'মেয়েটার নাম মুবি। পুরুষ সঙ্গীটির নাম মেগনামা মারইউস।'

আলী ফিরে এলেন মুবিদের কাছে। বললেন, 'আরেকটু বসো, আমি সুলতানের অনুমতি নিতে যাচ্ছি।'

সুলতানের কক্ষে আলীর অনেক সময় কাটলো। তিনি বিস্তারিত জানালেন সুলতানকে। ফিরে এসে যুবতীকে বললেন, 'সুলতান অনুমতি দিয়েছেন। তোমার পিতাকে নিয়ে এসো আমার সাথে।'

আলী ওদেরকে নিয়ে সুলতানের কক্ষের দরজায় গেলেন। বললেন, 'যাও, তিনি ভেতরে আছেন।'

মেয়েটি আলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কামরায় প্রবেশ করলো। ঢোকার আগে চকিতে চারদিকে নজর বুলিয়ে বাইরেটা দেখে নিল ভাল করে। ওরা ভেতরে ঢুকলে সুলতান ওদের বসতে বললেন। হাসিমুখে বললেন, 'বলুন, আপনাদের জন্য কি করতে পারি।'

কক্ষে সুলতান একা। যুবতীকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার পিতা কি জন্ম থেকেই বধির?'

'জ্বী মহামান্য সুলতান। বাবা জন্ম থেকেই বধির।'

সুলতান বসেননি, কক্ষে পায়চারি করতে করতে বললেন, 'তোমাদের অভিযোগ আমি শুনেছি। আমি তোমাদের ব্যথায় সমানভাবে ব্যথিত। তোমাদেরকে জমি এবং বাড়ী দেয়া হবে। শুনলাম তুমি নাকি আরো কিছু বলতে চাচ্ছো?'

'দীর্ঘজীবী হোন সুলতান। নিশ্চয়ই শুনেছেন কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে না। আমাকে বলছে হারেমের বেশ্যা। বাবাকে বলছে মেয়ে বিক্রেতা। জমি এবং বাড়ী তো দেবেন কিন্তু শূন্য বাড়ী দিয়ে আমি কি করবো? আমার কি এমন লোকের প্রয়োজন নেই,

অভিভূত হয়ে সুলতানের কথা শুনছিল মারইউস। তিনি বললেন, 'আমার খোদাকে গ্রহণ করতে হয় খাঁটি মনে। অন্তর পরিচ্ছন্ন না হলে তিনি তার ফরিয়াদ শোনেবেন কেন? তুমি ন্যায়বিচার চাইলে আগে নিজের অন্তর পরিষ্কার করো।'

সুলতান খঞ্জর ছুঁড়ে দিলেন তার দিকে। তার সামনে গিয়ে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মুবি! ওকে বলো, আমার জীবন তার হাতে তুলে দিলাম। এ খঞ্জর আমার পিঠে বিদ্ধ করুক।'

খঞ্জর হাতে তুলে নিল মেগনামা মারইউস। গভীর মনোযোগ দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো খঞ্জর। তাকালো সুলতানের পিঠের দিকে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো, তারপর চলে এলো সুলতানের সামনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সুলতানকে। চোখে চোখ রাখলো। কেঁপে গেলো তার হাত। সত্য খোদাকে দেখেছে ও।

হাটু গেড়ে সুলতানের পায়ের কাছে খঞ্জর রাখলো মারইউস। চুমো খেলো সুলতানের হাতে। তার চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো অশ্রুর বন্যা। মুবির দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই কি খোদা! নাকি খোদাকে তিনি বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখেছেন। মুবি, তার খোদাকে দেখাতে বলো।'

সুলতান দুবাহু ধরে তাকে তুললেন। জড়িয়ে ধরলেন বুকের সাথে। নিজের হাতে মুছে দিলেন তার অশ্রু।

'মেগনামা মারইউস। এক পথহারা পথিক। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তোমার হৃদয়ে। পরিস্থিতি তোমাকে স্বাভাবিক জীবন থেকে সরিয়ে এনে করে তুলেছে প্রতিশোধপরায়ণ ও বিকারগ্রস্থ। তোমার পাগলাটে স্বভাব বা আবেগ এক বিপজ্জনক অভিযানে নিয়ে এসেছে তোমাকে। কিন্তু তুমি ছিলে সত্যের সন্ধানী। তাই আল্লাহ তোমাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন, যাতে তুমি সত্যকে দেখতে পারো, চিনতে পারো আসল প্রভুকে। বলো, এখনো কি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও। তুমি মনে করেছিলে আল্লাহ নেই। কিন্তু তিনি না থাকলে তোমাকে বাঁচালো কে? এবার সত্যি করে বলো, তুমি কি এখনো আসল খোদাকে চিনতে পারোনি?'

মারইউস হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো সুলতানের দিকে। তার মনে হলো, হ্যাঁ, এবার আমি সত্যি খোদাকে চিনেছি। এইমাত্র তিনিই তো আমাকে নতুন করে জীবন দিলেন।

সুলতান আইয়ুবীর চোখ বলছিল, মারইউস নিরপরাধ। কিন্তু তবু তাকে তিনি ছাড়তে পারছিলেন না। কারণ যার সাথে আছে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও বিপজ্জনক এক ফেরারী গুপ্তচর– যার নাম মুবি। মারইউস নিরপরাধ হলেও মুবি নিরপরাধ নয়। খৃষ্টানদের সংবাদ সে সুদানীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। উস্কানি দিয়েছে তাদেরকে বিদ্রোহ করার জন্য। এই মেয়ে দেশ ও জাতির শত্রু। আইন তাকে ক্ষমা করতে পারে না। আর তার সাথে ক্ষমা করতে পারে না তার সহযোগী মারইউসকেও।

তাদের দু'জনকেই আইনের হাতে তুলে দেয়া হলো। জবানবন্দিতে অপরাধ স্বীকার করলো ওরা। স্বীকার করলো রসদবাহী কাফেলা লুণ্ঠন করার কথা। প্রহরীদের হত্যা করে মেয়েদের ছাড়িয়ে নেয়ার কথাও বললো তারা।

জিজ্ঞাসাবাদ চললো তিন দিন। এর মধ্যে মারইউসের চিন্তাধারা অনেকটা পরিচ্ছন্ন হয়েছে। আলাদা আলাদা ভাবে চলছে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ। একবার ও জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়েটা কোথায়? ওকে মুসলমান করে সুলতান কি তাকে হারেমে অন্তর্ভূক্ত করেছেন?'

'আজ সন্ধ্যায় এর জবাব পাবে।'

সন্ধ্যায় মারইউসকে এক দেয়াল ঘেরা চত্বরে নিয়ে যাওয়া হলো। ওখানে চাদরে ঢাকা দুটো তক্তপোষ। একদিক থেকে চাদর তুলে ফেলা হলো। আতংকে বিবর্ণ হয়ে গেলো মারইউসের চেহারা। একটায় মুবি অন্যটায় তার সঙ্গী। মৃত। ওদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বললেন, 'এদের ক্ষমা করা যায় না। মুসলিম মিল্লাতের কত ক্ষতি যে এরা করেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

'সুলতান, আমায় কেন ক্ষমা করলেন?'

'কারণ, তুমি এসেছিলে আমাকে হত্যা করতে। ওরা এসেছে আমার জাতিসত্তাকে ধ্বংস করতে। তোমার সঙ্গী বুঝেশুনে এ দলের সঙ্গী হয়েছে। হত্যা করেছে অনেক লোক। তুমি শুধু আমাকে মেরেই খোদাকে দেখতে চেয়েছো। ফলে তোমায় আমি ক্ষমা করতে পারলেও ওদের ক্ষমা করার সাধ্য আমার নেই।'

কিছুদিন পরের কথা। মেগনামা মারইউস এখন সাইফুল্লাহ। তাকে সুলতানের দেহরক্ষী দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। ইতিহাসে তার নাম না থাকলেও বাহাউদ্দিন শাদ্দাদের ডায়েরীতে সাইফুল্লাহর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আরবী ভাষায় লিখিত সেই ডায়েরী আজও অক্ষত আছে।

সাইফুল্লাহ সুলতানকে ভালবাসতো প্রাণের চে' বেশী। সুলতানের মৃত্যুর পরও সতেরো বছর বেঁচে ছিল সাইফুল্লাহ। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মৃত্যুর পর সে ছিল সুলতানের কবরের খাদেম।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কবর ছেড়ে সে যায়নি কোথাও। মরার আগে ওসিয়ত করে গিয়েছিল, মৃত্যুর পর যেন সুলতানের কবরের পাশেই তাকে দাফন করা হয়। সে কবরস্থান আজ কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছে, কিন্তু হারিয়ে যায়নি সুলতানের জন্য তাঁর ভালবাসার কাহিনী।

কায়রো থেকে দু'মাইল দূরে এক বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের এক দিকে বালিয়াড়ির ছোট ছোট পাহাড়। বাকি তিন দিকে দিগন্ত বিস্তৃত বালুর সমুদ্র। এ মাঠ আজ লাখো মানুষের পদভারে কম্পিত। উট, ঘোড়া আর গাধায় চড়ে এসেছে অজস্র মানুষ। তবে বেশীর ভাগ এসেছে পায়ে হেঁটে। চার পাঁচ দিন থেকে জমা হচ্ছে দর্শক। ভিড়ের চাপে দলিত মথিত হচ্ছে কায়রোর বাজার। সরাইখানায় উপচে পড়া ভিড়।

এরা এসেছে সরকারী ঘোষণা শুনে। এক হপ্তা পর অনুষ্ঠিত হবে সামরিক মহড়া। মিশরের সেনাবাহিনী ঘোড়দৌড়, তীরন্দাজী, অসিখেলাসহ বিভিন্ন যুদ্ধের খেলা দেখাবে। বেসামরিক লোকও এসব খেলায় অংশ নিতে পারবে।

এতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দুটো উদ্দেশ্য কাজ করছে। প্রথমত, সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। দ্বিতীয়ত, যারা মিশরের সেনাবাহিনীকে দুর্বল ভাবছে তাদের ভুল ধারণা দূর করা।

পাঁচ ছয় দিন আগে থেকেই লোকজন আসছে। এতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বেজায় খুশী। দর্শক এক লাখ হলে নতুন সেনা ভর্তি হবে পাঁচ হাজার। কিন্তু সরকারী এ ঘোষণায় আলী ছিলেন উদ্বিগ্ন।

'মাননীয় সুলতান!' বললেন তিনি 'এক লাখ দর্শক হলে এর মধ্যে এক হাজার থাকবে শত্রুর গুপ্তচর। মেয়েরা আসছে গ্রাম থেকে। এদের বেশীর ভাগ সুদানী। সুদানী মেয়েরা অত্যন্ত রূপসচেতন। তারা সাজগোছ খুবই পছন্দ করে। খৃস্টান মেয়েরা অনায়াসে তাদের সাথে মিশে যেতে পারবে।'

'তোমার সমস্যা আমি বুঝতে পারছি আলী। কিন্তু এ মহড়া কেন জরুরী তা তুমি নিশ্চয় জানো। তোমার সংস্থার তৎপরতা আরো বাড়িয়ে দাও।'

'আমি মেলার বিপক্ষে নই সুলতান। এটা যে খুবই প্রয়োজন তাও বুঝি। আপনাকে উৎকণ্ঠায় ফেলতে চাইনি আমি। শুধু মেলা কি সমস্যা নিয়ে আসছে তা আপনাকে বুঝাতে চাচ্ছি।

কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মিনি প্রমোদকেন্দ্র। এ সব প্রমোদকেন্দ্রগুলো রাতভর খদ্দেরে পূর্ণ থাকে। শহরের বাইরেও কিছু তাঁবু টানানো হয়েছে। আমার ব্রাঞ্চের রিপোর্ট অনুযায়ী কিছু তাঁবু রয়েছে ভাসমান নিশিকন্যাদের। সারারাত নাচগানের আসর জমজমাট থাকে ওসব তাঁবুতে। আগামীকাল মেলা, এর মধ্যেই নর্তকীরা দর্শকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে প্রচুর অর্থ।'

'মেলা শেষ হয়ে গেলে এসব থাকবে না। এখন এসবের ওপর আমি কোন বিধি-

নিষেধ আরোপ করতে চাই না। মিশরীদের নৈতিক চরিত্র উন্নত নয়। দীর্ঘ দিনের সাংস্কৃতিক আবহ দু'একদিনে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।'

সুলতান বললেন, 'সেনাবাহিনীতে লোক বাড়াতে হবে। লোকদের মধ্যে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য আমার প্রচুর দর্শক প্রয়োজন। আলী, তুমি জানো, আমাদের অনেক সৈন্য দরকার। সামরিক এবং বেসামরিক অফিসারদের বৈঠকেও আমি এ দিকটা ব্যাখ্যা করেছি।'

'মিটিংয়ে আপনি বড় বেশী খোলামেলা আলোচনা করেছেন। আপনাকে এ থেকে বিরত রাখতে পারিনি সুলতান। আমার গোয়েন্দা দৃষ্টি বলছে, এসব অফিসারদের অর্ধেক আপনার অনুগত নয়। আপনি জানেন, অনেকে আপনাকে সইতে পারছে না। কারো কারো আন্তরিকতা ও আনুগত্য রয়েছে সুদানীদের সাথে। আমি এদের প্রত্যেকের পেছনেই একজন করে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছি। ওরা নিয়মিত আমাকে খোঁজ-খবর দিচ্ছে।'

'কোন বিপজ্জনক তৎপরতা কি ধরা পড়েছে?'

'না। তবে পদমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে ওদের অনেকেই রাতে সন্দেহজনক তাঁবু এবং মিনি প্রমোদকেন্দ্রগুলোতে যাতায়াত করছে। দু'জন তো দু'টি নর্তকীকে বাড়ীতেই নিয়ে এসেছে। অন্যদিকে আমার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দু'টি পাল তোলা নৌকা, দশদিন আগে নৌকাগুলো রোম উপসাগরের পাড়ে দেখা গেছে।'

'এতে বিশেষ এমন কি ছিল?'

'স্পষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে ওদের তৎপরতা রহস্যজনক। ওখানকার সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনার পর দু'জন করে বিভিন্ন স্থানে পাহারা বসানো হয়েছে। খৃস্টানরা যেন আকস্মিক আক্রমণ করতে না পারে এ জন্য গোয়েন্দা বিভাগের কিছু লোক স্থানীয় বেদুঈন এবং জেলেদের পোশাকে ওখানে ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু বিশাল সাগর সৈকতে নজর রাখার জন্য ওদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। বিশেষ করে যেখানে সাগর থেকে ছোট চ্যানেল ভেতরে ঢুকে গেছে সে এলাকায় নজর রাখা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।

দিন দশেক আগে একটা চ্যানেল থেকে দুটো পাল তোলা নৌকাকে বেরোতে দেখা গেছে। হয়তো রাতে এসেছিল। দু'জন দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার ছুটে গিয়েও ওদের ধরতে পারেনি, নৌকা দুটো তখন সাগরের বেশ ভেতরে চলে গেছে। ওগুলো জেলে নৌকা ছিল না, নিশ্চয়ই সাগরের ওপার থেকে এসেছিল।

আমাদের সৈন্যরা পাহাড়ের ফাঁক-ফোঁকড় এবং মরুভূমির বিশাল এলাকা খুঁজেও কিছুই পায়নি। নৌকায় কারা ছিল, কেন এসেছিল নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছি না। দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল মরুভূমিতে ওদের খুঁজে বের করা কেবল কঠিন নয়, অসম্ভবও।'

আলী আরো বললেন, 'দেড় মাস থেকে মেলার সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। এ খবর ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছা বিচিত্র নয়। সংবাদ পেলে ওদের গোয়েন্দারা আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কায়রোতে মেয়ে কেনা-বেচা শুরু হয়েছে। ক্রেতারা সাধারণ নাগরিক নয়। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, প্রশাসনের বড় কর্মকর্তা, সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসার এবং প্রমোদ নারীদের দালালরা এসব মেয়েদের কিনছে। এদের মধ্যে খৃস্টান মেয়েও থাকতে পারে।

শুধু পারে না, আমি মনে করি অবশ্যই আছে।'

এ সংবাদে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তেমন উৎকণ্ঠিত হয়েছেন বলে মনে হলো না।

রোম উপসাগরের পাড়ে খৃষ্টান শক্তি পরাজিত হয়েছে বছর খানেক আগে। ওখানে এখন কোন ছাউনি নেই। আলী বিন সুফিয়ান ওখানে কিছু গোয়েন্দা নিয়োগ করলেও ওরা তেমন শক্তিশালী নয়। কিন্তু খৃষ্টান গুপ্তচরে যে মিশর ছেয়ে গেছে তা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

আলী ভাবছেন, মিশরের ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনা এখনো জানা যায়নি। শোনা যায়, বাগদাদ এবং দামেশকে ওদের তৎপরতা বেশী। বিশেষ করে সিরিয়ার মুসলিম আমীর-ওমরা মদ আর বিলাসিতায় ডুবে যাচ্ছে।

রোম উপসাগরের যুদ্ধের সময় নূরুদ্দিন জঙ্গী খৃষ্টান রাজা আক্রমণ করে ওদের সন্ধি করতে বাধ্য করেছিলেন। বন্দীদের মধ্যে রিনাল্ট নামের একজন সম্রাটও ছিলেন। ওরা মুসলমান বন্দীদের হত্যা করায় জঙ্গী ওদের ছাড়েননি।

নূরুদ্দিন জঙ্গী মুসলিম বিশ্বকে সফল নেতৃত্ব দিচ্ছেন আইয়ুবীর এ বিশ্বাস ছিল। তবুও ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার করার জন্য তিনি সেনাবাহিনী তৈরী করছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, মিশরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার সাথে সাথে ফিলিস্তিন মুক্ত করতে। একই সময়ে আক্রমণ এবং মিশরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অটুট রাখার জন্য প্রচুর সৈন্য প্রয়োজন। কিন্তু আশানুরূপ নতুন সেনা ভর্তি হচ্ছিল না।

সরকারী পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে তার বিরোধী শক্তি ছিল প্রবল, অনুগত ছিল যৎসামান্য। নূরুদ্দিন জঙ্গী কিছু সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। মিশরেও একটি ফৌজ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের দেখেনি। সুলতান আইয়ুবীকেও দেখেনি ওরা। এ জন্যই এ মেলার আয়োজন।

মেলার সময় অফিসার এবং কমান্ডারদের তিনি সাধারণ মানুষের সাথে আন্তরিক ও ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

'ওদের বুঝাতে হবে, আমরা সবাই এক। সিপাহী ও জনতার মধ্যে অভিন্ন চিন্তা-চেতনাই কাজ করছে। আমরা সবাই চাই আল্লাহর দ্বীনকে প্রসারিত করতে। চাই এ ভূখণ্ডকে খৃষ্টানদের আধিপত্য মুক্ত করতে।'

মেলার আগের দিন আলী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে বললেন, 'সুলতান, শত্রুর গুপ্তচরদের আমি ভয় পাই। যে সব মুসলমান দুশমনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে, তাদের নিয়েও আমি শংকিত। এদের ঈমান দৃঢ় হলে দুশমনের সমগ্র বাহিনীও আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারতো না। বেঈমানরা নবাগত নর্তকীদের দিয়ে জাল ফেলছে। তবে আমার বাহিনীও দিন রাত তৎপর রয়েছে।'

'তোমার লোকদের বলো, দুশমনের চরদের হত্যা না করে জীবিত গ্রেফতার করতে। ওরা শত্রুর জন্য চোখ এবং কান, কিন্তু আমাদের জন্য ভাষা। ওদের কাছ থেকেই তুমি সব খবর সংগ্রহ করতে পারবে।'

মেলার দিন। প্রসন্ন সূর্য হেসে উঠলো পূর্বাকাশে। বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠের তিন দিকে দর্শকদের উপচেপড়া ভিড়। পাহাড়ের দিক সংরক্ষিত, ওদিকে কাউকে যেতে দেয়া হয়নি।

বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা। বন্যার উত্তাল সাগরের গর্জনের মত ভেসে এলো অশ্বক্ষুরধ্বনি। ধূলোয় ভরে গেলো আকাশ। দু'হাজারেরও বেশী ঘোড়া ছুটে আসছে তীব্র গতিতে।

প্রথম ঘোড়া মাঠে প্রবেশ করলো। আরোহী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। তার দু'পাশে পতাকাবাহী। পেছনে অশ্বারোহী দল।

ঘোড়ার পিঠ রঙীন চাদরে সুশোভিত। আরোহীদের হাতে বর্শা। কোমরে তরবারী। বর্শার মাথায় রঙীন কাপড়ের তৈরী ছোট ছোট ঝাণ্ডা। মাঠে প্রবেশ করেই গতি কমিয়ে দিলেন তিনি। দুলকি চালে এগুচ্ছে ঘোড়াগুলো। সওয়াররা বসে আছে মাথা উঁচিয়ে। টানটান বুক। চোখে মুখে দৃঢ়তা।

নিস্তব্ধতা নেমে এলো দর্শকদের মাঝে। অর্ধ বৃত্তের মত দাঁড়িয়ে আছে দর্শকবৃন্দ। পেছনের দর্শকরা ঘোড়ার পিঠে। তারও পেছনে উট। প্রতিটাতে দু'তিন জন করে দর্শক।

দাঁড়ানো দর্শকদের সামনে একস্থানে চাঁদোয়া টানানো। নিচে চেয়ার পাতা। ব্যবসায়ী, সরকারী অফিসার এবং শহরের সম্মানিত ব্যক্তিরা বসেছেন ওখানে।

প্রথম সারিতে বসে আছেন কায়রো শহরের বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ। এরা সকলেই আইয়ুবীর শ্রদ্ধাভাজন। ধর্মীয় নেতা এবং আলেমদের তিনি বেশী ভালবাসেন। অনুমতি ছাড়া তাদের মজলিশে বসেন না।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের বলে রেখেছেন, 'সবার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে।' এ সচিবদেরই একজন খাদেমুদ্দিন আল বারক। আলী বিন সুফিয়ানের পর সুলতানের সবচে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। রাষ্ট্র এবং সেনাবাহিনীর সকল গোপন পরিকল্পনা তিনি জানেন। যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং ম্যাপ থাকতো তার কাছে।

খাদেমুদ্দিন আল বারকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেহে আরবীয় সৌষ্ঠব। সপ্রতিভ, সুপুরুষ। মঞ্চে তার পাশে এসে বসলো একটা মেয়ে। অপূর্ব সুন্দরী। যুবতীর সাথে এসেছে একজন পুরুষ। বয়স ষাটেরও বেশী। ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মনে হচ্ছে তাকে।

সামনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে যুবতী বার বার তাকাচ্ছে আল বারকের দিকে। কয়েকবারই মেয়েটার তাকানো লক্ষ্য করলেন আল বারক।

যুবতী আবার তাকালো তার দিকে। চোখাচোখি হতেই সুন্দর করে হাসলো মেয়েটা। এভাবে বেশ কয়েকবার চোখাচোখি হলো তাদের। প্রতিবারই মিষ্টি মধুর হাসি উপহার পেলো আল বারক। আবারো হাসতে যাবে, সাথে আসা বুড়োর দৃষ্টি পড়লো তার ওপর, সাথে সাথে ঠোঁট থেকে হাসি উবে গেলো মেয়েটার।

দর্শকদের সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেলো ঘোড়সওয়াররা। এগিয়ে আসছে উষ্ট্রারোহী বাহিনী।

উটগুলোকে সাজানো হয়েছে রঙবেরঙের কাপড় দিয়ে। বাঁকানো ঘাড়ের শীর্ষে গর্বোদ্ধত মাথা। আরোহীদের হাতে দীর্ঘ বাটঅলা বল্লম। ফলার খানিক নিচে তিন ফুট চওড়া এবং দেড় ফুট লম্বা রঙিন কাপড় বাঁধা। উড়ছে বাতাসে। সওয়ারের কাঁধে ধনুক। উটের পালানে বাঁধা রঙীন তুনীর। আরোহীদের দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। চেহারায় বীরত্বব্যঞ্জক হাবভাব।

উটগুলো দেখতে সাধারণ উটের মতো হলেও ওগুলো যে সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত ওদের ছন্দোবদ্ধ গতি দেখলেই তা বোঝা যায়। চলনে এমন একটা রাজসিক ভাব, যেন থোড়াই কেয়ার করে জনতার এই ভিড়কে।

মেয়েটা আবার চাইলো আল বারকের দিকে। চোখে চোখ পড়ে গেলো আল বারকের। মেয়েটার চোখ থেকে একই সাথে ঝরে পড়ছে নীরব আমন্ত্রণ আর আকুতি।

বিদ্যুৎ খেলে গেলো আল বারকের শরীরে। যুবতীর ঠোঁটে ভেসে উঠলো লাজনম্র প্রশ্রয়ের হাসি। তাকালো বুড়োর দিকে, সাথে সাথে যুবতীর চোখে মুখে নেমে এলো একরাশ ঘৃণা ও হতাশা।

আল বারকের স্ত্রী চার সন্তানের জননী। এ মুহূর্তে স্ত্রীর কথা ভুলে গেলেন তিনি। তাকিয়ে রইলেন যুবতীর দিকে। বাতাসে উড়ছে যুবতীর রেশমী নেকাব। কখনও এসে পাশে বসা আল বারকের বুকে, মুখে লুটিয়ে পড়ছে।

আল বারক আলতো হাতে সরিয়ে দিলেন সে কাপড়। লাজ রক্তিম কণ্ঠে ক্ষমা চাইলো যুবতী। মৃদু হাসলেন তিনি। বললেন, 'আরে না না, এতে ক্ষমা চাওয়ার কি আছে?'

উষ্ট্রারোহীদের পেছনে পদাতিক ফৌজ, তীরন্দাজ আর তলোয়ারবাজরা। তাদের সবারই পরণে সামরিক পোশাক। অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো দর্শকরা। প্রতিটি সৈনিকই সুঠামদেহী। চেহারায় আনন্দের দ্যুতি।

গর্বোদ্ধত বুকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। দর্শকরা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। সুলতান আইয়ুবীও তাই চাচ্ছিলেন।

সবশেষে এলো সাঁজোয়া বাহিনী। প্রতিটি কামানের পেছনে একটা করে এক্কাগাড়ী। গাড়ীতে বড় বড় পাথর এবং বিভিন্ন সাইজের ভাড়। ভাড়ে দাহ্য পদার্থ।

ধীরে ধীরে দর্শকদের সামনে দিয়ে এরাও পেরিয়ে গেলো।

দীর্ঘ চক্কর দিয়ে ফিরে এলেন সুলতান আইয়ুবী। সামনে পতাকাবাহী। ডানে, বাঁয়ে এবং পেছনে গার্ড রেজিমেন্টের সদস্যরা। তারও পেছনে সেনাপতিদের ঘোড়া।

সুলতান ঘোড়া থামালেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে সালাম দিয়ে লাফিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে। চলে গেলেন চাঁদোয়ার নিচে।

দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালো সবাই। তিনি সালামের জবাব দিয়ে নির্ধারিত আসনে গিয়ে বসলেন।

আরোহী এবং পদাতিক সৈন্যরা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলো। ময়দান এখন ফাঁকা। এক দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার মাঠে প্রবেশ করলো। তার এক হাতে ঘোড়ার বলগা, অন্য হাতে উটের রশি। মধ্য মাঠে এসে ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে পড়লো সওয়ার। লাগাম ছেড়ে দিয়ে উটের পিঠে লাফিয়ে পড়লো। আবার ফিরে এলো চলমান অশ্বের পিঠে। এরপর লাফিয়ে পড়লো মাটিতে। ঘোড়া এবং উটের সাথে ছুটে গেলো কিছু দূর। আবার এক লাফে ছুটন্ত ঘোড়ায় উঠে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেলো।

সামান্য ডানে ঝুঁকলেন আল বারক। তার মুখ এবং মেয়েটার মাথার মাঝে দু'তিন ইঞ্চি ফাঁক। মেয়েটা তাকে দেখলো। হাসলো আল বারকও। মেয়েটার ঠোঁটে এখনো

সেই লাজুক হাসি। এদিকে চোখ পড়তেই কপাল কুঞ্চিত হলো বৃদ্ধের। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে।

সহসা পাহাড়ের দিক থেকে উড়ে এলো কতগুলো মাটির পাতিল। মাঠে পড়ে ফেটে গেলো পাতিলগুলো। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো তরল পদার্থ। আশপাশের প্রায় একশ গজ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। ভিজে গেলো মাঠ।

পাহাড়ের টিলায় ভেসে উঠলো দু'জন তীরন্দাজের মুখ। আগুনের ফিতা বাঁধা তীর ছুঁড়ল ওরা। ভেজা মাঠে তীর পড়তেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

এক দিক থেকে ছুটে এলো চারজন ঘোড়সওয়ার। আগুনের কাছে এসেও থামলো না। তীব্র গতিতে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। অবাক দর্শকরা ভাবলো ওরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু আগুনের ভেতর দিয়ে ছুটতে দেখা গেলো ওদের। বেরিয়ে গেলো অপর দিক দিয়ে।

দর্শকদের শ্লোগানে প্রকম্পিত হলো আকাশ বাতাস। দু'জন আরোহীর কাপড়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লাফ দিল ওরা। গড়াগড়ি খেল বালিতে। নিভে গেলো পোশাকের আগুন।

আল বারকের দৃষ্টি মাঠে নেই। তিনি বার বার তাকাচ্ছেন যুবতীর দিকে। প্রতিবারই মিষ্টি করে হাসছে তরুণী। আবার দৃষ্টি ফিরে যাচ্ছে বুড়োর দিকে। হঠাৎ বৃদ্ধ উঠে গেলেন। মেয়েটাকে তার সাথে আসতে দেখেছে আল বারক।

'তোমার আব্বা উঠে গেলেন কেন?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'বৃদ্ধ আমার পিতা নন, স্বামী।'

'স্বামী!' আল বারকের কণ্ঠে অবাক বিস্ময়, 'তোমার পিতা মাতাই কি এ বিয়ে দিয়েছেন!'

'সে আমাকে কিনে নিয়েছে।' যুবতীর নিস্পৃহ জবাব।

'গেলেন কোথায়?'

'আপনার সাথে আমার চোখাচোখির ব্যাপারটা আঁচ করে রাগ করে চলে গেছেন। সন্দেহ করছেন, আপনার জন্য আমার আকর্ষণ রয়েছে।'

'সত্যিই কি আমার জন্য তোমার আকর্ষণ রয়েছে।'

লজ্জায় নত হলো যুবতীর চোখ। ঠোঁটে বিনম্র হাসি। অস্ফুট কণ্ঠে বললো, 'ওকে আর সহ্য করতে পারছি না। হাঁপিয়ে উঠেছি। কেউ আমাকে এ বুড়োর হাত থেকে মুক্তি না দিলে আত্মহত্যাই করবো।'

মাঠে সৈনারা নৈপুণ্য দেখাচ্ছে। মল্লযুদ্ধ, অসি চালনা, তীরন্দাজী। দর্শকরা এ ধরনের ক্রীড়ানৈপুণ্য আগে কখনো দেখেনি।

এতকাল এরা দেখে এসেছে সুদানীদের। ওদের হামবড়া ভাবের অন্ত ছিল না। অফিসাররা রাস্তায় বেরুতো রাজ-রাজার হালে। তাদের সঙ্গী সেনাদল গ্রামবাসীদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। চারণভূমি থেকে ওরা লুট করতো পশু। কারো কাছে ভাল জাতের উট বা ঘোড়া থাকলে জোর করে নিয়ে যেতো। সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, সেনাবাহিনী তৈরী করা হয় জনগণের উপর অত্যাচার করার জন্য।

কিন্তু সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ফৌজ ছিল তারচে ভিন্ন। যারা মহড়ায় অংশ নেয়নি,

তাদের ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল দর্শকদের মাঝে। জনসাধারণকে বুঝাতে হবে, ফৌজ তাদের ভাই এবং বন্ধু। শৃংখলা ভঙ্গকারী সৈনিকদের জন্য ছিল কঠোর শাস্তি।

আল বারক মহড়া সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়লেন। ভুলে গেলেন সুলতানের নির্দেশ। যুবতী তার বিবেকের উপর চেপে বসলো। আল বারক তাকে ভাললাগার কথা বললেন। আহবানে সাড়া দিল যুবতী। একান্তে দেখা করতে বললেন আল বারক।

যুবতী বললো, 'আমি তার কেনা বাঁদী। ও আমাকে বন্দী করে রেখেছে। তার দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে আসা সম্ভব নয়। ঘরে তার চারজন স্ত্রী। ওরাও আমার ওপর দৃষ্টি রাখে।'

বয়স আর স্বীয় পদমর্যাদার কথা ভুলে গেলেন আল বারক। টিনেজারদের মত সাক্ষাতের জন্য বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লেখ করতে লাগলেন। একটি স্থান তরুণীর পছন্দ হলো। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পড়োবাড়ী। শহরের বাইরে। ভবঘুরেরাই কেবল ওখানে যায়।

'ঠিক আছে, আমি ওখানে আসতে পারি, যদি আপনি আমাকে ওর হাত থেকে বাঁচানোর ওয়াদা করেন।'

'অবশ্যই। অই বুড়োর হাত থেকে তোমাকে মুক্ত করার ওয়াদা করছি আমি।'

'কখন আসবো?'

'আগামী কাল রাতে। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন। কি, আসবে তো?'

মেয়েটি আবারো সেই সলজ্জ হাসি দিয়ে ঘাড় নেড়ে বললো, 'আচ্ছা'।

কায়রোতে রাত নেমেছে। গতকালই মেলা শেষ হয়েছে। দর্শকরা যে যার বাড়ী ফিরে গেছে। অস্থায়ী প্রমোদকেন্দ্রগুলো ভেঙে দেয়া হয়েছে সরকারী নির্দেশে। সন্দেহজনক পুরুষ ও নারীদের খুঁজছে গোয়েন্দারা।

মেলার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আজ চার হাজার যুবক নতুন করে ফৌজে ভর্তি হয়েছে।

দিন পেরিয়ে রাত এলো। আল বারক চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পরণে সাধারণ পোশাক। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলেন কেউ দেখছে কিনা। না, কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই বুঝতে পেরে নিশ্চিন্তে রওনা দিলেন পুরনো সেই ভাঙা বাড়ীর দিকে।

ঘুমিয়ে পড়েছে মরুভূমি। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে থেকে থেকে ডেকে উঠছে পাহাড়ী শেয়াল। মেয়েটা বলেছিল সে বন্দিনী। সবসময় চোখে চোখে রাখা হয়। তবুও আসবে এ আশায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। আত্মরক্ষার জন্য একটা খঞ্জর সাথে নিয়েছেন। নারীর পাগল করা রূপের মোহ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। হৃদয় হয় ভয় শূন্য। আল বারক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হলেও এখন অবিবেচক যুবক।

ভাঙা বাড়ীটার কাছে একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে। আপাদমস্তক ঢাকা। ছায়াটা মিলিয়ে যাচ্ছে। তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। ভাঙা দেয়ালের ফাঁক গলে ঢুকে গেলেন ভেতরে।

অন্ধকার কক্ষ। পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ হলো। হঠাৎ গালে চর মারলো কেউ। সাথে সাথে ভেসে এলো চিঁ চিঁ শব্দ। বাদুড়। ওরা বড় বড় নখ দিয়ে মুখ আঁচড়ে দেবে

ভেবে ভয় পেয়ে বসে পড়লেন তিনি।

বাদুরগুলো উড়ে বেড়াতে থাকলো। ভয় পেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন কক্ষ থেকে। উড়ন্ত বাদুড়ে ভরা কক্ষটি। চি চি শব্দ করতে করতে বেরিয়ে এলো কয়েকটা বাদুড়ও।

সতর্ক প্রহরায় থাকা এক বন্দিনী যুবতী কি করে এ ভয়ংকর পড়োবাড়ীতে আসবে এ কথা তিনি একবারও ভাবলেন না। উঠোনে দাঁড়িয়ে ভীত চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন।

কারো পায়ের ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো। খঞ্জর হাতে তুলে নিলেন তিনি। মাথার উপর বাদুড় উড়ছে, পাখা ঝাপটানোর শব্দ হচ্ছে। আল বারক চাপা কণ্ঠে ডাকলেন, 'আছেফা।'

এ নামই তাকে বলেছিল মেয়েটা।

'আপনি এসেছেন!' আছেফার কণ্ঠ।

ছুটে এসে আল বারকের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'শুধু আপনার জন্যই এ ভয়ংকর স্থানে এসেছি। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। বুড়োকে মদের সাথে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। দেরী হলে জেগে উঠতে পারে।'

'মদের সাথে বিষ মিশাতে পারলে না?'

'আমি কখনো মানুষ হত্যা করিনি। একজন পর-পুরুষের সাথে এভাবে ভয়ংকর স্থানে আসবো, তাও কি ভেবেছি কখনো!'

আল বারক যুবতীকে জড়িয়ে ধরলেন। হঠাৎ পেছনের পথ আলোময় হয়ে উঠলো। তার আগমন পথে জ্বলে উঠলো দুটো মশাল। এক ঝটকায় আছেফাকে পেছনে নিয়ে এলেন তিনি। এরা কি প্রেতাত্মা না মেয়েটার পেছনে এসেছে, ভাবছেন আল বারক।

গর্জে উঠলো একটা কণ্ঠ, 'দুটোকেই জবাই করে ফেলো।'

মশাল নিয়ে এগিয়ে এলো চারজন বলিষ্ঠ জোয়ান। একজনের হাতে বর্শা, তিনজনের হাতে তরবারী।

মশাল মাটিতে পুতে দিল ওরা। আলোয় ভরে গেলো আঙ্গিনা। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ওরা আল বারকের চার পাশে ঘুরতে লাগলো। আছেফা তার পেছনে।

বারান্দা থেকে শব্দ এলো, 'পেয়েছো? জীবন্ত ছেড়ো না কাউকে।' মেয়েটার বুড়ো স্বামীর আওয়াজ।

আছেফা পেছন থেকে সামনে চলে এলো। ঘৃণা এবং ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বললো, 'এসো, এগিয়ে এসো। খুন করো আমাকে। এ জীবনে আমার আর বাঁচার সাধ নাই। বুড়ো পাঁঠা, টাকার জোরে আমার জীবনটা তুমি ধ্বংস করে দিয়েছো। আমার এ যৌবনকে তুমি কি দিতে পেরেছো? আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, আল্লার গজব পড়বে তোমার ওপর। তোমাকে আমি ঘৃণা করি। আমি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি। ওকে আমিই এখানে আসতে বলেছি......' আছেফা ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছে।

ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে চারজন সশস্ত্র লোক। বর্শাধারী এগোলো আছেফার দিকে। বর্শার ফলা তার পেটে ঠেকিয়ে বললো, 'ছিনাল মাগী, আর একটা কথাও না। মরবি তো মর, তার আগে ফলাটা দেখে নে। জাহান্নামে তোর নাগরকে আগে পাঠাব, না

তোকে?'

এক ঝটকায় বর্শা ধরে ফেললো আছেফা। হ্যাচকা টানে কেড়ে নিয়ে আল বারক থেকে সরে গেলো খানিক। এরপর বর্শা উঁচিয়ে বললো, 'আয়, এগিয়ে আয়। দেখি একে আমার আগে কে হত্যা করে!'

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই স্তম্ভিত। আল বারক খঞ্জর হাতে এগিয়ে এলেন। মেয়েটা বর্শাধারীকে আক্রমণ করলো। পিছিয়ে গেলো সে।

তার সঙ্গীরা আল বারককে আক্রমণ না করে আক্রমণের পাঁয়তারা করছিল। ইচ্ছে করলে ওরা অনেক আগেই তাকে হত্যা করতে পারতো।

আছেফা ধমকাচ্ছে। আঘাত করছে লক্ষ্যহীনভাবে। আল বারক এক ব্যক্তিকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করলো। তার পেছনে ছুটে এলো দু'জন, এক লাফে আছেফা ওদের পেছনে চলে গেলো।

ইচ্ছে করলে বর্শা মেরে ওদের ঘায়েল করতে পারতো আছেফা। কিন্তু খঞ্জর দিয়ে তরবারীর মোকাবিলা করা যায় না। বুড়ো তখনো এক দিকে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করছে।

আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে কেটে গেলো কিছু সময়। কেউ আহত হয়নি। আঁচড়ও লাগেনি কারো গায়ে। এবার বৃদ্ধ বললো, 'থামো!'

যুদ্ধ থেমে গেলো।

'এমন বিশ্বাসঘাতিনীকে আমি আর ঘরে নেবো না। জানতাম না ও এত দজ্জাল। জোর করে নিয়ে গেলে কখন আমাকে মেরেই ফেলবে!'

'আমি তোমাকে এর মূল্য পরিশোধ করে দেবো।' আল বারক বললো, 'তুমি একে কত দিয়ে কিনেছিলে?'

'আমার সম্পদের অভাব নেই। ওকে আমি আপনাকে উপহার দিলাম। আমি অবাক হচ্ছি আপনার প্রতি ওর ভালবাসা দেখে। কি পরিমাণ ভালবাসা থাকলে নিজের জীবন বিপন্ন করে এতগুলো লোকের মোকাবিলা করতে পারে একবার ভেবে দেখেছেন? ও যুদ্ধবাজ বংশের মেয়ে তো, এক যোদ্ধার ঘরেই ওকে মানাবে ভাল।

তাছাড়া আপনি প্রশাসনের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। সুলতানের এক অনুরাগী হিসাবে আপনাকে আমি অসন্তুষ্ট করতে পারি না। আমি ব্যবসায়ী মানুষ, সারাদিন ব্যস্ত থাকি বাইরে। আর এ বুড়ো বয়সে ওর মত যুবতী ঘরে রাখাও বিপদজনক। আমি ওকে তালাক দিলাম। এবার ও আপনার জন্য বৈধ।'

করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে। অস্ত্রধারীদের দিকে ফিরে বললো, 'এই চল্। খবরদার, এই ঘটনা কাউকে বলবি না।'

লোকগুলো মশাল তুলে ফিরে গেলো। অবাক চোখে ওদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন আল বারক। তার পায়ের নিচের মাটি কাঁপতে লাগলো। কিছুই বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল বৃদ্ধ তার সাথে প্রতারণা করেছে। পথে লুকিয়ে থেকে দু'জনকেই হত্যা করবে। আছেফার হাত থেকে বর্শা হাতে নিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলেন ভাঙা বাড়ী থেকে।

আছেফার হাত ধরে দ্রুত হাঁটছিলেন তিনি। বারবার তাকাচ্ছিলেন ডানে, বায়ে,

পেছনে। সামান্য শব্দেও চমকে উঠে থেমে যেতেন। অন্ধকারেই চাইতেন এদিক ওদিক। ধীরে ধীরে হাঁটা ধরতেন আবার। শহরে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আছেফা থামলো। তার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন!' আল বারক তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগের কারণে কিছুই বলতে পারলেন না।

এ ঘটনার পর দেখা গেলো আল বারক নয়, মেয়েটাই তাকে কিনে নিয়েছে। তার মনে হচ্ছিল, আছেফা তার জন্য পাগল। শুধু তার জন্য এতগুলো লোকের সাথে একা লড়াই করেছে আছেফা।

আছেফা তার রূপের জালে আটকে ফেললো আল বারককে। আল বারক আগের স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেললেন। সে স্থান দখল করলো আছেফা।

সে যুগে মেয়েদের ক্রয় বিক্রয় চলতো। স্ত্রীর কোন মর্যাদা ছিল না। চারজন স্ত্রী রাখাকে পুরুষের অধিকার মনে করা হতো। বিত্তশালীরা পুষতো রক্ষিতা। মুসলমান আমীর ওমরাকে নারীরাই ধ্বংস করেছে। স্বামীদের সন্তুষ্ট করার জন্য স্ত্রীরাই সুন্দরী মেয়ে খুঁজে এনে স্বামীদের উপহার দিতো।

আল বারক আছেফাকে নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। সবাই তখন ঘুমিয়ে। সকালে স্ত্রী দেখলো স্বামীর বিছানায় এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবতী। এতে সে মোটেই অসন্তুষ্ট হলো না। ভাবলো, এমন দু'একজন স্ত্রী বা রক্ষিতা পোষার ক্ষমতা তার স্বামীর রয়েছে। ও আসায় তার কিছুটা দায়িত্ব বরং কমবে। কিন্তু একবারও ভাবলো না, আজ থেকে তার ভালবাসা হারিয়ে গেছে।

একদিন যে মেয়েরা পুরুষের সাথে রণাঙ্গনে কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এখন তারা শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের সামগ্রী- এ কথা ভাবতেও কষ্ট হতো আইয়ুবীর। এতে সমাজের অর্ধেক শক্তিই নিঃশেষ হয়নি বরং এরা জাতির পৌরুষকেও নিঃশেষ করে দিয়েছে।

ব্যবসায়ী পণ্যের মতো মেয়েদের নিলাম হতো। অপহরণ, খুন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটতো অহরহ। তিনি নারীদের এ অবস্থার পরিবর্তন করতে চাইলেন।

নারীকে পুরুষের এবং পুরুষকে নারীর এই অনাহুত মোহ থেকে মুক্ত করতে তিনি রক্ষিতা রাখার বিরুদ্ধে শ্লোগান তোললেন। তিনি জানতেন, দু'তিনজন স্ত্রী এবং রক্ষিতার মালিক আমীর ওমরারা সরাসরি এর বিরোধিতা করবে। কারণ, এরাই ছিল নারীদের প্রধান খরিদ্দার।

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কুমারী মেয়েদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করবেন কিনা ভাবলেন। এতে হারেমগুলো শূন্য হবে। নারী ফিরে পাবে মর্যাদা। কিন্তু পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে না আসা পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। ইসলাম নারীকে যথেষ্ট সম্মান দিলেও তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের কারণে অমুসলমানদের মতো মুসলমানরাও নারীদের উপযুক্ত সম্মান ও অধিকার দেয়ার ব্যাপারে কুণ্ঠিত ছিল। নারীদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিলে সমাজে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে।

বিশেষ করে অজ্ঞ ও মূর্খ বেদুঈনদের সামনে ইসলামের যে রূপ এখন আছে তা পাল্টাতে হলে আগে তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত চেহারার সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে। তার আগে এমন বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিলে কিছুতেই তারা তা মেনে নেবে না। তাছাড়া সমাজে তাঁর শত্রুর পরিমাণ এখনো যথেষ্ট। আপাতত তিনি এইসব অজ্ঞ-মূর্খ মুসলমানদেরকে নিজের শত্রুর কাতারে নিয়ে যেতে চান না। তাই সেনাবাহিনীতে নারীদের ভর্তি করার চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়ে দিলেন।

তিনি জানতেন, বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি জানতেন না, তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী, রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক গোপন পরিকল্পনার রক্ষক আল বারকও এক রূপসীর ফাঁদে পড়েছেন। প্রেমের অভিনয় দিয়ে যে রূপসী তাকে আপন কর্তব্য ভুলিয়ে দিচ্ছিল।

সেনা মহড়া দেখেছে জনগণ। আইয়ুবীর সামরিক শক্তি দেখে তারা ভীত হয়নি, বরং খুশী হয়েছে। বক্তৃতা বিবৃতির প্রতি আগ্রহী ছিলেন না সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, কিন্তু মহড়ায় তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। জনতার সামনে খৃস্টানদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'আরবের মুসলমান আমীররা ভোগবিলাসে মত্ত। সাধারণ মুসলমানরা খৃস্টানদের অত্যাচারে জর্জরিত। খৃস্টানরা সুযোগ পেলেই মুসলিম কাফেলা লুণ্ঠন করে। অপহরণ করে মুসলিম যুবতীদের। ওদের ইজ্জত আব্রু হরণ করার পর তাদের তারা বিক্রি করে দেয় খোলা বাজারে।'

সুলতান জনতাকে জাতীয় চেতনাবোধে উজ্জীবিত করতে চাইলেন। মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করলেন যুবকদের।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর আগুন ঝরা বক্তৃতায় আবেগে উদ্বেলিত হলো দর্শকরা। সেদিন থেকেই সেনাবাহিনীতে নতুন ভর্তি শুরু হলো।

দশ দিনের মধ্যে নতুন ভর্তি দশ হাজারে গিয়ে পৌঁছলো। এদের মধ্যে দেড় হাজার নিয়ে এসেছিল উট, এক হাজার ঘোড়া এবং খচ্চর। সুলতান ওদের পশুর দাম চুকিয়ে দিলেন। শুরু হলো নবাগত সৈন্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ।

মেলার তিন মাস পর। দেখা গেলো সেনাবাহিনীতে তিনটি অপরাধ ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। চুরি, জুয়া এবং রাতে যেখানে যার থাকার কথা সেখানে না থাকা।

তিনটি অপরাধের মূল ছিল জুয়া। এক সৈন্য আরেক সৈন্যের ব্যক্তিগত জিনিস চুরি করে বাজারে বিক্রি করে ফেলতো।

এক রাতে তিনটি ফৌজি ঘোড়া হারিয়ে গেলো, অথচ দেখা গেলো সৈন্যদের কেউ অনুপস্থিত নেই। ফলে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হলো না। আরেক রাতে দেখা গেলো দশটি ঘোড়া নেই।

সৈন্যদের শাস্তির ভয় দেখানো হলো, পরকালের ভয় দেখানো হলো, কিন্তু অপরাধ কমলো না।

এক রাতে এক সৈনিককে গেটের বাইরে দেখা গেলো। মাতালের মত তার পা কাঁপছে। সেন্ট্রি ডাকলো তাকে। দাঁড়ালো সিপাইটি। এরপর এগিয়ে আসতে গিয়ে ধড়াম

করে মাটিতে পড়ে গেলো।

এগিয়ে গেলো সেন্ট্রি। সৈন্যটির দেহ রক্তে ভেজা। সেন্ট্রি তাকে সুবেদারের কাছে নিয়ে গেলো। চিকিৎসা করা হলো তার। কিন্তু তাকে বাঁচানো গেলো না।

মৃত্যুর আগে সে বললো, 'একজন সিপাইকে আমি হত্যা করে এসেছি। ক্যাম্প থেকে আধা মাইল উত্তরে এক তাঁবুতে পড়ে আছে তার লাশ।'

ওখানে ছিল তিনটি বেদুঈন তাঁবু। ওদের কাছে রয়েছে সুন্দরী যুবতী। দিনে সেজেগুজে ক্যাম্পের চারপাশে হাঁটতো যুবতীরা। রাতে সৈন্যরা ওদের কাছে চলে যেতো। একজনের কাছে শুনে আরেকজন।

এরা কোন সাধারণ পতিতা ছিল না। প্রতিটি খদ্দেরের সাথে ওরা প্রেমের অভিনয় করতো। কে কখন আসবে বলে দিতো যুবতীরা। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন এক যুবতীর তাঁবুতে এক সাথে দু'জন সৈনিক এসে হাজির হলো। এদের দু'জনের সাথেই অভিনয় করছিল যুবতী। দু'জনই ওকে পাওয়ার জন্য ছিল উদগ্রীব।

সে রাতে দু'জন এক সঙ্গে তাঁবুতে পৌঁছে মেয়েটাকে নিজের অধিকারে নেয়ার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়লো। সংঘর্ষে একজন হলো নিহত, অন্যজন আহত হয়ে ক্যাম্পে এসে মারা গেলো। একজন কমাণ্ডার কয়েকজন সিপাই নিয়ে লাশের জন্য ওখানে গেলো। গিয়ে দেখে লাশ পড়ে আছে, কিন্তু তাঁবু নেই।

সৈন্যটার লাশ নিয়ে ফিরে এলো সিপাইরা। রাতে আর খোঁজাখুজিতে গেলো না। আইয়ুবীর কাছে রিপোর্ট করা হলো। বলা হলো, 'সৈন্যদের মাঝে অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

কেন অপরাধ বৃদ্ধির পাচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে আলীকে হুকুম দিলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। গোয়েন্দাদের তৎপর হতে বললেন এ কাজে। আল বারককে বললেন, 'আপনিও একটু খোঁজ খবর নিন।'

শহরের এমন জায়গায় ছিল এ 'কেনো'র জবাব, যেখানে যেতে পারতো না আলীর গোয়েন্দারা।

শহরের কেন্দ্রে কেল্লার মত বিশাল বাড়ী। মিশরের একটা পরিবার নয় বরং একটা বংশের সকলেই ওখানে থাকতো। এরা ছিল অভিজাত ও সম্মানিত। ওদের দানের হাত ছিল উন্মুক্ত। এতিম, বিধবা এবং গরীবরা কখনো ওখান থেকে শূন্য হাতে ফিরতো না। এ বংশের সবাই ছিল ব্যবসায়ী। মহড়ার সময় সেনাবাহিনীকে আশরাফি দিয়েছিল দুই থলে ভর্তি করে।

সুলতান সালাহউদ্দিন মিশরে আসার আগে সুদানী ফৌজের বড় বড় অফিসাররা এখানে এসে সময় কাটাতো। সুদানীরা নিশ্চিহ্ন হবার পর এরা আইয়ুবী সরকারের অনুগত হয়ে পড়লো।

সুলতান যখন আলী এবং আল বারককে নির্দেশ দিচ্ছিলেন সে রাতে ওই বাড়ীর এক কক্ষে চলছিল জমজমাট মদের আসর। আসরে বসেছিল বার জন যুবক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

কক্ষে প্রবেশ করলো এক বৃদ্ধ। সাথে একদল সুন্দরী। এদের মধ্যে এক যুবতীর মুখ নেকাবে ঢাকা।

উঠে দাঁড়ালো সবাই। ওরা কক্ষে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। নেকাব

খুলে বৃদ্ধের পাশে এসে বসলো মেয়েটা।

'ফৌজে অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ার সংবাদ গতকাল সুলতানের কানে দেয়া হয়েছে।' বৃদ্ধ বললো, 'এ জন্য আমাদের আজকের এ বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফৌজে গোয়েন্দাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে সুলতান।'

'আমরা ওদের তৎপরতা সফল হতে দিতে পারি না।' বললো একজন।

'তোমাদের জন্য সুসংবাদ হলো দু'জন মিশরী সৈন্য এক যুবতীকে নিয়ে ঝগড়া করেছে। নিহত হয়েছে একজন, অন্যজন আহত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে মারা গেছে। এটা আমাদের প্রথম সাফল্য।'

'তিন মাসে নিহত হলো মাত্র দু'জন। এত ধীরগতির সফলতায় সন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই। যখন আইয়ুবীর এক সালার আরেক সালারকে হত্যা করতে শুরু করবে তখনই শুধু বলা যাবে আমরা সফল হচ্ছি।' বললো অন্য একজন।

'কোন সেনাপতি বা কমাণ্ডার যদি আইয়ুবীকে হত্যা করে তবেই আমরা সফল।' বৃদ্ধের কণ্ঠ, 'এক হাজার সৈন্য নিহত হলেও কিছু যায় আসে না। আমাদের লক্ষ্য আইয়ুবী। গত বছরের কথা তো তোমরা জানো, আইয়ুবীর প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। রোম থেকে আসা লোকগুলো সব মারা পড়লো। ওদের দলের এক হারামী মুসলমান হয়ে গেলো। এতে বুঝা যায়, আইয়ুবীকে হত্যা করা এতো সহজ নয়, যা তোমরা মনে করো।'

'এওতো হতে পারে, আইয়ুবীকে মারলে তার স্থান দখল করবে তারচে গোঁড়া কোন ব্যক্তি? বাগদাদ ও দামেশকের আমীরদেরকে যেমন যুবতী মেয়ে দিয়ে ধ্বংস করেছি, আইয়ুবীর ফৌজকেও সেভাবে নষ্ট করতে হবে।'

'খৃষ্টান এবং সুদানীরা পরাজিত হয়েছে এক বছর হলো।' একজন বললো, 'এ এক বছরে আপনারা কি করেছেন? আপনারা যে পথে এগুচ্ছেন এ পথ বড় দীর্ঘ। এ মুহূর্তে দু'জনকে হত্যা করা অত্যন্ত জরুরী। একজন আইয়ুবী, অন্যজন আলী বিন সুফিয়ান।'

'আপনি ঠিক বলেছেন। আলীকে হত্যা করলে আইয়ুবী অন্ধ হয়ে যাবে।' সমর্থন জানালো এক যুবক।

'আইয়ুবীর বুকের সব গোপনীয়তা দেখার চোখ এখন আমাদের হাতে।' বৃদ্ধ যুবতীর পিঠ চাপড়ে বললো, 'এ হলো সে চোখ। এর চোখের যাদু দেখে নাও। তোমরা আল বারক নামে সালাহউদ্দিনের এক সচিবের নাম শুনেছো। কেউ কেউ তাকে দেখেও থাকবে। আইয়ুবীর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে মাত্র দুটো লোক, আলী বিন সুফিয়ান এবং আল বারক। আলীকে হত্যা করা হবে বোকামী। আল বারকের মত আমরা তাকেও হাত করে নেবো।'

'আল বারক হাতে এসেছে!' বিস্মিত কণ্ঠে বললো একজন।

বুড়ো যুবতীর রেশম কোমল চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো, 'এ শিকল দিয়ে তাকে আমি বেঁধে ফেলেছি। এ সুসংবাদ শোনানোর জন্যই আজ তোমাদের ডাকা হয়েছে এখানে।'

'কি বলছেন আপনি! এ অসাধ্য কি করে সাধন করলেন?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো

বিড়ালমুখো ঢেঙ্গাপাতলা এক লোক।

'আলী এবং আল বারককে ফাঁসানোর জন্য আমি এক বছর ধরে ঘুরছি। পারিনি। সেনা মহড়ার দিন এক অভাবিত সুযোগ ঘটে গেলো। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসার জন্য মঞ্চে উঠলাম। আলী বিন সুফিয়ানকে দেখলাম না আশপাশে, তবে আল বারককে পেলাম।'

যুবতীকে দেখিয়ে বললো, 'এ কে তো তোমরা চেনোই, ওকে পুরুষ ধরার ট্রেনিং দিয়েছি দীর্ঘদিন। সে ট্রেনিং এবার কাজে লাগাবার পালা।

ওকে তার পাশে বসিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। আমি সরে যেতেই তার সাথে ভাব জমিয়ে ফেললো ও। আমাকে অত্যাচারী বৃদ্ধ স্বামী বানিয়ে আমার কাছ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ও তার সাহায্য চাইলো। তার মায়াবী রূপের জালে আটকে গেলো আল বারক। গোপনে ওরা সাক্ষাৎ করলো। সাক্ষাতের স্থানে আমরা একটা নাটক করলাম।

আমাদের লোকেরা তরবারী এবং বর্শা নিয়ে আক্রমণ করলো ওদের। তার মোকাবেলায় রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করলো ও। আল বারক ভাবলো মেয়েটা তার জন্যই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এতোসব করছে। অথচ বেকুবটা একবারও ভাবলো না, এত লড়াইয়ের পরও দুই পক্ষের কেউই আহত হয়নি কেন। শেষ পর্যন্ত আমি ওকে তার হাতে তুলে দিলাম।'

সবাই তাকালো মেয়েটার দিকে। তার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায় সবাই। মেয়েটা বললো, 'তাকে আমার নাম বলেছি আছেফা। আশ্চর্য! এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক আমার ফাঁদে পা দিল! সে কখনো মদ খায়নি, আমি তাকে মদে অভ্যস্ত করিয়েছি। ঘরে তার স্ত্রী সন্তান রয়েছে। ওদের ভুলেই গেছে সে।' আল বারককে ফাঁসানোর বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করলো যুবতী।

বৃদ্ধ বললো, 'এ তিন মাসে ও আমাকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। সুলতান বিশাল সেনাবাহিনী তৈরী করেছেন। তার অর্ধেক থাকবে মিশরে, বাকী অর্ধেক খৃষ্টান রাজাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বাইরে যাবে। তার লক্ষ্যস্থল ফিলিস্তিন। আল বারক বলেছে, আইয়ুবী পরিকল্পনা নিয়েছে সর্ব প্রথম মুসলমান শাসক ও সামন্ত প্রভুদের ঐক্যবদ্ধ করার।'

'তার মানে আল বারক এখন আমাদের লোক?'

'না।' বৃদ্ধের জবাব, 'সে আইয়ুবীর যেমন একান্ত অনুগত তেমনি এ মেয়েটার প্রতিও তার টান অপরিসীম।'

'আমি সুলতানের একজন অন্ধ ভক্ত। ইসলামের ব্যাপারে আমি যেমন ভীষণ আগ্রহী তেমনি মুসলিম জাতির উন্নতিই আমার একমাত্র স্বপ্ন। ইসলামের এমন একজন সেবিকার সাথে আলাপ করার সময় সে কোন রকম রাখঢাক করে কথা বলার প্রয়োজন মনে করে না।' খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়লো মেয়েটা।

'হ্যাঁ, তা তো হবেই। অমন যুবতী দেহের আকর্ষণ যার, তার কাছে আবার গোপনীয়তা কি?'

বৃদ্ধ বললো, 'তাকে আমাদের সঙ্গী করতে পারছি না, তার দরকারই বা কি? সে তো

এখন আমাদের হাতের পুতুল।'

'সুলতান আইয়ুবী আর কি করতে চায়?' প্রশ্ন করলো আরেক সদস্য।

'তার মাথায় এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন। খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামের পতাকা উড়াবার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সে। আমাদের গোয়েন্দাদের তৎপরতা নস্যাৎ করার জন্য আলীকে দিয়ে তৈরী করেছে গোয়েন্দা বাহিনী। আল বারকের দেয়া তথ্য অনুযায়ী সে আলাদাভাবে ত্যাগী ও কর্মঠ যুবকদের নিয়ে এক বাহিনী গঠন করেছে। ট্রেনিংও শুরু হয়েছে ওদের। ট্রেনিং শেষ হলে ওদেরকে আমাদের দেশে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য পাঠাবে। তার এসব পরিকল্পনা অত্যন্ত ভয়ংকর।'

বিড়ালমুখো ঢেঙ্গা লোকটা মুখ খুললো এবার। বললো, 'সেনা মহড়ার মাধ্যমে মুসলমানদের মনে সে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে। যুবকরা ফৌজে ভর্তি হচ্ছে প্রতিদিন। ছ'সাত হাজার নতুন সৈন্য ইতিমধ্যে যোগাড়ও করে ফেলেছে। ভর্তি এখনো চলছে। অনেক সুদানীও রয়েছে এর মধ্যে। আইয়ুবী যথেষ্ট পরিকল্পিত পদক্ষেপ নিচ্ছে।'

'এ তো এক মারাত্মক পরিকল্পনা!'

'হ্যাঁ, তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাহিনী বড় হলেই যুদ্ধে জেতা যায় না, যুদ্ধজয়ের প্রধান শর্ত যে শৃঙ্খলাবোধ তা আমরা ভেঙে দিচ্ছি। আইয়ুবীর সেনাবাহিনীকে জুয়া এবং ব্যভিচারে লিপ্ত করার কাজ বেশ ভালই এগুচ্ছে। সেনাবাহিনীতে আমাদেরও অনেক লোক ভর্তি হয়েছে। ওরা ইতিমধ্যেই জুয়া খেলা জমিয়ে তুলেছে। আর কে না জানে, জুয়া ও নারী মানুষকে নানা অপকর্ম, চুরি এবং খুনখারাবীতে সহজেই লিপ্ত করে দেয়।'

'তা দেয় ঠিক, কিন্তু খুনখারাবী ব্যাপকভাবে শুরু হচ্ছে কই?'

'হবে, হবে। যে সব মেয়েদের ট্রেনিং দিয়ে ছাউনির আশপাশে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, ওরা যে পেশাদার নিশিকন্যা তা প্রকাশ করে না। সুলতানের সৈন্যদের বিপথগামী করা ছাড়াও ওদের সাথে প্রেমের অভিনয় করে। গত পরশু এক মেয়ের জন্য দু'জন যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে, এ তো সবে শুরু।'

'কিন্তু আইয়ুবী এ সংবাদ পেয়ে আলী এবং আল বারককে তদন্তের নির্দেশ দেয়ায় বুঝা যাচ্ছে ও এ ব্যাপারে সচেতন। এখন ধড়পাকড় শুরু না হলেই হয়।'

'আমি ভাবছি, এখন থেকে কিছুদিন ক্যাম্পের কাছে যেতে মেয়েদেরকে নিষেধ করে দেবো।'

বৈঠকে আছেফা জানালো, সে প্রতি সপ্তাহে একদিন বৃদ্ধের সাথে দেখা করে সব খবরাখবর জানিয়ে যায়। জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে এর বাইরেও দেখা করা সম্ভব। আল বারককে মদের সাথে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে সে চলে আসে বৃদ্ধের কাছে।

মিটিং চললো গভীর রাত পর্যন্ত। আলোচনা হলো অন্যান্য মিনি প্রমোদকেন্দ্রগুলো নিয়ে। ফল আশাব্যঞ্জক। বৃদ্ধ জানালো, 'এতে সম্ভ্রান্ত বংশের উঠতি যুবকরা সহজেই আকৃষ্ট হচ্ছে। তাদের নষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েরাও যথেষ্ট সফলতা দেখাচ্ছে। এখন কাজ হচ্ছে মুসলমান মেয়েদেরকেও এ পথে টেনে নামানো। কাঁচা পয়সা, দামী উপহার আর পর্যাপ্ত নিরাপত্তার গ্যারান্টি পেলে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার দিকে ওরা সহজেই ছুটে আসবে। ওদের হাতে তুলে দিতে হবে নেশার দ্রব্য, তবেই দেখবে কেল্লা ফতে।'

গোপন বৈঠক শেষ হলো। কামরা থেকে বেরিয়ে এলো একজন। তার পনের মিনিট পর আর একজন, এভাবে একে একে সবাই। শেষ পর্যন্ত সেখানে রইলো কেবল সেই যুবতী ও অন্য এক গোয়েন্দা। নেকাবে মুখ ঢেকে যুবতী গোয়েন্দাটিকে বললো, 'চলো যাওয়া যাক।' উঠে দাঁড়ালো গোয়েন্দা। বললো, 'চলো।'

আল বারক দ্বিতীয় বিয়ের কথা গোপন রাখলেন, কাউকে বললেন না। দীর্ঘদিন এক স্ত্রী নিয়ে ঘর করেছেন, চল্লিশে এসে বিয়ে করলেন এক যুবতীকে, তার ভয় ছিল বন্ধুরা এ খবর জানতে পারলে তাকে উপহাস করবে। কিন্তু অতি বুদ্ধিমানরা সহজ কথা একটু দেরীতেই বোঝে, এ কান ও কান করে তার এ বিয়ের কথাটা যে শেষ পর্যন্ত সবাই জেনে গেছে, এ কথাটাও বুঝতে পারলেন না আল বারক।

সেনানিবাসের চারপাশে আলী গোয়েন্দাদের গভীর নেটওয়ার্ক গড়ে তোললেন। একদিন আলীর কাছে রিপোর্ট করলো এক গোয়েন্দা, 'মেলার পর শহরে জুয়া এবং বেহায়াপনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আল বারকের ঘর থেকে একটা মেয়েকে বেরুতে দেখা গেছে। গত তিন মাসে চার বার গভীর রাতে কালো বোরকা পরে মেয়েটা বের হয়েছে। কিছু দূর গেলে তার সাথে যোগ দেয় একজন পুরুষ। প্রথম দু'বার তেমন গুরুত্ব না দেয়ায় এর বেশী অনুসরণ করা হয়নি। তৃতীয়বার আমাদের এক গোয়েন্দা মেয়েটার পিছু নেয়। শহরের এক সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে গিয়ে ঢুকে ওরা। একটু পর মেয়েটাকে ওখানে রেখে পুরুষটা চলে যায়।

গত রাতেও তার পিছু নিয়েছিল গোয়েন্দা। এক দৌড়ের সাথে ওরা শহরের সম্মানিত বাড়ীটায় পৌঁছলো। লুকিয়ে রইলো গোয়েন্দা। ভেতরে ওদের অনেকক্ষণ কাটলো। এক সময় বেরিয়ে এলো একজন। তার পনের মিনিট পর আরো একজন। এভাবে এক এক করে এগার জন বেরিয়ে গেলো। সব শেষে বেরোল মেয়েটা এবং একজন পুরুষ।

গোয়েন্দা অন্ধকারে ওদের পিছু নিল। আল বারকের বাড়ীর কাছে এসে পুরুষটা রাস্তা ধরে সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেলো, ভেতরে ঢুকে পড়লো মেয়েটা।'

রিপোর্ট পেয়ে আলী যেমন চিন্তিত হলেন তেমনি খুশীও। খুশী হলেন এ জন্য যে, আলী গোয়েন্দাদের বলেছিলেন, 'ব্যক্তি যত বড়ই হোক সন্দেহ হলেই রিপোর্ট করবে। এমনকি সুলতান আইয়ুবীর কোন কাজে সন্দেহ হলেও রিপোর্ট করতে হবে।' তার লোকেরা কথাটা তাহলে গুরুত্বের সাথেই নিয়েছে।

আলী আল বারকের স্ত্রীকে ভাল করেই জানতেন। রাতে অন্য পুরুষের সাথে বাইরে যাবার মতো মহিলা তিনি নন। তার কোন যুবতী মেয়েও নেই। এ নিয়ে আলী অনেক ভাবলেন।

বন্ধুর জন্য কিছু করা দরকার। তখনি তার মনে হলো, শহর ভাসমান নিশিকন্যায় ভরে গেছে। তবে কি তিনি তেমন কোন মেয়ের খপ্পরে পড়লেন!

তিনি ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান এক মহিলাকে পাঠালেন আল বারকের বাড়ীতে। তাকে বুঝিয়ে বললেন সেখানে গিয়ে কি করতে হবে। মহিলাটি সেখানে গিয়ে বললো, 'আমি এক গরীব ও দুস্থ মহিলা। স্বামী মারা গেছে, এক মাত্র ছেলেও বেকার। আমাকে

একটু দয়া করুন। আমার জন্য কিছু সাহায্য ব্যবস্থা করে দিন।'

ওকে ভিক্ষুকের মতো দেখাচ্ছিল না। দরিদ্র হলেও মনে হচ্ছিল যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আল বারক তখন ঘরে ছিলেন না। আল বারকের স্ত্রী মহিলার কথায় প্রভাবিত হলেন। তাকে বসতে দিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে তুমি ভদ্র ঘরের মেয়ে। তোমাকে কিভাবে সাহায্য করা যায় বুঝতে পারছি না। তিনি বাড়ী থাকলে হয়তো কিছু করতে পারতেন। তুমি কি একটু বসবে?'

এটাই তো চাচ্ছিল মহিলাটি। সে আল বারকের স্ত্রীর সাথে গল্প জুড়ে দিল। কথা বলতে বলতে এক সময় আল বারকের স্ত্রীর সাথে অন্দরে চলে এলো। ওখানেই দেখতে পেলো সুন্দরী আছেফাকে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার মেয়েটি তো খুব সুন্দর! ওর কি বিয়ে হয়েছে?'

'তৌবা! তৌবা! ও আমার মেয়ে হতে যাবে কেন!' বললো আল বারকের স্ত্রী, 'ও তো আমার স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী! তিনি মাস তিনেক আগে ওকে বিয়ে করে এনেছেন।'

যা জানার জন্য গিয়েছিল মহিলাটি, তা তার জানা হয়ে গেলো। আর এখানে অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই। 'তিনি তো এলেন না!' মহিলা আল বারকের স্ত্রীকে বললো, 'আমি না হয় পরে দেখা করবো। আপনি উনাকে একটু বলে রাখবেন আমার ব্যাপারে।'

বেরিয়ে এলো সেই মহিলা। রিপোর্ট করলো এসে আলীকে।

এ সংবাদ শুনে আলী খুবই অবাক হলেন। বুঝতে পারলেন, তার এ নতুন স্ত্রীই রাতের সে বাইরে যাওয়া যুবতী। কিন্তু রাতের আঁধারে সে কোথায় যায়? কেন যায়? কার কাছে যায়? মহা চিন্তা এসে ঘিরে ধরলো আলীকে।

আলী আল বারকের প্রথম স্ত্রীকে সংবাদ পাঠালেন একটু দেখা করার জন্য। খবর পেয়ে শান্ত মনেই আলীর সাথে দেখা করতে এলেন ভদ্রমহিলা।

আল বারক তখন অফিসে ব্যস্ত। আলী মহিলাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাকে বসতে বলে বললেন, 'শুনেছি আল বারক দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন?'

'আল্লাহর কাছে হাজার শোকর দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন, চতুর্থ বা পঞ্চম করেননি।'

'নতুন বৌ দেখতে কেমন?'

'অপূর্ব সুন্দরী।'

'সুন্দরীদের তো আবার পাখা থাকে, উড়াল দেয় না তো?' কৌতুক করে বললেন আলী, 'মানে, আপনি কোন সন্দেহ করছেন না তো!'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন ভদ্রমহিলা, কোন জবাব দিলেন না। আল বারকের স্ত্রীর এ মৌনতা থেকে যা বুঝার বুঝে নিলেন আলী। বললেন, 'যদি বলি ও প্রায় রাতেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, কিছু মনে করবেন না তো?'

মৃদু হেসে মহিলা বললেন, 'আমিও ভাবছিলাম এ নিয়ে কার সাথে কথা বলবো? আসলে আমার স্বামী এখন তার গোলাম হয়ে গেছে। আমার সাথে কথা বলার সময়ও আর তার হয় না।'

'আপনি স্বামীকে কিছু বলেন না?'

'ওর ব্যাপারে স্বামীর সাথে কথা বলতে গেলে ভাববে হিংসা করছি। ওর যা মেজাজ,

রাগে সাথেই আমাকে না আবার বাড়ী থেকে বের করে দেয়, এই ভয়ে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না।'

'মেয়েটার স্বভাব চরিত্র কেমন?'

'মেয়েটাকে আমার ভাল মনে হয় না। আমাদের ঘরে মদের গন্ধও ছিল না। এখন বোতলকে বোতল শূন্য হয়ে যায়।'

'কি বললেন! মদ?' চমকে উঠলেন গোয়েন্দা প্রধান আলী, 'আল বারক মদ ধরেছেন?'

'শুধু ধরেন নি, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকেন। মেয়েটা মাঝে মধ্যেই ওকে মদ খাইয়ে রাতে বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাতে। আমি নিজে দেখেছি। যে রাতে ও বেরিয়ে যায় সে রাতে আমার স্বামী বেহুশ হয়ে পড়ে থাকেন। সকালেও উঠেন অনেক দেরী করে। ভাবতে পারেন কি বদমাইশ মেয়ে, স্বামীকে ধোঁকা দিয়ে রাত কাটায় বাইরে?'

'মেয়েটা বদমাইশ নয়, গোয়েন্দা। ধোঁকা দিচ্ছে দেশ এবং জাতিকে।'

'গোয়েন্দা!' চমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা, 'আমার ঘরে গোয়েন্দা!'

তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, 'আপনি জানেন আমি এক শহীদের কন্যা। আল বারক একজন খাঁটি মুসলমান। ইসলামের জন্য তার জীবন পণ। আমি আমার সন্তানদের জেহাদের জন্য তৈরী করছি, আর আপনি বলছেন আমার সন্তানের পিতা এক গোয়েন্দার খপ্পরে পড়েছে? সন্তানের পিতাকে আমি কোরবানী দিতে পারি, কিন্তু ইসলাম এবং জাতিকে কোরবানী দিতে পারি না। আমি দু'জনকেই হত্যা করবো।'

রাগে কাঁপতে লাগলেন ভদ্রমহিলা। অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করলেন আলী। বললেন, 'ও যে গোয়েন্দা তা নিশ্চিত হতে হবে। জানতে হবে আল বারক সত্যিই কি ওদের দলে ভিড়েছেন, না মদ খাইয়ে স্বার্থ উদ্ধার করা হয়। ওর অন্য সঙ্গীরা কোথায় আছে তাও জানতে হবে। এ জন্য গোয়েন্দাদের হত্যা না করে গ্রেফতার করতে হয়।'

এ অবস্থায় মহিলার কি করা উচিত সে ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিয়ে তাকে বিদায় জানালেন আলী। মহিলা ফিরে গেলেন। মনে হলো, আলীর কথা মতো ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করবেন। কিন্তু আল বারকের স্ত্রীর মনে হচ্ছিল, যে কোন সময় সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে। সে তো হারেমের মেয়ে নয়, স্বামীর অনুগত এক স্ত্রী। দেশ এবং জাতির জন্য আত্মোৎসর্গকারী বংশের সন্তান।

আল বারকের ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখার জন্য গোয়েন্দা লাগালেন আলী বিন সুফিয়ান। গোয়েন্দারা সারা রাত জেগে থেকে তাকে পাহারা দিতে লাগলো।

পাহারা জোরদার করার দু'দিন পর। রাতে ঘুমিয়ে আছেন আলী। গাঢ় ঘুম। আলীর নির্দেশ ছিল, ঘুম যত গভীরই হোক, জরুরী কোন খবর থাকলে তা সাথে সাথে তাকে জানাতে হবে। প্রয়োজনে ডেকে তুলতে হবে ঘুম থেকে।

সে রাতে দারোয়ান তাকে গভীর ঘুম থেকে ডেকে তুললো। তার চোখে মুখে

উদ্বেগের ছাপ। বললো, 'ওমর উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে এসে দ্রুত আপনাকে ডেকে দিতে বললো। তার চেহারায় আতংক আর অস্থিরতা, মনে হয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

কক্ষ থেকে তীরের মতো বেরিয়ে এলেন আলী। দু'তিন লাফে বারান্দা পার হয়ে নেমে এলেন আঙিনায়। ওখানেই দাঁড়িয়েছিল ওমর, আলীকে প্রশ্ন করারও অবকাশ দিল না। বললো, 'জলদি দশ বারোজন অশ্বারোহী সিপাইকে ডাকুন। আপনার ঘোড়াও তৈরী করতে বলে দিন। তারপর বলছি কি হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দজন সওয়ার এবং নিজের ঘোড়া আনার জন্য চাকরকে হুকুম দিয়ে আলী ফিরে দাঁড়ালেন ওমরের দিকে। বললেন, 'হ্যাঁ, এবার বলো কি ঘটেছে?'

'আমি এবং আজম আপনার নির্দেশে আল বারকের বাড়ীর ওপর নজর রাখছিলাম। কিছুক্ষণ আগে তার বাড়ী থেকে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা এক মহিলা বেরিয়ে এলো। সে পঞ্চাশ কি ষাট গজ এগিয়েছে, বাড়ী থেকে সর্বাঙ্গ ঢাকা আরেক মহিলা বেরিয়ে এসে আগের মেয়েটার পিছু নিল।

দ্রুত পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে গেলো পেছনের মহিলা। হঠাৎ প্রথম মহিলা টের পেয়ে গেলো যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়লো সে। আমরা দু'জন লুকিয়ে দেখতে লাগলাম।

দু'মহিলা মুখোমুখি হলো। তাদের মধ্যে কি কথা হলো বুঝা গেলো না, আগের মেয়েটা হাত তালি দিল। আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক লোক।

দ্বিতীয় মহিলাকে ধরার জন্য দ্রুত এগুলো সে, মহিলা তাকে আঘাত করলো। পুরুষও পাল্টা আঘাত করলো তাকে। প্রথম মেয়েটা বললো, 'ওকে তুলে নাও।'

দ্বিতীয় মহিলা পুরুষের আক্রমণকে পাশ কাটিয়ে প্রথম মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। চিৎকার করে উঠলো প্রথম মহিলাটি। দ্বিতীয় মহিলা আবার আঘাত করার আগেই পুরুষ লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। ও প্রতিহত করলো পুরুষের আক্রমণ। ততোক্ষণে দুই মহিলাই আহত।

আমি এসেছি আপনাকে সংবাদ দিতে, ওরা কোথায় যায় তা দেখার জন্য আজমকে রেখে এসেছি সেখানে।'

আকস্মিক অভিযানের জন্য আলী কিছু যুদ্ধবাজ সৈন্য তৈরী রাখতেন। ওরা ঘুমোতো আস্তাবলের পাশে নিজেদের কামরায়। মাথার কাছে ঘোড়ার জিন এবং অস্ত্র সব সময় প্রস্তুত রাখতো। দিনে রাতে যখনি প্রয়োজন, প্রস্তুতি নিতো কয়েক মিনিটের মধ্যে।

আলী বিন সুফিয়ান কাপড় পরে তৈরী হতে না হতেই ওরা এসে পৌঁছলো। আলীর নেতৃত্বে সংবাদ বাহকের সাথে ঘোড়া ছুটালো ওরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলো আল বারকের বাড়ীর পাশে, ঘটনাস্থলে।

দু'জনের হাতে মশাল। মশালের আলোয় ওরা দেখতে পেলো, লাশের মতো পড়ে আছে দু'জন মানুষ। একজন দ্বিতীয় মহিলা, অন্যজন ওমরের সঙ্গী আজম।

অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলেও দু'জনই এখনো জীবিত। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটি।

আজম বললো, 'মহিলাকে আহত করে ওরা চলে গেলে আমি তার কাছে এসেছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে আক্রান্ত হলাম আমি। খঞ্জর দিয়ে তিনটে আঘাত

করলো আমাকে। কিছু বুঝে উঠার আগেই আক্রমণকারী পালিয়ে গেলো। মেয়েটি আল বারকের বাড়ী যায়নি, প্রতিদিনকার মতো ওদিকেই গেছে।'

আলী মহিলাকে দেখলেন। আল বারকের প্রথমা স্ত্রী। তিনি দু'জন সিপাইকে দিয়ে ওদেরকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বাকী সওয়ারদের নিয়ে ছুটলেন অভিজাত সেই বাড়ীর দিকে।

বিশাল প্রাচীন বাড়ী। বাড়ীটার চারপাশ ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে আরো কয়েকটা বাড়ী। দেখতে ছোটখাট পাড়া মনে হলেও আসলে পুরোটা মিলেই একটা অভিন্ন বাড়ী।

বাড়ীর পেছন থেকে ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি ভেসে এলো। আলী কয়েকজন সওয়ারকে ওদিকে পাঠিয়ে দিলেন। দু'জনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন প্রধান ফটকে। বললেন, 'কেউ বেরোলেই বন্দী করবে। পালাতে চাইলে তীর মেরে শেষ করে দেবে।'

আলী এক সওয়ারকে বললেন, 'দ্রুত ক্যাম্পের কমাণ্ডারকে গিয়ে বলো, বাড়ীটা ঘেরাও করে ফেলতে। ভেতরের সবাইকে গ্রেফতার করতে হবে।'

অশ্বারোহী ক্যাম্পের দিকে ছুটলো। বাড়ীর পেছন থেকে ভেসে এলো অশ্বক্ষুরের শব্দ। আলী উচ্চস্বরে সঙ্গের সৈন্যদের বললেন, 'ঘোড়া ছুটাও। ওদের অনুসরণ করো। একজন আরেকজনের প্রতি নজর রেখো।'

তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সেনাবাহিনীর বাছাই করা ঘোড়া তীব্রগতিতে ছুটে চললো। পলায়নকারীরাও অভিজ্ঞ অশ্বারোহী। ক্ষুরের শব্দে মনে হলো ঘোড়াগুলোও বেশ ছুটতে পারে। আঁকাবাঁকা গলিপথের শহরে ঘোড়া ছুটাতে কিছু সমস্যা হয়েছিল। শহর ছাড়িয়ে এলো ওরা, সামনে খোলা প্রান্তর।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে হচ্ছে। খোলা মাঠে পলায়নকারীদের জন্য লুকানো কষ্টকর হয়ে পড়লো। দিগন্তে ওদেরকে ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। ওরা চার জন, চলছে পাশাপাশি। আলীর নির্দেশে দু'জন সওয়ার ছুটন্ত ঘোড়া থেকে তীর ছুঁড়ল। সম্ভবতঃ লাগেনি। ওদেরকেও বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়লো ওরা। একজন থেকে অন্যজনের দূরত্ব বেড়ে যেতে লাগলো।

আলীর দল তীব্র বেগে ছুটছিল। কমে এলো দূরত্ব। সামনে টিলা। টিলায় খেজুরগাছ, ঝোপঝাড়।

ওদের ঘোড়া দু'ভাগ হয়ে গেলো। একভাগ ঝোপের ডানে, এক ভাগ বায়ে। টিলা পেরোল ওরা। এরপর অদৃশ্য হয়ে গেলো দৃষ্টি থেকে। ধাওয়াকারীরা টিলায় উঠলো। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে চারটি ছায়া। ছুটছে বিচ্ছিন্নভাবে। আলী উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'চার ভাগ হয়ে ওদের ধাওয়া করো। ঘোড়া আরো জোরে ছুটাও। দূরত্ব কমিয়ে আনো। ধনুতে তীর জুড়ে নাও।'

সওয়াররা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে ছুটতে লাগলো। সবাই ধনুতে তীর গেঁথে নিল। বেড়ে গেলো ঘোড়ার গতি। অশ্ব ক্ষুরধ্বনির মাঝে তীর ছোঁড়ার শন্ শন্ শব্দ হলো।

একজন চিৎকার দিয়ে বললো, 'একটাকে শেষ করেছি।'

আলীর আরেক সঙ্গী তীর ছুঁড়লো। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে নিক্ষিপ্ত তীর ওদের গায়ে লাগলো না। দূরত্ব আরো কমে এলো। আহত হয়ে একটা ঘোড়া পা ভেঙে পড়ে গেলো।

আলীর এক সঙ্গী দ্রুত আরোহীর কাছে পৌঁছে ঘাড়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো। নুয়ে আঘাত ঠেকাল সে। আরেকজন লাফিয়ে পড়ে ছুটে গিয়ে পেঁচিয়ে ধরলো তার গলা। তার সামনে একই ঘোড়ার পিঠে বসা ছিল একটা মেয়ে। মেয়েটি অজ্ঞান।

কিছুক্ষণের মধ্যে সৈনিকদের হাতে পলায়নকারী সবাই ধরা পড়ে গেলো। ডাকাডাকি করে এক জায়গায় জড়ো করা হলো ওদের। আহত ঘোড়া দুটো মরুভূমিতে ছেড়ে দেয়া হলো। পলায়নকারী পাঁচ জন, এর মধ্যে একজন তরুণী।

ওদের একজন বললো, 'আমাদের সাথে যা ইচ্ছে ব্যবহার করো। কিন্তু মেয়েটা আহত। আশা করি ওকে বিরক্ত করবে না।'

ঘোড়ার জিনের সাথে বাঁধা মশাল জ্বালানো হলো। মেয়েটা সত্যি আহত। অনন্যা সুন্দরী। পাকা খেজুরের মতো টসটসে চেহারা। কাপড় রক্তে ভেজা। কাঁধে, ঘাড়ের কাছে খঞ্জরের আঘাতের চিহ্ন।

আলীর এক সহকারী আঘাত পরীক্ষা করলো। ক্ষত বেশ গভীর। রক্ত ঝরে মরার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা। এখনো অজ্ঞান। চোখ দুটো বন্ধ। আলী একটা কাপড় ছিঁড়ে মেয়েটার ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন। ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলো।'

তাড়াতাড়ির প্রশ্ন অবান্তর। ওরা এখন শহর থেকে অনেক দূরে। বন্দীদের মধ্যে ছিল এক বৃদ্ধ। সেই বৃদ্ধ আর মেয়েটিকে নিয়ে দলটা কায়রোর দিকে ফিরে চললো। সূর্যোদয়ের সময় ওরা পৌঁছলো কায়রো। সুলতান আগেই শুনেছিলেন রাতের ঘটনা। তাই আলী সুলতানের কাছে না গিয়ে প্রথমে হাসপাতাল গেলেন।

আজম এবং আল বারকের স্ত্রীর জ্ঞান ফিরলেও অবস্থা আশংকাজনক। ডাক্তার মেয়েটার দিকে নজর দিল।

সুলতানও হাসপাতালে এলেন। আলীকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আল বারকের জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম। আশ্চর্য কথা শোনাল সে। আল বারক নাকি বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। কক্ষে মদের সোরাহী এবং গ্লাস। সে কি মদও ধরেছে? স্ত্রী আহত হয়ে বাইরে পড়ে আছে এ অনুভূতিও তার নেই? আমি মহিলার সাথে কোন কথা বলিনি। ডাক্তার নিষেধ করেছেন।'

'আল বারকের এক স্ত্রী নয় দু' স্ত্রীই আহত। মরুভূমি থেকে যে মেয়েটাকে ধরে এনেছি সে তার দ্বিতীয় স্ত্রী। কথা বলার মতো হোক, আমরা অনেক বড় শিকার হাতে পেয়েছি সুলতান।'

সূর্য উঠার অনেক পর জাগলেন আল বারক। চাকর বললো, 'সুলতান তাকে স্মরণ করেছেন।'

সুলতানকে খুঁজতে খুঁজতে হাসপাতালে ছুটে এলেন তিনি। তার দু' স্ত্রী আহত। পাশে চার গোয়েন্দা। এদের সাথে বৃদ্ধকে দেখে আশ্চর্য হলেন তিনি। এই সে বৃদ্ধ, যাকে তিনি আছেফার স্বামী মনে করেছিলেন। এদের বিচারের ভার নিজের হাতে নিলেন সুলতান। কারণ এর সাথে প্রতিরক্ষা সচিব জড়িয়ে পড়েছেন।

সুস্থ হওয়ার পর ওদের জবানবন্দী নেয়া হলো। আল বারকের প্রথম স্ত্রী বললেন, 'যখন শোনলাম মেয়েটা গোয়েন্দা, ভীষণ রাগ হলো। ইচ্ছে হলো স্বামীকে এবং তাকে হত্যা করে ফেলি। কিন্তু আলী যখন বললেন, সঙ্গীদের খোঁজ নেয়ার জন্য গোয়েন্দাকে জীবিত ধরতে হয়, রাগ সামলে বাড়ী গেলাম। নজর রাখলাম মেয়েটার ওপর। এমনকি রাতের ঘুমও ছেড়ে দিলাম। সুযোগ বুঝে তার শয়ন কক্ষের দরজায় একটা ফুটো করলাম। রাতে তাকিয়ে থাকতাম ছিদ্র পথে।

রাতে দেখতাম মেয়েটা আল বারককে মদ খাওয়াচ্ছে। অর্ধ উলংগ দেহ। তার সাথে অশ্লীল আচরণ করছে। এমনভাবে সুলতানের কথা বলছে, যেন সুলতান তার পীর মুর্শিদ। গালাগালি করছে খৃষ্টানদের। বিশেষ করে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সুলতানের সামরিক পরিকল্পনার কথাই বেশী বলতো। আল বারক হড়হড় করে সুলতানের সব পরিকল্পনার কথা তাকে বলে দিতেন।

এরপর এলো প্রতীক্ষিত রাত। আছেফা আল বারককে মদ পান করাতে লাগলো। পশু হয়ে উঠলো সে। দুটো গ্লাস নিয়ে পাশের কক্ষে চলে গেলো আছেফা। মদ ভরে ফিরে এলো। একটা তাকে দিল, অন্যটা নিল নিজে। এরপর অশ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে গেলো।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। কালো কাপড়ে দেহ ঢাকল আছেফা। ধীরে ধীরে ডাকলো তাকে। জবাব না পেয়ে আস্তে করে ধাক্কা দিল। আল বারক চোখ খুললেন না। সম্ভবতঃ মেয়েটা তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল।

তখন প্রায় মধ্যরাত। আপাদমস্তক কালো বোরকায় নিজেকে ঢেকে কক্ষের আলো নেভালো মেয়েটা, বেরিয়ে এলো বেড়ালের মতো নিঃশব্দে। ক্রোধে ফেটে যাচ্ছিলাম আমি। বোরকা পরে একটা খঞ্জর সাথে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরোতে যাবো, দেখলাম এক চাকরানীর সাথে ফিসফিস করে কথা বলছে ও। বুঝলাম, চাকরানীটাকেও হাত করে নিয়েছে সে।

বেরিয়ে গেলো আছেফা। চাকরানী ফিরে গেল তার ঘরে। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে আমি দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। আমি দেখতে চাচ্ছিলাম ও কোথায় যায়। আছেফা সম্ভবতঃ আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। মোড় ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়লো ও। অন্ধকারে ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না, মোড় ঘুরেই ওর মুখোমুখি পড়ে গেলাম। হঠাৎ মুখোমুখি হওয়ায় সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না কি করবো। বললাম, 'কোথায় যাচ্ছো আছেফা?'

ওর পাহারায় লোক আছে জানতাম না। দেখিনি কাউকে। আছেফা হাততালি দিল। হেসে বললো, 'আপনি আমার পেছনে এসেছেন, না কোথাও যাচ্ছেন?'

অকস্মাৎ কেউ পেছন থেকে আমাকে জাপটে ধরলো। এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে দ্রুত খঞ্জর টেনে নিলাম। আঘাত করলাম লোকটাকে। ও পড়ে গেলো। লোকটা দ্রুত উঠে আমার পেটের পাশে আঘাত করতে চাইলো, সরে গেলাম আমি।

সরতে গিয়ে ধাক্কা খেলাম আছেফার গায়ে। ঘুরে আমি আছেফাকে আক্রমণ

করলাম। খঞ্জর ঢুকে গেলো তার কাঁধে, ঘাড়ের পাশে। চিৎকার দিল ও।

লোকটা ছুটে এসে আমাকে আঘাত করলো। পড়তে পড়তে সামলে নিলাম। আবার আঘাত করলাম তাকে। কিন্তু এ আঘাতও ঠেকিয়ে দিল ও।

আছেফা এসে জাপটে ধরলো আমাকে। লোকটা আমাকে আঘাত করলো, পড়ে গেলাম আমি।'

এরপর জবানবন্দী দিল আজম। সে বললো, 'ওমর চলে যাওয়ার পর দেখলাম দু'জন মহিলাই মাটিতে পড়ে আছে। সাথের লোকটা প্রথম মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেলো, দ্বিতীয় মহিলা আহত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। মহিলার অবস্থা আশংকাজনক। তার কাছে বসলাম। হঠাৎ কেউ আমাকে পেছন থেকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করলো। পরপর তিনবার। এরপর পালিয়ে গেলো। তারপরের কথা আমার মনে নেই।'

সন্ধ্যার দিকে আল বারকের প্রথম স্ত্রী এবং আজমের অবস্থা খারাপের দিকে মোড় নিল। ডাক্তারদের শত চেষ্টায়ও তাদের বাঁচানো গেলো না। আল বারকের স্ত্রী আলীকে বলেছিলেন, 'আমি আমার স্বামীকে কোরবানী দিতে পারি, কিন্তু জাতি এবং দেশের ইজ্জতকে কোরবানী দিতে পারি না।' শেষ পর্যন্ত তিনি তাই করলেন। জাতির জন্য বিলিয়ে দিলেন নিজের জীবন।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর নির্দেশে আল বারককে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তিনি বারবার বলছিলেন, 'আমি স্বেচ্ছায় এ অপরাধ করিনি। ওরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে।'

কিন্তু তিনি মদ আর সুন্দরীর মোহে পড়ে সামরিক এবং বেসামরিক তথ্য খৃষ্টানদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তা প্রমাণিত হলো। হত্যাকারীকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য পাচারের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। সুলতান প্রীতি বা বন্ধুত্বের কারণে এমন অপরাধীকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না।

সেদিনই আছেফার জবানবন্দী গ্রহণ করা হলো। আহত হওয়ার চাইতে ভয়ই ওকে কাবু করে ফেলেছিল বেশী। কারণ সে গোয়েন্দা হলেও সৈনিকের মতো দুঃসাহসী হওয়ার ট্রেনিং তার ছিল না। রাজকুমারী সেজে রাজা বা রাজকুমারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ট্রেনিং সে পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর পরিণতির কথা সে কখনো ভাবেনি।

মুসলমানদের হাতে পড়ায় ও ছিল বেশী শংকিত। কারণ ও শুনেছিল, মুসলমানরা পশু। নারীদের সাথে পশুর মতোই ব্যবহার করে ওরা। ওর ভয় ছিল, নিশ্চয়ই ওরা ওর চিকিৎসা করবে না। তাই ও ভয় পাওয়া শিশুর মতোই কাঁদছিল।

আলী তাকে অনেক বুঝালেন। বললেন, 'এক আহত মুসলমান মেয়ের সাথে যেমন ব্যবহার করা হয়, তোমার সাথেও তাই করা হবে।'

কিন্তু সুলতানের সাথে দেখা করতে চাইলো মেয়েটি।

সুলতানকে তার কথা বলা হলো। সুলতান নিজেই এলেন হাসপাতালে। তার বেডের পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভয় করো না, তুমি আমার মেয়ের মতো।'

'আমি শুনেছি সুলতান আইয়ুবী তলোয়ার নয়, হৃদয়ের সম্রাট।' কাঁদতে কাঁদতে

বললো আছেফা, 'যে সম্রাটকে পরাজিত করার জন্য সকল খৃষ্টান সম্রাটরা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, এক অসহায় মেয়ের সাথে প্রতারণা করতে তাঁর কি ভাল লাগবে? আমাকে শান্তনা নয়, বিষ দিন। এ অবস্থায় আমি কোন কষ্ট সইতে পারবো না।'

'তুমি চাইলে আমি সবসময় তোমার কাছে থাকবো। তোমাকে ধোঁকাও দেবো না, কষ্টও দেবো না। তুমি সুস্থ হও। ডাক্তার বলেছেন, তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে। তোমাকে কষ্ট দিতে চাইলে চিকিৎসা করাতাম না, এ অবস্থায়ই জেলে পাঠিয়ে দিতাম। লবণ ছড়িয়ে দিতাম তোমার ক্ষতস্থানে। তুমি চিৎকার দিয়ে অপরাধ স্বীকার করতে। বলে দিতে সঙ্গীদের নাম। কিন্তু আমরা মেয়েদের সাথে এমন ব্যবহার করি না। আল বারকের প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন। তুমি তার দ্বিতীয় স্ত্রী। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো আমি।'

'সুস্থ হলে আমার সাথে কেমন ব্যবহার করবেন?'

'তুমি যুবতী এবং সুন্দরী' এখানকার কোন পুরুষ তোমাকে সে চোখে দেখবে না। মনের সকল সন্দেহ মুছে ফেলো। তোমার সাথে ব্যবহার হবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী।'

অভিজাত ওই বাড়ীটিতে তল্লাশী নেয়া হলো। কারো বসতবাড়ী নয় ওটা। বাড়ীটি ছিল খৃষ্টান গোয়েন্দাদের আড্ডাখানা। ভেতরেই ছিল আস্তাবল। ওখান থেকে পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলো।

এ পাঁচ জন এবং পলায়নকারী চারজন কোন জবানবন্দী দিতে অস্বীকার করলো। ওদের পাঠানো হলো নির্দিষ্ট কক্ষে, যেখানে পাথরও মুখ খুলতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ স্বীকার করলো, মেয়েটাকে দিয়ে সে-ই আল বারককে ফাঁসিয়েছে। প্রথম থেকে পুরো ঘটনা শোনাল সে। অন্যরাও বলতে বাধ্য হলো।

মানুষ যে বাড়ীকে সম্মানের চোখে দেখতো, সেখানে ছিল অনেকগুলো মেয়ে। গুপ্তচরবৃত্তি, সরকারী কর্মকর্তাদের ফাঁসানো এবং যুবকদের চরিত্র হননের জন্য ওদের ব্যবহার করা হতো।

ওরা বললো, ফৌজে নিজেদের লোক ভর্তি করে ওরাই সৈন্যদেরকে জুয়া, চুরি এবং ব্যভিচারে অভ্যস্ত করে তুলছে। শহরে ছড়িয়ে দিয়েছে পাঁচশোরও বেশী নিশিকন্যা। মিনি প্রমোদকেন্দ্র খুলেছে। সুদানীদের উস্কানী দিয়েছে বিদ্রোহ করার জন্য। ওরা প্রশাসন এবং ফৌজের বড় বড় ক'জন অফিসারের নাম বললো। এসব অফিসার ওদের হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে কাজ করছিল।

আছেফা ছিল খৃষ্টান। নাম ফিলমেংগো। বাড়ী গ্রীসে। তের বছর বয়স থেকে তাকে ট্রেনিং দেয়া শুরু হয়। তাকে শেখানো হয়েছে বিভিন্ন ভাষা, মিশরের সংস্কৃতি, আচার আচরণ। মুসলমানদের এলাকায় কাজ করার জন্য এমন হাজার হাজার মেয়ে তৈরী করা হয়েছে। অনেককে এরই মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এদিকে। সুস্থ হওয়ার পর অকপটে সবই বলেছে আছেফা, কিছুই গোপন করেনি।

আছেফা সম্পূর্ণ সুস্থ হলো পনেরো দিন পর। তাকে বলা হলো, 'তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।'

সে বললো, 'আমি সন্তুষ্ট চিত্তে এ শাস্তি গ্রহণ করছি। আমি ক্রুশের মিশন সফল

করেছি।'

ওকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হলো। তার এবং অন্যান্যদের বর্ণনা অনুযায়ী বহু লোককে গ্রেফতার করা হলো। এদের অনেকেই ছিল মুসলমান। বিচার শেষে অধিকাংশকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

আল বারককে দেয়া হলো একশ বেত্রাঘাত। তিনি সইতে পারলেন না এ শাস্তি। দু'দিন পর হাসপাতালে মারা গেলেন তিনি। তার মৃত্যুর পর সরকার তার সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ করলো। বাড়ীতে সরকারী খরচে চাকর বাকর এবং কেয়ারটেকার নিয়োগ করা হলো। আল বারকের সন্তানরা বললো, 'আমরা আল বারকের সন্তান নই, এক শহীদ মায়ের সন্তান।'

১১৭১ এর জুন মাস। মরু-সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে জ্বলছে মিশর। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে খলিফা আল আযেদের দূত এসে বললো, 'খলিফা আপনাকে স্মরণ করছেন।'

'কেন ডেকেছেন বলেছেন কিছু?'

'জ্বী না।'

মেজাজ বিগড়ে গেলো আইয়ুবীর। দূতকে বললেন, 'খলিফাকে আমার সালাম দিয়ে বলো, আমি খুব ব্যস্ত আছি। তাঁকে আরো বলো, আমার সামনে যে কাজ পড়ে আছে তা খলিফার কাছে হাজিরা দেয়ার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তবে জরুরী কোন কাজ থাকলে তিনি যেন তা জানিয়ে তলব করেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া খোশগল্প করার জন্য দরবারে হাজিরা দেয়ার সময় আমার নেই।'

দূত ফিরে গেলো। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কক্ষে পায়চারি করতে লাগলেন। চোখে মুখে তার উৎকণ্ঠা।

তখন ফাতেমী খেলাফতের যুগ। খলিফারা ছিলেন সম্রাটের মতো। জুম্মার খোতবায় আল্লাহ এবং রাসূলের (সা.) নামের সাথে তাদের নামও উচ্চারণ করতে হতো। এসব খলিফারা ছিলেন বিলাসপ্রিয়, নারী ও মদে মাতোয়ারা।

নূরুদ্দিন জঙ্গী এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবী না থাকলে এরা হয়তো মুসলিম দেশগুলোকে বিক্রি করে ফেলতেন।

আল আযেদও ছিলেন এমনি একজন খলিফা। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মিশর আসার পর তাকে তিনি কয়েক বারই ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনিও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে খলিফার দরবারে ছুটে গেছেন। কিন্তু ওখানে স্রেফ গল্পগুজব ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

আইয়ুবী যেন নিজেকে দেশের প্রধান মনে না করেন, খলিফা হলেন দেশের সর্বেসর্বা– আইয়ুবীকে এ অনুভূতি দেয়ার জন্যই এত ডাকাডাকি। কিন্তু খলিফা আল আযেদ আইয়ুবীকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য আইয়ুবীকে ভালও বাসতেন। আইয়ুবী গেলে তাকে কাছে বসিয়ে কথা বলতেন। তবে আচরণে হামবড়া একটা ভাব অবশ্যই থাকতো। কথাবার্তায় প্রকাশ পেতো রাজকীয় দেমাগ। যতবারই আইয়ুবীকে ডেকেছেন, প্রয়োজনীয় কোন কথা তিনি বলেননি।

খৃষ্টানদের পরাজিত এবং সুদানীদের বিদ্রোহ দমনের পর থেকেই আইয়ুবী খলিফাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। খলিফার প্রাসাদের শান-শওকত আইয়ুবীর মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তিনি ভাবতে পারতেন না, মূল্যবান তৈজষপত্র, কারুকার্যখচিত স্বর্ণের প্লেট-গ্লাস আর হীরা-মুক্তা বসানো মদের সোরাহী ও পানপাত্র সংগ্রহ করাই কোন খলিফার একমাত্র কাজ হতে পারে।

পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার কঠিন দায়িত্ব যে খলিফার ওপর ন্যস্ত, কি করে তাঁর হারেম ভরা থাকে সুন্দরী তরুণীতে, এ কথা কিছুতেই বুঝতেন না আইয়ুবী। অথচ আরব, মিশর, মরক্কো, সুদান, তুরস্কসহ মুসলিম বিশ্বের খলিফা ও শাসকদের হারেমগুলোতে জায়গা করে নিয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টান মেয়েরা। এটাই ছিল সে সময়ের বিলাসপ্রিয় শাসকদের প্রাসাদের চিত্র।

আল আযেদের দেহরক্ষীদের সবাই ছিল সুদানী। ওমরাদের মধ্যেও ছিল বিদ্রোহী সুদানী বাহিনীর কমাণ্ডার এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। আইয়ুবী এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

আয়ুবীর নির্দেশে খলিফা আল আযেদের প্রাসাদ কর্মচারীদের সাথে গুপ্তচরদের অন্তর্ভুক্ত করলেন আলী বিন সুফিয়ান। হারেমের দু'জন মেয়েকেও হাত করে নিল আলী।

ওদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী প্রমাণিত হলো, খলিফা সুদানীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। ষাট-পয়ষট্টি বছর বয়সেও যুবতীদের মাহফিলেই সময় কাটাতেন তিনি। আর তাঁর এ দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছিল আইয়ুবী বিরোধী সুদানী ও অন্যান্যরা।

১১৭১-এর দ্বিতীয় কি তৃতীয় মাসে খলিফার হারেমে এলো নতুন এক যুবতী। খাপখোলা তলোয়ারের মতো ঝলসানো রূপ। যেমন রূপ তেমনি প্রাণবন্ত ও সপ্রতিভ।

তাকে নিয়ে এসেছিল আরবী পোযাক পরা চার ব্যক্তি। সাথে ছিল প্রচুর উপঢৌকন সামগ্রী। মেয়েটাও উপহার হিসেবেই এসেছে। নাম উম্মে আমারা। যেমন চৌকস তেমনি বুদ্ধিমতী। অল্প ক'দিনেই রূপের চমক আর মুখের যাদু দিয়ে মেয়েটা খলিফাকে বশ করে ফেললো।

আইয়ুবী রাজপ্রাসাদের সব অপকর্মের খবর পেতেন। কিন্তু তখনো ক্ষমতায় বাগডোর মজবুতভাবে ধারণ করতে পারেননি বলে খলিফার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারছিলেন না।

পূর্বের গভর্ণররা সব সময় খলিফার সামনে নত হয়ে থাকতো। এতে মিশর হয়ে পড়েছিল বিদ্রোহীদের স্বর্গরাজ্য। নামে ইসলামী খেলাফত হলেও সেখানে ইসলামের পতাকা মাটিতে লুটাচ্ছিল। খৃষ্টানদের সাথে মুসলিম সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসারদের ছিল গোপন আঁতাত। এরাই কায়রো এবং ইস্কান্দারিয়ায় ইহুদী ও খৃষ্টানদের পুর্নবাসন করেছিল।

সুদানী সেনাবিদ্রোহ দমন করলেও তাদের কিছু জেনারেল ইচ্ছে করলে তখন চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারতো। রাজপ্রাসাদের সাথে এদের ছিল গভীর সম্পর্ক। কিন্তু ওরা সে সাহস করেনি। তাছাড়া দেশের কিছু মানুষ তখনো খেলাফতকে মনে করতো ইসলামের রক্ষক। ওরা খলিফাকে সম্মান করতো। আবার কিছু ছিল যারা এ আবেগকে

আহত করতে চাইতো না। এ ছাড়া চাটুকার ও তোশামুদে তো ছিলই। গভর্ণর হওয়ার স্বপ্ন দেখতো ওরা। কিন্তু ওদের সবার আশার গুড়েই বালি দিলেন আইয়ুবী।

ওদের চর দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়েছিল। খৃষ্টান আক্রমণের ভয় ছিল বলে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ওদের বিরুদ্ধে তখনো কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। সার্বিক পরিস্থিতি ভাল করে জানা থাকায় আইয়ুবী বিলাসী খলিফাকে প্রথমে চটাতে চাননি। তাই যতবার খলিফা ডেকেছেন ততোবারই তিনি হাজিরা দিয়েছেন। কিন্তু এবারই প্রথম খলিফার কাছে যেতে তিনি সরাসরি অস্বীকার করলেন।

দূত বেরিয়ে যেতেই সালাহউদ্দিন আইয়ুবী প্রহরীকে ডেকে বললেন, 'আলী বিন সুফিয়ান, বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ, মুফতি ঈশা আল হুকারী এবং আল নাসেরকে এক্ষুণি আমার কাছে আসতে বলো।'

কয়েক মিনিট পর। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর চারজন বিশিষ্ট সভাসদ বসে আছেন সুলতানের সামনে। আইয়ুবী বললেন, 'আপনাদেরকে আজ এক বিশেষ উদ্দেশ্যে ডেকে এনেছি। এই মাত্র খলিফার দূত আমাকে নিতে এসেছিল। আমি যাইনি। ইসলামের নামে ভোগ-বিলাস, নারী আর মদে ডুবে থাকতে খলিফাকে আমরাই সুযোগ করে দেই। পাপাচার না করেও আমরা হই পাপাচারের অংশীদার।

আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের সুন্নাহর বিরুদ্ধে চলার কোন অধিকার আমাদের নেই, অথচ আমরা তাই করে চলেছি। আমি মনে করি, পাপ করা আর পাপের দোসর হওয়া সমান অপরাধ। তাই পাপ না করেও পাপের দোসর হিসাবে আমরা খলিফার মতোই অপরাধী।

এ পথ থেকে আমাদের সরে দাঁড়ানো উচিত। এখন থেকে তাই আমি জুম্মার খোৎবা থেকে খলিফার নাম বাদ দিতে চাই। এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি?'

'পদক্ষেপটা সময়ের পূর্বেই হয়ে যাচ্ছে না!' বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ বললেন, 'খলিফাকে মানুষ নবীর মতো সম্মান করে। এতে হয়তো সাধারণ মানুষ ক্ষেপে যেতে পারে।'

'এখন নবীর মতো সম্মান করে।' সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বললেন, 'ক'দিন পর তাকে খোদা ভাববে। আমরা যারা আল্লাহ এবং রাসূলের (সা.) নামের সাথে তার নাম জুড়ে দিচ্ছি, তারাই তাকে খোদা এবং নবীর আসনে বসিয়েছি। এ অপরাধ যতটুকু না তাঁর, তারচে বেশী অপরাধী আমরা।'

'আমি একমত।' বললেন মুফতি ঈশা, 'খোৎবায় আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে অন্য মানুষের নাম উচ্চারিত হবে কোন মুসলমান তা সহ্য করতে পারে না। তাও এমন একটা লোক, যে মদ্যপ এবং ব্যাভিচারী। এতদিন খলিফাকে নবীর মর্যাদা দেয়া হয়েছে সে ভিন্ন কথা। আমি শহরের ধর্মীয় ইমাম হিসাবে সুলতানের সাথে একমত পোষণ করছি। তবে খোৎবা থেকে খলিফার নাম বাদ দিলে রাজনীতি বা সেনাবাহিনীতে কি প্রতিক্রিয়া হবে তা আপনারা জানেন।'

'প্রতিক্রিয়া হবে মারাত্মক।' শাদ্দাদ বললেন, 'বিরোধিতা কেবল খেলাফতের পক্ষ থেকেই আসবে না, খেলাফতের সুবিধাভোগীরাও এর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামবে। কিন্তু তাই বলে দিনের পর দিন মানুষকে আমরা অন্ধকার ও কুসংস্কারে ডুবিয়ে রাখতে

পারি না। হকের পথে চলতে চাইলে এটুকু ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। ঝুঁকি ছাড়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার কোন বিকল্প কোন কালে ছিল না, এখনো নেই। আমি চাই এ কুসংস্কার দূর হোক, প্রয়োজনে সাহসিকতার সাথে আমরা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করবো।'

'আমরা একটি বেদয়াত থেকে মুক্তি চাচ্ছি। যদি খলিফাকে সোজা পথে আনা সম্ভব হতো তবে হয়তো আমরা এ ঝুঁকি এড়াতে পারতাম। কিন্তু আমরা সবাই জানি, তা কখনো হবার নয়। খলিফার মন রক্ষা করার চাইতে শরিয়ত রক্ষা করা অনেক বেশী জরুরী।' মুফতি ঈশা আবারো কথা বললেন।

'সাধারণ মানুষের মতামত আমি বেশী জানি।' গোয়েন্দা প্রধান আলী বললেন, 'ওরা খলিফাকে চেনে না, কখনো খলিফার চেহারাও দেখেনি। আমি হলপ করে বলতে পারি, সাধারণ মানুষ খলিফার চাইতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর নামের সাথে বেশী পরিচিত এবং তাকে তারা ভালও বাসে।'

তিনি আরো বললেন, 'আমার ব্রাঞ্চের রিপোর্ট অনুযায়ী আপনার দু'বছরের শাসনামলে মানুষ তাই পেয়েছে, যার আশাও তারা করেনি। শহরে কোন ক্লিনিক বা হাসপাতাল ছিল না। সামান্য রোগেও মানুষ মারা যেতো। এখন সরকারীভাবে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে পারছে। ছিনতাই, রাহাজানি এবং সন্ত্রাস নেই। অন্যান্য অপরাধের পরিমাণও কম। ইচ্ছে করলেই মানুষ আপনার কাছে যে কোন অভিযোগ পৌঁছাতে পারে।

আপনি আসার আগে মানুষ সরকারী আমলা, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীকে ভীষণ ভয় করতো। ওরা এখন নিজেদেরকে জাতি এবং দেশের অংশ মনে করে।

খেলাফত ওদের দিয়েছে অন্যায় এবং নির্যাতন, আপনি দিয়েছেন ন্যায়, ইনসাফ এবং অধিকার। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, সাধারণ মানুষ খেলাফতের নয়, প্রশাসনের সিদ্ধান্তই মেনে নেবে।'

'জানি না আমি দেশে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি কিনা। মানুষকে তার অধিকার দিতে পেরেছি কিনা তাও আমার জানা নেই। কিন্তু জাতিকে এক অপ্রয়োজনীয় কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখতে পারি না আমি, চলতে দিতে পারি না শিরক এবং কুফরী। যে কুসংস্কার ধর্মের অঙ্গ হয়ে গেছে, তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলা আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করি। না হলে এর থেকে জন্ম নেবে আরো পাপ, আর সে পাপের দায়ভাগ পোহাতে হবে আমাকেই।

এ নিয়ম চলতে থাকলে দেখা যাবে, কাল আমিও খোৎবায় আমার নাম জুড়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। অথবা আমার অজান্তেই আমাকে খুশী করার আশায় কেউ এ কাজ করে বসবে। এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপ জ্বালানো হয়। যে দীপশিখা শিরকের পথ আলোকিত করে আমি সে দীপ নিভিয়ে দিতে চাই।'

মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছেন চার প্রধান সভাসদ। তাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখছেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। তিনি আবেগঘন কণ্ঠে বললেন, 'আপনাদের কারো অজানা নেই, রাজপ্রাসাদ এখন ব্যাভিচারের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সুদানীরা যে

রাতে আমাদের আক্রমণ করেছিল, সে রাতেও হারেমে মেয়েদের সাথে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছিলেন খলিফা। খোদার সৈনিকরা যখন শহীদ হচ্ছিল, তখনো তার হাতে ছিল মদের পিয়ালা। আপনারা সেদিন ব্যর্থ হলে ইসলামের পতাকা মিশর থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিত।

নিয়ম অনুযায়ী খলিফাকে সবকিছু অবহিত করা দরকার। বিজয়ের পর আপনাদের পক্ষ থেকে বিজয়ের খবর নিয়ে আমি গিয়েছিলাম খলিফার দরবারে। তিনি সে বিজয়ের খবর শুনে কি করলেন? মাতাল ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে তিনি শুধু বললেন, 'শাবাশ! আমি খুব খুশী হয়েছি। আমার বিশেষ দূতের মাধ্যমে তোমার কাছে উপহার পাঠাবো।'

আমি বললাম, 'খলিফাতুল মুসলেমিন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আপনাকে বা আমার পিতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, বরং আল্লাহ এবং রাসূলকে খুশী করার জন্য আমার ওপর যে কর্তব্যের বোঝা আপনারা দিয়েছিলেন, আমি তা পালন করেছি মাত্র।'

বৃদ্ধ খলিফা বললেন, 'সালাহউদ্দিন, তুমি এখনো শিশু, কিন্তু কাজ করেছো বড়দের মতো।' এমনভাবে কথা বললেন, যেন আমি তার চাকর। অপ্রিয় হলেও আমি আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি, 'রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য এরা শ্বেতহস্তি বিশেষ, যা পোষার জন্য ব্যয় হয় প্রচুর, কিন্তু মানবতার জন্য তা কোন কাজে আসে না।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বললেন, 'এটা নূরুদ্দিন জঙ্গীর চিঠি। পাঁচ ছ'দিন আগে পেয়েছি আমি। তিনি লিখেছেন, 'খেলাফত তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বাগদাদের অধিনস্ত দু'জন খলিফার ওপর এখন কেন্দ্রের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। মিশরের খলিফাও যেন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। প্রয়োজনে তিনি খৃষ্টান বা সুদানীদের সাথে গাটছড়া বাঁধতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমি ওদের ষড়যন্ত্রের আশংকা করছি। আমার কাছে যে খবর আছে তাতে বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিশরের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও ভাল নয়। ওখানে আরেকটি বিদ্রোহের সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য আপনার সতর্কতা জরুরী।

মিশরের খলিফাকে তার তৎপরতা প্রাসাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য করবেন। খৃষ্টানদের সহযোগিতা নিয়ে তিনি যেন মুসলিম বিশ্বের কোন অনিষ্ট করতে না পারেন সে ব্যাপারে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে। প্রয়োজনে যে কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করবেন না। আমি আপনাকে সামরিক এবং আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি। সুদানীদের প্রতিও কড়া দৃষ্টি রাখবেন।' —নূরুদ্দিন।

চিঠিপড়া শেষ করে আইয়ুবী বললেন, 'খলিফা যে শ্বেতহস্তি এতে সন্দেহ নেই। আপনারা দেখেছেন, খলিফা ভ্রমণে বের হলে অর্ধেক ফৌজকে ছড়িয়ে দেয়া হয় তার নিরপত্তা দেখার জন্য।। তার চলার পথে গালিচা বিছিয়ে দেয়ার জন্য। ফুল ছোঁড়ার জন্য জনগণকে বাধ্য করা হয়। তার ভ্রমণের জন্য অপব্যয়ের টাকা জনকল্যাণে এবং দেশরক্ষার কাজে ব্যয় হতে পারতো।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তার বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে, 'মিশরের জনগণ এবং

বিভিন্ন ধর্মের লোকদের বুঝাতে হবে, ইসলাম শুধু রাজা বাদশাহর ধর্ম নয়, ইসলাম মরুচারী বেদুঈন, কৃষক-শ্রমিক এবং খেটে খাওয়া মানুষের ধর্ম। আল্লাহ মানুষকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, ইসলাম মানুষকে সে মানবতাই শিক্ষা দেয়।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বক্তব্য শেষ হলে কথা বললেন বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ, 'নিজে শাসন ক্ষমতা দখল করার জন্যই খলিফার বিরোধিতা করছেন, আপনার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আসতে পারে।'

'সত্য সব সময় বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে এবং হচ্ছে।' বললেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, 'আজকে মিথ্যা এবং বাতিলের শিকড় এতটা মজবুত হতে পেরেছে এ জন্য যে, বিরোধিতার ভয়ে লোকেরা সত্য বলা আজ ছেড়েই দিয়েছে। বুকের ভেতর আটকে গেছে সত্যের কণ্ঠ। রাজকীয় বিলাস-ভ্রমণ এবং বাদশাহী দাপট প্রজাদের স্বাধীন চেতনা হরণ করেছে। সাধারণ মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে, মানুষের উপর জোর করে বাদশাহী চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে এমন শিকলে বাঁধা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (সা.) যে শিকল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিলেন।

আমাদের শাসকরা জাতিকে পতনের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। ভোগ বিলাসের জন্য তারা খৃস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন। ফলশ্রুতিতে খৃস্টানরা ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব। আপনি বিরোধিতার কথা বলছেন শাদ্দাদ! এ বিরোধিতায় ভয় পেয়ে সত্যকে তুলে ধরা থেকে পিছিয়ে থাকলে আল্লাহ যেদিন পাকড়াও করবেন সেদিন কি জবাব দেবেন?'

'মহামান্য আমীর।' স্থল বাহিনী প্রধান আল নাসের বললেন, 'আমরা বিরোধিতাকে ভয় পাই না। আপনি আমাদের যুদ্ধের ময়দানে দেখেছেন। অবরুদ্ধ হয়েও নিঃশঙ্ক চিত্তে লড়াই করেছি আমরা। যুদ্ধ করেছি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়ে। যখন আমরা নগন্য ছিলাম তখনো শত্রুর অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করে দিয়েছি। সুলতান! আপনার একটা কথা সব সময়ই মনে পড়ে আমার। আপনি বলেছিলেন, 'বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব কিন্তু ভেতর থেকে আক্রান্ত হলে চমকে গিয়ে ভাবতে হয়, এসব কি হচ্ছে! শাসক যখন দেশের দুশমনে পরিণত হবে তখন আপনার তরবারী খাপের মধ্যেই নিশপিশ করবে, বাইরে আসতে পথ পাবে না।' আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার তরবারী কোষের ভেতরেই নিশপিশ করছে, শাসকদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত হতে চায় না। শাসকদের আমি সব সময়ই সম্মান করি। শাসকরা জাতির গৌরব, দেশের অহংকার। বলতে পারেন, আমাদের শাসকদের কি এ সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা আছে?'

'আমি শুধু খলিফা আল আযেদের কথাই বলছি না।' আইয়ুবী বললেন, 'আলীকে জিজ্ঞেস করুন, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের রিপোর্ট অনুযায়ী হলব, দামেস্ক, মক্কা এবং মদিনার খেলাফতও ভোগ বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ওখানকার আমীর এবং গভর্নররা নিজেরাই স্বাধীন শাসক। খেলাফত এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, আমীর ওমরা এবং গভর্নররা তাকে নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে।

আমি জানি, এ ছিন্নভিন্ন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে গেলে এরা আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের সামনে বাঁধার পাহাড় দাঁড় করাবে। এরপরও আমি ভীত নই। আমার বিশ্বাস,

আপনারাও এতে ভয় পাবেন না। আপনাদের মতামতকে আমি সম্মান করি। আগামীতে কোন সুনির্দিষ্ট জরুরী কাজে ডাকলেই কেবল খলিফার আহবানে আমি সাড়া দেবো। এখন থেকে খোৎবায় আর খলিফার নাম থাকবে না।'

সুলতানের সাথে একমত হলেন সবাই। এরপর সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যে যার কাজে ফিরে গেলেন।

খলিফার খাস কামরা। দূত ফিরে গিয়ে বললো, 'কোন জরুরী কাজ থাকলে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আসবেন। এখন তিনি ভীষণ ব্যস্ত। কি জন্য ডেকেছেন তা জানাতে বলেছেন তিনি।'

খাস কামরায় খলিফার পাশে বসেছিল উম্মে আমারা। দূতের মুখে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর জবাব শুনে সে বললো, 'সালাহউদ্দিন আপনার নফর। আপনিই তাকে মাথায় চড়িয়েছেন। এ বেয়াদবকে পদচ্যুত করছেন না কেন? সৈন্য পাঠিয়ে কেন তাকে বন্দী করছেন না?'

'পরিণাম ভাল হবে না বলেই তাকে পদচ্যুত করছি না।' খলিফার কণ্ঠে ক্ষোভ, 'সেনাবাহিনী তার হাতে। সে আমার বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে।'

রজব ছিল সুদানী বাহিনীর এক সালার। বর্তমানে খলিফার গার্ড বাহিনীর কমাণ্ডার। গার্ড বাহিনীর সবাই ছিল সুদানী কাফ্রী। রজবই ওদের বাছাই করেছিল। সে ছিল চাটুকার এবং সুলতান আইয়ুবীর ঘোর বিরোধী।

দূতের খবর শুনেই তাকে ডেকে পাঠালেন সুলতান। রজব এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো একপাশে।

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে খলিফা বললেন, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী! আমি আগেই জানতাম কমবখত স্বাধীনচেতা, বেয়াড়া। আমি তাকে ডেকেছিলাম, সে আসতে অস্বীকার করেছে। বলেছে, কোন জরুরী কাজ থাকলে আসবে, নয়তো তার কাছে আমার ডাকের কোন গুরুত্ব নেই। এখন তার হাতে নাকি খুব জরুরী কাজ....।' বলতে বলতে খলিফার হেঁচকি উঠলো। সাথে কাশি। দু'হাতে বুক চেপে ধরলেন তিনি। বিবর্ণ হয়ে গেলো চেহারা। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি যে অসুস্থ বদবখত তাও দেখলো না। আমি হার্টের রোগী। রাগ করা ঠিক না। আমি শরীর স্বাস্থ্যের চিন্তায় অস্থির, আর সে আছে জরুরী কাজ নিয়ে।'

'আপনি তাকে কেন ডেকেছিলেন আমাকে বলুন।'

'ডেকেছিলাম যেন সে বুঝে তার উপরও একজন আছে।'

বুক চেপে কাৎরাতে কাৎরাতে বললেন খলিফা, 'তুমি বলেছিলে, সে স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। আমি বার বার তাকে এখানে ডেকে আনতে চাই। চাই নির্দেশ দিতে। যেন সে আমার সামনে মাথা নুইয়ে রাখে। কোন জরুরী কাজ হলেই তাকে ডাকবো, এমন তো কথা নেই।'

উম্মে আমারা মদের পিয়ালা খলিফার ঠোঁটের সামনে তুলে ধরে বললো, 'আপনাকে একশ বার বলেছি, রাগ করবেন না। হৃদরোগের জন্য রাগ ভীষণ ক্ষতিকর।'

একটা স্বর্ণের কৌটা থেকে কিছু পাউডার জাতীয় জিনিস খলিফার মুখে তুলে দিল মেয়েটা। খলিফা তার রেশম কোমল চুলে বিলি কেটে বললো, 'তুমি না থাকলে এতদিনে আমি মরেই যেতাম। সবার আকর্ষণ আমার সম্পদ আর আমার পদবীর সাথে। আমার কোন স্ত্রীও আমাকে ভালবাসে না। তুমি আছো বলেই আজো বেঁচে আছি।'

'খলিফাতুল মুসলেমিন!' রজব বললো, 'আপনার মনটা খুব নরম। ভীষণ ভাল মানুষ আপনি। এ জন্যই সালাহউদ্দিন এতো সাহস পায়। সে যে আরব বা ফাতেমী বংশের নয় বরং একজন কুর্দি, তা আপনি ভুলেই গেছেন। বাইরের লোককে এতো বড় পদ না দিলে আজ এমন সমস্যা দেখা দিত না। মানি, সে একজন ভাল সৈনিক। সে যুদ্ধ করতে জানে, করাতেও জানে, শুধু এ জন্যেই তাকে মিশরের গভর্ণর করতে হবে?'

খলিফা মন দিয়ে তার কথা শুনছে দেখে সে বললো, 'একবারও কি ভেবে দেখেছেন, সেনাবাহিনীতে যখন সুদানীরা ছিল, নাজি এবং এডরোসের মতো সেনাপতি ছিল, তখন প্রজারা আপনার কুকুরের সামনেও মাথা নোয়াতো। আপনার নির্দেশ পালনের জন্য এক পায়ে খাঁড়া থাকতো সুদানী সালাররা। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, অধীনস্তকে ডাকলেও সে আসতে সরাসরি অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখায়। আমি অবাক হয়ে ভাবি, সুদানীদের এতবড় ফৌজকে যে খেলনার মতো নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, কোন দিন জানি সে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।'

'রজব!' গর্জে উঠলেন খলিফা, 'এ জন্য তুমিই দায়ী।'

রজবের চেহারার রঙ বদলে গেলো। চমকে সরে যেতে চাইলো উম্মে আমারা। খলিফা তাকে টেনে জড়িয়ে ধরে মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, 'ভয় পেয়েছো? আমি রজবকে বলতে চাচ্ছি, আইয়ুবীর তৈরী ফৌজের চেয়ে আগের ফৌজ ভাল ছিল এ কথা ও আমাকে আগে বলেনি কেন? চুপ করে আছো কেন রজব? গভর্ণর যখন তার আসন পাকাপোক্ত করেছে তখন বলছো, এরা খেলাফতের দুশমন।'

'আপনি রাগ করবেন ভেবে ভয়ে বলিনি। আপনার সাথে পরামর্শ করে বাগদাদের খলিফা আইয়ুবীকে পাঠিয়েছে, আমি খেলাফতের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন সাহসে মুখ খুলবো! আজ আপনার সাথে গভর্ণরের ঔদ্ধত্যের কারণেই শুধু বলছি। আমি কয়েক দিনই সালাহউদ্দিনকে হুজুরের সাথে বেআদবী করতে দেখেছি। যে কোন বিপদ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা এবং আপনাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।'

উম্মে আমারা কিছুক্ষণ খেলা করলো খলিফার আঙ্গুল নিয়ে। এরপর খলিফার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'শরীর ঠিক হয়েছে!'

খলিফা মেয়েটার চিবুক নেড়ে বললেন, 'ওষুধের চাইতে তোমার আদরের প্রভাব অনেক বেশী। খোদা তোমাকে যে রূপ ও আবেগ দিয়েছেন আমার রোগ মুক্তির জন্য তাই যথেষ্ট।' তিনি রজবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রজব! পরকালে আমাকে যখন বেহেশতে দেয়া হবে, আমি খোদার কাছে হুরের পরিবর্তে উম্মে আমারাকে চাইবো।'

'উম্মে আমারা শুধু সুন্দরী নয়, বুদ্ধিমতী এবং মেধাবী। হুজুরের প্রাসাদ তো ষড়যন্ত্রের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। ও এসে সব ঠিক করেছে। এখন কেউ কারো বিরুদ্ধে টু শব্দটি করতে পারে না।'

রজব সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে খলিফার কান ভারী করতে লাগলো। উম্মে আমারা বললো, 'ওর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং সালাহউদ্দিনের একটা বিহিত করুন।'

'তুমি কি বলছিলে রজব?'

'গভর্ণরের বিরুদ্ধে কিছু বললে আপনি রাগ করবেন ভেবে মুখ খুলিনি। সালাহউদ্দিন একজন যোগ্য সেনাপতি।'

'তার এ গুণটা আমার খুব পছন্দ। যুদ্ধের মাঠে সে ইসলামের পতাকা অবনমিত হতে দেয় না। যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম বিশ্বের মর্যাদা রক্ষা করার মতো এমন একজন সেনাপতিই আমাদের প্রয়োজন।'

'আমি ক্ষমা চাচ্ছি খলিফাতুল মুসলেমিন! খেলাফত আমাদের যুদ্ধের ময়দানে পরীক্ষা করেনি। সালাহউদ্দিনের ব্যাপারে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সে মুসলিম বিশ্বের জন্য লড়াই করছে না, করছে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য।

যে কোন সৈনিককে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সে এমন রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করে যার কোন সীমা থাকবে না। এতে বুঝা যায়, সে নিজেই বাদশাহ হতে চাচ্ছে। তাকে সহযোগিতা করছে নূরুদ্দিন জঙ্গী। আইয়ুবীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য সে দু'হাজার অশ্বারোহী এবং দু'হাজার পদাতিক সৈন্য পাঠিয়েছে। সৈন্য পাঠাতে জঙ্গী কি বাগদাদের খলিফার অনুমতি নিয়েছিল? মিশরে ফৌজি সাহায্য প্রয়োজন আছে কি না, আপনাকে কেউ কি একথা জিজ্ঞেস করেছিল? যা হয়েছে সব খেলাফতের অজান্তে।'

'তুমি ঠিকই বলেছো। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি। এখন মনে পড়ছে, ফৌজ তো ফিরেও যায়নি!'

'পুরনো সৈন্যদের কৃষক এবং ভিখিরী বানানোর জন্যই এ সাহায্য এসেছিল। নাজি, এডরোস, কাকিশ, আবদ, ইয়াজদাম, আবি আজরের মতো সেনানায়করা এখন কোথায় হুজুর কখনো ভাবেননি। আইয়ুবী এদের গোপনে হত্যা করেছে। ওদের অপরাধ, ওরা আইয়ুবীর চাইতে যোগ্য। এ হত্যার জন্য দায়ী কে? সালাহউদ্দিন প্রশাসনের লোকদের বলেছে, মিশরের খলিফা এদেরকে গাদ্দারী এবং বিদ্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।'

'মিথ্যে কথা।' খলিফা খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ডাহা মিথ্যে কথা। সালাহউদ্দিন আমাকে বলেছিল এরা দেশদ্রোহী। আমি বলেছি, সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে মামলা করো।'

'অথচ কি আশ্চর্য, মামলা না করে তিনি নিজেই বিচারকার্য শেষ করলেন, খলিফার অনুমোদন পর্যন্ত নিলেন না। খলিফার অনুমোদন ছাড়া কোন রায় যে কার্যকরী করা যায় না এ কথা কি তার জানা ছিল না?

সে সব হতভাগ্য সেনাপতিদের অপরাধ, তারা খৃস্টান সম্রাটদের সাথে সুসম্পর্ক গড়েছিল। তারা চেয়েছিল যুদ্ধ বন্ধ করতে। যুদ্ধ কোন জাতির জন্য কল্যাণকর নয়। এ কথা তো ঠিক, খৃষ্টানরা আমাদেরকে শত্রু মনে করতো না। নূরুদ্দিন জঙ্গী এবং শেরে কুহীর আক্রমণের ভয়েই ওরা আমাদের শত্রু ভাবা শুরু করে। শেরে কুহী মরে গিয়ে আইয়ুবীকে তার স্থানে রেখে গেছে। এ লোকটার জীবন কাটবে খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করে। এতে আমাদের শত্রু সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে। সালাহউদ্দিনের স্থানে অন্য কেউ গভর্ণর

হলে খৃস্টান সম্রাটরা আপনার কাছে আসতো বন্ধু হয়ে। এত রক্তপাত হতো না। এভাবে হারিয়ে যেতো না আমাদের অভিজ্ঞ সেনাপতিরা।'

'তাহলে রোম উপসাগরে খৃস্টানরা আক্রমণ করলো কেন?'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ওদেরকে উস্কানী দিয়ে টেনে এনেছিল রোম উপসাগরে। আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে ওরা যুদ্ধ করেছে। ওরা আইয়ুবীর চাল ধরতে না পেরে ছুটে এসেছিল ওর পাতা ফাঁদে ধরা দেয়ার জন্য। চালটা যদি ওদের হতো তবে ওরা এভাবে মরতো না। আপনিই বলুন, খৃস্টানরা আক্রমণ করছে এ খবর জানলো কিভাবে আইয়ুবী? আসলে সে-ই খৃস্টানদের ধ্বংসে করার জন্য এ যুদ্ধ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। প্রয়োজনীয় প্রতিরোধের ব্যবস্থাও করে রেখেছিল আগে থেকেই। তাই তার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে মরতে হলো এতগুলো মানুষকে। মাননীয় খলিফাতুল মুসলেমীন! আপনি কি ভেবে দেখেছেন, তার কারণে কত হাজার হাজার শিশু পিতৃহীন হয়েছে? বিধবা হয়েছে কত অসংখ্য নারী? অথচ এই খুনীকেই আপনি ধন্যবাদ দিলেন। আমরা আপনার সামান্য গোলাম মাত্র। তাই এর প্রতিবাদ সেদিন আমি করতে পারিনি।

আপনি জানতেন, সুদানী ফৌজ ছিল আপনার অনুগত। রাতের অন্ধকারে সে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিল, এ জন্যও আপনি তাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। আসলে আপনি খুব সহজ সরল। কারো ধোঁকা আর প্রতারণা বুঝতে পারেন না। কিন্তু আমি ভাবছি, এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?'

রজবের প্রতিটি কথা খলিফার মনের গভীরে গিয়ে দাগ কাটতে লাগলো। তিনি উম্মে আমারার দিকে তাকিয়ে শুনছিলেন রজবের কথা। রজব সামান্য বিরতি নিল, এরপর আবার যখন মুখ খুললো তাতে ছিল কূটচক্রান্তের বিষ। রজব সাবধানে আইয়ুবীর উপর একটা মিথ্যে আঘাত করলো। বললো, 'সালাহউদ্দিন এখন মেয়েদের নিয়ে শয়তানী শুরু করেছে। সুন্দরী মেয়েদের এনে ক'দিন আমোদ ফূর্তি করে। এরপর গুপ্তচরীর অভিযোগ এনে মেরে ফেলে। মারার সময় প্রচার করে, খৃস্টানরা মিশরে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য এবং যুবকদের চরিত্র নষ্ট করার জন্য এসব মেয়েদের পাঠিয়েছিল।'

'আমি এ শহরের মানুষ।' উম্মে আমারা বললো, 'এখানকার নিষিদ্ধ পল্লীতে রয়েছে মিশর এবং সুদানী মেয়ে। খৃস্টান দু'একটা মেয়ে থাকলেও ওরা গুপ্তচর নয়। ওরা পেশাজীবী। অথচ আমাকে হারেমেরই তিন চারটে মেয়ে বলেছে, আইয়ুবী ওদের নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে নষ্ট করেছে।'

খলিফার চোখ দুটো রাগে রক্তজবার মতো লাল হয়ে উঠলো। সগর্জনে তিনি বললেন, 'আমার হারেমের মেয়ে! এ কথা আমাকে আগে বলোনি কেন?'

'আপনি অসুস্থ। এ খবর শুনলে আপনার শরীর আরো খারাপ হবে। এখন কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। আমি এমন ব্যবস্থা করেছি, কেউ ডাকলেও কোন মেয়ে আর বাইরে যাবে না।'

'আমি তাকে দোররা মারবো, এর প্রতিশোধ নেবো আমি।'

'প্রতিশোধ নেয়ার অনেক পথ আছে।' বললো রজব, 'সাধারণ মানুষ এখন আইয়ুবীর পক্ষে। কিছু করতে গেলে তারা আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে।'

'তাহলে এ অপমান কি আমি মুখ বুঁজে সহ্য করবো?'

'আপনার অনুমতি এবং সহযোগিতা পেলে সে যেভাবে সেনাপতিদের গুম করেছে সেভাবে আইয়ুবীকেও গুম করে দেয়া যাবে।'

খলিফা অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু কিভাবে করবে?'

'ঘাতক দলের মাধ্যমে। কেউ জানতেও পারবে না, কে তাকে গুম করেছে। তবে ওদের চাহিদা অনেক বেশী।'

'যত টাকা লাগে আমি দেবো। তুমি ব্যবস্থা করো।' খলিফা হুকুমের স্বরে বললেন।

দু'দিন পর জুমা। খোৎবায় খলিফার নাম না নেয়ার জন্য মুফতি ঈশা আল হুকারি খতিবকে অনুরোধ করেছিলেন। খতিব ছিলেন তুর্কী। ইতিহাসে তার পুরো নাম পাওয়া যায় না, তবে তিনি আমিরুল আলম হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

সে যুগের পুরনো দলিল দস্তাবেজ থেকে জানা যায়, তিনি কয়েকবারই এ বিদআত বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কারো মতে সুলতান আইয়ুবীই তাকে এ পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশেষে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর হুকুমে তা বাস্তবায়ন করেন খতিব এবং মুফতি ঈশা আল হুকারী।

জুম্মার দিন। মসজিদের মাঝামাঝি কাতারে বসেছেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। আলী বিন সুফিয়ান বসেছেন আরো দু'সারি পেছনে। আইয়ুবীর উপদেষ্টা এবং কর্মকর্তারাও বসে আছেন বিভিন্ন স্থানে।

আলী সমগ্র মসজিদে গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন। খতিব মিম্বরে উঠলেন। খোৎবা পাঠ করলেন, কিন্তু খোৎবায় খলিফার নাম নিলেন না। তার এ পদক্ষেপ খেলাফতের আইনের বিরুদ্ধে মারাত্মক অপরাধ। নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেবল খলিফাই মসজিদে অনুপস্থিত ছিলেন।

নামাজ শেষ হলো। উঠে দাঁড়ালেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। খতিবের সাথে হাত মেলালেন। তার জুব্বায় চুমো খেয়ে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন।'

খতিব বললেন, 'এ নির্দেশ দিয়ে আপনি বেহেশতে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে নিলেন।'

চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে গিয়েও কি ভেবে আবার দাঁড়ালেন আইয়ুবী। খতিবকে বললেন, 'খলিফা আপনাকে ডাকলে সোজা আমার কাছে চলে আসবেন। আমিও আপনার সাথে যাবো।'

'অপরাধ না নিলে বলবো, বাতিল এবং শিরকের বিরুদ্ধে কাজ করা এবং হক কথা বলা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে আমি একাই শাস্তি ভোগ করবো। এ জন্য আপনার সাহায্য নেবো না। খলিফা ডাকলে আমি একাই যাবো। আপনার নির্দেশে নয় বরং খোদার নির্দেশেই খোৎবা থেকে খলিফার নাম বাদ দিয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ সুলতান।'

সন্ধ্যার পর শহরের রিপোর্ট দিচ্ছিলেন আলী। সুলতানের সাথে রয়েছেন বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ এবং আরো ক'জন উপদেষ্টা। আলী বললেন, 'এ ব্যাপারে কোথাও কোন কথা হয়নি। আমাদের গোয়েন্দারা নিজেরাই কয়েক জায়গায় বলেছে, 'আজ খোৎবায় খলিফার

নাম নেয়া হয়নি। কাজটা ভাল করেনি খতিব।'

লোকজন আশ্চর্য হয়ে গেছে। খোৎবায় খলিফার নাম নেয়া হয়েছে কি না এ কথাই তারা জানে না। কেউ কেউ বলেছে, 'খলিফা তো খোদা বা নবী না, খোৎবায় তার নাম বলা হয়নি, তাতে এমন কি হয়েছে?'

নিশ্চিন্ত হলেন সুলতান। জনগণের বিরোধিতার যে ভয় ছিল তা হচ্ছে না।

সে দিনই তিনি নুরুদ্দিন জঙ্গীর কাছে চিঠি লিখলেন। লিখলেন, 'খোৎবা থেকে খলিফার নাম তুলে দিয়েছি। এতে জনগণের মাঝে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। আপনিও খলিফার নাম খোৎবা থেকে তুলে দিন।'

প্রাসাদে গোয়েন্দাদের আরো সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেন আইয়ুবী। আলীকে বললেন, 'সন্দেহজনক কিছু দেখলে সাথে সাথে যেন আমাকে অবহিত করা হয়।'

তিনি জানতেন, রজবকে খলিফা তার নিজস্ব গার্ড রেজিমেন্টের কমাণ্ডার করেছেন। এ জন্য আলীকে বললেন, 'তার সাথে একজন লোক দাও, যে তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে।'

খলিফার রাতের মাহফিল জমজমাট। রজব নেই, সে চলে গেছে গুপ্তঘাতক দলের কাছে। যত শীঘ্র সম্ভব সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত সে। খলিফা বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে বেখবর, উম্মে আমারার মাদকতাময় রূপের সাগরে ডুবে আছেন তিনি।

খোৎবা থেকে তার নাম তুলে দেয়া হয়েছে, একথা কেউ তাকে বলেনি। আইয়ুবীকে হত্যার ব্যবস্থা হচ্ছে এ জন্য তিনি ভীষণ খুশী। বুড়োর হাত থেকে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মেয়েটা তাকে মদের সাথে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিল। ঘুমিয়ে পড়লেন খলিফা।

আলো নিভিয়ে ও কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। এগিয়ে গেলো নিজের বিশ্রামের জন্য আলাদা করে রাখা এক বিশেষ কক্ষের দিকে, যেখানে মাঝে মধ্যে রজব গোপনে এসে দেখা করে।

কামরায় ঢুকতে যাবে, পেছন থেকে কেউ তার ওপর কম্বল ছুঁড়ে মারলো। কোন শব্দ করার আগেই আরেকজন তাকে কম্বলসহ জাপটে ধরলো। চিৎকার করতে যাবে সে, কিন্তু ততোক্ষণে কম্বলসহ আরেকটা কাপড় দিয়ে মেয়েটাকে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়েছে কেউ।

উম্মে আমারা তৃতীয় কোন লোকের অস্তিত্ব টের পেলো না। বুঝলো, ওরা মাত্র দু'জন। তাকে নিয়ে চলতে শুরু করেছে ওরা।

ওরা এদিক ঘুরে, ওদিক ঘুরে যেভাবে দ্রুত ওকে নিয়ে এগুচ্ছে, তাতে তার মনে হলো, প্রাসাদের পথঘাট, অলিগলি সব অপহরণকারীদের চেনা।

অন্ধকারেই সিঁড়ি ভাঙতে লাগলো অপহরণকারীরা। উঠে এলো ছাদে। ছাদ থেকে নিচের দিকে রশি ঝুলে আছে। মেয়েটাকেসহ একজন রশি বেয়ে নেমে এলো নিচে। পেছনে নামল দ্বিতীয় জন। তারপর দু'জনই অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

একটু দূরে চারটে ঘোড়া বাঁধা ছিল। দ্রুত ওখানে চলে এলো অপহরণকারীরা।

ঘোড়ার পাশে বসেছিল দু'জন লোক। সঙ্গীদের আসতে দেখে ওরা ঘোড়াসহ এগিয়ে এলো। ঘোড়ায় চড়লো চারজন। একজন বললো, 'সাবধানে চলতে হবে, নইলে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে শহরের লোকজন জেগে যাবে।' ধীরে ধীরে শহর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা।

'নিশ্চয়ই এটা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাজ।'

'গভর্ণর ছাড়া আর কেউ এমন সাহস করবে না।'

'এ কাজ সে ছাড়া আর কে করতে পারে!'

রাজপ্রাসাদে কানাঘুষা চলছে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী উম্মে আমারাকে অপহরণ করেছেন।

রজব ফিরে এসেছে। তল্লাশী নেয়া হয়েছে প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষে। রক্ষীদের ওপর মনের ঝাল মেটাচ্ছে কমান্ডার। যেন-তেন অপরাধ নয়, খলিফার হারেমের হীরকখণ্ড অপহৃত।

দেখা গেলো প্রাসাদের পেছনে ছাদ থেকে একটা রশি ঝুলছে। পায়ের চিহ্ন খানিক দূর গিয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের চিহ্নের সাথে মিশে গেছে। সন্দেহ নেই, মেয়েটাকে দড়ি বেয়ে নামানো হয়েছে। মেয়েটা স্বেচ্ছায় কারো সাথে পালিয়ে গেছে এমন সন্দেহও প্রকাশ করলো কেউ কেউ। খলিফা এ কথা বাতিল করে দিলেন। 'মেয়েটা আমাকে জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসে।'

'এটা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাজ।' রজব খলিফাকে বললো, 'প্রাসাদের সবাই বলছে, সে ছাড়া এমন দুঃসাহস কারো নেই।'

প্রাসাদে এ কথা ছড়িয়েছে রজবই। মহল তল্লাশী নেয়ার সময় প্রতিটি লোককেই বলেছে, 'এটা সুলতান আইয়ুবীরই কাজ।'

তার এ রটনা কাজ দিয়েছে। মহলের প্রতিটি লোকের মুখে এখন এক কথা, 'এ কাজ সুলতান আইয়ুবীই করেছে।'

খলিফা একবারও ভাবলেন না, এ অপবাদ মিথ্যেও হতে পারে। আগেই তাকে বলা হয়েছিল, সুলতান হারেমের মেয়েদের নষ্ট করেছেন। ফলে এ অভিযোগ তার কাছে আরো সত্য বলে মনে হলো।

তিনি তার বিশেষ দূতকে ডেকে বললেন, 'আইয়ুবীকে গিয়ে বলো, মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিতে। আমি তাকে কোন শাস্তি দেবো না।'

দূত সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে পৌছলো। দূত যখন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে খলিফার নির্দেশ শোনাচ্ছিল, কায়রোর দশ বার মাইল দূরে ঘটছিল অন্য ঘটনা।

তিনটি উট ধীরে ধীরে কায়রোর দিকে এগিয়ে আসছে। আরোহী তিনজন মিশরীয় সৈন্য। পেট্রোল ডিউটি থেকে ফিরছে ওরা।

রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুশমনের গুপ্তচরবৃত্তি, দেশদ্রোহীদের তৎপরতা এবং সুদানীদের হামলার আশংকায় সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সৈন্যদের অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

রাতের বেলা বিস্তীর্ণ মরু এবং পার্বত্য এলাকায় টহল দিয়ে বেড়াতো ওরা। ওদের বাহন ছিল উট এবং ঘোড়া। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুবীর কাছে সংবাদ পৌঁছে দিত।

ডিউটি শেষে কায়রো ফিরে আসছিল তিন উষ্ট্রারোহী। সামনে মাটি এবং পাহাড়ের বিস্তীর্ণ পাথুরে এলাকা।

উপত্যকা দিয়ে চলছে ওরা, একটা মেয়ের কান্নার শব্দ ভেসে এলো। সাথে পুরুষালী কণ্ঠ। মনে হয় কাউকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

উট থেকে নেমে এলো একজন সৈনিক। পায়ে পায়ে পাহাড়ে উঠে গেলো। শব্দ আসছে ওপাশ থেকে। লুকিয়ে পড়লো সৈন্যটা। ওপাশে চারটে ঘোড়া বাঁধা। কাছেই চারজন সুদানী কাফ্রী। একটা সুন্দরী মেয়ে দৌড়াচ্ছে। তার পেছনে ছুটছে এক কাফ্রী। কিছু দূর গিয়েই মেয়েটার নাগাল পেয়ে গেলো সে। মেয়েটার বাহু ধরে সঙ্গীদের কাছে নিয়ে এলো।

একজন কাফ্রী তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললো, 'তুমি পবিত্র মেয়ে। নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলে আমাদের পাপী করো না। দেবতার অভিশাপে আমরা পুড়ে যাবো। দেবতা আমাদের পাথরে পরিণত করবেন।'

'আমি মুসলমান!' চিৎকার করে বললো মেয়েটা, 'আল্লাহর গজব পড়ুক তোমাদের দেবতার ওপর। আমাকে ছেড়ে দাও, নইলে খলিফার কুকুর দিয়ে তোমাদেরকে টুকরো টুকরো করে খাওয়াবো।'

'তুমি এখন খলিফার মালিকানায় নেই, দেবতাদের মালিকানায় রয়েছো। দেবতাদের রয়েছে বজ্রের শক্তি, নাগ-নাগিনীর বিষ আর সিংহের দাঁত। তোমাকে কেউ লুকানোর চেষ্টা করলে মরুভূমির উত্তপ্ত বালু তাকে ছাই-ভস্ম করে দেবে।'

এক কাফ্রী বললো, 'তোমাদেরকে থামতে নিষেধ করেছিলাম। বলেছিলাম, বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। ওর হাত-পা বাঁধা থাক। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা পৌঁছে যেতে পারবো।'

'আমাদের ঘোড়াগুলোর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। তুমি নিজেও জানো, দ্রুত যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কারোরই আপত্তি নেই।'

'এখন কথা না বলে আবার ওকে বেঁধে ফেলো।'

একজন মেয়েটাকে ধরলো। একটা তীর এসে বিঁধল তার পিঠে। ঢিলে হয়ে গেলো মেয়েটাকে ধরা হাত। তাকে ধাক্কা দিয়ে আবার দৌড় দিল মেয়েটা।

একজন এসে আহত লোকটাকে ধরে ঘোড়ার আড়ালে নিয়ে গেলো। আরেকটা তীর এসে বিঁধল অন্য কাফ্রীর ঘাড়ে।

একজন দৌড়ে গিয়ে মেয়েটাকে ধরে আনলো আবার। দ্বিতীয় লোকটা তীরবিদ্ধ হতেই যে লোকটা মেয়েটাকে ধরে রেখেছিল সে উটের লাগাম তুলে নিয়ে দ্রুত নিচের দিকে নেমে গেলো। সাথে তার সঙ্গীও ছুটলো।

তীর দুটো ছুঁড়েছিল যে সেন্ট্রি সে পরে বলেছে, 'দেবতাদের নাম শুনে প্রথমটায় আমি ভড়কে গিয়েছিলাম। মেয়েটা যখন বললো 'আমি মুসলমান, গজব পড়ুক

দেবতাদের ওপর' তখন জেগে উঠলো আমার ঈমানী শক্তি। খলিফার নাম শুনে বুঝলাম ও হারেমের মেয়ে। পোশাক-আশাকেও তাকে বড় ঘরেরই মনে হলো। মেয়েটাকে অপহরণ করে সুদানীদের মেলার বিক্রি করা হতে পারে ভেবে আর স্থির থাকতে পারিনি; সাথে সাথে তীর ছুঁড়লাম।'

সেনাবাহিনীর প্রতি সুলতানের নির্দেশ ছিল, এক ডজন মানুষ হত্যা করতে হলেও একটা মেয়ের ইজ্জত রক্ষা করতে হবে। এ জন্যই সৈন্যটি দু'জনকে হত্যা করেছে। বাকী দু'জনকে জীবিত ধরার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েই ভুল করেছিল সে।

সে পাহাড় থেকে নিচে নেমে সঙ্গীদের কাছে পৌঁছলো। ওদেরকে জানালো ঘটনা। বললো, 'চলো, ওদের পাকড়াও করতে হবে।'

ওরা উটে সওয়ার হলো। অনেকটা পথ ঘুরে ঘটনাস্থলে এসে দেখলো, দুটো লাশ পড়ে আছে। মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেছে বাকী দু'জন।

উট নিয়ে ঘোড়ার পিছু নেয়া সম্ভব নয়। তিন জনের একজনের কাছে তীর, দু'জনের কাছে তরবারী এবং বর্শা। কাফ্রীরা ওদের চারটে ঘোড়াই নিয়ে গেছে।

সেন্ট্রিরা পার্বত্য এলাকায় ধাওয়া করলো ওদের। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কানে এলেও উট নিয়ে ওরা ওদের নাগাল পেলো না।

মেয়েটার মুখে খলিফার নাম শুনেছে বলে লাশ দুটোকে তুলে নিল ওরা। অপহরণকারীদের সনাক্ত করার জন্য ওরা লাশগুলো সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে নিয়ে গেলো।

কক্ষে পায়চারী করছিলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। চোখে মুখে ক্রোধ আর উৎকণ্ঠা। কয়েকজন উপদেষ্টা মাথা নুইয়ে বসে আছেন। এর আগে সুলতানকে তারা কখনো এমন রাগান্বিত হতে দেখেননি। আবেগ তাকে কাবু করতে পারেনি কোন দিন। রাগান্বিত হবার মতো ঘটনা ঘটলেও সব সময় ধীরে সুস্থে সিদ্ধান্ত নিতেন তিনি।

শত্রুবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধ করেছেন, অবরুদ্ধ হয়েছেন, কেল্লায় খাবার নেই, সাহস হারিয়ে ফেলেছে সৈন্যরা। সবাই অপেক্ষা করছে কমাণ্ডার আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেবেন, এ পরিস্থিতিতেও সুলতান সাহস হারাননি। ফৌজকে সাহসে উদ্দীপ্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শত্রুর ওপর। ছিনিয়ে এনেছেন বিজয়। কিন্তু আজ সুলতান নিজেকে সংবরণ করতে পারছেন না। তার চেহারায় লেপ্টে আছে ক্রোধের সাথে ভয়। এ এক ভিন্নতর চেহারা। কক্ষের সব কটি লোক চুপ করে তাকিয়ে আছে আইয়ুবীর দিকে।

'এই প্রথম আমার মাথা কাজ করছে না।' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন আইয়ুবী।

'সুলতান, আপনি কি খলিফার এ নির্দেশটাকে ভুলে যেতে পারেন না?' স্থল বাহিনী প্রধান আল নাসের বললেন।

'চেষ্টা করছি, কিন্তু অপবাদের ধরনটা দেখেছেন? আমি হারেমের একটা মেয়েকে চুরি করেছি! আস্তাগফিরুল্লা। আল্লাহ আমায় ক্ষমা করুন। সে আমাকে চরমভাবে অপমানই করেনি, দূত পাঠিয়ে ধমক দিয়েছে। আমাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করতে

পারতো।'

'এরপরও আমার পরামর্শ হলো, আপনি শান্ত হোন।' বললেন বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ।

'ভাবছি, সত্যিই কি হারেমের কোন মেয়ে অপহৃত হয়েছে? আমার মনে হয় না। খোৎবা থেকে খলিফার নাম বাদ দিয়েছি, হয়তো কোন ভাবে তা জেনে মেয়ে চুরির অপবাদ দিয়ে তার বদলা নিতে চাচ্ছেন খলিফা। এভাবেই প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করছেন।' একটু থামলেন। তারপর মুফতি ঈশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুফতি ঈশা, মিশরের প্রতিটি মসজিদে নির্দেশনামা পাঠিয়ে দিন, আগামী জুম্মা থেকে খোৎবায় কোন মসজিদেই খলিফার নাম নেয়া হবে না।'

'আপনি নিজে গিয়ে খলিফার সাথে কথা বলুন।' আল নাসের বললেন, 'তাঁকে স্পষ্ট বলে দিন, খলিফা জাতির ইজ্জতের প্রতিভূ হলেও দেশে তার হুকুম কার্যকর করা এখন সম্ভব নয়। বিশেষ করে যখন দেশের ভেতরে বাইরের শত্রুর আক্রমণের ভয় রয়েছে, আর খলিফা রয়েছেন মদে মাতাল। খলিফার গার্ড বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কমিয়ে দিন। সুদানীদের পরিবর্তে নিয়োগ করুন মিশরীয় সৈন্যদের। প্রাসাদের রাজকীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজকোষের যথেচ্ছ ব্যবহারের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করুন। জানি, আমাদেরকে তার মোকাবিলা করতেই হবে। অতএব এ ব্যাপারে এখনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর ভরসা করে সত্যের সপক্ষে এখনি আমাদের দাঁড়ানো উচিত।'

'আমি সব সময় আল্লাহর ওপর নির্ভর করেই যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। নিশ্চয়ই তিনি এ অপবাদ ও অপমান থেকে আমাকে নিষ্কৃতির কোন উপায় বের করে দেবেন।'

মহলের প্রহরী ভেতরে ঢুকলো। সবাই তাকালো তার দিকে। প্রহরী বললো, 'একজন কমাণ্ডার এসেছেন। সাথে পেট্রোল ডিউটি থেকে আসা তিনজন সিপাই এবং সুদানীদের দুটো লাশ।'

এ সময় প্রহরীর আগমনে কক্ষের সবাই বিরক্ত হলো। কারণ সুলতান এখন এক জরুরী মিটিং করছেন তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত উপদেষ্টাদের নিয়ে। কিন্তু প্রহরীর কথা শুনে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বললেন, 'ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

কমাণ্ডার ভেতরে এলো। ধুলোয় মলিন তার চেহারা। সুলতান তাকে বসতে বলে প্রহরীকে বললেন, 'ওর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করো।' তারপর তার দিকে ফিরে বললেন, 'বলো, কি খবর নিয়ে এসেছো?'

কমাণ্ডার বললো, 'টহলরত সৈন্যরা চারজন কাফ্রীর হাত থেকে একটা অপহৃত মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে তীর মেরে দু'জনকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। বাকী দুই কাফ্রী মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ওরা বলছে, মেয়েটা বেদুঈন নয়, মনে হয় কোন বড় ঘরের মেয়ে। ও নাকি বলছিল, ও খলিফার প্রাসাদে থাকে।'

'হয়তো।' সুলতান বললেন, 'হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন। কোথায় তোমার প্রহরীরা?'

কথা বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'চলো, ওদের কাছে।'

সুলতান বেরিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলো সবাই।

বাইরে মাটিতে দুটো লাশ পড়ে আছে। একটা পড়ে আছে উপুড় হয়ে, তীর বিঁধেছে তার পিঠে। দ্বিতীয় লাশের তীর ঘাড়ে, পড়ে আছে কাত হয়ে। লাশ দুটোর পাশে দাঁড়ানো তিনজন টহল সৈনিক। ওরা গভর্ণর এবং সেনাপতিকে এই প্রথম দেখলো।

স্যালুট করে দু'পা পিছিয়ে গেলো ওরা। সুলতান ওদের সাথে করমর্দন করে বললেন, 'এ শিকার কোত্থেকে নিয়ে এলে?'

তীর নিক্ষেপকারী সৈন্যটি এগিয়ে সুলতানকে পুরো ঘটনা শোনালো।

'ওই মেয়েটাই কি খলিফার রক্ষিতা!' উপদেষ্টাদের দিকে তাকিয়ে সুলতান প্রশ্ন করলেন।

'তাই মনে হয়।' দুটো খঞ্জর দেখিয়ে বললেন আলী।

সৈন্যটি যখন ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিল, আলী তখন লাশের তল্লাশী নিচ্ছিলেন। ওদের পরণে গোত্রীয় পোশাক। ভেতরে বেল্টের সাথে খঞ্জর আটকানো। খলিফার গার্ড বাহিনীর বিশেষ খঞ্জর। বাটে খেলাফতের মোহর অঙ্কিত।

'খঞ্জর দুটো চুরি না করে থাকলে এরা গার্ড বাহিনীর সদস্য। এরাই খলিফার রক্ষিতা মেয়েটাকে অপহরণ করেছে।'

'লাশ তুলে নাও, খলিফার কাছে যাবো।'

'আগে নিশ্চিত হতে হবে এরা গার্ড বাহিনীর সদস্য কি না।' বললেন আলী।

কিছুক্ষণ পর প্রাসাদ রক্ষীদের এক কমাণ্ডারকে হাজির করলো আলী। লাশ দুটো দেখানো হলো তাকে। কমাণ্ডার বললো, 'এরা গার্ড বাহিনীর সদস্য। তিনদিন আগে ওরা এক হপ্তার জন্য ছুটি নিয়েছে।'

'আর কেউ ছুটিতে আছে?' প্রশ্ন করলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

'এদের সাথে আরো দু'জন ছিল।'

'এরা কি একত্রেই গেছে?'

'হ্যাঁ।'

কমাণ্ডার এরপর এমন তথ্য প্রকাশ করলো, যা শুনে সবাই চমকে উঠলেন। সে বললো, 'এরা সুদানের জঙ্গী উপজাতির লোক। ফেরাউনের সময় থেকে ওদের মধ্যে কিছু রসম চলে আসছে। প্রতি তিন বছর পর ওদের একটা উৎসব হয়। উৎসবের সময় জমজমাট মেলা বসে। চলে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত। চতুর্থ রাতে থাকে ভরা পূর্ণিমা।

এ গোত্রের লোক ছাড়া অন্যরাও মেলায় অংশ গ্রহণ করে। ওরা যায় স্ফূর্তি করার জন্য। ওখানে মেয়েদের বেচাকেনা হয়।

মেলা বসার এক মাস আগে থেকেই কায়রো পর্যন্ত আশপাশের যুবতী মেয়েদের পিতামাতারা আতঙ্কে সময় কাটায়। যতটা সম্ভব সতর্ক থাকে ওরা। মেয়েদের একা বের হতে দেয় না। বেদুঈনরা মেয়ে চুরি করার জন্য অনেক দূর দূরান্ত পর্যন্ত চলে যায়। যুবতীদের ধরে এনে মেলায় বিক্রি করে। এ চারজন সুদানীও মেলায় অংশ গ্রহণের জন্য ছুটি নিয়েছে। তিন দিন পর মেলা শুরু হওয়ার কথা।'

'হারেমের মেয়েটাকে এরাই চুরি করেছে?' আলী প্রশ্ন করলেন।

'নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এ সময় জীবনবাজি রেখেও ওরা মেয়ে চুরি করে। কোন অভিভাবক মেয়েকে আনতে গেলে তাকেও হত্যা করে। মিশরের আমীর-ওমরা, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ও সরকারী কর্মকর্তারাই এসব মেয়েদের গ্রাহক। মেলায় অস্থায়ী রঙমহলেরও ব্যবস্থা থাকে। মদ আর জুয়া চলে রাতভর। শেষ রাতটি হয় রহস্যে ঘেরা।

গোপন স্থানে অনন্যা সুন্দরী এক যুবতীকে বলী দেয়া হয়। মেয়েটাকে কোত্থেকে আনা হয় বা কিভাবে বলী দেয়া হয় কেউ জানে না। এ কাজ সম্পন্ন করে ধর্মীয় গুরু। জংলীরা তাকে ঈশ্বরের মতো সম্মান করে।

বলী অনুষ্ঠানে ধর্মীয় গুরু ছাড়াও চার পাঁচ জন যুবতী এবং ক'জন বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকে। দর্শকদের দেখানো হয় মেয়েটার কাটা মাথা এবং রক্ত। জংলীরা তখন মদপান করে পাগলের মতো নাচতে থাকে।'

খলিফার গার্ড বাহিনীকে এ্যাটেনশন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সকাল থেকে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এখন সূর্য ডুবোডুবো। খাদ্য পানি কিছুই দেয়া হয়নি ওদের সারাদিন।

রজব বার বার ওদের সামনে এসে ঘোষণা করছিল, 'তোমাদের সহযোগিতা ছাড়া প্রাসাদ থেকে কোন মেয়ে অপহরণ করা সম্ভব নয়। যে অপহরণকারীকে সাহায্য করেছো সে সামনে আসো। না হয় সবাইকে না খাইয়ে মারা হবে। যদি মেয়েটি স্বেচ্ছায় গিয়ে থাকে তবুও তোমরা কেউ না কেউ তা দেখেছো।'

কিন্তু এতে কোন কাজ হচ্ছে না। সবাই বলছে, তারা কিছুই জানে না। খলিফা রজবকে একদম বিশ্রাম দিচ্ছেন না, 'রজব! মেয়েটাকে অপহরণ করা হয়েছে এতে আমার দুঃখ নেই। ভাবছি এমন কঠোর প্রহরা থেকে যে মেয়েকে নিয়ে যেতে পারে সে আমাকেও হত্যা করতে পারে। সালাহউদ্দিন এ কাজ করেছে এর প্রমাণ হাজির করো।'

সুলতান আইয়ুবীর ওপর মেয়ে চুরির অপবাদ দেয়া সহজ, কিন্তু রজব তার প্রমাণ দেবে কিভাবে? সে মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেলো।

রাগের চোটে সে একবার যাচ্ছে রক্ষীদের কাছে, আবার খলিফার ডাকে ছুটে যাচ্ছে তার পাশে। রক্ষীদের ধমকাচ্ছে রজব। প্রহরী ফটক খুলে ঘোষণা করলো, 'মিশরের গভর্ণর আসছেন।'

ভেতরে প্রবেশ করলো আইয়ুবীর ঘোড়া। সামনে দু'জন দেহরক্ষী। পেছনে আটজন ঘোড়সওয়ার। একজন ডানে, একজন বাঁয়ে, উপদেষ্টারা পেছনে। ওদের সাথে আলীও রয়েছেন।

রজব সুলতানের আগমনের সংবাদ দিল খলিফাকে। একে একে সবাই ভেতরে ঢুকলো। পেছনে একটি টাঙ্গায় দুটো লাশ। একটা রয়েছে চিৎ হয়ে, অন্যটা উপুড় হয়ে। তীর বিঁধে আছে দুটো লাশের শরীরে।

খলিফা এগিয়ে এলেন। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নামলেন ঘোড়া থেকে। সাথে সাথে সঙ্গীরাও নেমে পড়লো। সুলতান এগিয়ে খলিফাকে সালাম করে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন।

'হারেমের চুরি যাওয়া মেয়েটাকে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ আমি পেয়েছি। আমি নিয়ে এসেছি আপনার দু'জন রক্ষীর লাশ। এরাই আমাকে নিরপরাধ প্রমাণ করবে। আপনাকে বিনয়ের সাথে বলতে চাই, আইয়ুবী আপনার সেনাবাহিনীর সৈন্য নয়। আপনি যে খেলাফতের প্রতিনিধি, আইয়ুবীকে সেখান থেকেই পাঠানো হয়েছে।'

আইয়ুবীর মনের অবস্থা বুঝে ফেললেন খলিফা। পাপের ভারে পিষ্ট হচ্ছিল তার বিবেক। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়ানোর শক্তি তার ছিল না।

সুলতানের কাঁধে হাত রেখে খলিফা বললেন, 'তোমাকে আমি নিজের সন্তানের চাইতেও বেশী স্নেহ করি সালাহউদ্দিন।'

'আমি এখন আসামী। আমাকে এখন নিজের সাফাই পেশ করতে হবে। আল্লাহ আমার সাহায্যে এ দুটো লাশ পাঠিয়েছেন। ওদের নীরবতা এবং ওদের দেহের বিদ্ধ তীর বলবে, আইয়ুবী অপরাধী নয়। নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ না করা পর্যন্ত আমি ভেতরে যাবো না।'

তিনি লাশের দিকে হাঁটা দিলেন। খলিফা কাঁচুমাচু হয়ে তার পেছনে চললেন। সুলতান গার্ডদের সামনে লাশ দুটি রেখে বললেন, 'প্রথমে কমাণ্ডার ও পরে আটজন করে এক সাথে এগিয়ে এসে বলো, কার এ লাশ।'

এগিয়ে এলো কমাণ্ডার। লাশ দেখে ওদের নাম বললো। স্বীকার করলো, 'এরা আমাদের গার্ড বাহিনীর সদস্য।' আটজন করে প্রহরী এগিয়ে এসেও লাশ দুটো গার্ড বাহিনীর বলে সনাক্ত করলো।

'সালাহউদ্দিন, বুঝলাম এ দুটো গার্ড বাহিনীর সদস্যের লাশ। তার আগে বলো এদের কে হত্যা করেছে?'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী পেট্রোল ডিউটির সৈন্য তিনজনকে ডাকলেন। ওরা খলিফাকে আবার সব ঘটনা খুলে বললো। ওদের বলা শেষ হলে সুলতান খলিফাকে বললেন, 'মেয়েটাকে আমার কাছে নেয়া হয়নি। নেয়া হয়েছে সুদানী কাফ্রীদের মেলায় বিক্রি করার জন্য।'

খলিফা সুলতানকে ভেতরে যেতে বললেন। তিনি ভেতরে যেতে অস্বীকার করে বললেন, 'আমি মেয়েটাকে এনে আপনার সামনে হাজির হবো। শুধু বলবো, উপহার হিসেবে পাওয়া এ মেয়েটা আপনার স্ত্রী নয়, রক্ষিতা। আমার কাছে এ মেয়ে মূল্যহীন। আল্লাহ আমাকে এরচে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন।'

'একটা মেয়ে চুরি হয়েছে বলে আমি শঙ্কিত নই। আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে, এভাবে মেয়েরা অপহৃত হতে থাকলে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির কি হবে?'

'আর আমার দুশ্চিন্তা হলো, মুসলিম বিশ্ব অপহৃত হচ্ছে, এর থেকে জাতিকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। আপনি ভাববেন না, আমার কমাণ্ডোরা মেয়েটাকে উদ্ধার করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে খলিফা বললেন, 'সালাহউদ্দিন, কিছুদিন থেকে দেখছি তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো। আমি তোমার পিতা নাজমুদ্দিনকে ভীষণ সম্মান করতাম। কিন্তু তুমি আমাকে মোটেও সম্মান করো না। আজই শোনলাম,

জামে মসজিদের খতিব আমিরুল আলেম নাকি খোৎবা থেকে আমার নাম বাদ দিয়েছে। তার এ অপরাধের শাস্তি আমি দিতে পারি। কিন্তু ভাবছি, সে তো তোমার আশকারা পেয়ে এমনটি করেনি?'

'আমার আশকারা পেয়ে নয়, আমার নির্দেশে খতিব এ কাজ করেছেন। শুধু আপনার নাম নয়, এখন থেকে আপনার পরে যত খলিফা আসবেন খোৎবায় কারো নামই থাকবে না।'

'এ পদক্ষেপ ফাতেমী খেলাফতকে দুর্বল করার জন্য নেয়া হয়েছে। মনে হয় এখানে আব্বাসী খেলাফত নিয়ে আসার পরিকল্পনা হচ্ছে।'

'আপনার অনেক বয়স হয়েছে। মাথাটাও ঠিকমত কাজ করে না। কোরআনে মদ হারাম করেছে কারণ মদ মানুষের মস্তিষ্ক দুর্বল করে দেয়। আমি ভাবছি, আপনার গার্ড বাহিনী পরিবর্তন করবো। রজবের স্থানে অন্য কমাণ্ডার দেবো।'

'কিন্তু রজবকে তো আমি রাখতে চাই।'

'সামরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করবো।'

আলীর দিকে তাকালেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। পাঁচজন কাফ্রী সেপাই নিয়ে এগিয়ে আসছেন তিনি।

'এ পাঁচজন সেই গোত্রের। কমাণ্ডার বলেছে, এরা আগামী পরশু ছুটিতে যাচ্ছে। আমি এদেরকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি। অপহরণে ওদের হাত থাকতে পারে।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রজবকে ডেকে বললেন, 'কাল থেকে এখানে অন্য কমাণ্ডার আসবে। তুমি যাবে আমার কাছে। তোমাকে মেনজানিক কামানের দায়িত্ব দেবো।' রজবের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

কাফ্রী দু'জন মেয়েটাকে নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেলো। এখন আর ধরা পড়ার ভয় নেই। থামলো ওরা। আরেকবার পালাতে চাইলো মেয়েটা। কাফ্রী বললো, 'পালানোর বৃথা চেষ্টা করছো। পালাতে পারলেও এ বিজন মরু থেকে একা কোথাও যেতে পারবে না তুমি। আমরা তোমার ইজ্জত নষ্ট করতে চাই না।'

অবশ্য এখন পর্যন্ত ওরা সে রকম কোন চেষ্টা করেনি। আশ্চর্য হলো উম্মে আমারা। তার মাদকতাময় দেহ ওদের আকর্ষণ করেনি। যে দু'জন মারা গেছে তাদের একজন তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নিজেকে কষ্টে না ফেলার জন্য আবদার করেছিল। ও জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'

ওরা বললো, 'তুমি হবে আকাশের দেবতার রাণী।'

ওরা আমারার চোখ বেঁধে ঘোড়ায় তুলে নিল। পালানোর চেষ্টা করা বৃথা। ও আর মুক্ত হবার চেষ্টা করলো না, ঘোড়ায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এক জায়গায় থেমে ওকে পানি পান করানো হলো। অনেকক্ষণ পর বাতাসের শীতল স্পর্শ অনুভব করলো ও। রাত হয়েছে, ভাবলো উম্মে আমারা। দীর্ঘ পথশ্রমে ও ক্লান্ত শ্রান্ত। ব্যথায় শরীর ভেঙে যাচ্ছে। ভয়ে আতংকে চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলছে।

ঘোড়া থামলো। ভেসে এলো চার পাঁচ জন নারী পুরুষের কণ্ঠ। পথে কাফ্রীরা ওর

সাথে আরবীতে কথা বলেছে। এখন ওদের ভাষা বোঝা যাচ্ছে না। ওরা ওর চোখের বাঁধন খুললো না।

বোবা হয়ে গেছে উম্মে আমারা। এক ব্যক্তি ওকে পালকিতে তুলে দিল। শুরু হলো দ্বিতীয় যাত্রা।

দফের শব্দের সাথে ভেসে এলো নারী কণ্ঠের গান। গানের ভাষা ও বুঝতে পারল না। সুরে এক মোহময় আবেশ।

আতংক বেড়ে গেলো ওর। রাতের নিঃশব্দ প্রকৃতিতে এক মাতাল করা আবহ সৃষ্টি হলো। উম্মে আমারা পালকি থেকে লাফিয়ে পালাতে চাইলো, কিন্তু সাহস পেলো না।

ওর মনে হলো এরা মানুষ নয়, ভিন গ্রহের অন্য কোন শক্তি। নিজের ইচ্ছায় সে এখন কিছুই করতে পারবে না। বেহারারা সিঁড়ি ভাঙছে। প্রায় ত্রিশটা সিঁড়ি অতিক্রম করে সমতল ভূমিতে চলতে লাগলো ওরা। থামলো বেহারারা। কাঁধ থেকে পালকি নামালো।

চোখের বাঁধন খুলে একজন চোখের ওপর হাত রাখলো। ধীরে ধীরে ফাঁক হলো আঙ্গুল। ঝাঁপিয়ে পড়লো আলো। হাত সরে গেলো। ও দাঁড়িয়ে আছে হাজার বছরের পুরনো এক বাড়ীতে।

বাড়ীটি পুরনো হলেও আলোয় ঝলমল করছে। বিরাট হলঘর। প্রাচীরের সাথে আটকানো লাঠির মাথায় মশাল জ্বলছে। দফ বাজছে। ভেসে আসছে নারী কণ্ঠের গান। কক্ষের বাতাসে অনঘ্রাত সুবাস। এ যেন এক স্বপ্নপুরী।

সামনে তাকালো ও। উঁচু বেদী। আট দশটি সিঁড়ি রয়েছে। বেদীর ওপর অবাক করা এক পাথরের মূর্তি।

মূর্তির মাথা এবং মুখটি বিশাল। থুতনির ঈষৎ নিচে গলা, ঘাড়। থুতনি থেকে মাথা পর্যন্ত উচ্চতা দু'জন মানুষের সমান। দাঁতের মাড়ি দেখলে মনে হয় মূর্তিটি হাসছে। হা করা মুখ। একজন মানুষের মাথা সে পথে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে অনায়াসে। মূর্তির দু'কানে গোঁজা লাঠির মাথায় মশাল। দু'হাত লম্বা চোখ। এক সময় চোখ দু'টি জ্বলে উঠলো। স্বচ্ছ নীল আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়লো কক্ষে। বদলে গেলো গানের সুর।

মূর্তির মুখের ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠলো। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন লোক। পরণে আজানুলম্বিত জুব্বা। লোক দুটো কাল। মাথায় রঙবেরঙের পালকের মুকুট।

চত্বর থেকে নিচে নামার তিনটে সিঁড়ি। লোক দুটো সিঁড়ির দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। মূর্তির মুখ থেকে বেরিয়ে এলো আরেকজন। বয়স্ক মানুষ, পরণে লাল জুব্বা। মাথায় মুকুট। দু'কাঁধে ফণা ধরে কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে দুটো কাল সাপ।

বৃদ্ধ এ গোত্রের পুরোহিত। মোহাবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে আছে উম্মে আমারা। বৃদ্ধ সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলো। হাঁটু গেড়ে বসলো মেয়েটার কাছে। ওর দু'হাত নিজের হাতে নিয়ে চুমো খেলো। অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, 'তুমি ভাগ্যবতী। আমাদের দেবতা তোমাকে পছন্দ করেছেন। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

উম্মে আমারা কেঁদে বললো, 'আমি দেবতা বিশ্বাস করি না। তোমরা যে দেবতাকে মানো তার দোহাই, আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে এখানে কেন এনেছো?'

'এখানে যে আসে প্রথম প্রথম সে এ রকম কথাই বলে। যখন এ পবিত্র স্থান সম্পর্কে জানতে পারে, আর যেতে চায় না। তুমি মুসলমানদের খলিফার প্রেমিকা, কিন্তু পৃথিবীর রাজা বাদশাহ এবং দেবদূতরা যার সামনে মাথা নোয়ায় তিনি তোমাকে পছন্দ করেছেন। তুমি স্বর্গে এসেছো।

জুব্বার ভেতর থেকে একটা ফুল নিয়ে পুরোহিত মেয়েটার নাকের সামনে তুলে ধরলো। উম্মে আমারা হারেমের রাজকুমারী। বিভিন্ন আতর গোলাপের গন্ধের সাথে পরিচিত। এ ফুলের ঘ্রাণ তার কাছে নতুন মনে হলো। হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে গেল ফুলের সুবাস। তার দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটলো। বদলে গেল অভিব্যক্তি।

ফুলটা সরিয়ে নিয়ে পুরোহিত বললো, 'দেবতার দেয়া উপহার।'

হাত প্রসারিত করলো উম্মে আমারা। পুরোহিতের ফুল ধরা হাত টেনে আবার নাকের কাছে নিয়ে এলো। জড়ানো কণ্ঠে বললো, 'চমৎকার উপহার। আমায় দেবেন?'

'তুমি এ উপহার খুশি মনে গ্রহণ করছো?' পুরোহিতের ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'হ্যাঁ, আমি এ উপহার আনন্দের সাথেই গ্রহণ করছি।'

ও আবার ফুল শুঁকলো। আবেশে বন্ধ হলো ওর চোখ দুটো।

'তুমি দেবতার ফুল গ্রহণ করেছো, দেবতাও তোমাকে গ্রহণ করেছেন!' পুরোহিত বললো, 'এতোক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

পুরোহিতের দিকে তাকালো মেয়েটা। স্মরণ করার চেষ্টা করছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'এখানেই তো ছিলাম, নাকি অন্য কোথাও! কি জানি, কোথায় ছিলাম মনে করতে পারছি না।'

'কে তোমাকে এখানে এনেছে?'

'কেউ না, আমি নিজেই এসেছি।'

'তুমি ঘোড়ায় চড়ে আসোনি?'

'না, আমি উড়ে এসেছি।'

'আসার পথে বিজন মরু, পাহাড় আর বন জঙ্গল পড়েনি?'

'না তো! চারদিকে ছিল সবুজের সমারোহ।'

'তোমার চোখ বেঁধে দেয়া হয়েছিল?'

'না, না, আমার চোখ খোলাই ছিল? পথে কত রঙবেরঙের সুন্দর সুন্দর পাখি, ফুল, প্রজাপতি দেখেছি।'

পুরোহিত তারপর কি যেন বললো, উম্মে আমারা বুঝতে পারল না। উম্মে আমারা দেখলো তার চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে চারটি মেয়ে।

ওরা তার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো। তারপর হাত দিল উম্মে আমারার গায়ে। মেয়েগুলো তার দেহের সব কাপড় খুলে নিল। উম্মে আমারা বিবস্ত্র হয়ে পড়লো।

মৃদু হেসে উম্মে আমারা বললো, 'দেবতা এভাবে আমাকে পছন্দ করবেন?'

'না, তোমাকে দেবতাদের কাপড় পরানো হবে।'

মেয়েরা তার কাঁধের উপর চাদর বিছিয়ে দিল। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে গেলো সে চাদরে।

চাদরের মাথায় বেঁধে দেয়া হলো রংগীন ফিতা। উম্মে আমারার সোনালী চুল আঁচড়ে কাঁধে ছড়িয়ে দিল একটা মেয়ে। পুরোহিত মুচকি হেসে ঘুরে মূর্তির দিকে হাঁটা দিল। মেয়েরা উম্মে আমারার হাত ধরে পুরোহিতের পিছু নিল। রাজকুমারীর মতো এগিয়ে চললো ও। কোন দিকে তাকাচ্ছে না।

গানের সুর আরো আকর্ষণীয় মনে হলো তার কাছে। সিঁড়িতে পা রাখল ও। মূর্তির মুখে প্রবেশ করলো পুরোহিত। সিঁড়ি পেরিয়ে ঢুকে গেলো মূর্তির ভেতরে।

মূর্তির কাছে এসে থেমে গেলো মেয়েরা। মূর্তির গলা থেকে সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। ওরা সিঁড়ি ভেংগে একটা অপ্রশস্ত কক্ষে এলো।

সুবাসিত কক্ষে আলো জ্বলছে। দেয়াল এবং ছাদ গাছের পাতা ও ফুলে ঢাকা। এক পাশে সুন্দর সোরাহী এবং গ্লাস।

পুরোহিত সোরাহী থেকে দুটো গ্লাস ভরলো। উম্মে আমারাকে একটা দিয়ে নিজে অন্যটা ঠোঁটে ছোয়াল।

'দেবতা কখন আসবেন?' প্রশ্ন করলো উম্মে আমারা।

'তুমি এখনো তাকে চিনতে পারোনি! তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছেন?'

তার পায়ের কাছে বসে ও বললো, 'হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। তুমি উপরের সে লোক নও। তুমি দেবতা। তুমি কি আমায় গ্রহণ করেছো?'

'হ্যাঁ, আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী।'

'বাবার কাছে শুনেছি, পুরোহিত মেয়েটাকে ফুল শুঁকতে দেয়। সে তখন নিজের পরিচয় ভুলে যায়। কোত্থেকে এসেছে, কিভাবে আনা হয়েছে কিছুই মনে থাকে না। পুরোহিত যে কথা শুনতে চায় ও তাই বলে, যা করতে বলে তাই করে। নিকৃষ্ট জিনিসও তার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। পুরোহিতের সাথে মাটির নিচের কক্ষে মেয়েটিকে থাকতে হয় তিন দিন। এর বেশী আমি আপনাকে বলতে পারবো না।' পাঁচজন কাফ্রীর একজন বললো আলী বিন সুফিয়ানকে।

উম্মে আমারার অপহরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনি খলিফার পাঁচজন দেহরক্ষীকে নিয়ে এসেছিলেন। এরা ছিল সে জংলী গোত্রের লোক।

গোয়েন্দা প্রধান ওদেরকে মেয়েটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। অজ্ঞতা প্রকাশ করলো ওরা। তিনি ওদের লোভ দেখালেন। বললেন, 'তোমাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না।' কিন্তু মুখ খুললো না ওরা।

ওদের গোত্র ছিল জংলী এবং হিংস্র প্রকৃতির। শাস্তির ভয়ে ভীত হওয়ার মতো লোক নয় ওরা। পাঁচজনই অনড়। বললো, 'মেয়েটার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।'

আলী ওদের পাঠিয়ে দিলেন 'শাস্তি সেলে'। সেখানে মূর্তির মুখ থেকেও কথা বের হয়। কিন্তু এ পাঁচ সুদানী ছিল অত্যন্ত কঠোর-প্রাণ। রাতভর ওদেরকে শাস্তি দেয়া হলো। ওদের সাথে জেগে রইলেন আলী।

অবশেষে শেষ চেষ্টা করা হলো। উপুর করে শুইয়ে হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। পা আটকানো হলো আংটার সাথে। হাতের রশির প্রান্ত বাঁধা হলো একটা চাকার

সাথে।

এ শাস্তিতে চাকা ঘুরলেই বাহু কাঁধ থেকে এবং পা উরুর গোড়া থেকে ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। হঠাৎ চাকা থামিয়ে দেয়া হয়। ঘুরানো হয় আবার। অজ্ঞান হয়ে যায় অপরাধী। ওদের উপর এ শাস্তি চললো।

শেষ রাতে মাঝ বয়েসী এক কাফ্রী বললো, 'আমি সব জানি, কিন্তু কিছুই বলতে পারবো না আমি। দেবতাকে আমি বড় ভয় পাই। তাহলে দেবতা আমাকে নিকৃষ্টতম মৃত্যু দেবেন।'

'যে ভাবে তোমাদের মারা হচ্ছে, এরচে' ভয়ংকর মৃত্যুও কি হতে পারে?' আলী বললেন, 'তোমাদের দেবতা সত্যি হলে এ শাস্তি থেকে তোমাদের সে অবশ্যই রক্ষা করতো। তোমরা যদি সত্যি কথা বলো, আমার কাছে এমন দেবতা আছেন, যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দেবতার আক্রোশ থেকে রক্ষা করবেন।'

বন্দীর চোখে দেবতার পরিবর্তে ভেসে উঠছিল মৃত্যুর বিভীষিকা। মুখ খুলতে রাজি হলো কাফ্রী। তার বাঁধন খুলে দেয়া হলো। তাকে খাবার ও পানি দেয়া হলো। খাওয়ার পর শুইয়ে দেয়া হলো আলাদা এক ঘরে।

লম্বা ঘুম দিল লোকটা। ঘুম থেকে জেগে সে স্বীকার করলো, তার গোত্রের লোকেরাই উম্মে আমারাকে অপহরণ করেছে। চারজন ছুটিতে যাওয়ার সময় অপহরণের বিস্তারিত পরিকল্পনা করেছিল। সে রাতে ওদের ডিউটি ছিল। চারজনের দু'জন ভেতরে ঢুকেছিল। বাকী দু'জন অপহরণে সহযোগিতা করেছে বাইরে থেকে।

প্রতি তিন বছর পর মেলা হয়। বলী দিতে হয় একটা মেয়ে। তবে শর্ত হচ্ছে, মেয়ে সে গোত্রের হতে পারবে না। সে হবে বিদেশী কোন উঁচু বংশের। ফর্সা এবং সুন্দরী। এমন সুন্দরী, যার দিকে দর্শকরা হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

'তার মানে প্রতি তিন বছর পর তোমাদের গোত্র একটা মেয়েকে বলী দেয়, আর তোমরা একটা সুন্দরী যুবতী অপহরণ করো!'

'তা ঠিক নয়। তিন বছর পর মেলা বসে। প্রতি পাঁচ মেলার পর একটা মেয়ে বলী দেয়া হয়। যারা জানে না, প্রতি মেলায় বলী দেয়া হয় এ কথা কেবল তারাই বলে।'

'বলীটা কোথায় দেয়া হয়?'

বলীর স্থানের বর্ণনা করলো কাফ্রী, 'পুরোহিতকে মনে করা হয় দেবতার সন্তান। মেলা প্রাঙ্গণ থেকে মাইল দেড়েক দূরে পার্বত্য এলাকা। সে পার্বত্য এলাকার এক দুর্গম জঙ্গলে দেবতা থাকেন। দেবতার সেবার জন্য আছে অপ্সরী।'

সে আরো বললো, 'ধু ধু মরুভূমির মাঝে দ্বীপের মতো এক জায়গায় দেখা যাবে সবুজের সমারোহ। মনে হবে প্রকৃতি অপূর্ব লীলায় মেতে উঠেছে সেখানে। ওখানে রয়েছে ফেরাউনের সময়কার পুরাকীর্তি। পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে রয়েছে স্বচ্ছ পানির ঝিল। ঝিলে রয়েছে ছোট বড় কুমীর। গোত্রের কেউ মারাত্মক অপরাধ করলে পুরোহিতের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। পুরোহিত তাকে নিক্ষেপ করে ঝিলে।

তিনি ওই প্রাচীন বাড়ীতেই থাকেন। প্রতি পনর বছরের শেষ দিন বাইরে থেকে একটা মেয়ে চুরি করে বলী দেয়া হয়। মেয়েটা তার সাথে থাকে কয়েকদিন। এছাড়া

থাকে চারজন পুরুষ এবং চারজন সুন্দরী তরুণী।

অন্য কেউ ওখানে যেতে পারে না। বেদীতে নেয়ার সময় মেয়েটা বুঝতেই পারে না, তাকে হত্যা করার জন্য নেয়া হচ্ছে। তার চেহারায় থাকে আনন্দ এবং গর্ব। বলীর পর দেহ থেকে মাথাটা কেটে দেহটা ফেলে দেয়া হয় ঝিলে। চুলগুলো গোত্রের লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়। এ চুল ওদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। এরপর কাটা মাথা শুকিয়ে একটা গুহায় রেখে দেয়া হয়।' সে আরো বললো, 'আর ছ'দিন পর পনরো বছর পূর্ণ হবে। তাই মেয়ে জোগাড় করা জরুরী হয়ে পড়েছিল।'

'তোমরা কত জন আছো সেনাবাহিনীতে?'

'আমরা একই গোত্রের নয় জন সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিলাম। সাহসী এবং জংলী বলে আমাদেরকে গার্ড বাহিনীতে নেয়া হয়েছে।'

'কিন্তু এ মেয়েকে অপহরণের দুর্মতি হলো কেন তোমাদের?'

'দু'মাস আগে মেয়েটাকে দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। এত রূপসী মেয়ে আমরা আর কখনো দেখিনি। সেদিনই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ওকেই বলী দেয়ার জন্য এবার আমরা চুরি করবো। আমরা গোত্রের সর্দারকেও এ কথা জানিয়েছি। বলেছি, বলী দেয়ার জন্য এবার আমরাই মেয়ে দেবো। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই আমরা উম্মে আমারাকে অপহরণ করেছি।'

এসব কথা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে শোনানো হলো। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। আলী বিন সুফিয়ান তার নির্দেশের অপেক্ষায় বসে রইলেন।

এলাকাটির ম্যাপ খুলে সুলতান বললেন, 'এ স্থান আমাদের সীমানার বাইরে। আলী! তোমার দেয়া তথ্য শুনে মনে হচ্ছে, ফেরাউন মরে গেলেও ফেরাউনের প্রেতাত্মা এখনো বেঁচে আছে। মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য সর্বপ্রকার শিরক ও কুফরের মূলোৎপাটন করা। আজ পর্যন্ত কত নিষ্পাপ মেয়েকে বলী দেয়া হয়েছে, মেলায় বিক্রির জন্য অপহৃত হয়েছে কত যুবতী তার হিসেব নেই। মানুষের মন থেকে এই দেবতার ভয় দূর করতে হবে। বুঝা যাচ্ছে, এদের ধর্মীয় গুরুরা খুব চতুর। ভণ্ডামীরও একটা সীমা আছে, এরা সে সীমাও অতিক্রম করে গেছে। সুন্দরী নারী ভোগের জন্য মেয়ে অপহরণের জুৎসই বুদ্ধি বের করে ওরা ভণ্ডামীর চূড়ান্ত করে ছেড়েছে।'

'আমাদের কিছু ফৌজি অফিসার এবং শহরের বিত্তশালীরা ওখান থেকে মেয়ে কিনে নিয়ে আসে।' আলী বললেন, 'এতে সমাজের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে।'

'তা ঠিক। আমার তো মনে হচ্ছে, আমাদের নতুন সেনা সদস্যদের মধ্যেও কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক ঢুকে পড়েছে, যারা ফৌজের সাবেক সদস্যদেরও মাথা বিগড়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।'

আলী সুলতানের সাথে একমত হলেন। তারপর আগের কথার খেই ধরে বললেন, 'মেয়েটাকে জীবন্ত ধরে এনে খলিফার হাতে তুলে দেয়া দরকার। তাহলে খলিফা বুঝবেন, আপনার ওপর দেয়া অপবাদ আসলে কতটা ভিত্তিহীন ছিল।'

'খলিফা কি বললো না বললো, তার পরোয়া আমি করি না। আমি নিজেকে নিয়ে

ভাবি না। ইসলামের কাজ করতে গেলে এমন কিছু অপবাদ শুনতেই হয়। অতীতেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হয়তো হবে। এসব অপবাদ যত নিকৃষ্টই হোক তাতে আল্লাহর সৈনিকদের কিছু যায় আসে না। মুমীনের অন্তর বা দেহ কিছুই তাতে নাপাক হয় না।'

'মাফ করবেন, আমি এমন অভিযোগ তুলিনি! আমি শুধু...'

আলীকে কথা শেষ করতে দিলেন না সুলতান। বললেন, 'আলী, নিজের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নাও। দৃষ্টি দাও দেশের কল্যাণের দিকে। ইসলামের হেফাজত এবং দেশের আজাদী ও ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব খলিফার। কিন্তু এখন আমাদের খলিফারা ভোগ-বিলাসে বিভোর হয়ে আছে। আত্মপূজায় ডুবে গিয়ে ভুলে গেছে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ওরাই এখন দেশ ও জাতির জন্য সবচে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতির নীতি-নৈতিকতাকে গলা টিপে হত্যা করছে ওরা। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে ইসলামের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে। যে মানবতার বিজয় নিশান উড়িয়ে ইসলাম দৃষ্টি কেড়েছিল মুক্তিকামী মানুষের, সে সততার পতাকা ওরা এখন লুকিয়ে রাখতে চায় মখমলের চাদরের নিচে। এ দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে খৃস্টান শক্তি। দ্বীনের চেরাগ নিভিয়ে দেয়ার জন্য ওরা সর্বস্ব পণ করে বসে আছে। এ অবস্থায় সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করতে চাইলে নিজের কথা ভুলে যাও। মনে রেখো, আমাদের সামনে থাকবে বাঁধার পাহাড়, ডানে-বায়ে ষড়যন্ত্রের নিকষ আঁধার আর পেছনে ভোগবাদী আমীর ও খলিফাদের অনিহা ও ব্যর্থতার উত্তাল সমুদ্র। আর এর সবকিছু আমাদের দূর করতে হবে ইসলামের সর্বগ্রাসী আলো দিয়ে।'

আলী অভিভূত হয়ে শুনছিলেন সুলতান আইয়ুবীর হৃদয়ের হাহাকার ও সংকল্পের কথা। সুলতান থামলে বললেন, 'আপনার এ নসীহত আমার মনে থাকবে সুলতান!'

'শোন, খলিফার দেয়া অপবাদে আমি কষ্ট পাইনি, এমন নয়। অনেক কষ্টে আমি তা বরদাশত করেছি। এর যথার্থ জবাব আমি দিতে পারতাম, কিন্তু এতে রাজনীতি ব্যক্তি স্বার্থের সাথে জড়িয়ে পড়ার ভয় ছিল। যখন থেকে আমার বুদ্ধি হয়েছে, তখন থেকেই আমীর ও খলিফাদের যে চরিত্র আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, তাতে মুসলিম বিশ্ব যে অচিরেই ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিপূজা, আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতালিপ্সার ক্রীড়নকে পরিণত হবে, সে আশংকা জেগে ছিল আমার মনে। আজ সেই ভয় সত্যে পরিণত হয়েছে।' থামলেন আইয়ুবী।

'অপরাধ ক্ষমা করুন সম্মানিত সুলতান। মেয়েটাকে বাঁচাতে চাইলে আমাদের হাতে সময় খুব কম। আগামী পরশু মেলা শুরু হয়ে যাবে। যা করার আমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'সেনাবাহিনীর কোন সদস্য বা অফিসার মেলায় শরীক হতে পারবে না, আমার এ নির্দেশ এখনি ছাউনিতে পৌঁছে দাও।' আইয়ুবী বললেন, 'নির্দেশ অমান্যকারীর শাস্তি পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। শাস্তি দেয়ার সময় কারো পদমর্যাদা দেখা হবে না।' তিনি আরো বললেন, 'সেনা অফিসারদের জরুরী মিটিং তলব করো।'

যথাসময়ে আইয়ুবীর নির্দেশ পৌঁছে দেয়া হলো সেনা ছাউনিতে। সেনা অফিসারদের জরুরী মিটিং বসলো। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বললেন, 'ওদের কুসংস্কার ভেঙে দিতে হবে। মনে হচ্ছে এটিই ফেরাউনের শেষ চিহ্ন। বলো, এ ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নিতে চাও

তোমরা।'

প্রথমেই সেনা অভিযানের প্রস্তাব এলো। এক অফিসার বললো, 'কিন্তু এতে গোত্রের লোকদের বাঁধা ও প্রতিরোধের সম্ভাবনা আছে। জংলী সম্প্রদায় সামরিক অভিযান রুখে দাঁড়ালে অনেক দর্শক এবং নিরপরাধ নারী ও শিশু মারা পড়বে।'

কাফ্রী পাঁচজনকে সাথে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলো কেউ। সুলতান এ প্রস্তাব নাকচ করলেন এই বলে, 'কাফ্রীরা মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করতে পারে।'

স্থল বাহিনী প্রধান আল নাসের এবং আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'পার্বত্য এলাকায় যাবে বারোজন কমান্ডো সদস্য। কাফ্রীদের দেয়া তথ্যে মনে হয় মেলা হয় জাঁকজমকের সাথে। অথচ মেয়েটাকে কোথায় বলী দেয়া হয় দর্শকদের কেউ তা জানে না। তাই সাধারণ পোশাকে পাঁচশ সশস্ত্র সৈনিক দর্শকদের সাথে মিশে যাবে। বলীর স্থান খুঁজে বের করবে ওরা।

ওদের দেয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কমান্ডোরা অভিযান চালাবে। কমান্ডোরা কাপড়ে আগুন লাগিয়ে উপরের দিকে নিক্ষেপ করলেই কেবল পাঁচশো সৈনিক সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করবে।'

এ প্রস্তাব মনপূত হলো সবার। কমান্ডো বাহিনীর সদস্যদের বলে দেয়া হলো, 'মেয়েটাকে যখন বেদীতে চড়ানো হবে তখনই কেবল সর্বাত্মক হামলা করতে হবে। এর আগে কৌশলে পাহারাদারদের মেরে ফেলতে হবে বা নিরস্ত্র করতে হবে। আক্রমণ আগে হলে ওরা হয়তো মেয়েটাকে বন্ধ কক্ষেই হত্যা করবে বা লুকিয়ে ফেলবে।'

কমান্ডোদের আরো বলা হলো, 'মেয়েটাকে বলী দেয়া হবে মেলার শেষ দিন মাঝ রাতে। তোমাদেরকে তার পূর্বেই পৌঁছতে হবে পার্বত্য এলাকায়। ধরা পড়লে সমগ্র পরিকল্পনাই পণ্ড হয়ে যাবে, তাই খুব সাবধান থাকবে।'

নূরুদ্দিন জঙ্গীর পাঠানো বাহিনী থেকে অভিযানের জন্য সদস্য নির্বাচন করা হলো। এরা ছিল আরব। সুদানের নোংরা রাজনীতি এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত। ইসলাম ছিল ওদের একমাত্র লক্ষ্য। ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী প্রতিটি কাজের বিরুদ্ধে এরা ছিল সোচ্চার।

ওদেরকে অভিযানের গুরুত্ব এবং কর্মপদ্ধতি বুঝিয়ে দেয়া হলো। এ অভিযানে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে ঠিকই, আবার এমনো হতে পারে, হয়তো কোন সংঘর্ষই হবে না।

বলী দানের আর মাত্র ছ'দিন বাকী। তিনদিন তিন রাত ওদের ট্রেনিং দেয়া হলো। চতুর্থ দিন কমান্ডো বাহিনীকে পাঠানো হলো উটে চড়িয়ে।

দেড় দিনের সফর। উটের চালককে নির্দেশ দেয়া হলো, 'ওদেরকে পাহাড় থেকে খানিক দূরে নামিয়ে ফিরে আসবে।'

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পাঁচশো সৈন্য রওনা হলো উট ও ঘোড়ায় চড়ে। বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে দিয়ে ওদের রওনা করিয়ে ছদ্মবেশে সৈন্যদের সঙ্গী হলেন কমান্ডার।

মেলার শেষ রাত। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় হাসছে মরুর বালুকারাশি। মেলায় উপচে পড়া ভিড়। কোথাও নাচছে অর্ধ নগ্ন নারী, গানের আসর

জমেছে কোথাও। সবচে বেশী ভিড় মেয়ে বিক্রির হাটে। একটা মেয়ে তুলে আনা হয় চত্বরে। গ্রাহকরা দেখে। কেউ দেখে দাঁত, কেউ চুল। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখার পর নিলামে ডাক উঠে। সবচে বেশী দরদাতার হাতে মেয়েটাকে তুলে দেয়া হয়।

জুয়ার আড্ডা এবং মদের আসরও জমে উঠেছে। এসব ব্যাপারে এখানে আইনের কোন কড়াকড়ি নেই।

মেলার চারপাশে দর্শকদের জন্য টানানো তাঁবু। নীতি-নৈতিকতা, ধর্ম এবং সামাজিকতার বাঁধন থেকে মুক্ত এরা। এরা এসেছে অবাধ স্ফূর্তি ও আনন্দের জন্য। পাশের পাহাড়ে কি হচ্ছে তা জানার কোন আগ্রহ নেই ওদের।

ওরা জানতো, পাহাড় ঘেরা স্থানটি দেবতাদের আবাস। দেবতাদের পাহারা দেয় জ্বীন এবং ভূতের দল। কোন মানুষ ওখানে গেলে জীবন নিয়ে ফিরতে পারে না।

ওরা জানে না, খানিক দূরের সেই পাহাড়ের কোলে এক সুন্দরী যুবতীকে বলী দেয়ার জন্য তৈরী করা হচ্ছে। দেবতা হচ্ছেন একজন মানুষ। ওরা এও জানতো না, দর্শক বেশে মেলায় রয়েছে পাঁচশো খোদার সৈনিক। বারোজন কমাণ্ডো সদস্য পৌঁছে গেছে দেবতাদের পাহাড় ঘেরা আস্তানায়।

কমাণ্ডো বাহিনীকে বলা হয়েছিল, পাহাড়ের আশপাশে দৃশ্যতঃ কোন পাহারা থাকবে না। ওখানে পাহারা দেয় অদৃশ্য জ্বীন ও ভূত। কিন্তু দেখা গেলো, কাফ্রীর বক্তব্য ঠিক নয়। আস্তানার চার পাশে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে।

পার্বত্য এ এলাকাটা মাইলখানেক দীর্ঘ এবং আধ মাইল প্রশস্ত। কমাণ্ডো সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগিয়ে চললো আস্তানার দিকে।

হঠাৎ একজন দেখলো, গাছের কাছে একটা ছায়া নড়ছে। হামাগুড়ি দিয়ে ছায়ার পেছনে চলে গেলো সে। ঝাঁপিয়ে পড়লো ছায়াটার ওপর। এক হাতে পেঁচিয়ে ধরলো গলা। অন্য হাতের খঞ্জর তার বুকে ঠেকিয়ে বললো, 'এখানে কি করছো? কিভাবে পাহারা দিচ্ছো তোমরা?'

আরবী বুঝল না কাফ্রীটা। ততোক্ষণে আরেকজন কমাণ্ডো চলে এসেছে। এবার তাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করা হলো, কিন্তু কিছু বললো না সে।

আরো পাহারাদার আছে বলে সন্দেহ হলো ওদের। কাফ্রীটাকে নিকেশ করে ওরা সতর্ক পায়ে এগিয়ে চললো। কিছু দূর গিয়েই আবার দেখা পেলো আরেক পাহারাদারের। এভাবে বেশ কয়েকটা বাঁধা ডিঙিয়ে ওরা জঙ্গলের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলো।

সামনে জঙ্গল হালকা, তারপর পাহাড়। চাঁদ উঠে আসছে উপরে। ওরা গাছের ছায়ায় লুকিয়ে লুকিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করলো।

আস্তানার ভেতরে ওরা দেখতে পেলো পাথরের মূর্তি। সামনের চত্বরে কার্পেট বিছানো। সে কার্পেটের ওপরে ফুল ছড়ানো। ফুলের ওপর পাশাপাশি রাখা আছে চওড়া তরবারী ও পেতলের থালা।

চত্বরের চারপাশে মশাল জ্বলছে। চারজন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে চার কোণায়। ওদের সারা দেহ অনাবৃত। গাছের পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকা। এক জায়গায় শরীরে শাদা চাদর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারজন কাফ্রী।

উম্মে আমারা তখনো নিচের অন্ধকার কামরায়। পুরোহিত তার চুল নিয়ে খেলা করছিল। নেশায় ঢুলুঢুলু চোখ, জড়ানো কণ্ঠে ও বলে যাচ্ছে, 'আমি আংগুকের মা। তুমি আংগুকের পিতা। আমাদের সন্তান হবে মিশর এবং সুদানের সম্রাট। ওদেরকে আমার রক্ত পান করতে দাও। প্রতিটি ঘরে বিলিয়ে দাও আমার সোনালী চুল। তুমি দূরে কেন, কাছে এসো।'

'আংগুক' গোত্রের দেবতা। নেশার ঘোরে এক আরব মেয়ে হয়েছে জংলী গোত্রের মা এবং পুরোহিতের স্ত্রী। দেবতার নামে বলী দেয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে। বলীর অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করার জন্য পুরোহিত নানা রকম রসম রেওয়াজ পালন করছিল।

বারোজন কমাণ্ডো পাহাড় বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে। কাঁটা ঝোপে ভরা এবড়ো থেবড়ো পাহাড় পেরোতে কষ্ট হচ্ছে ওদের। চাঁদ মাথার উপর উঠে এসেছে। গাছের ছায়ার কারণে ওদের দেখা যাচ্ছে না।

ওরা দেখলো, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে এক কাফ্রী। এক হাতে বর্শা, অন্য হাতে ঢাল।

প্রহরী এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, পেছন থেকে তাকে আক্রমণ করা সম্ভব নয়, আবার সামনাসামনি সংঘর্ষে যাওয়াও ঠিক হবে না। কিন্তু তাকে হত্যা করা জরুরী। এক কমাণ্ডো সদস্য লুকিয়ে পড়লো। আরেকজন তার সামনে পাথর নিক্ষেপ করলো।

আকস্মিক শব্দে চমকে উঠলো কাফ্রী। এগিয়ে গেল পাথর নিক্ষিপ্ত স্থানের দিকে।

ঝোপের কাছে আসতেই কমাণ্ডো সদস্য জাপটে ধরে ওর বুকে খঞ্জর সেঁধিয়ে দিল। নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়লো কাফ্রীর লাশ। সতর্ক পায়ে আবার এগিয়ে চললো কমাণ্ডো বাহিনী।

উম্মে আমারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পুরোহিত ওকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করলো। এরপর হাত ধরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললো। চারজন অনাবৃত যুবতী এবং চারজন কাফ্রী তাকিয়ে আছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মূর্তির মুখ। সিজদায় লুটিয়ে পড়লো ওরা।

পুরোহিত তার আগমন ঘোষণা করে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে উম্মে আমারা। ওকে চত্বরে তুলে দেয়া হলো। ঘিরে দাঁড়ালো কাফ্রী এবং যুবতীরা।

মেয়েটা আরবী ভাষায় বললো, 'আমি আংগুকের সন্তানদের জন্য আমার মাথা কাটাচ্ছি। ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্য করছি। আমার মাথা কেটে ফেলো। দেবতার পদতলে রেখে দাও কাটা মস্তক। দেবতা এ মাথার ওপর মিশর এবং সুদানের মস্তক স্থাপন করবেন।'

যুবতী এবং কাফ্রীরা আবার সিজদায় লুটিয়ে পড়লো। পুরোহিত উম্মে আমারাকে হাঁটু গেড়ে বসালো। মাথা নোয়াল ও। হাতে তরবারী তুলে নিল পুরোহিত।

পর্বত চূড়া থেকে এক কমাণ্ডো দৃষ্টি ফেললো চত্বরে। অনুচ্চ কণ্ঠে সঙ্গীদের বললো, 'মেয়েটা মাথা নুইয়ে বসে আছে, উলংগ।'

ঝকঝকে জোসনা আর মশালের আলোয় ওরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সবকিছু। পাহাড় চূড়া থেকে নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। পাহাড়ের গা ঢালু নয়, খাঁড়া দেয়ালের

মতো।

হাতে সময় নেই। উড়ে গেলেও ওকে বাঁচানো সম্ভব নয়। চূড়া থেকে নিচে তাকালো ওরা। ঝিল। শুনেছে ঝিলে কুমীর থাকে।

ডানদিক কিছুটা ঢালু হলেও মসৃণ দেয়ালের মতো। কিছু ঝোপঝাড় রয়েছে। কমাণ্ডোরা একে অপরের হাত ধরে নামতে লাগলো। সর্বশেষ আরোহীর দৃষ্টি পড়লো এক কাফ্রীর উপর। দাঁড়িয়ে আছে বর্শা নিয়ে। হাত উঁচিয়ে আছে নিক্ষেপের জন্য।

হয়তো সে সন্দেহ করেছে কিছু। কমাণ্ডো সদস্যদের দেখা যাচ্ছে না। একজন তীর ছুঁড়ল। শোঁ শোঁ শব্দ তুলে ছুটে গেল তীর। বক্ষ ভেদ করলো কাফ্রীর। পড়ে গিয়ে গড়াতে লাগলো দেহটা।

কমাণ্ডোরা নেমে আসছে খাঁড়া পাহাড়ের গা বেয়ে। যে কোন মুহূর্তে পা পিছলে পড়ে যেতে পারে অনেক নিচের টলটলে পানির ঝিলে।

পুরোহিত উম্মে আমারার মাথার ওপর তরবারী তুললো। সিজদা থেকে সোজা হলো কাফ্রী এবং যুবতীরা। হাঁটু গেড়ে বসে ওরা গান ধরলো। হালকা অথচ মিষ্টি সুর। সুরের আবহ সৃষ্টি করছিল এক অতিপ্রাকৃতিক পরিবেশ।

'পাহাড় ঘেরা এ ক্ষুদ্র উপত্যকা মানুষের নয়, দেবতাদের আবাস' কমাণ্ডোদের মনে হলো, যে কোন মানুষকে এ পরিবেশে এ কথা বিশ্বাস করানো সম্ভব।

পুরোহিতের তরবারী আরো উপরে উঠে ধীরে ধীরে নেমে আসছে নিচে। আর মাত্র দু এক সেকেণ্ড, হয়তো তারপরেই ভেসে আসবে মেয়েটার আর্ত চিৎকার।

তরবারী উম্মে আমারার ঘাড় স্পর্শ করার আগেই একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো পুরোহিতের পাঁজরে। তরবারী তার হাত থেকে খসে পড়ার আগেই পরপর তিনটে তীর বিধল তার দেহে।

চিৎকার করে উঠলো মেয়েরা। কাফ্রীরা ডাক-চিৎকার শুরু করলো। পুরোহিতের দেহটা একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল। তরবারী ছিটকে পড়লো অদূরে।

কঠিন শিলায় পড়ে ঝনঝন শব্দ হলো তরবারীর। ঘাড় তুলে তাকালো মেয়েটা।

দু'জন কাফ্রী মূর্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই এক ঝাঁক তীর এসে শুইয়ে দিল ওদেরও।

মেয়েরা যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। রক্তে তড়পাচ্ছে তিনটে দেহ। উম্মে আমারা নির্বিকারভাবে মাথা নত করে বসে আছে। দৌড়ে চত্বরে এসে একজন কমাণ্ডো উম্মে আমারাকে তুলে নিল কাঁধে। ওকে নিয়ে গেলো মূর্তির পেছনে।

তখনো তার নেশা কাটেনি। নিজের জামা খুলে মেয়েটাকে পরিয়ে দিল কমাণ্ডো। একদিক থেকে বারো জন কাফ্রী ছুটে এলো। হাতে বর্শা এবং ঢাল।

ছড়িয়ে গেলো কমাণ্ডোরা। ওদের চার জনের হাতে রয়েছে তীর ধনু। তীর ছুঁড়তে লাগলো ওরা। অন্যরা একদিকে লুকিয়ে পড়লো।

কাফ্রীরা এগিয়ে এলে ওরা পেছন থেকে আক্রমণ করলো। পেছনে আরো কাফ্রী থাকতে পারে ভেবে পরিকল্পনা মতো তীরের মাথায় কাপড়ে আগুন জ্বেলে উপরের দিকে

ছুঁড়ে দিল এক কমান্ডো।

মেলা তখনো জমজমাট। নিজস্ব বাহনে চড়ে পাঁচশো দর্শক মেলা থেকে খানিক দূরে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। ওদের চোখে পড়লো আগুনের ফিতা বাঁধা তীর।

ধীরে ধীরে ভীড় থেকে সরে এলো ওরা। একটু দূরে গিয়ে ঘোড়া ছুটাল তীব্র গতিতে।

মেলার আনন্দে ডুবে থাকা দর্শকরা ভাবতেও পারেনি কি বিপদে পড়েছে দেবতারা। দেবতাদের আবাসে পৌঁছলো পাঁচশো সওয়ার। কাফ্রীদের কয়েকটা লাশ পড়ে আছে। শহীদ হয়েছেন দু'জন কমান্ডো সদস্য। ভেতরে আর কোন কাফ্রী নেই।

কমান্ডোরা মূর্তির মুখপথে ভেতরে ঢুকলো। হাতের কাছে যা পেল তুলে নিল। অন্যান্য জিনিসের সাথে পাওয়া গেলো কাপড়ের তৈরী একটি ফুল। ফুলটি কাপড়ের হলেও সুবাসিত। হালকা, মোলায়েম কিন্তু ইন্দ্রিয় অবশ করা সুবাস।

কমান্ডো সদস্যরা উম্মে আমারাকে সাথে নিয়ে পাহাড় পেরোলো। এরপর ঘোড়া ছুটালো কায়রোর দিকে।

মেলা শেষ হয়ে গেছে। মাতাল হয়ে পড়ে আছে অনেকে। ব্যবসায়ীরা মালপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে মেয়ে বিক্রেতার দল। মরুভূমিতে বাড়ীমুখো মানুষের সারি।

চুলের জন্য অপেক্ষা করছে পাশের গাঁয়ের মানুষ। দূর গাঁয়ের মানুষজন তাকিয়ে আছে দেবতার আবাসের দিকে।

প্রবীণ বুড়োরা বলাবলি করছে, 'এখনি পুরোহিত এসে বলী দানের সুসংবাদ দেবেন। আমাদের দেবেন পবিত্র কেশ।'

কিন্তু কেউ এলো না। দেবতার আস্তানা কবরের মতো নিস্তব্ধ। এরা জানে না, দেবতার ঘোষণা আর কেন দিন আসবে না ওদের কানে। দেবতার আস্তানা এখন মুসলিম ফৌজের দখলে।

রাত শেষে দিন এলো। তারপর দেখা গেলো দিনও পেরিয়ে যাচ্ছে। লোকজনের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। বলীর কথা সবার মুখে মুখে। যুবকরা বলাবলি করতে লাগলো, 'দেবতা না ছাই, সব ধোঁকাবাজি, সবই মিথ্যা।'

ডুবে গেলো সূর্য। দেবতার আস্তানায় গিয়ে কি ঘটেছে দেখার সাহস হলো না কারো।

'ডাক্তার নিয়ে এসো।' সুলতান আইয়ুবী নির্দেশ দিলেন, 'মেয়েটা এখনো নেশার ঘোরে রয়েছে।'

উম্মে আমারা সুলতানের সামনে বসে আছে। ও বলছে, 'আমি আংগুকের মা। তুমি কে? তুমি তো দেবতা নও। আমার স্বামী কোথায়? আমার মাথা কেটে দেবতার পায়ের কাছে রেখে দাও। আমাকে আমার সন্তানদের জন্য উৎসর্গ করো।'

ও নেশার ঘোরে বকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে জড়িয়ে এলো ওর কণ্ঠ। ডাক্তার এসে ওকে ওষুধ খাওয়ালেন। একটু পর চোখ বন্ধ করলো ও। তাকে শুইয়ে দেয়া হলো, ও হারিয়ে গেলো গভীর ঘুমের অতলে।

মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে। সুলতানকে শোনানো হলো আক্রমণের বিস্তারিত ঘটনা।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী স্থল বাহিনী প্রধান আল নাসের এবং বাহাউদ্দিন শাদ্দাদকে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা এখনি পাঁচশো সৈন্য নিয়ে ওখানে যাও। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে নেবে। সেনাবাহিনী জায়গাটা ঘিরে রাখবে। তোমরা মূর্তিটা ভেঙে ফেলো। আক্রমণ এলে মোকাবিলা করবে, এলাকার মানুষ সংঘর্ষে না এলে লড়াই করো না। ওদের বুঝিয়ে বলবে, এ ছিল স্রেফ ধোঁকা, শুধুই ভাওতাবাজি।'

শাদ্দাদ নিজের ডায়েরীতে লিখেছেন, 'আমরা পাঁচশো সৈন্য নিয়ে ওখানে গেলাম। পথ দেখাল কমাণ্ডো বাহিনীর কমাণ্ডার। হাজার হাজার কাফ্রী দূরে দাঁড়িয়েছিল। এদের কেউ উটের পিঠে, কেউ ঘোড়ার পিঠে। হাতে বর্শা, তলোয়ার এবং তীর ধনুক।

আমরা পাহাড়ের দিকে পিঠ করে চারপাশে সৈন্যদের দাঁড় করালাম। যাদের তীর ছিল না ওদের হাতে ছিল বর্শা। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রস্তুতি। আমি এবং নাসের ভেতরে গেলাম। মূর্তি দেখে নাসের বললো, 'ফেরাউনের স্মৃতি।'

চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলাম আমরা। কাফ্রীদের লাশগুলো পড়ে আছে দু'পাহাড়ের মাঝের সেই প্রাচীন বাড়ীতে। ফেরাউনের সময় হয়তো এটা সুন্দর অট্টালিকা ছিল। দেয়ালের গায়ে প্রাচীন লিপি। পর্বতের পাদদেশে ঝিল। ঝিলে ছোট ছোট অনেকগুলো কুমীর।

পাহাড় কেটে ভেতরে ঢুকে গেছে ঝিলের পানি। ঝিলের ওপর পাহাড়কে ছাদের মতো মনে হয়। ভয়ংকর স্থান।

অনেকগুলো কুমীর কিনারে এসে আমাদের দেখতে লাগলো। সৈন্যদের বললাম, 'কাফ্রীদের লাশ ঝিলে ফেলে দাও। কুমীরগুলো ক্ষুধার্ত।'

ওরা লাশগুলো টেনে নিয়ে এলো। ফেলে দিল ঝিলে। কুমীরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো লাশের ওপর। ছোট বড় অগণিত কুমীর। মনে হলো লাশগুলো দ্রুত সাঁতরে পাহাড়ের ভেতর দিকে ছুটে যাচ্ছে।

এরপর এলো পুরোহিতের লাশ। বহু মৃত মানুষকে কুমিরের মুখে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। আমরা তার দেহটাও ঝিলে ফেলে দিলাম।

দু'জন সিপাই চারজন সুদানী মেয়েকে ধরে নিয়ে এলো। বিবস্ত্র। সিঁড়ির নিচে লুকিয়েছিল ওরা।

আমি এবং নাসের দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। সিপাইদের বললাম, 'ওদের কাপড় পরাও।'

কাপড়ে ঢেকে দেয়া হলো ওদের দেহ। প্রতিটি মেয়েই অপূর্ব সুন্দরী। ওরা কাঁদছিল। দোভাষী ওদের কাহিনী বুঝিয়ে বললো আমাদের।

লজ্জা ও বেদনার সে কাহিনী। কোন মুসলমান মেয়েদের এ অপমান সইতে পারে না। নারী, সে যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন, ইসলাম তার আব্রু রক্ষা করে।

এরা ফেরাউনকে খোদা মনে করতো। ফেরাউনের অনুপস্থিতিতে গোত্র প্রধানকে পূজা করতো খোদা হিসাবে।

আমরা পুরো এলাকাটাই ঘুরে ঘুরে দেখলাম। চমৎকার স্থান। মরুর বুকে যেন সবুজের মেলা বসেছে। পাহাড়ী ঝর্ণায় তৈরী হয়েছে ঝিল। ঝিলের ওপর বিশাল ছায়াবৃক্ষ। স্থানটি কোন ফেরাউনের পছন্দ হয়েছিল, শখ করে তিনি এখানে প্রমোদ ভবন

বানিয়েছিলেন। নিজের খোদায়ীত্ব প্রমাণ করার জন্য তৈরী করেছিলেন মূর্তি। ভোগ বিলাসের জন্য মাটির নিচে তৈরী করেছিলেন সুদৃশ্য কক্ষ।

সূর্য সরে গেছে। বদলে গেছে আকাশের রূপ। খসে পড়েছে ফেরাউনের ক্ষমতার নক্ষত্র। মিশরে এসেছে অন্য ধর্ম, অন্য সম্রাট। শেষ পর্যন্ত কালেমার বিজয় হয়েছে।

সত্যের ফৌজ ঘিরে রেখেছে পার্বত্য এলাকা। ভেঙে ফেলা হলো পাথরের মূর্তি। মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হলো বেদী। মাটির নিচের কক্ষগুলো ভরে ফেলা হলো পাথর দিয়ে।

বাইরে হাজার হাজার কাফ্রী আতংকিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল সেদিকে। কি হচ্ছে ওরা বুঝতে পারছিল না কিছু। দেবতাদের আস্তানা আক্রান্ত হতে পারে এমনটি ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি। অথচ তাদের চোখের সামনে দেবতাদের সব স্মৃতি একদল লোক কেমন নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে।

দাঁড়িয়ে থাকা এসব কাফ্রীদের ডেকে ভেতরে নিয়ে দেখানো হলো। খুলে দেয়া হলো পুরোহিতের প্রতারণার মুখোশ। মেয়ে চারজনকে তুলে দেয়া হলো ওদের হাতে।

চারজনেরই পিতা এবং ভাইয়েরা উপস্থিত ছিলেন ওখানে। ওদের বলা হলো, 'এখানে থাকতো এক বদমাশ। এখন সে কুমিরের পেটে।'

হাজার হাজার কাফ্রীকে শোনানো হলো উপত্যকার পাপের কাহিনী। নীরবে শুনলো ওরা। কখনো মনে হতো, ওদের চোখে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে, কখনো সে চোখে খেলা করতো বিষাদের ছায়া।

ওদের বলা হলো, 'যদি সত্যিকার খোদাকে দেখতে চাও, দেখানো হবে। তোমরা যেখানে বসে আছো, মনে করছো দেবতার আস্তানা, আসলে এ ছিল ভণ্ডদের আখড়া। আমরা মিথ্যা খোদার এ পার্বত্য এলাকা ধূলায় মিশিয়ে দেবো। তারপর দেখবে কোন্ খোদা সত্য।'

উম্মে আমারার জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে তার ওপর দিয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা খুলে বললো। ও যা বললো, মনে হয় তা এক দুঃস্বপ্ন।

উম্মে আমারা বলে যাচ্ছে, 'পুরোহিত দিনে রাতে কয়েকবার করে আমাকে ভোগ করেছে। পুরোহিত কিছুক্ষণ পরপর আমাকে ফুল শুঁকতে দিত। সে ফুল শুঁকলে আমি ভুলে যেতাম আমার অতীত।'

ওকে যখন বলা হলো, 'তোমার শিরচ্ছেদ করা হচ্ছিল। কমাণ্ডো বাহিনী সময়মত না পৌঁছলে এতক্ষণে থাকতে কুমীরের পেটে' তখন ভয়ে কাঁপতে লাগলো মেয়েটা।

কী ভয়ংকর অবস্থায় পড়েছিল বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগলো উম্মে আমারা। সুলতানের হাতে চুমো খেয়ে বললো, 'আল্লাহ আমার পাপের শাস্তি দিয়েছেন। আমি প্রায়শ্চিত্য করবো। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।'

উম্মে আমারা ছিল বিত্তশালী এক ব্যবসায়ী পিতার কন্যা। তার পিতার সাথে সিরিয়ার আমীরদের ছিল গভীর হৃদ্যতা। এসব আমীররা কেন্দ্রের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা শাসন

করতো। দশম শতাব্দীর পর এরা ডুবে গেলো ভোগের সাগরে। অর্থের প্রয়োজনে সম্পর্ক গড়ে তুললো বড় বড় ব্যবসায়ীর সাথে। হারেমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলো সুন্দরী যুবতীরা। আমীররা রাতভর মদে মাতাল হয়ে পড়ে থাকতো রঙমহলে।

উম্মে আমারা বারো বছর বয়সেই পিতার সাথে আমীরদের নৃত্যের আসরে অংশ নিয়েছিল। ও ছিল অসম্ভব সুন্দরী। পিতা কৈশোর থেকেই তাকে আমীর ওমরাদের আসরগুলোতে নাচ-গানে অভ্যস্ত করে তুললো।

উম্মে আমারা বললো, 'আমার বয়স তখন চৌদ্দ। আমার ওপর আমীরদের দৃষ্টি পড়তে লাগলো। দু'জন আমীর আমাকে মূল্যবান উপঢৌকন দিল। তাদের সাথে আমার গড়ে উঠলো গভীর সম্পর্ক। ধীরে ধীরে আমি পাপের মধ্যে ডুবে গেলাম।

ষোল বছর বয়সে এক আমীরের রক্ষিতা হলাম বাবাকে না জানিয়ে। থাকতাম নিজের বাড়ীতে। অর্থ বিত্তের মাঝেই আমি বড় হয়েছি। আমার পরিবেশে লাজলজ্জা বলে কিছু ছিল না।

দু'তিন বছর পর বাবার সংসার থেকে সরে গেলাম। সম্পর্ক গড়লাম আরো দু'জন আমীরের সাথে। ওরা আমার চোখের ইশারায় উঠবস করতে লাগলো।

এরপর বাবা আমার সাথে সমঝোতা করলেন। গত দু'বছর থেকে তিনজন আমীর এবং বাবা আমাকে নতুন এক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। মুসলিম খেলাফতের মূলোৎপাটন করার জন্য তারা আমাকে ব্যবহার করতে চাইলেন। কদিন পর বাবার এ ষড়যন্ত্রে শরীক হলো এক খৃষ্টান।

আমীররা চাচ্ছিল স্বাধীন শাসক হতে, খৃষ্টানদের সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। আমাকে বলা হলো, নুরুদ্দিন জঙ্গী এবং খেলাফতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির করতে হবে। এ কাজে সহযোগিতার জন্য সাথে দেয়া হলো খৃষ্টানদের তিনজন গুপ্তচর মেয়েকে।

আমাকে আরো বলা হলো, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মিশরে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তার তৎপরতায় জনগণ তাকে রাজার মতো সম্মান করে।

সবকিছু বুঝিয়ে আমাকে খলিফা আল আযেদের কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো হলো। উদ্দেশ্য, নুরুদ্দিন জঙ্গী, আইয়ুবী এবং খলিফার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করা এবং সুদানীদেরকে আরেকবার বিদ্রোহের জন্য উসকে দেয়া।'

উম্মে আমারা সুলতানকে আরো জানালো, সে মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছে। তার পিতাই তাকে ইসলামী চেতনা ধ্বংসের ট্রেনিং দিয়েছে। খলিফার হৃদয়ে আইয়ুবীর ব্যাপারে বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য কাজ করছিল ও। রজব ছিল এ ষড়যন্ত্রের নায়ক। রজবই খলিফার দেহরক্ষী দলে মিশরীদের পরিবর্তে সুদানীদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

খলিফার কাছে ও এসেছে মাত্র আড়াই মাস। এর মধ্যেই সে হয়ে উঠেছিল মহলের রাণী। ও আরো বললো, 'খলিফা আইয়ুবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছেন। রাজব এ জন্য ঘাতক দলের সাথে চুক্তি করেছে।'

খলিফার ভোগ বিলাসে বিরক্ত হয়েই সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তার বিরোধিতা করেছিলেন। উম্মে আমারার অপহরণ, উদ্ধার এবং গোপন তথ্য প্রকাশ হওয়া ছিল কাকতালীয় ব্যাপার। সুলতান উম্মে আমারাকে নিজের আশ্রয়ে রাখলেন।

এ ঘটনায় উম্মে আমারার চিন্তা চেতনা বদলে গেলো। ও তার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে চাচ্ছিল। সুলতান ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে লাগলেন, দেশ এবং জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ তিনি নেবেন।

ওদিকে ফেরাউনের শেষ চিহ্ন ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে পরদিন শাদ্দাদ এবং আল নাসের সসৈন্যে কায়রো ফিরে এলেন।

আটদিন পর। রাতের শেষ প্রহর। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী গভীর ঘুমে অচেতন। চাকর তাকে ডেকে তুলে বললো, 'আল নাসের, আলী বিন সুফিয়ান এবং দু'জন নায়েবে সালার এসেছেন।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বিছানা ছেড়ে বৈঠক রুমে চলে এলেন। অভ্যাগতদের একজন পেট্রোল ডিউটিরত সৈন্যদের কমাণ্ডার।

সুলতানকে বলা হলো, 'ছ'হাজার সুদানী ফৌজ মিশর সীমান্তে ছাউনি ফেলেছে। এদের সাথে রয়েছে মূর্তি ভেঙে ফেলা গোত্রের কাফ্রী এবং বিদ্রোহী সুদানী সৈন্য।'

কমাণ্ডার দু'জন উষ্ট্রারোহীকে পাঠিয়েছিলেন সংবাদ নেয়ার জন্য। ওরা সুদানী হলেও সুলতানের বিশ্বস্ত ছিল। সুদানীরা পরাজিত হওয়ার পর সুলতানের সাধারণ ক্ষমা এবং পূনর্বাসনের প্রস্তাব ছিল তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত। আইয়ুবী আগ্রহী সুদানী সৈনিকদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের অনুমতি দিলে তারা সুলতানের কাছে আত্মসমর্পন করে ফৌজে যোগ দিয়েছিল।

ওরা সুদানী সেনাপতির সাথে দেখা করলো। কথা বললো সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে। জানালো, ওরা কায়রো আক্রমণ করলে তাদেরকে তারা সব রকমের সাহায্য দেবে।

'তোমরা শহরের অবস্থা এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যতটুকু পারো খবরাদি সংগ্রহ করে আমাকে জানাতে পারবে?' জানতে চাইলেন সেনাপতি।

তারা সেনাপতিকে আশ্বস্ত করলো। বললো, 'কখন আপনাকে রিপোর্ট করবো?'

'আজ রাতেই আমাদের আরো ফৌজ এসে আমাদের সাথে মিলিত হবে। তোমরা যদি রাতের মধ্যেই খবর দিতে পারো তবে আগামী কালই আমরা কায়রোর দিকে রওনা করবো।' ওরা সেনাপতিকে আশ্বস্ত করে ফিরে এলো শহরে।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বললেন, 'খলিফার দেহরক্ষী ফৌজে পঞ্চাশজন সৈন্য এবং একজন কমাণ্ডার থাকবে। বাকীদের ছাউনিতে নিয়ে এসো। খলিফা বাঁধা দিলে বলবে, এ আমার হুকুম।

আলী! তোমার সংস্থায় যারা সুদানের ভাষায় কথা বলতে পারে এমন একশ লোক উষ্ট্রারোহী দু'জনের সাথে ওদের কাছে পাঠিয়ে দাও। ওরা যাবে বিদ্রোহী সেজে। সেনাপতিকে বলবে, ওরা সুদানী ফৌজে যোগ দিতে চায়। এদের কাজ হবে, সুদানী ফৌজের গতিবিধি আমাদের অবহিত করা। রাতে ওদের পশু এবং রসদ কোথায় থাকে তাও জেনে নিতে বলবে। নাসের, তুমি ছোট ছোট মেনজানিক কামানসহ কমাণ্ডো

বাহিনীকে প্রস্তুত করো।'

'আমি ভেবেছিলাম মুখোমুখি আক্রমণ করে শহরের বাইরেই ওদের শেষ করে দেবো।'

'না! মনে রেখো নাসের, শত্রু যত কমই হোক, মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়ে চলবে। রাতে কমাণ্ডো হামলা করবে। ডানে বাঁয়ে পেছনে আঘাত করে গেরিলারা পালিয়ে যাবে। শত্রুর বাহন, রসদ এবং পশুগুলো ধ্বংস করে দেবে। ব্যতিব্যস্ত করবে ওদের। ওদের শৃংখলা ভেঙ্গে দেবে। ওদেরকে আর সামনে এগোতে দেবে না। ডানে বাঁয়ে ছড়িয়ে যেতে বাধ্য করবে ওদের। যদি সামনাসামনি যুদ্ধ করতেই হয়, পানি রাখবে নিজেদের দখলে। সূর্য এবং বাতাস থাকবে ওদের প্রতিকূলে।

যুদ্ধ করার জন্য তোমার পছন্দ করা ময়দানে নিয়ে আসবে ওদের। ওরা কায়রো এসে সেনাবাহিনীর সাথে সামনাসামনি লড়াই করতে চায়, আমি তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হতে দেবো না।

আলী! তোমার পাঠানো লোকদের বলবে, ওরা সুদানী বাহিনীতে প্রচার করবে, সুলতান ছ'সাত দিনের মধ্যে ফিলিস্তিন আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। এ জন্য তার অনুপস্থিতিতে কায়রো আক্রমণ করতে হবে।'

প্রয়োজনীয় নির্দেশ শেষে সুলতান বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় আমি কায়রো থাকবো না।' কায়রো থেকে দূরে একটা স্থানের উল্লেখ করে বললেন, 'ওখানেই হবে আমার হেড কোয়ার্টার।'

বৈঠকখানাতেই সবাই ফজর আদায় করলেন। নামায শেষে বেরিয়ে গেলেন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য। নিজের কক্ষে ঢুকলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

সুদানী সেনা ছাউনিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিপূর্বে সুদানী বিদ্রোহ দমনের পর তারা আরেকটি বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়েছিল। খৃষ্টান সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিল ওরা। ওদের গুপ্তচর কাজ করছিল মিশরে। গোয়েন্দাদের কাছ থেকে আইয়ুবীর প্রস্তুতির খবর পেয়ে সে অভিযান ওরা মুলতবী করেছিল।

আইয়ুবী জানতেন, আবার একদিন পরাজিত সুদানীরা আক্রমণ করবে। ওদের একটা গোত্রের দেবতার আশ্রম ধ্বংস করেছেন সুলতান, এটা মামুলি কথা নয়। মিশরে সুলতান বিরোধীরা এ সুযোগ কাজে লাগালো। সুযোগ পেলো পরাজিত বিদ্রোহী কমাণ্ডাররা।

সুদানের মুসলমানরাও আক্রমণের জন্য ওদের উত্তেজিত করছিল। দেবতাদের অপমান করা হয়েছে, প্রতিশোধ নিলেই কেবল দেবতার অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। প্রতিশোধের লক্ষ্যে জংলী উপজাতিও যোগ দিল বিদ্রোহীদের সাথে। এক হপ্তার মধ্যে সৈন্য জমা করে ওরা কায়রো অভিমুখে রওনা করলো।

পথে সংবাদ পেলেই বিভিন্ন গোত্র থেকে সুদানীরা এসে ওদের সাথে যোগ দিত।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ওদের ছাউনির কাছাকাছি চলে এসে আত্মগোপন করলেন।

উষ্ট্রারোহী দু'জন সুদানী সেনাপতিকে বললো, 'কয়েকদিনের মধ্যেই আইয়ুবী ফিলিস্তিনের দিকে যাবেন।'

সেনাপতি ভীষণ খুশী। আইয়ুবীর অনুপস্থিতিতে মিশর আক্রমণ করা যাবে এ আশায় ছাউনিতে অবস্থানের মেয়াদ আরো ক'দিন বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

পরের রাতে পাঁচটি মেনজানিক কামান এবং তরল দাহ্য পদার্থসহ পঞ্চাশ জন কমাণ্ডো সদস্যকে পাঠিয়ে দেয়া হলো। মাঝরাতে ঘুমিয়ে আছে সুদানী সৈন্যরা। রসদের স্থানে তরল পদার্থের ভাণ্ড এসে পড়তে লাগলো। এর পরেই উড়ে এলো আগুনের সলতে বাঁধা তীর।

জ্বলে উঠলো আগুন। ছুটাছুটি শুরু হলো ছাউনিতে, সাঁজোয়া বহর পেছনে সরিয়ে দিল কমাণ্ডোরা। তিন চার ভাগ হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ছাউনির ভেতর দিয়ে।

সুদানী সৈন্যরা কিছু বুঝে উঠার আগেই আইয়ুবীর লোকদের বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো ওরা। ওদের দলিত মথিত করে কমাণ্ডোদের ঘোড়াগুলো পৌঁছে গেলো অন্য প্রান্তে। মিশে গেলো মরুর অন্ধকারে।

আগুনের লেলিহান শিখায় ভয় পেয়ে ছাউনির উট ও ঘোড়াগুলো দিগ্বিদিক ছুটতে লাগলো। সুলতানের সওয়ার দল তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে গেলো।

রাতে আর আক্রমণ করলো না। আগুনে পুড়ে, ঘোড়ার পায়ে পিষে এবং তীরের আঘাতে নিহত হলো সুদানীদের চারশো লোক। রসদ এবং তীরের স্তুপ পুড়ে ছাই হয়ে গেলো ওদের।

অবশিষ্ট সৈন্যরা রাতেই অন্য স্থানে গিয়ে ছাউনি ফেললো। চারপাশে মাটির ঢিবি, লুকিয়ে থাকার মোক্ষম জায়গা। ভাবলো, এখানে আর অতর্কিত কমাণ্ডো হামলার ভয় নেই। এরপর ওরা আইয়ুবীর কমাণ্ডোদের হদিস পাওয়ার আশায় দূর দূরান্ত পর্যন্ত পাঠিয়ে দিল তাদের কিছু সৈন্যকে। কিন্তু তাদের সব ভাবনা চিন্তা ও সতর্কতাকে মিথ্যা প্রমাণ করে এরপরও আক্রমণ হলো গত রাতের মতো।

পেট্রোল ডিউটিরত দু'টি দল আইয়ুবীর কমাণ্ডো সদস্যদের হাতে মারা গেছে সুদানী সেনাপতি তা জানতো না। প্রথমে আগুনের সলতে বাঁধা তীর নিক্ষেপ করে পালিয়ে গেলো গেরিলারা। তারপর থেকে থেকে আক্রমণ চললো ভোর পর্যন্ত। গত রাতের চেয়ে এ রাতে ওদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক বেশী।

সন্ধ্যায় আলী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে বললেন, 'ওরা কমাণ্ডো বাহিনীর আস্তানা খুঁজে বের করার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।'

পরের রাতে সুলতান কোন আক্রমণ করলেন না। বললেন, 'ওরা বুঝুক, কমাণ্ডোরা ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।'

পরদিন। সুদানী ফৌজের ডান দিক দিয়ে চারশো এবং বাঁ দিক দিয়ে চারশো পদাতিককে আধা মাইল দূরত্ব রেখে এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন আইয়ুবী। সুদানীদের দু'পাশ দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা। যতই এগুচ্ছিল ততোই দু'দিকে সরে দূরত্ব বাড়াচ্ছিল। দু'পাশ থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে সুদানী ফৌজও দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। মাঝখানে সৃষ্টি হলো বড় ধরনের একটা ফাঁক।

অকস্মাৎ টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সুলতানের পাঁচশো অশ্বারোহী। সেই ফাঁক দিয়ে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়লো ওদের ভেতর। এরপর শুরু হয়ে গেলো

কেয়ামতের প্রলয়। আক্রমণের তীব্রতায় সুদানী ফৌজে সৃষ্টি হলো বিশৃংখলা। শুরু হলো দিগ্বিদিক ছুটাছুটি। দু'পাশ থেকে তীর ছুঁড়তে লাগলো আইয়ুবীর পদাতিক ফৌজ।

মাত্র তেরশো সৈন্যের আক্রমণে মুহূর্তে বিধ্বস্ত হয়ে গেলো সুদানের দু'হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। লাশে ভরে গেলো মরু ময়দান। বাকীরা হাতিয়ার ছেড়ে বন্দীত্ব কবুল করলো। পালিয়ে যাওয়া সৈন্যের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য।

সুদানীদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ সুলতান এভাবে ওদেরই রক্তে ডুবিয়ে দিলেন। এবার কৌশল নয়, বন্দীদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে বিদ্রোহে শরীক সকল কমাণ্ডার এবং কর্মকর্তাদের বন্দী করলেন। গোয়েন্দাদের গ্রেফতার করে দিলেন মৃত্যুদণ্ড।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সেনা কমাণ্ডারদের ডেকে বললেন, 'মিশরের প্রতিরক্ষার স্বার্থে যত শীঘ্র সম্ভব সুদান আক্রমণ করতে হবে।'

এ আক্রমণের পথে প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখা দিল খলিফা আল আযেদ। বাধ্য হয়ে খলিফা আল আযেদকে পদচ্যুত করে সুলতান আইয়ুবী ঘোষণা করলেন, 'এখন থেকে মিশর আব্বাসী খেলাফতের অধীন থাকবে। খেলাফতের কেন্দ্র থাকবে বাগদাদ।'

এরপর তিনি উম্মে আমারাকে আটজন দেহরক্ষীর সাথে নূরুদ্দিন জঙ্গীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে মনোযোগ দিলেন।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। কক্ষে পায়চারী করছেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। একপাশে বসে আছেন বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ এবং আলী বিন সুফিয়ান। আলীর দিকে তাকালেন সুলতান। বিষণ্ণ দৃষ্টি।

'আলী!' বেদনা ঝরে পড়ছে সুলতানের কণ্ঠ থেকে, 'জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব, কিন্তু উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালিপ্সু আমীর ওমরা এবং নেতারা জাতিকে গোপনে বিক্রি করে দেয়ার যে চক্রান্ত করছে, তা রোধ করা বড় কষ্টসাধ্য। তোমরা দেখেছো আমাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কোন অভিযোগ নেই। গাদ্দারী করছে শুধু বড়লোকেরা। আমার সাথে ওদের ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। শত্রুতা ক্ষমতার জন্য, গদির জন্য লালায়িত ওরা।'

জুন-জুলাইতে সুদানী বিদ্রোহ দমন করার পর পরই সালাহউদ্দিন আইয়ুবী খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। এর আগেও সুদানী সেনা বিদ্রোহ দমন করেছেন, বিদ্রোহী নেতা অথবা সেনা কমাণ্ডারদেরকে শাস্তি দেননি। কূটনীতি এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন।

এবার তা করেননি, পদ এবং মর্যাদার তোয়াক্কা না করে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। অধিকাংশকে দিয়েছেন মৃত্যুদণ্ড। কাউকে কারাদণ্ড দিয়েছেন, কাউকে বহিষ্কার করেছেন দেশ থেকে।

'দু'মাস ধরে দেশের উন্নয়ন এবং কল্যাণের দিকে নজর দিতে পারছি না।' সুলতান বললেন, 'অপরাধীদের আনা হচ্ছে, আদালত বসিয়ে বিচার করছি, বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। দুর্ভাগ্য আমাদের, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অধিকাংশই মুসলমান।'

'সম্মানিত আমীর।' মুখ খুললেন বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ, 'মুসলমান এবং কাফের সমান

অপরাধ করলে মুসলমানের শাস্তি বেশী হওয়া উচিত। তার কাছে এসেছে সত্য সুন্দর জ্যোতির্ময় দ্বীন। কাফেরের তো ধর্ম এবং বিবেকের দুয়ার রুদ্ধ। মুসলমানদের শাস্তি দিচ্ছেন বলে দুঃখ করবেন না। ওরা গাদ্দার, দেশদ্রোহী। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বেঈমানদের সাথে গাটছড়া বেঁধেছিল ওরা।'

'আমার দুঃখ অন্যখানে শাদ্দাদ। আমি শাসক হয়ে মিশরে আসিনি। সম্রাট হতে চাইলে মিশরের বর্তমান পরিস্থিতি তার জন্য উপযুক্ত। যে শুধু গদিকে ভালবাসে সে মিথ্যাবাদী এবং ষড়যন্ত্রকারীদের দলে টানে। চরিত্রহীন লোকেরা হয় তার বেশী আপন। গালভরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া ওরা জনগণকে কিছুই দিতে পারে না। তাদের অধীনস্তরা নিজেদেরকেই মনে করে দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা।

গদির জন্য ক্ষমতা আমার দরকার নেই, ক্ষমতা দরকার আমার স্বপ্ন পুরণের জন্য। আমি ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারি, যদি নিশ্চয়তা দিতে পারো, আমার চলার পথে কেউ বাঁধা সৃষ্টি করবে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি ঘর ছেড়েছি, তা যদি পূর্ণ করতে পারি, তবে আমার আর কোন দুঃখ থাকবে না।

মিশর এবং সিরিয়ার সাথে ঐক্য সৃষ্টির জন্য নুরুদ্দিন জঙ্গী হাজার হাজার জীবন কোরবান করেছেন। আরব মুজাহিদদের খুনে রঞ্জিন হয়েছে নীলের পানি। এই সাম্রাজ্যের সীমা আরো বিস্তৃত করতে হবে। সুদানকে মিশরের সাথে একীভূত করে খৃষ্টানদের নিয়ে যেতে হবে মধ্য ইউরোপে। কারো রাজ্য বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং খোদার হুকুম প্রতিষ্ঠার জন্যই এ বিজয় প্রয়োজন। কিন্তু মিশর আমার জন্য চোরাবালিতে পরিণত হয়েছে। এমন একটা এলাকার কথা বলো, যেখানে ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ আর গাদ্দারী নেই!'

'এসব ষড়যন্ত্রের পেছনে খৃষ্টানদের হাত রয়েছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান, 'ভাবতেও অবাক লাগছে, নিজের যুবতী মেয়েদেরকে অশ্লীলতার ট্রেনিং দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে ওদের বিবেকে বাঁধছে না। তাদের মনভুলানো হাসি, চোখ ধাঁধাঁনো রূপ, টলটলে যৌবন, পটলচেরা কটাক্ষ, মধুভরা কন্ঠের আকর্ষণ থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা না গেলে জাতির পতন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এ বড় কঠিন অস্ত্র।'

আইয়ুবী বললেন, 'আর এ কঠিন অস্ত্রের মোকাবেলা করা হচ্ছে আরো কঠিনতর। 'দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় কান দিও না' বলে যতই কবিতা আওড়াও, বাস্তবে তা কোন কাজে আসে না। জিহবা যাদু জানে। ভাষার আঘাত তলোয়ারের চেয়েও তীব্র। ওরা তোমার দুর্বলতা বুঝে এমন ভাষা ব্যবহার করবে, যা তোমার তরবারী কোষবদ্ধ করতে বাধ্য করবে। স্বেচ্ছায় তুমি দুশমনের পদতলে রেখে দেবে তোমার অস্ত্র।'

তিনি আরো বললেন, 'আমাদের চাইতে খৃষ্টানদের দু'টি হাতিয়ার বেশী আছে। একটি প্রতারণার যাদু, অন্যটি মানুষের পাশব শক্তি উস্কে দেয়ার ক্ষমতা। এ পাশব শক্তিকে উস্কে দেয়ার জন্যই ওরা ব্যবহার করছে সুন্দরী তরুণীদের। মুসলমান আমীর ওমরা এবং শাসকদের হৃদয় থেকে ওরা মুছে দিচ্ছে ন্যায়-অন্যায় বোধ। শুধু শাসকদের মন থেকেই নয়, সম্মানিত আমীর এমনকি সাধারণ মানুষও এখন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অশ্লীলতার বান ডেকেছে অভিজাত ও বিত্তশালী মুসলমানের ঘরে ঘরে, এটা

খৃষ্টানদের বড় রকমের সাফল্য।'

'আর এটিই হচ্ছে আমাদের জন্য সবচে বড় সমস্যা।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমি সমগ্র খৃষ্টান শক্তির মোকাবিলা করতে পারি, কিন্তু তাদের এ আঘাত সামাল দিতে পারছি না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি শিউরে উঠছি। এ অবস্থা চলতে থাকলে মুসলমান থাকবে শুধু নামে। খৃষ্টানদের মতোই হবে ওদের সভ্যতা সংস্কৃতি। অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনায় ওদেরকেও ছাড়িয়ে যাবে মুসলমানরা। তুমিই বলো, আমার স্বভাব ও আচরণ যদি একজন অমুসলমানের মতোই হয়, তবে আমাকে মুসলমান বলার স্বার্থকতা কি?'

'যথার্থ বলেছেন সুলতান। কিন্তু এর কারণ হচ্ছে, মুসলমানের দুর্বলতা। ওরা আপন পর চিনে না। বন্ধু আর শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। সহজেই দুশমনের আকর্ষণীয় ফাঁদে আটকে যায় ওরা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু দুর্বলতা কেবল মুসলমানের নয়, খৃষ্টানদেরও আছে। সে ফাঁকও আমাদের তালাশ করতে হবে। যুদ্ধে জেতার এটাই প্রথম শর্ত। খৃষ্টানদের দুর্বলতা হচ্ছে, মুসলমানের বিরুদ্ধে ওরা ঐক্যবদ্ধ হলেও নিজেদের মধ্যে আছে প্রচণ্ড রেশারেশি। ফ্রান্স এবং জার্মান একে অপরের শত্রু। বৃটেন এবং ইটালী কেউ কাউকে পছন্দ করে না। মুসলমানরা খৃষ্টানদের শত্রু বলেই কেবল ওরা একত্রিত হয়েছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওদের মধ্যে রয়েছে বিভেদ ও অনৈক্য। কিন্তু আমরা ওদের এ দুর্বলতায় আঘাত করতে পারছি না।'

'অথচ ওরা আমাদের ঠিকই আঘাত করে চলেছে। নিজেদের বিভেদ ভুলে অর্থবিত্ত আর নারীর রূপের ফাঁদে ফেলে বন্দী করছে মুসলমানদের আত্মাগুলো।'

'কিন্তু মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়ে একবার ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে, ওরা অল্প সময়ের মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো। কিন্তু ঐক্যের বদলে আমরা কেবল বিভেদই বাড়িয়ে তুলছি। আফসোস! ফাতেমী খেলাফত বাতিল করে আমি এ শত্রুর সংখ্যা আরো বাড়িয়ে তুলেছি। গদির জন্য ফাতেমীরা এখন সুদানী ও খৃষ্টানদের সাথে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।'

'কিন্তু এ ষড়যন্ত্রও গুঁড়িয়ে দিতে হবে, যেভাবে কাল ওদের একজন কবিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।' আলী বললেন।

'কিন্তু আমি তো এমনটি চাইনি আলী! তুমি জানো না, আম্মারাতুল ইয়ামানীর কবিতা আমিও পছন্দ করতাম। আমার হৃদয়েও দাগ কেটেছিল তার কবিতা। তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে গিয়ে আমি তৃপ্তি নয়, দুঃখই পেয়েছি শুধু। কিন্তু তার সাম্প্রতিক কবিতার মধ্য দিয়ে সে নিজেকে মুরতাদ বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিল। নিজের পছন্দের কারণে মুরতাদের শাস্তি মওকুফ করার কোন অধিকার আল্লাহ আমাকে দেননি। শব্দ ও ছন্দের আগুন দিয়ে ইসলামের ঘর জ্বালাতে গিয়ে নিজেই তার আগুনে পুড়ে মরেছে সে।'

আম্মারাতুল ইয়ামানী ছিল একজন নামকরা কবি। তখনকার সময় মানুষ কবিকে পীরের মতো সম্মান ও ভক্তি করতো। তার কাব্যের ছন্দ এবং শব্দ সৈন্যদের মাঝে সৃষ্টি করতো নতুন আবেগ-উদ্দীপনা। খৃষ্টানরা এ কবিকে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিল। খৃষ্টানদের

থপ্পড়ে পড়ে আম্মারাতুল ইয়ামানী সমাজে তার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানো শুরু করলো ইসলামের বিরুদ্ধে। মানুষকে যৌন সুড়সুড়ি দেয়া, হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ানো, যুদ্ধের নামে বর্বরতার জয়গান এবং মানুষের মনে ফাতেমী খেলাফতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য এ কবি উঠে পড়ে লেগেছিল। তার কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছিল সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও মুজাহিদদের বিরোধিতা। এ জন্য খৃষ্টান ও ফাতেমীরা নিয়মিত অর্থ যোগান দিত তাকে। তার শেষ কবিতা ছিলঃ

'ফাতেমী খেলাফতকে ভালবাসার অপবাদ দিচ্ছো আমায়।
আমাকে তোমরা অভিশাপ দাও। অথচ
আমার কাছে তোমরাই অভিশপ্ত।
অশ্রু ঝরাও ফাতেমীদের মহলের প্রাচীরে, দেয়ালের গায়।
মহলে এখনো যারা আছে তাদের বলো,
তোমাদের জন্য যে ক্ষত হয়েছে আমার হৃদয়ে
তা মুছবে না কখনো, না কখনোই মুছবে না।
দুর্ভাগ্য ফাতেমীদের,
তাদের এ দুর্ভাগ্যের কারণ যে মানুষটি
সে আইয়ুবীকে আজো কোন দুর্ভাগ্য স্পর্শ করলো না।
ফাতেমীদের প্রতি এ আল্লাহর সীমাহীন জুলুম।
আল্লাহর কি একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেলো
যে জন্য এই একচোখা নীতি!
অশ্রু ঝরাও নারী, অশ্রু ঝরাও শিশু
রক্ত ঝরাও সাহস করে, বদলা দেবেন যিশু।'

তার বাড়ীতে তল্লাশী নেয়া হলো। দেখা গেলো, শুধু ফাতেমীরাই নয়, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য তাকে নিয়মিত অর্থ ও উপঢৌকন দিতো খৃষ্টানরাও। খৃষ্টান সম্রাটদের পত্র পাওয়া গেলো তার ঘর থেকে। সে চিঠি থেকেই জানা গেলো, সে কেবল একজন কবিই নয়, একজন গুপ্তচরও। মূলতঃ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল এই গোয়েন্দাগিরি ও গাদ্দারীর অভিযোগে।

'যে জাতির কবিরা দুশমনের কাছে বিকিয়ে দেয় নিজের আত্মা ও বিবেক, সে জাতির ভাগ্যে অপমান এবং লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি থাকতে পারে?' বললেন সুলতান।

প্রহরী ভেতরে এসে বললো, 'পদচ্যুত খলিফার দূত এসেছে।'

আইয়ুবীর কপাল কুঞ্চিত হলো। বললেন, 'খেলাফতের গদি ছাড়া এ বুড়ো আমার কাছে আর কি চাইতে [illegible] দূতকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

দূত ভেতরে এসে সালাম দিয়ে বললো, 'খলিফার সালাম গ্রহণ করুন।'

'তিনি খলিফা নন।' সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বললেন, 'দু'মাস আগেই তাকে পদচ্যুত করা হয়েছে। আল আযেদ এখন গৃহবন্দী।'

'ক্ষমা চাইছি মাননীয় সুলতান। পুরনো অভ্যাস, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। আল আযেদ আপনাকে সালাম দিয়ে বলেছেন, তিনি ভীষণ অসুস্থ। বিছানা থেকে উঠতে

পারছেন না। আপনার সাথে দেখা করার ইচ্ছে। সম্মানিত আমীর, একটু কষ্ট স্বীকার করলে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিজের ঠোঁট কামড়ে বললেন, 'তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, কারণ কি? তিনি কি এখনো নিজেকে খলিফা মনে করেন?'

'তা নয় মহামান্য সুলতান! তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রাসাদের ডাক্তার সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি হার্টের রোগী। একটু রাগ হলেই রোগ বেড়ে যায়। এখন তো বিছানা থেকেই উঠতে পারেন না।' দূত একটু থেমে সংকোচ জড়ানো কণ্ঠে বললো, 'আপনাকে একা যেতে বলেছেন। গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় কথা আছে। অন্য কারো সামনে তা বলা যাবে না।'

'তাঁকে সালাম দিয়ে বলো, আইয়ুবী গোপন কথা সবই জানেন। এখন তিনি যেন খোদার সাথেই গোপন কথা বলেন। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।' নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো দূত।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বললেন, 'তিনি আমায় একা যেতে বলেছেন। এতে কোন ষড়যন্ত্র নেই তো?'

'আমার মনে হয় প্রাসাদে ডেকে নিয়ে তিনি আপনাকে শেষ করে দিতে চাচ্ছেন।'

প্রহরীকে ডাকলেন আইয়ুবী। বললেন, 'ডাক্তারকে সালাম দাও।'

ডাক্তার এলে সুলতান বললেন, 'আল আযেদের কাছে যাও। আমি জানি তিনি অনেক দিন থেকেই অসুস্থ। হয়তো তার পারিবারিক ডাক্তার নিরাশ হয়ে গেছে, তুমি গিয়ে তার চিকিৎসা করো। অবস্থা মারাত্মক হলে আমাকে খবর দিও।'

সাবেক খলিফা আল আযেদ তার প্রাসাদে গৃহবন্দী। তার প্রাসাদ ছিল পৃথিবীর স্বর্গ। হারেমের শোভা বৃদ্ধি করেছিল দেশ-বিদেশের রূপসী যুবতীরা। তন্বী তরুণী দাসী বাঁদীর সংখ্যা ছিল অগণিত। বিশাল দেহরক্ষী বাহিনী সবসময় প্রস্তুত থাকতো। সেনা অফিসাররা দাঁড়িয়ে থাকতো তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য।

সুলতান আইয়ুবীর নতুন বিপ্লব মহলের চেহারা বদলে দিল। খলিফার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হলেও তার ভোগবিলাস সামগ্রীতে হাত দেয়া হয়নি, কেবল সামরিক গার্ড বাহিনীকেই সরিয়ে নেয়া হয়েছে। প্রহরী হিসেবে কিছু সৈন্য রয়েছে, যাদের কাজ এখন পাহারার সাথে সাথে ষড়যন্ত্রের এ কেন্দ্রের প্রতি গভীরভাবে নজর রাখা।

গৃহবন্দী আল আযেদ একে তো বৃদ্ধ, তার ওপর হার্টের রোগী। গদি হারানোর অপমান ও দুশ্চিন্তা, বয়সের ভার আর অতিরিক্ত মদপান ও ভোগবিলাস তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল।

ক'দিনেই তাঁর চেহারা মরার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দু'জন আধ বয়সী মহিলা এবং একজন চাকর ছাড়া তার কক্ষে কেউ নেই। বৃদ্ধ চোখ খুলে ওদের দেখে আবার বন্ধ করে নিলেন চোখ।

একটু আগে ডাক্তার তাকে ওষুধ খাইয়েছেন। হারেমের দু'জন যুবতী ভেতরে ঢুকলো। একজন তার হাত নিজের হাতে নিয়ে শরীরের অবস্থা জানতে চাইলো। অন্যজন

দু'হাতে তাকে ধরে সুস্থ হওয়ার জন্য দোয়া করলো। এরপর পরস্পর চোখের দিকে তাকিয়ে একজন বললো, 'বিশ্রাম করুন। এখন আপনার বিশ্রাম নষ্ট করা ঠিক হবে না। আমরা পাশের কামরায় আছি, প্রয়োজন হলে ডাকবেন।' দু'জনই কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো।

আল আযেদ দীর্ঘশ্বাস টেনে পাশের মহিলাকে বললেন, 'এরা আমার সেবা করতে আসেনি। দেখতে এসেছে আমি কখন মরবো। আমার সম্পদের সাথেই ওদের সম্পর্ক। ওরা শকুন, ওরা শুধু আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। ওদের লোলুপ দৃষ্টি আমার সম্পদের দিকে। তোমরা তিনজন ছাড়া আমার সমব্যথী আর কেউ নেই। না, কেউ নেই, কেউ নেই! যারা ফাতেমী খেলাফতের নামে শ্লোগান তুলতো তারা এখন কোথায়?'

বুকে হাত চেপে পাশ ফিরলেন বৃদ্ধ। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তাঁর। দূত কক্ষে প্রবেশ করে বললো, 'গভর্ণর আসতে অস্বীকার করেছেন।'

'হায় হতভাগ্য আইয়ুবী।' আল আযেদের কণ্ঠে বিষণ্ণতা, 'আমার মৃত্যুর পূর্বে একবার তো আসতে পারতে!'

তাঁর বুকের ব্যথা বেড়ে গেলো। থেমে থেমে ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি ডাকলে দাসীবাঁদীরাই এখন আসে না, মিশরের গভর্ণর আসবেন কেন? এ সবই আমার পাপের শাস্তি। আমার রক্তের সম্পর্কের কেউ এখন পর্যন্ত আসেনি, ওরা আসবে জানাযায়, প্রাসাদের যা পাবে নিয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ ব্যথায় কাৎরালেন তিনি। দু'জন সেবিকা আতংক নিয়ে তার কথা শুনতে লাগলো। সান্ত্বনা দেয়ার কোন ভাষা এলো না ওদের মুখে। ওরা সে খোদার অভিশাপকে ভয় পাচ্ছিল, যিনি আমীরকে ফকীর আর সম্রাটকে ভিক্ষুকে পরিণত করেন।

ঘরের ভেতর কারো ছায়া পড়লো। চকিতে দরজার দিকে তাকালো ওরা। দেখলো শুভ্রকেশধারী এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়।

ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে এলেন আল আযেদের কাছে। নাড়িতে হাত রেখে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি গভর্ণরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। আপনার চিকিৎসার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'আমাকে দেখে যাওয়ার সৌজন্যতাটুকুও গভর্ণর হারিয়ে ফেলেছেন? আমি ডাকলাম, তারপরও এলো না!'

'কি জানি, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তিনি আমাকে ডেকে আপনার চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন, তা না হলে আমায় পাঠাতেন না।'

আল আযেদ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ডাক্তার তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন, 'আপনি এখন কথা বলবেন না, তাহলে আপনার রোগ বেড়ে যেতে পারে।'

'আমার চিকিৎসা হয়ে গেছে, যা বলছি মন দিয়ে শোন। এর প্রতিটি শব্দ আইয়ুবীকে পৌঁছে দেবে। নাড়ি থেকে হাত সরাও। তোমাদের পৃথিবীর চিকিৎসা এবং ওষুধ থেকে আমি এখন অনেক দূরে। আইয়ুবীকে বলো, আমি তার শত্রু নই। দুশমনের চালে আটকে গিয়েছিলাম। আমার অথবা সালাহউদ্দিনের দুর্ভাগ্য, এমন সময় অপরাধ স্বীকার

করছি, যখন আমি মাত্র কয়েক মুহূর্তের অতিথি।

সালাহউদ্দিনকে বলো, আমার হৃদয়ে সবসময়ই তার জন্য স্নেহ ছিল। তার জন্য ভালবাসা বুকে নিয়েই আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। টাকা পয়সা এবং গদির লোভ আমার সব ভালবাসা কেড়ে নিয়েছিল। লোভ এবং মোহ আমার হৃদয়কে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যা আমাকে ইসলাম থেকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। এ ছিল আমার মস্তবড় ভুল। আজ আমার নেশা ছুটে গেছে।

আমার পায়ের কাছে বসে যারা কথা বলতো, তারা এখন আমাকে চেনে না। যেসব দাসীবাঁদী আমার চোখের ইশারায় নাচতো, তারা আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। উলংগ নৃত্য করেছে যেসব মেয়েরা, ওরাও আমাকে ঘৃণার চোখে দেখছে।

মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং আল্লাহর কাছেই মানুষকে আবার ফিরে যেতে হবে। সেখানে কারো পাপের বোঝা কেউ বহন করবে না– মানুষের কথায়, চাটুকারদের চাটুকারিতায় এ সত্যকে ভুলে যাওয়া ছিল আমার জীবনের সবচে বড় বোকামী। এ ভুল আমি করেছি।

ওসব কমবখতের দল আমাকে খোদার আসনে বসিয়েছিল। যখন আসল খোদার ডাক এসেছে, চোখ খুলে গেছে আমার। আমি বুঝতে পারছি, অপরাধ স্বীকার করার মধ্যেই আমার মুক্তি। সালাহউদ্দিনকে এমন সব তথ্য দেবো যা সে জানে না। তাকে বলো, আমার গার্ড বাহিনীর কমান্ডার রজব মরেনি। সুদানের কোথাও না কোথাও সে আত্মগোপন করে আছে। সে আমাকে বলে গেছে, ফাতেমী খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সে সুদানী এবং আইয়ুবী বিরোধী মিশরীদের নিয়ে সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে। সামরিক সাহায্য নেবে খৃস্টানদের কাছ থেকে।

সালাহউদ্দিনকে বলো, তার দেহরক্ষীদের দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে। রাতে যেন একা বের না হয়। রজব তাকে হত্যা করার জন্য ঘাতক বাহিনীর সাথে চুক্তি করেছে। মিশর তার জন্য এক জলন্ত আগ্নেয়গিরী।

তাকে বলো, যাদের তুমি বন্ধু মনে করো, তারা সবাই তোমার বন্ধু নয়, এদের মাঝে অনেক শত্রুও আছে। ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যারা তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায় তাদের মধ্যেও রয়েছে খৃস্টানদের পালিত সাপ। এমন অনেক আলেম পাবে, ক্ষমতার লোভেই যারা ইসলামের পক্ষে কথা বলে।'

তিনি কয়েকজন লোকের নাম করে বললেন, এদেরকে তোমরা মনে করো মস্ত বড় মুজাহিদ। অসংখ্য নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ তাদের পিছনে জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তারা জানে না, এরা কখনো চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। ওরা মুখে বলে পরকালের কথা, কিন্তু বাস্তবে পুঞ্জীভুত সম্পদ ও ক্ষমতা হারাবার ভয়ে সব সময় অস্থির থাকে। একদিন হয়তো তারাও নিবেদিতপ্রাণ ছিল, কিন্তু যতই ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা বাড়ছে, ততই তা হারাবার ভয়ও বাড়ছে, আর এ ভয় তাদেরকে ইসলাম থেকে ঠেলে দিচ্ছে দূরে। কেউ কেউ এগিয়ে গেছে আরো এক ধাপ। দুনিয়ার মোহে উপরে দ্বীনের শ্লোগান দিচ্ছে আর গোপনে শত্রুর সাথে হাত মিলাচ্ছে।

এদেরই একজন ফয়জুল ফাতেমী, সেনা সদর দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছে সে।

বন্ধু ভেবে তাকে অনেক বড় পদ দিয়ে রেখেছে আইয়ুবী। সে তোমাদের বন্ধুবেশী দুশমন। তোমরা জানো না, কিন্তু আমি জানি সে রজবের দোসর।

সেনাবাহিনীর মধ্যে তুর্কী, সিরীয় এবং অন্যান্য আরব বংশোদ্ভূত সদস্যদের ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করো আইয়ুবীকে। ওরাই তার অনুগত এবং ইসলামের সৈনিক।

মিশরী সৈন্যদের মধ্যে বিশ্বস্ত অবিশ্বস্ত দু'দলই আছে। আইয়ুবী যখন সুদানীদের আক্রমণ করেছিল দুটো প্লাটুনের কমাণ্ডার সৈন্যদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। আরব সৈন্যরা কমাণ্ডারের নির্দেশ উপেক্ষা করেই আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল, তা না হলে যুদ্ধের ফল হতো উল্টো।'

আল আযেদ ক্ষীণ কণ্ঠে থেমে থেমে বলে যাচ্ছেন। ডাক্তার বাঁধা দিয়েছেন কয়েকবার, তিনি হাতের ইশারায় তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছেন। ঘামে ভিজে যাচ্ছে তার শরীর, যেন কেউ পানি ছিটিয়ে দিয়েছে তার সারা শরীরে।

ঘাম মুছছে দু'জন সেবিকা। মনে হয় ঝর্ণা বইছে শরীর থেকে। তিনি সামরিক বেসামরিক কয়েকজন কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করে খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রের বর্ণনা দিলেন। বললেন, 'এসব কর্মকর্তাদের মুসলমান মনে করো না। ওরা নিজেদের ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে। ওকে বলো, আল্লাহ তোমাকে সফল করবেন। তবে তাকে মনে রাখতে বলবে, যারা তাকে ঘিরে রেখেছে তাদের মধ্যেই একদল রয়েছে ধোঁকাবাজ, অন্যদল চাটুকার। চাটুকাররা খোদার আসনে বসিয়ে তোমাকে নিঃশেষ করে দেবে। ওরা মোনাফেকের চেয়েও বেশী ক্ষতিকর। দুশমনকে পদানত করে তুমি যখন নিশ্চিন্তে মসনদে বসবে, তখন আমার মতো দুই জাহানের সম্রাট হয়ে যেও না। রাজত্ব আল্লাহর। ফেরাউনের প্রাচীন চিহ্নগুলো দেখো, দেখো আমার পরিণতি, তুমি নিজেকে এ পরিণতি থেকে রক্ষা করে চলো।'

জড়িয়ে এলো আল আযেদের কণ্ঠ। চেহারার বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে ফুটে উঠলো প্রশান্তি। আবারো কিছু বলতে চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু চিরদিনের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ। মাথা কাত হয়ে গেলো এক দিকে। শেষ হয়ে গেল আল আযেদের দুনিয়ার সফর।

এ ঘটনা ঘটেছিল ১১৭১ সনে।

ডাক্তার সুলতানের কাছে খবর পাঠালেন। প্রাসাদেও এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। কান্না দূরে থাক, সামান্য আফসোসও কেউ করলো না। শুধু সেবিকা দু'জনের চোখ ছিল অশ্রুভেজা।

সংবাদ পেয়েই সুলতান কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তাকে নিয়ে প্রাসাদে পৌঁছলেন। চাকর বাকরদের তৎপরতায় তার মনে সন্দেহ জাগলো। তিনি পাহারাদারদের কমাণ্ডারকে ডেকে বললেন, 'প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষে ঢুকে নারী পুরুষ এবং হারেমের যুবতীদেরকে বাইরের বারান্দায় বসিয়ে রাখো। যতবড় প্রয়োজনই হোক, কাউকে বাইরে যেতে দেবে না। আস্তাবলেও কাউকে যেতে দেবে না। গোটা প্রাসাদ নিজের কব্জায় রেখো।'

কি আশ্চর্য! সুলতান লক্ষ্য করলেন, যেই আল আযেদ ছিলেন এক সম্রাট, নারী আর

মদ ছিল যার জীবন, যার হারেমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল অগণিত রূপসী তরুণী, চাকর বাকর দাস দাসীতে গমগম করেছে যার মহল, তার জন্য এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলার মতো কোন লোক নেই।

ডাক্তার সুলতানকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে আল আযেদের অন্তিম কথাগুলো শুনিয়ে বললেন, 'আপনার আসা উচিত ছিল।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাকে বললেন, 'আল আযেদকে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। যে ঈমান বিক্রি করে দেয় তাকে আর সহজে বিশ্বাস করা যায় না।'

ডাক্তারের কাছ থেকে আল আযেদের শেষ কথাগুলো শুনে সুলতান দুঃখ করে বললেন, 'আমি এলে আরো কিছু তথ্য বের করতে পারতাম।'

আল আযেদ যদিও বিলাসপ্রিয় ছিলেন এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বিরোধী ষড়যন্ত্রে তিনি সহযোগিতাও করেছেন, তবুও আইয়ুবীর জন্য সত্যি তাঁর আন্তরিক ভালবাসা ছিল। সুলতান বুঝতে পারলেন, আল আযেদের এ আহবানে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না। তার অন্তিম কথাগুলো শুনতে পারেননি বলে সুলতান দীর্ঘদিন অনুতাপ করেছিলেন।

আলীকে ডাকলেন সুলতান। আল আযেদের দেয়া নামগুলো দিয়ে বললেন, 'এদের পেছনে গোয়েন্দা লাগাও। প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। কারো প্রতি যেন ন্যূনতম জুলুমও না হয়।' পরে প্রমাণিত হলো, আল আযেদের দেয়া প্রতিটি লোকই ষড়যন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত।

সুলতান আল আযেদের দাফনের ব্যবস্থা করলেন, দাফন করা হলো সাধারণ কবরস্থানে। কালের প্রবাহে সে কবরের চিহ্ন মুছে গেছে।

মহলে তল্লাশী নেয়া হলো। সোনা রূপা এবং সম্পদের স্তুপ দেখে হতবাক হয়ে গেলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

হারেমের রূপসী এবং অন্যান্য যুবতীদেরকে আলীর হাতে দিয়ে সুলতান বললেন, 'খোঁজ খবর নিয়ে যার যার বাড়ীতে পৌঁছে দাও। ফিরিংগী এবং অমুসলিম মেয়েদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নাও। সন্দেহ হলে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করো।'

এরপর প্রাসাদের সমস্ত ধন সম্পদ সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালগুলোতে বন্টন করে দিলেন।

মৃত্যুর পূর্বে আল আযেদ বলেছিলেন, 'রজব বেঁচে আছে। ফৌজ তৈরী করছে আইয়ুবীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য।'

এ খবর শুনে দু'জন দুঃসাহসী গুপ্তচর বাছাই করলেন আলী বিন সুফিয়ান। দু'জনই রজবের পূর্ব পরিচিত। ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ওদেরকে সুদান পাঠিয়ে দেয়া হলো। নির্দেশ দেয়া হলো রজবকে জীবিত ধরে আনতে। সম্ভব না হলে হত্যা করতে।

গুপ্তচর দু'জন সুদানের পথ ধরলো। রজব তখন সুবাক কেল্লায়। সুবাক ফিলিস্তিনের খৃষ্টানদের হেড কোয়ার্টার। এখান থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করে ওরা।

ওদের অত্যাচারে মুসলিম পরিবারগুলো দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। কারো ইজ্জত নিরাপদ নয়। ফিলিস্তিনের খৃষ্টানরা ডাকাতের ভূমিকায় লুন্ঠন করছে মুসলমানদের

কাফেলা। মেয়েদের অপহরণ করছে। এ কারণেই সুলতান আইয়ুবী ফিলিস্তিন অধিকার করতে চাচ্ছিলেন।

মুসলমানদের প্রথম কিবলা ওরা দখল করে রেখেছে। আকাশ বাতাস ভারী হয়ে আছে নির্যাতীত মানুষের বুক ফাটা কান্নায়। ইজ্জত আব্রু লুণ্ঠিত নারীর অশ্রু শুষে নিচ্ছে মরুর বালুকারাশি। কিন্তু মুসলমান আমীর ওমরাদের সম্পর্ক সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে অভিজাত খৃষ্টানদের সাথেই বেশী।

রজব আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সামরিক সাহায্যের জন্য এসেছে সুবাক ঘাটিতে। তার সম্মানে নৃত্যগীতের আসর জমানো হলো। নর্তকীদের অধিকাংশই মুসলমান। অল্প বয়সে অপহরণ করে ওদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে পুরুষ ঘায়েলের জন্য। রজব একবারও ভাবলো না, স্বজাতির মেয়েরা অমুসলিমের আসরে উলঙ্গ নাচছে। সে উপভোগ করছে আর মদপান করছে। সাথে দু'জন মুসলমান কমাণ্ডার। রাতভর আসরে মত্ত হয়ে রইলো ওরা।

কথা শুরু হলো সকালে, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুইলজিনান এবং কোনার্ড। এ ছাড়াও ছিলেন ক'জন পদস্থ সামরিক অফিসার।

রাতে রজব ওদের বলেছিল, 'আইয়ুবী সুদানে এক কাফ্রী গোত্রের মন্দির ভেঙে দিয়েছে। হত্যা করেছে পুরোহিতকে। সুদানীরা আক্রমণ করেছিল, সফল হয়নি। সে খলিফা আল আযেদকে সরিয়ে মিশরকে আব্বাসী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। এতে মনে হয়, আইয়ুবী মিশরের একচ্ছত্র সম্রাট হতে চাচ্ছে।'

রজব মিটিংয়ে আরো বললো, 'আমি সামরিক সাহায্যের জন্য এসেছি। সুদান ফিরে ফৌজ তৈরী করবো। মিশরের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার জন্যও আমি আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।'

'এ মুহূর্তে দু'টি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত।' বললেন কোনার্ড, 'যে গোত্রের মন্দির ভাঙা হয়েছে তাদেরকে প্রতিশোধের জন্য উত্তেজিত করা। অন্যদিকে সুদানের সব ধর্মের লোকদের বলা যে, সুলতান আইয়ুবী অন্য ধর্মের ইবাদতখানা, দেবতা এবং মূর্তি ভেঙে ফেলে। আঘাত হানে অন্য ধর্মের ওপর। সে যতদিন বেঁচে থাকবে কোন ধর্মই নিরাপদ নয়। ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি করে সুদানীদেরকে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়।'

'মিশরের মুসলমানদেরকেও আমরা আইয়ুবীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারবো।' এক খৃষ্টান কমাণ্ডার বললো, 'মিঃ রজব, মনে কিছু না করলে বলবো, মুসলমানদের ভেতর ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি করে একজনকে দিয়ে অন্যজনকে হত্যা করানো কঠিন নয়। আমাদের ধর্মে বান্দা এবং খোদার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন পাদ্রীরা। ইসলামেও কোন কোন ইমাম মসজিদ দখল করে খোদার এজেন্সি নিয়ে বসে আছে।

আমাদের সম্পদ আছে। টাকা দিয়ে মৌলভী তৈরী করে আমরাও মিশরের মসজিদে বসিয়ে দিতে পারি। তুমি শুনলে খুশী হবে, আমরা অনেক খৃষ্টানকে কোরআন ও ইসলামের জ্ঞানে পারদর্শী করে তুলেছি। ওদেরকে সহজেই মুসলমান এলাকায় পাঠিয়ে ইমাম হিসেবে বিভিন্ন মসজিদে ঢুকিয়ে দেয়া যাবে। সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে মসজিদে

কিছু বলার প্রয়োজন নেই ওদের। ওরা ওয়াজের মাধ্যমে মানুষকে কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলবে। ইসলামের সঠিক চেহারা যাতে সাধারণ মুসলমান দেখতে না পায় সে জন্য সঠিক ইসলামের সাথে ভেজাল মিশিয়ে দেবে ওরা। জনগণ বিকৃত ইসলামে আশ্রয় নিলে স্বাভাবিকভাবেই আইয়ুবীর দাপট কমে যাবে।'

'এ কাজ এখনি শুরু করা উচিত।' বললো রজব, 'আইয়ুবী মিশরে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছে। শিশু-কিশোর, যুবক সবাই ওখানে ধর্মের সঠিক শিক্ষা পাচ্ছে। সে আসার পূর্বে মিশরে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। লোকজন মসজিদের খোৎবা শুনতো, যেখানে বেশীর ভাগ থাকতো খলিফার প্রশংসা। মানুষের জ্ঞানের চোখ খুলে গেলে আমাদের কাজ করতে কষ্ট হবে। দেশ শাসন করতে হলে মানুষকে দৈহিক এবং মানসিকভাবে পরনির্ভরশীল রাখতে হয়।'

'মিঃ রজব!' এক কমাণ্ডার মৃদু হেসে বললো, 'আপনার দেশে গোপনে কি হচ্ছে তাই জানেন না আপনি। সালাহউদ্দিন যেদিন আমাদের রোম উপসাগরের পাড়ে পরাজিত করেছিল, সেদিন থেকেই এ কাজ শুরু হয়েছে। আমরা সরাসরি কিছু করার পক্ষে নই, তবে মানসিকভাবে গোঁড়া মুসলমানদের বিকলাঙ্গ করার জন্য সবকিছুই করা হচ্ছে।

ভেবে দেখুন, দু'বছর আগে কায়রো শহরে কয়টা প্রমোদভবন ছিল, আর এখন ক'টা? বিত্তশালী পরিবারের তরুণ তরুণীরা অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনায় ডুবে যায়নি? আমাদের পাঠানো খৃষ্টান মেয়েরা মুসলমানের ছদ্মবেশ নিয়েছে। মুসলিম যুবকদের ভালবাসার জালে ফেলে একজনকে দিয়ে আরেকজনকে হত্যা করাচ্ছে। কায়রোর স্থানে স্থানে এখন আকর্ষণীয় জুয়ার আখড়া গড়ে উঠেছে। দুটো মসজিদে রয়েছে আমাদের পাঠানো ইমাম। ওরা ইসলামের রূপ পাল্টে দিচ্ছে। জেহাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছে ভিন্নভাবে।

ওখানে আলেমের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে আমাদের বেশ কিছু লোক। ওরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বুঝাচ্ছে। বন্ধু এবং শত্রুর ধারণা পাল্টে দিচ্ছে। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, ক'বছর পর ওরা নিজেরা মুসলমান বলে গর্ব করলেও ওদের মনমানসিকতায় থাকবে খৃষ্টানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি। ওরা কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়, চিন্তা করবে আমাদের মস্তিষ্ক দিয়ে।'

'সালাহউদ্দিনের গোয়েন্দারা অত্যন্ত সতর্ক।' রজব বললো, 'গোয়েন্দা প্রধান আলীকে শেষ করতে পারলে আইয়ুবী অন্ধ এবং বধির হয়ে যাবে।'

'এর অর্থ আপনি নিজে কিছুই করতে পারছেন না!' কোনার্ড বললো 'একজন সরকারী কর্মচারীকেও আপনি হত্যা করতে পারছেন না। এতটা বুদ্ধিহীন হলে আমাদের লোকদেরকেও ধরিয়ে দেবেন। ওরাও মারা পড়বে, অহেতুক নষ্ট হবে আমাদের সম্পদ।'

'ঠিক আছে, এ কাজ আমি নিজেই করবো। ঘাতকদলের সাথে কথা বলেছি, ওরা সালাহউদ্দিনকে হত্যা করতে প্রস্তুত।'

'আপনি সুদানের দিক থেকে মিশর সীমান্তে অশান্তি সৃষ্টি করবেন।' কোনার্ড বললেন, 'দেশের ভেতরে আমরা ওদের সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস করার তৎপরতা চালাবো। আরবের কয়েকজন আমীর ওমরাকে আমরা হাত করে নিয়েছি। মুসলমানদের মধ্যে

এখন দুটো লোকই বেঁচে আছে, নূরুদ্দিন জঙ্গী এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। ওদের শেষ করতে পারলে পৃথিবী থেকে ইসলামের সূর্য ডুবে যাবে। তবে আপনাদেরকে অটল থাকতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এরপর মিশর হবে আপনাদের।'

এভাবে আলাপ চললো দীর্ঘক্ষণ। আইয়ুবীকে প্রতিহত করার বিভিন্ন পরিকল্পনা নেয়া হলো। বিদায়ের সময় রজবের হাতে তুলে দেয়া হলো তিনটে অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী। দেয়া হলো প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা। কায়রোর দু'জন সম্মানিত ব্যক্তির ঠিকানা দিয়ে বলা হলো, 'মেয়ে তিনটিকে গোপনে তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন।' এ দু'জনের একজন ছিল ফয়জুল ফাতেমী। ওকে বলা হলো, 'মেয়েদের কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তিনি জানেন। মেয়েরাও জানে কি করতে হবে ওদের। ওরা কয়েকটা ভাষায় পারদর্শী।'

বিদায় নিল রজব। সাথে তিনটি মেয়ে এবং দশজন সৈনিক।

আংগুক গোত্রের কাছে যাচ্ছে সে। ওদের দেবতা এবং মন্দির ভেঙেছেন আইয়ুবী। মিশর থেকে পালিয়ে ওখানেই আশ্রয় নিয়েছিল রজব। জঙ্গী কাফ্রীদের নিয়ে মিশর আক্রমণ করেছিল, সফল হয়নি। গোত্রের বেশীর ভাগই মারা গেছে।

এখনো পাহাড় ঘেরা স্থানকে ওরা দেবতার আশ্রম মনে করে। ভয়ে কেউ ভেতরে ঢোকে না। গোত্রের ধর্মীয় গুরু আরো তিনজনকে নিয়ে দেবতার আবাসে গেলেন। নিজকে নিজে পুরোহিতের স্থলাভিষিক্ত করলেন। এ তিনজন তার দেহরক্ষী। দেবতার আশ্রমে কেবল এ চারজনই আসা যাওয়া করতো।

পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে আস্তানা গাড়লো রজব। ওখান থেকেই একদিন ফিলিস্তিন অভিমুখে ছুটলো।

আংগুক গোত্র ছিল ভীত সন্ত্রস্ত। দেবতার উদ্দেশ্যে বলী দেয়া যায়নি, পুরোহিত মারা গেছে, ভেঙে ফেলা হয়েছে দেবতার বিগ্রহ। তাছাড়া দেবতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিহত হয়েছে অসংখ্য যুবক। ঘরে ঘরে মাতম। কেউ কেউ ভাবতে লাগলো, 'যে দেবতার আশ্রম ভেঙে দিতে পারে, সে নিশ্চয়ই বড় দেবতা।'

বর্তমান পুরোহিত গোত্রের অবস্থা দেখে বললেন, 'দেবতাদের কুমীর ক্ষুধার্ত। ওদের খাবারের ব্যবস্থা করো।'

কাফ্রীরা উট, ভেড়া, ছাগল পাঠিয়ে দিল। কিন্তু মানুষের অন্তর থেকে দেবতাকে নাখোশ করার ভয় দূর হলো না।

এক রাতে পুরোহিত গোত্রের সবাইকে একত্রিত করলেন পাহাড়ের বাইরে। বললেন, 'আমি দেবতাদের সাথে কথা বলেছি। সময়মতো বলী না দেয়ায় এ বিপদ এসেছে। দেবতারা বলেছেন, এক সঙ্গে দুটো মেয়ে বলী দিলেই কেবল এ বিপদ দূর হবে। তা না হলে দেবতা কাউকে ছাড়বে না। বলীর মেয়েদের অবশ্যই ফর্সা হতে হবে।'

দুঃসাহসী যুবকরা উঠে দাঁড়ালো। ওরা পুরোহিতকে সাক্ষী রেখে শপথ নিল মিশর থেকে দুটো মুসলমান বা ফিরিঙ্গী মেয়ে তুলে আনার।

ফিলিস্তিন থেকে আসছে রজব। সাথে তিন যুবতী এবং দশজন সৈন্য। দীর্ঘ বিপজ্জনক সফর। সে আইয়ুবীর ফৌজের বিদ্রোহী এক পলাতক কমাণ্ডার। সীমান্তে পেট্রোল ডিউটি দিচ্ছে সুলতানের সৈন্য। ধরা পড়ার আশংকা রয়েছে। অনেক ঘুরপথ

দিয়ে চলেছে সে। খাবার এবং পানিতে বোঝাই তিনটি উট। ওদের বাহন ঘোড়া।

ক'দিন পর। ওরা সেই দেবতার আশ্রম সংলগ্ন পাহাড়ের কাছে পৌঁছলো। তারা যখন ওখানে পৌঁছলো তার একদিন আগে পুরোহিত মেয়ে বলী দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

রজব প্রথমেই দেখা করলো পুরোহিতের সাথে। তিনটি সুন্দরী যুবতী দেখে পুরোহিতের চোখ খুশীতে ঝলমল করে উঠলো। এমন মেয়েই বলীর জন্য উপযুক্ত। মেয়েদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো পুরোহিত। রজব বললো, 'এদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে।'

তিনদিকে পাহাড় ঘেরা এক মনোরম জায়গায় মেয়েদের নিয়ে গেলো রজব। তাঁবু টানালো। সুযোগ পেলেই ওদেরকে কায়রো পাঠিয়ে দেবে। পথে কোন ঝামেলা হয়নি, নিরাপদেই পৌঁছতে পেরেছে, এ খুশীতে রাতে উৎসব জমালো। জমলো মদের আসর। খৃষ্টান সৈন্যরাও অংশ নিল এতে। পান করলো মেয়েরাও।

মধ্যরাত। ঘুমিয়ে আছে সবাই। একটা মেয়ের হাত ধরে নিজের তাঁবুর দিকে যেতে চাইলো রজব। উদ্দেশ্য বুঝে ফেললো মেয়েটি। বেঁকে বসলো। বললো, 'আমি বাজে মেয়ে নই। ক্রুশের দায়িত্ব পালন করার জন্য এসেছি। আপনার সাথে মদপান করতে পারি, কিন্তু বাজে প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারি না।'

রজব হেসে ওকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো, হাত ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা। রজব বাড়াবাড়ি করতেই ও হাত ছাড়িয়ে এক দৌড়ে সঙ্গী মেয়েদের কাছে ছুটে গেলো। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল অন্য দু'জন। ওরা রজবকে বুঝিয়ে বললো, 'বিশেষ উদ্দেশ্যে ওদের আসা। রজব যেন ওদের খারাপ মেয়ে মনে না করে।'

ক্ষেপে গেলো রজব। 'তোমরা কেমন সতী আমি জানি। তোমাদের পেশাই তো হলো পুরুষ তোষণ।'

'দায়িত্বের খাতিরে সবই করি আমরা। কিন্তু আমরা পেশাদার বাজে মেয়ে নই।'

রজব কোন কথা শুনতে নারাজ। তাকে বুঝাতে না পেরে মেয়েরা বললো, 'আমাদের সাথে দশজন সৈন্য আছে। ওরা এসেছে আমাদের হেফাজতের জন্য। কাল ওদের ফিরে যাবার কথা। কিন্তু আমরা প্রয়োজন মনে করলে ওদের রেখে দিতে পারি বা বাড়াবাড়ি করলে আমরা ফিরেও যেতে পারি।'

হুমকিটা ঠিকমতোই কাজে লাগলো, চুপ মেরে গেলো রজব। কিন্তু চেহারা দেখে মনে হলো সে মেয়েদের সহজে ছাড়বে না।

পরদিন সৈন্যদের বিদায় করে দিল সে। দিন গড়িয়ে গেলো। সন্ধ্যায় মেয়েদের সাথে গল্প করছিল রজব, পুরোহিত এলেন চারজন কান্ত্রী সাথে নিয়ে। রজবকে বললেন, 'আমাদের দেবতা অসন্তুষ্ট। তিনি দু'টি ফিরিঙ্গী অথবা মুসলমান মেয়ের রক্ত চেয়েছেন। এ মেয়েরা বলীর জন্য উপযুক্ত। এখান থেকে দুটো মেয়ে আমাদের দিতে হবে।'

রজবের মাথায় যেন বাজ পড়লো। বললো, 'এদের বলী দেয়ার জন্য আনা হয়নি, এদের দিয়ে অন্য কাজ করাবো। যারা তোমাদের অপমান করেছে তাদের হত্যা করবো এদের সাহায্য নিয়ে।'

'তুমি মিথ্যে বলছো।' পুরোহিত বললো, 'তুমি ভোগের জন্য এদের এনেছো।

এদের দু'জনকে অবশ্যই আমরা বলী দেবো।'

রজব অনেক যুক্তি পেশ করলো, কোন কিছুই শুনতে রাজি নন পুরোহিত। দেবতা তার মনমানসিকতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তিনি এগিয়ে পর পর দুটো মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আংগুকের মুক্তি এ দুটো মেয়ের হাতে।'

চলে যাওয়ার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। রজবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়েদের নিয়ে পালাবার চেষ্টা করো না। তুমি যেখানেই যাবে, খুঁজে বের করে ফেলবে আমাদের ছেলেরা।'

চলে গেলেন পুরোহিত। মেয়েরা ওদের ভাষা বোঝেনি। ওরা সবাই রজবকে ঘিরে দাঁড়ালো। বললো, 'কি বলেছে কাফ্রীটা?'

রজব বললো, 'পুরোহিত দেবতার নামে বলী দেয়ার জন্য তোমাদের দু'জনকে চেয়েছে।'

একটা মেয়ে বলীর ব্যাপারে জানতে চাইলে সে বললো, 'মাথা কেটে রোদে শুকাবে। দেহটা ফেলে দেবে ঝিলে। ওখানে অনেক কুমীর রয়েছে।'

বিবর্ণ হয়ে গেলো মেয়েদের চেহারা। বললো, 'আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আপনি কি চিন্তা করেছেন?'

'আমি অনেক বুঝিয়েছি, পুরোহিত কিছুই শুনতে চাচ্ছে না। এখন তার দয়ার ওপর নির্ভর করছে আমাদের জীবন। ওরা বলছে, আমার ফৌজে ওরা যোগ দেবে, তবে তার পূর্বে দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে হবে।'

রজবের কথায় ওদের সন্দেহ হলো, পুরোহিতকে খুশী করতে চাইবে লোকটা। ওদের বাঁচানোর চেষ্টা সে করবে না। গত রাতেই তাকে চিনে ফেলেছে ওরা। লোকটা ওদের একটু সান্ত্বনাও দেয়নি।

মেয়েরা তাঁবুতে ফিরে গেলো। ভাবতে লাগলো কি করা যায়। দেবতাকে খুশী করতে বা রজবের ভোগের সামগ্রী হতে ওরা এখানে আসেনি। উদ্দেশ্যহীনভাবে মরতেও চায় না ওরা। সিদ্ধান্ত নিল, ওরা পালিয়ে যাবে। কিন্তু পালিয়ে ফিলিস্তিন পর্যন্ত যাওয়া সহজ নয়। তবু আত্মরক্ষার জন্য ওদেরকে এ ঝুঁকি নিতেই হবে। ওরা শুধু সুন্দরী নয়, জাতির খেদমতের জন্য দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ওদের। এভাবে মরার জন্য ওদের ট্রেনিং দেয়া হয়নি।

রাত কেটে গেলো। দিনের বেলায় ওরা ঘোড়ার আস্তাবল দেখলো। যে পথে এসেছে তাও দেখলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পুরোহিত এসে রজবকে কি বলে চলে গেলো।

রজব মেয়েদের বললো, 'পুরোহিত আগামীকাল তোমাদের নিয়ে যাবে। বাঁধা দিলে আমাকে হত্যা করে ঝিলের কুমীর দিয়ে খাওয়াবে বলে শাসিয়ে গেছে।'

মেয়েরা পালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ কথা রজবকে বললো না।

'মরুভূমিতে এত সবুজ কোত্থেকে এসেছে? কি সুন্দর পরিবেশ। আমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখাবেন?' বললো শায়লা, মেয়েদের একজন।

রজব ওদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো ঝিলের কাছে। কিনারে শুয়ে আছে পাঁচটি কুমীর। এক সঙ্গে দেখলো সবাই। কুমীর দেখে তিনটি

মেয়েই একত্রে চিৎকার করে উঠলো।

রজব বললো, 'বলী দেয়া মেয়েদের দেহ এবং গোত্রের অপরাধীদের দেহ এসব কুমীরকে খেতে দেয়া হয়।'

এ ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ওদের পালানোর চিন্তা আরো দৃঢ় হলো। রজবের সাথে ঘুরে ফিরে পালাবার সম্ভাব্য পথ দেখে নিল ওরা।

সুসংবাদ শোনাতে আশ্রম ছেড়ে গাঁয়ে ছুটে গেলেন পুরোহিত। লোকদের ডেকে বললেন, 'তোমাদের জন্য সুসংবাদ। আজ থেকে চার রাত পর ভরা পূর্ণিমায় দেবতার আশ্রমে দু'টি ফিরিঙ্গী মেয়ে বলী দেয়া হবে। বলীদান শেষ হলেই মন্দির মেরামত করবো। এরপর যারা আমাদের দেবতাদেরকে অপমান করেছে তাদের উপর প্রতিশোধ নেবো।'

মধ্যরাত। মেয়েগুলো রজবের হাতে তুলে দিচ্ছে মদের গ্লাস। একটার পর একটা গ্লাস নিঃশেষ করে চলেছে রজব। অতিরিক্ত মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলো, ভোর পর্যন্ত জাগার সম্ভাবনা নেই।

নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গেলো মেয়েরা। সফরের প্রস্তুতি নিতে লাগলো। জিন বাঁধলো ঘোড়ার পিঠে, আলগোছে সওয়ার হয়ে দিনের দেখা পথ ধরে এগিয়ে চললো।

কাফ্রীদের চারজন পাহারাদার খানিক দূরে ঘুমিয়ে আছে। ওরা জানতো, এখান থেকে পালাবার সাহস কারো হবে না। পালিয়ে গেলেও হারিয়ে যাবে মরুভূমির বিশাল বিস্তারে। তাই ওরা নিশ্চিন্ত। ফলে, শ্যামল সবুজ সেই ভয়ংকর কারাগার থেকে মেয়েরা সহজেই বেরিয়ে যেতে সমর্থ হলো।

যে পথে রজব ওদের এনেছিল সে পথ ধরেই ওরা ফিরে যাচ্ছিল। ওরা ছিল মেধাবী, বুদ্ধিমতি। ওদের ছিল সামরিক ট্রেনিং। তাই ওরা ভাবলো, কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু ওরা জানতো না, ঊষর মরুভূমির সীমাহীন বিস্তৃতিতে ধূ ধূ বালুর সমুদ্রে হারিয়ে যেতে সময় লাগে না। আদিগন্ত বালির রাজ্যে একজন বুদ্ধিমান মানুষও অবলীলায় প্রতারিত হতে পারে, দিকভ্রান্ত হয়ে হারিয়ে যেতে পারে সীমাহীন সীমানায়। এ জন্যই লোকেরা মরুভূমিতে ভ্রমণের সময় দলবদ্ধভাবে বের হয়। মরুভূমির এ বিপদ প্রতিরোধের কোন অস্ত্র ওদের হাতে ছিল না।

নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতা মাড়িয়ে কিছু দূর পর্যন্ত ধীরে ধীরেই পথ চললো ওরা। এরপর ঘোড়া ছুটালো তীব্র গতিতে। রাতের উত্তাপহীন মরু বাতাস কেটে যতদূর সম্ভব দ্রুত এগিয়ে চললো ওরা। অনেক দূর গিয়ে গতি কমালো। ততোক্ষণে রাত একদিকে হেলে পড়েছে। কমে এসেছে ধরা পড়ার আশঙ্কা। এরপর ঢিলেঢালাভাবেই পথ চললো বাকী রাতটুকু।

ভোরে সূর্য উঠলো। চারপাশে বালিয়াড়ি। সামনে দূরে দেখা যাচ্ছে উঁচু উঁচু পাহাড়। কোন দিকে কোন পথ নেই। যেদিকে চোখ যায় কেবল অন্তহীন বালু আর বালু। ওরা সূর্য দেখে দিক ঠিক করে উত্তরমুখো এগিয়ে চললো।

ঘোড়াগুলো তৃষ্ণার্ত। ওদের পিঠে বাঁধা মশকে যে পানি আছে তাতে বড়জোর একদিন চলবে। মেয়েরা চারদিক তাকিয়ে কোন খেজুর বাগান বা ওয়েসিস পাওয়া যায়

কিনা খুঁজতে লাগলো।

আকাশে উঠে এসেছে সূর্য। তাপ বাড়ছে, উত্তপ্ত হচ্ছে মরুর পরিবেশ। কোন দিকে কোন ছায়া নেই, খর্জুরবীথি নেই, একফোটা পানির চিহ্ন নেই কোথাও।

প্রায় মাথার উপরে উঠে এসেছে সূর্য। রজবের ঘুম তখনো ভাঙেনি। তিনজন কাফ্রীকে সাথে নিয়ে তাঁবুতে এলেন পুরোহিত। রজবকে জাগালেন।

'মেয়েরা কোথায়?' পুরোহিত বললেন, 'মেয়ে দুটোকে আমার হাতে তুলে দাও।'

'এমন মূল্যবান মেয়েগুলোকে নষ্ট করবেন না।'

কিন্তু পুরোহিত নিজের সিদ্ধান্তে অটল। চিৎকার করে বললেন, 'জ্ঞান দেবার দরকার নেই। দুটো মেয়েকে আমার হাতে তুলে দাও।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো রজব। ডাকলো মেয়েদের। মেয়েদের তাঁবু থেকে কোন জবাব এলো না। এগিয়ে গিয়ে মেয়েদের তাঁবুর ভেতর উঁকি দিল। তাকালো এদিক ওদিক। না, কোথাও নেই ওরা।

দৃষ্টি ফেললো আস্তাবলে, জিনসহ তিনটি ঘোড়া গায়েব। ফ্যাকাশে হয়ে গেলো রজবের চেহারা। পুরোহিতকে বললো, 'ওরা তোমাদের ভয়ে পালিয়ে গেছে। তোমরা আমার মহা মূল্যবান মেয়েগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছো।'

'তুমিই ওদের ভাগিয়ে দিয়েছো।' পুরোহিত সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে বেঁধে ফেলো। ও আবার আংগুকের দেবতাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছে।'

পুরোহিতের সঙ্গীরা রজবের দিকে এগিয়ে গেলো। পুরোহিত একজনকে বললেন, 'গাঁয়ে যাও। দ্রুত ঘোড়া ছুটাতে পারে এমন যুবকদেরকে এখনি ডেকে নিয়ে এসো। মেয়েরা নিশ্চয়ই এখনো বেশী দূর যেতে পারেনি। ওদের পিছু নাও।'

শত অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও রজবকে পিছমোড়া করে গাছের সাথে বেঁধে ফেললো ওরা। তার সঙ্গীদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হলো। বলা হলো, 'তাঁবুর বাইরে পা বাড়ালেই হত্যা করা হবে।'

একটুপর দু'জন দ্রুতগামী অশ্বারোহী মেয়েদের পেছনে ছুটলো। বালিতে ঘোড়ার ক্ষুরের চিহ্ন স্পষ্ট। ট্রেইল ধরে এগিয়ে চললো ওরা। আট দশ ঘন্টা আগে পালিয়েছে মেয়েরা। কিন্তু কাফ্রীরা মরু সন্তান। চরম কষ্টসহিষ্ণু উপজাতি। ভয়ংকর বিপদ মোকাবেলা করেই জীবন কাটে ওদের। ধুলোঝড় সৃষ্টি করে ওদের রেখে যাওয়া ট্রেইল ধরে ঘোড়া ছুটালো তীব্র গতিতে।

সামনে ট্রেইল নেই। বালু উড়ে ঘোড়ার পদচিহ্ন মুছে দিয়ে গেছে। তবুও অনুমান করে দ্রুত এগিয়ে চললো ঘোড়সওয়ার দু'জন।

চার ঘন্টা একটানা ঘোড়া ছুটিয়েছে ওরা। হঠাৎ দূর দিগন্তে দেখা গেলো ধুসর লালচে বালু ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাচ্ছে। আতংকিত দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকালো ওরা। ছুটে আসছে মরু ঝড়, সাইমুম।

ঘোড়া ঘুরিয়ে পেছন দিকে ছুটতে লাগলো ওরা। প্রাণপণে সরে যেতে চাইছে সাইমুমের ছোবল থেকে। সাইমুমের প্রচণ্ডতা ওদের চাইতে আর কে বেশী জানে! এ

ঝড় নিমিষে লণ্ডভণ্ড করে দেয় বালির পাহাড়। কেউ থেমে গেলে বা বসে পড়লে তার উপর মুহূর্তে তৈরী হয়ে যায় আরেকটা বালির পাহাড়। ছুটতে থাকলে উড়িয়ে নিয়ে যায় মাইলকে মাইল দূরে। পাথুরে কোন পাহাড়ের সুবিধাজনক খাঁজে লুকোতে পারলেই কেবল কিছুটা বাঁচার আশা করা যায়।

আশপাশে তাকালো ওরা। ঝড় থেকে রক্ষা পাওয়ার মতো কোন শক্ত পাহাড় নেই ধারে কাছে। ওরা যেতে চাচ্ছিল সামনের পাহাড় শ্রেণীতে, যা এখনো অনেক দূরে।

ঝড় পৌঁছে গেছে দেবতার পার্বত্য আবাসে। কুমীরগুলো আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের গর্তে। মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে গাছগাছালি। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পুরোহিত চিৎকার করে বলছেন, 'আংগুকের দেবতা! তোমার এ অভিশাপ তুলে নাও। আমরা খুব শীঘ্রই দুটো রূপসী যুবতী তোমার উদ্দেশ্যে বলী দেবো।' পুরোহিত ঝড়কে দেবতার অভিশাপ মনে করছিলেন।

মেয়ে তিনটিও ঝড়ের কবলে পড়লো। আশ্রয় নেয়ার কোন আড়াল ছিল না। ওরা কাফ্রীদের নাগাল থেকে অনেক দূরে এক বিজন মরুতে। ঝড়ের আঘাতে আতংকিত ঘোড়া এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগলো। সামরিক বাহিনীর ঘোড়া, শত বিপদেও তাই ওরা বিচ্ছিন্ন হলো না। এক সাথে ছুটছে ঘোড়াগুলো, কোথায় গিয়ে থামবে জানে না ওরা।

সাইমুম সরাসরি ওদের ওপর আঘাত হানেনি। নিস্তেজ একটি শাখার ঝাপটা খেয়েই মেয়েগুলোর অবস্থা কাহিল। কাহিল ঘোড়াগুলোও। ঘোড়াগুলো যেমন দ্রুত ছুটতে পারছে না, তেমনি মেয়েরাও ওদের সামলানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

তৃষ্ণার্ত ঘোড়াগুলো মাঝরাত থেকে একনাগাড়ে ছুটেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় দুর্বল হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো। দৌড়াতে দৌড়াতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলো একটা ঘোড়া। সাথে সাথে ছিটকে পড়লো আরোহিনী। ঘোড়াটা ডিগবাজি খেয়ে পড়লো গিয়ে মেয়েটা ওপর। উপরে ঘোড়া, নিচে মেয়েটা। বুঝতে পারলো মারা যাচ্ছে ও।

অন্য ঘোড়া দুটো খানিক এগিয়ে গেলো। ওদের থামাতে চাইলো মেয়েরা। টেনে ধরলো লাগাম। হঠাৎ গতি পড়ে যাওয়ায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো আরেকটা মেয়ে। ঘোড়ার জিন ঢিলা হয়ে কাত হয়ে গেলো একদিকে। মেয়েটা পড়ে গেলো নিচে। পা দানিতে আটকে গেলো বাম পা। দৌড় থামালেও ঘোড়াটা তার হাঁটা থামাল না, মেয়েটা মাটির সাথে হেঁচড়াতে থাকলো।

তৃতীয় মেয়েটা ওদের কোন সাহায্য করতে পারছে না। ওর নিজের ঘোড়াও বশে নেই, এলোমেলো ছুটছে সে। কানে ভেসে আসছে বান্ধবীদের হৃদয় ফাটা চিৎকার। দীর্ঘক্ষণ এ চিৎকার ধ্বনি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। এক সময় থেমে গেলো চিৎকার। একটা মেয়ের লাশ ঘোড়ার সাথে হিঁচড়ে যাচ্ছিল, সেদিকে বোবার মতো তাকিয়ে রইলো ও। ভয়ার্ত ও আতংকিত দৃষ্টি। দুঃসাহসী গোয়েন্দা হলেও সে তো একটা মেয়ে। হঠাৎ কি হলো, নিরবতা ভেঙে সেও চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

তার চিৎকার শুনেই কিনা আল্লা মালুম, হঠাৎ থেমে গেলো সামনের ঘোড়াটা। ও নিশ্চিত জানে, মরে গেছে তার বান্ধবী। তবু কি এক অব্যক্ত আশা নিয়ে সে তাকিয়ে রইলো ওদিকে। অশ্রুজলে ভরে গেলো চোখ। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে চাইলো

পেছন দিকে। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, ঘোড়ায় চাপা পড়া বান্ধবী বা ঘোড়া কিছুই দেখা গেলো না সে অন্ধকারে।

তৃতীয় মেয়েটা এখন একা, নাম রেশমা। রেকাব থেকে পা খানিকটা পেছনে সরিয়ে নিল ও। বলগা ছেড়ে দিয়ে দু'হাত আকাশের দিকে তুললো মেয়েটা। চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হে মহান প্রভু! হে আকাশের মালিক! আমায় ক্ষমা করো। পাপী আমি, পাপের সাগরে আকণ্ঠ ডুবে আছি। পাপ করার জন্যই এসেছিলাম দুনিয়ায়। বড় হয়েছি পাপের মধ্যে। খোদা আমার! আমি তখন খুব ছোট। বড়োরাই আমাকে পাপের পথে টেনে এনেছে। পাপের প্রশিক্ষণ দিয়ে বড় করেছে আমাকে। ওরা আমাকে বলেছে, যাও, এ চোখ ধাঁধানো রূপ আর দেহ দিয়ে মানুষকে নষ্ট করো, মিথ্যা কথা বলো, একজনের হাত দিয়ে আরেকজনকে হত্যা করাও। প্রতারিত করো মানুষকে। ওরা বলেছে, এ হচ্ছে ক্রুশের পক্ষে পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলে তুমি স্বর্গ পাবে.....'

মেয়েটা প্রলাপ বকছিল আর চিৎকার করছিল পাগলের মতো। শ্লথ হয়ে এলো ঘোড়ার গতি। কাঁদতে কাঁদতে ও বললো, 'তোমার কাছে যে ধর্ম সত্য, আমাকে তার মোজেযা দেখাও প্রভু। আমি তোমার সত্য দ্বীনকে চিনতে চাই। মৃত্যুর আগে একবার দেখতে চাই তোমার মহিমা।'

তার বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। অনুশোচনায় পিষ্ট হচ্ছে তার কোমল হৃদয়। সে কোন্ ধর্মের অনুসারী মৃত্যু ভয় তাও ভুলিয়ে দিয়েছে। সে শুধু ভাবছে, তার পাপে ভরা জীবনের কথা। চেতনার পরতে পরতে সে পাপের অনুভূতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। ও ভাবছে, আমি কি কেবলই পুরুষের ভোগের সামগ্রী? মানুষকে প্রতারিত করার জন্যই কি আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? হায়! এখন আমাকে দেখার আর কেউ নেই।

মাথা ঝাঁকিয়ে তন্দ্রা দূর করে বিলাপের সুরে ও বলতে লাগলো, 'হে খোদা, আমাকে সাহায্য করো। এখনি আমি মরতে চাই না।'

হঠাৎ ওর মনে হলো, ও এক পিতৃহারা, স্বজনহারা অনাথ যুবতী। মৃত্যু সামনে এলে মানুষ অতীতে ফিরে যায়। এক যুবতী তার হারানো অতীতে ফিরে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু ওখানে কিছুই নেই। মা নেই, বাবা নেই, নেই কোন ভাইবোন। ওর শুধু মনে আছে, খৃস্টানরা ওকে লালন পালন করেছে। ওরাই এ পথে নিয়ে এসেছে ওকে। ও এক মনকাড়া প্রতারণা মাত্র।

নিজের ওপর ঘৃণা হলো ওর। ও ক্ষমা চাইছে, মুক্তি চাইছে। আবার তন্দ্রা এসে জাপটে ধরলো ওকে। ঘোড়াটা ধীরে ধীরে হাঁটছে। থেমে গেছে ঝড়। মরুভূমিতে নেমে এসেছে রাতের আঁধার। প্রকৃতির সে সীমাহীন বিশালতায় অন্ধকার রাতে ঘোড়ার পিঠে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে অসহায় এক মেয়ে।

সীমান্ত পাহারার জন্য বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট বসিয়েছিলেন সুলতান আইয়ুবী। সীমান্ত রক্ষীদের হেডকোয়ার্টার ছিল মিশর এবং সুদান সীমান্তের চার-পাঁচ মাইল ভেতরে এক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। ওখানে ছিল তিন প্লাটুন সৈন্য। থাকতো তাঁবু খাঁটিয়ে। সীমান্তের বিভিন্ন চেকপোস্টে পাঠিয়ে দেয়া হতো সৈনিকদের। এক চেকপোস্ট থেকে

আরেক চেকপোস্ট পর্যন্ত টহল বাহিনী নিয়মিত টহল দিয়ে বেড়াতো।

আজকের ঝড়ে তাঁবুগুলোর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। উট ঘোড়া সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছিল সৈন্যরা। ঝড় থামার পর ওরা তাঁবু মেরামতে লেগে গেলো। ওদের কমাণ্ডার একজন তুর্কী। আহমদ কামাল। চমৎকার দেহের গড়ন। ফর্সা আকর্ষণীয় চেহারা।

ঝড় থামতেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মালপত্র এবং উট ঘোড়া দেখলেন। দিগন্ত ফর্সা হয়ে গেছে। একজন সৈনিক দক্ষিণ দিকে ইশারা করে বললো, 'কমাণ্ডার, ওই দিকে দেখুন, মনে হয় কোন সওয়ারী।'

'হ্যাঁ, তাই।' দূরে নজর দিয়ে বললো কমাণ্ডার, 'এবং মনে হয় সওয়ারী কোন পুরুষ নয় মহিলা।'

'এ সওয়ারী ও ঘোড়া কি আমাদের?'

'আমাদের সেনাবাহিনীতে এখনো কোন মেয়ে ভর্তি করা হয়নি। দেখছো না চুল ছড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি দুটো ঘোড়া নিয়ে এসো, অন্ধকার গ্রাস করার পূর্বেই ওর কাছে পৌঁছতে হবে আমাদের।'

মেয়েটাকে নিয়ে ঘোড়াটা তখন ওদের দিকেই আসছিল। ওরাও ঘোড়া ছুটালো ওদিকে। সামনের পথটুকু চোরাবালিতে ভরা। তাই দ্রুত ছুটতে পারছিল না। মেয়েটার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেলো।

সিপাইকে সাথে নিয়ে কমাণ্ডার যখন ওখানে পৌঁছলো, তখন রাতের আঁধার নেমে এসেছে। ঘোড়াটা মাথা নুইয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে। ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে যাচ্ছে তাঁবুর দিকেই। আরোহী এক যুবতী। মাথা নোয়ানো। ঘোড়ার ঘাড়ের খানিকটা পেছনে অবিন্যস্ত চুল ছড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। অজ্ঞান।

কমাণ্ডার রেকাব থেকে মেয়েটার পা ছাড়িয়ে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে আনলেন। সিপাইকে বললেন, 'বেঁচে আছে, মনে হয় ফিরিঙ্গী। তুমি ওর ঘোড়াটাকে সামলাও।'

মেয়েটাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে ওরা যতটা সম্ভব দ্রুত ক্যাম্পে ফিরে এলো। ওকে এক তাঁবুতে নিয়ে গেলেন কমাণ্ডার। চুলে বালি লেগে আছে। পানির ঝটকা দিলেন মেয়েটার চোখে মুখে। এরপর ফোঁটা ফোঁটা পানি দিতে লাগলেন মুখের ভেতর।

চোখ খুললো মেয়েটা। তাকালো আহমদ কামালের দিকে। কয়েক মুহূর্ত হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। মেয়েটার জ্ঞান ফিরেছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কমাণ্ডার। রেশমা বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি এখন ফিলিস্তিনে?'

এদিক ওদিক মাথা দুলিয়ে কমাণ্ডার বোঝালেন, এ ভাষা তিনি বোঝেন না। মেয়েটা আরবীতে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কে? আমি এখন কোথায়?'

'আমি মুসলিম ফৌজের সাধারণ এক কমাণ্ডার আহমদ কামাল।' বললেন, 'তুমি এখন মিশরে।'

আতংকে বিস্ফারিত হলো মেয়েটার চোখ। যেন এখনি জ্ঞান হারাবে আবার। আহমদ কামাল বললেন, 'ভয় নেই, সুস্থির হও, নিজেকে সংযত করো।'

আহমদ কামালের কথায় তার ভয় ও আতংক মোটেই কমলো না, বরং সে আরো অবাক হলো। তার সে অবাক করা ভাব ফুটে উঠলো চেহারায়।

আহমদ কামাল আবার বললেন, 'বুঝেছি, তুমি ফিরিঙ্গী। কিন্তু এখন তুমি আমার অতিথি। ভয়ের কোন কারণ নেই, আমি একজন মুসলমান। মুসলমান অসহায় নারীদের সম্মান করতে জানে। তুমি যে ধর্মেরই হও না কেন, তোমার ইজ্জত আব্রুর হেফাজত করা এখানকার প্রতিটি সৈনিকের পবিত্র কর্তব্য।'

কমাণ্ডার একজন সিপাইকে ডাকলেন। বললেন, 'এর জন্য খাবার এবং পানি নিয়ে এসো।'

পানি আনতেই মেয়েটা পানির গ্লাস লুফে নিয়ে ঢকঢক করে পান করতে শুরু করলো। আহমদ কামাল তার ঠোঁট থেকে গ্লাস সরিয়ে দিলেন।

'আস্তে। আগে খেয়ে নাও, পরে পানি পান করো।'

মেয়েটা খাবার খেলো, পানি পান করলো। চেহারায় ফিরে এলো দ্যুতি।

কমাণ্ডার ওর গোসলের ব্যবস্থা করলেন। গোসল শেষে তাঁবুতে ঢুকলো ও। তাঁবুটা ছিল কমাণ্ডার আহমদ কামালের। কোন তাঁবু খালি না থাকায় এখানেই এনে তুলেছিলেন তিনি। ও যখন গোসল করছিল, ততোক্ষণে কমাণ্ডার পর্দা টানিয়ে তাঁবুটা দু'ভাগ করে নিলেন। ও তাঁবুতে ঢুকতেই পর্দা টেনে দিলেন তিনি।

ওর আতংক তখনো কাটেনি। ও জানে এখন ও শত্রুর আশ্রয়ে। এদের কাছে ভাল ব্যবহার আশা করা যায় না। শৈশব থেকেই ওকে বুঝানো হয়েছে, মুসলমানরা হলো পশু। নারীদের জন্য আস্ত জানোয়ার। এই সাথে ওর মনে ছিল কাফ্রীদের কুমীর এবং মরু ঝড়ের কবলে পড়ার দুঃসহ আতংক।

সঙ্গী দু'জনের ভয়ংকর মৃত্যু এখনো ওর চোখে ভাসছে। গোসল করার সময় ওর মনে হয়েছিল, সে এতটাই অপবিত্র যে, পৃথিবীর সব পানি ঢাললেও তার সে অপবিত্রতা আর পরিষ্কার করা যাবে না।

এমন অসামান্য রূপবতী তরুণী কোন সাধারণ ঘরের মেয়ে হতে পারে না, আহমদ কামাল ভাবলেন। এ ফিরিঙ্গী তরুণী এ দুর্গম অঞ্চলে কি করে এলো এ ভাবনা তোলপাড় করছিল তার মনে। জিজ্ঞেস করায় যদিও ও বলেছে, ঝড়ের কবলে পড়ে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ও, কিন্তু সে কথা বিশ্বাস হয়নি কমাণ্ডারের। গত দু'দিনেও এ অঞ্চলে কোন কাফেলা দেখা যায়নি, গেলে টহল বাহিনীর নজরে তা অবশ্যই পড়তো।

আহমদ কামাল আবারো বললেন, 'সত্যি করে বলো তো, তুমি এখানে কি করে এলে?'

'বলেছি তো, কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।'

'যদি বলতে, তোমাকে অপহরণ করা হয়েছিল, ঝড় তোমাকে অপহরণকারীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, তবুও বিশ্বাস করতাম। কিন্তু তুমি যা বলছো তা বিশ্বাস করা যায় না। এ স্রেফ মিথ্যা। আমার কাছে মিথ্যে বলার কোন দরকার ছিল না।'

এক সিপাই তাঁবুর পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে একটা থলি এবং মশক দিয়ে বললো, 'ঘোড়ার জিনের সাথে বাঁধা ছিল।'

থলিটা খুলতে গেলেন কমাণ্ডার, মেয়েটার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। কমাণ্ডার তা লক্ষ্য করে তার হাতে থলিটা দিয়ে বললেন, 'নিজেই খোল, খুলে দেখো সব ঠিক

আছে কি না।'

মেয়েটা যেন বোবা হয়ে গেছে। থলিটা শিশুর মতো পিছনে সরিয়ে নিল।

'বলতে পারি না তুমি চলে যাও।' কমাণ্ডার বললেন, 'তোমাকে আটকে রাখার অধিকারও আমার নেই। কিন্তু যে মেয়েকে বিজন মরুতে ঘোড়ার ওপর অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে তাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না। তোমার হেফাজত করা আমার মানবিক দায়িত্ব। বাড়ীর ঠিকানা বলো, সিপাইদের দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। দেখে মনে হয় তুমি মিশরী নও, সুদানীও নও।'

মেয়েটার চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এলো। পেছনের ভয়ংকর আতংকগুলো ওর স্নায়ু অবশ করে রেখেছে। ও থলি আহমদ কামালের দিকে ছুঁড়ে দিল। থলির মুখ খুললো কমাণ্ডার। কিছু খেজুর, মেয়েদের ব্যবহার্য সামান্য টুকিটাকি জিনিস এবং একটি পুটুলী পাওয়া গেলো। পুটুলীর মধ্যে অনেকগুলো স্বর্ণ মুদ্রা। একটা স্বর্ণের চেইনের সাথে কাঠের তৈরী ক্রুশ। কমাণ্ডার ওকে বললেন, 'এখানে আমার প্রশ্নের জবাব নেই।'

'এ স্বর্ণ মুদ্রাগুলো যদি তোমাকে দেই, আমাকে সাহায্য করবে?' মেয়েটা প্রশ্ন করলো।

'কেমন সাহায্য?'

'আমাকে ফিলিস্তিন পৌঁছে দাও। কিন্তু কোন প্রশ্ন করো না।'

'তোমাকে অবশ্যই ফিলিস্তিন পৌঁছে দেবো, তবে প্রশ্নও করবো।'

'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করলে অন্য পুরস্কার পাবে।'

'কি পুরস্কার?'

'আমার ঘোড়াটা তোমায় দিয়ে দেবো। তিন দিনের জন্য আমার দেহ হবে তোমার।'

আহমদ কামাল এর আগে এত স্বর্ণ একত্রে দেখেননি। দেখেননি এমন অনন্যা সুন্দরী যুবতী। স্বর্ণমুদ্রার দিকে তাকালেন তিনি। চোখ ঘুরিয়ে নিলেন যুবতীর দিকে। তার রেশম কোমল চুল সোনার তারের মতো ঝলমল করছে। তাকালেন ওর মায়াবী চোখের দিকে। ও চোখের যাদু এক সম্রাটকে আরেক সম্রাটের শত্রুতে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট। আহমদ কামাল এক স্বাস্থ্যবান যুবক, সীমান্ত রক্ষীদের কমাণ্ডার। তাকে জিজ্ঞেস করার বা বাঁধা দেয়ার কেউ নেই।

তিনি স্বর্ণমুদ্রা এবং ক্রুশ পুটুলীতে বাঁধলেন। থলিটা ফিরিয়ে দিলেন মেয়েটার হাতে।

'বিনিময় কি খুব কম?' মেয়েটার প্রশ্ন।

'অনেক কম। ঈমানের মূল্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।'

মেয়েটা কিছু বলতে চাইলো, কমাণ্ডার তাকে সে সুযোগ না দিয়ে বললেন, 'আমি আমার কর্তব্য এবং ঈমান বিক্রি করতে পারি না। আমি আছি বলেই সমগ্র মিশর নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে। মাস তিনেক পূর্বে সুদানীরা কায়রো আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল, আমার ঈমান বিক্রয় করলে ওরা দখল করে নিত কায়রো। ওদের চাইতে তোমাকে বেশী ভয়ংকর মনে হচ্ছে। তুমি তো কোন গোয়েন্দা নও?'

'না, বরং বলো, বড় এক অত্যাচারীর কবল থেকে আমাকে রক্ষা করেছে।'

মেয়েটার অর্থহীন জবাব শুনে কমাণ্ডার বললেন, 'তুমি কে, কোত্থেকে এসেছো

আমার জানার প্রয়োজন নেই। কাল তোমাকে কায়রোয় আমাদের গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেবো। এরপর কি হবে তা তোমার আর তাদের ব্যাপার।'

'অনুমতি পেলে খানিকটা বিশ্রাম করবো। কাল কায়রো পাঠানোর সময় হয়তো তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো।'

গত রাতে ঘুমুতে পারেনি রেশমা। দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ংকর এক ভ্রমণে ক্লান্ত, শ্রান্ত। শোয়ার সাথে সাথেই ও ঘুমিয়ে পড়লো। কমাণ্ডার তাকিয়ে রইলেন ওর ঘুমন্ত চেহারার দিকে। মেয়েটা ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করছে। মাথা নাড়ছে এদিক ওদিক। দুঃস্বপ্ন দেখছে হয়তো। স্বপ্নের মধ্যেই ও কাঁদছে। কমাণ্ডার সঙ্গীদের বললেন, 'মেয়েটাকে সন্দেহ হচ্ছে। ভাবছি, ওকে কাল কায়রো পাঠিয়ে দেবো।'

সঙ্গীরা কমাণ্ডারকে জানতো। যুবতীকে নিজের তাঁবুতে রেখেছেন বলে কেউ তাকে সন্দেহ করেনি। আহমদ কামাল মেয়েটার ঘোড়া দেখলেন। উন্নত জাতের। জিনের নিচে মিশরী ফৌজের চিহ্ন। মেয়েটা যে গোয়েন্দা এখন আর সন্দেহ নেই।

ঝড়ের কারণে মেয়েদের ধাওয়া করা থেকে কাফ্রীদের বিরত থাকতে হলো। জীবন নিয়ে কোন মতে পৌঁছলো দেবতার আশ্রমে। পুরোহিত বললেন, 'মেয়েগুলো ঝড়ের কবলে পড়েছে। ওদের কেউ বেঁচে নেই। বলী দেয়ার সময়ও চলে গেছে। সুতরাং ওদের পিছু নেয়া বৃথা।'

বিপদে পড়লো রজব। বার বার কাফ্রীরা প্রশ্ন করছিল, 'বলো, মেয়েরা কোথায়?'

সে শপথ করে বলতে লাগলো, 'আমি জানি না।'

কাফ্রীরা এতে সন্তুষ্ট নয়। নির্যাতন শুরু হলো। তরবারীর মাথা দিয়ে খোঁচা মেরে একই প্রশ্ন করতে লাগলো ওরা। অত্যাচার চললো রজবের সঙ্গীদের উপরও। ওরা দেশ এবং জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার পরিণাম ভোগ করছিল। সারা রাত চললো এ নির্যাতন। ঝাঁঝরা হয়ে গেলো তিনটা দেহ।

কমাণ্ডারের তাঁবুতে ঘুমিয়েছিল মেয়েটা। সারাটা দিন ঘুমিয়েই কাটালো। জাগলো সূর্য ডোবার খানিক আগে। আহমদ কামাল বললো, 'যাক বাবা, ঘুম তাহলে ভাঙলো। দেখো, খাবার রাখা আছে। আবার ঘুমোনোর আগে চারটে খেয়ে নিও।'

খেয়ে দেয়ে ও ঘুমিয়ে পড়লো আবার। কমাণ্ডার ঘুমিয়েছিল মেয়েটার কয়েক কদম দূরে। তাঁবুতে জ্বলছে প্রদীপের আলো। ধীরে ধীরে রাত গভীরতর হচ্ছে।

গভীর রাতে হঠাৎ মেয়েটা চিৎকার করে উঠলো। চোখ খুলে গেলো কমাণ্ডারের। মেয়েটা বসে আছে। কাঁপছে। চোখে মুখে আতংক।

কাছে এলেন কমাণ্ডার। মেয়েটা কমাণ্ডারকে জাপটে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'ওদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। ওরা আমাকে কুমীরের মুখে ছুঁড়ে দেবে। আমার মাথা কেটে ফেলবে ওরা।'

'কারা?'

'কালো কাফ্রীরা।' মেয়েটার কণ্ঠে ভীতি, 'ওরা এখানেও এসেছিল।'

কাফ্রীদের বলীর কথা জানতেন কমাণ্ডার। ভাবলেন, একে হয়তো বলী দেয়ার জন্য নেয়া হচ্ছিল। মেয়েটাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমাকে কি বলী দেয়ার জন্য অপহরণ

করা হয়েছিল?'

ও কমাণ্ডারের গলা জড়িয়ে রেখেই বললো, 'আমাকে এ নিয়ে আর প্রশ্ন করো না। আমি দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।'

কামাল তার ফ্যাকাশে চেহারা দেখে শান্তনা দিয়ে বললেন, 'এখান থেকে কেউ তোমাকে নিতে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও।'

'আমার আর ঘুম আসবে না। তুমি আমার সাথে কথা বলতে পারবে? একা একা জেগে থাকতে পারবো না। আমি তাহলে পাগল হয়ে যাবো।'

'ঠিক আছে, যখন ভয় পাচ্ছো, তোমার সাথে আমিও জেগে থাকবো।' মেয়েটাকে শান্তনা দিয়ে বললেন, 'যতক্ষণ এখানে আছো, ভয়ের কারণ নেই।'

তবে তিনি ওকে কাফ্রী বা তার সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

ওরা কথা বলে কাটিয়ে দিল বাকি রাতটুকু। কথার বেশীর ভাগ ছিল তুর্কিস্তান এবং মিশরের গল্প। এক সময় ও ঘুমিয়ে পড়লো।

সূর্য উঠার দেরী নেই। মেয়েটার ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে বসলো সে। দেখলো ফজরের নামাজ পড়ছেন আহমদ কামাল। ও নির্নিমেষ নয়নে সে দিকে তাকিয়ে রইলো। নামাজ শেষ করে দোয়ার জন্য হাত তুললেন কমাণ্ডার। মেয়েটা এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'তুমি খোদার কাছে কি চেয়েছো?' মুনাজাত শেষ হলে প্রশ্ন করলো তরুণী।

'অন্যায় প্রতিরোধ করার শক্তি।'

'তুমি স্বর্ণ এবং সুন্দরী যুবতী পাওয়ার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করোনি?'

'না চাইতেই এ দুটো খোদা আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু তার ওপর আমার কোন অধিকার নেই। হয়তো তিনি আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন।'

'তুমি কি মনে করো তিনি তোমাকে পাপের মোকাবিলা করার শক্তি দিয়েছেন?'

'কেন, দেখোনি। তোমার স্বর্ণ এবং তোমার রূপ যৌবন আমাকে আমার কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ এবং আমি তার কাছে এটাই চাই।'

'তিনি কি পাপ মোচন করেন?'

'হ্যাঁ, তিনি পাপ মোচন করেন। তবে শর্ত হলো, সে পাপ বার বার করা যাবে না।'

মাথা নোয়াল মেয়েটা। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। কমাণ্ডার ওর মাথায় হাত রাখলেন। ও আহমদ কামালের হাত দুটো ধরে কয়েকবার চুমো খেলো। কামাল হাত সরিয়ে নিলেন। ও বললো, 'আজ আমায় পাঠিয়ে দেবে কায়রো, তোমার সাথে হয়তো আর কোন দিন দেখা হবে না। যাবার আগে আমি কে, কোত্থেকে এসেছি তোমাকে বলে যেতে খুব মন চাইছে। তুমি অনুমতি দিলে আমার বর্তমান অবস্থা বলবো।'

'যাত্রার সময় হয়ে গেছে। আমি নিজেই তোমার সাথে যাচ্ছি। এ ধরনের বিপজ্জনক দায়িত্ব সাধারণত আমি অন্য কাউকে দেই না।'

'আমি কে, কোত্থেকে এসেছি তাও শুনবে না?'

'চলো, এ কথা শোনার দায়িত্ব আমার নয়।' বলে কমাণ্ডার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কায়রো অভিমুখে রওনা হলো ছ'টি ঘোড়া। সামনে আহমদ কামাল। পেছনের ঘোড়ায় চেপেছে মেয়েটা। তার পেছনে আড়াআড়িভাবে চারজন রক্ষী সেনা। সব শেষে প্রয়োজনীয় খাবার দাবারসহ একটি উট। প্রায় ছত্রিশ ঘন্টার সফর। রেশমা দু'বার কমাণ্ডারের পাশাপাশি চলার চেষ্টা করলো।

'তোমার ঘোড়া সৈন্যদের মাঝখানে রাখো।' কমাণ্ডার বললেন।

সূর্যাস্তের পর আহমদ কামাল কাফেলা থামিয়ে তাঁবু টানানোর নির্দেশ দিলেন। রাতে মেয়েটাকে শোয়ালেন নিজের তাঁবুতে। আলো জ্বলছে। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর রাতে কারো আলতো স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ খুলে দেখেন মেয়েটা পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলাচ্ছে।

তড়াক করে উঠে বসলেন কমাণ্ডার। মেয়েটার চোখে চোখ রাখলেন। ও কাঁদছে।

আহমদ কামালের হাত নিজের হাতে তুলে নিল বিদেশিনী। ঠোঁট ছোঁয়াল তার হাতে। এরপর শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

তাকিয়ে রইলেন কমাণ্ডার। মেয়েটা অশ্রু মুছে বললো, 'আমি তোমার দুশমন। গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তোমার দেশে এসেছি। এসেছি বড় বড় সরকারী কর্মকর্তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করতে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য আমাকে ফিলিস্তিন থেকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস করো, এখন আমার মনে কোন শত্রুতা নেই।'

'তুমি খুব ভীতু মেয়ে। কেন আপন জাতির সাথে গাদ্দারী করছো! শূলের কাঠে দাঁড়িয়েও তোমার বলা উচিত, আমি ক্রুশের জন্য জীবন বিলিয়ে দিচ্ছি।'

'আমার মনে শত্রুতা নেই কেন, জানো? তুমিই প্রথম পুরুষ যে আমার অনন্য রূপ যৌবনকে ঘৃণা করেছো। প্রত্যাখ্যান করেছো আমার আহবান। আপন পর সবাই আমাকে পাওয়ার জন্য উন্মুখ। পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়ে, ওদের সাথে প্রতারণা করে বিলাসিতার জীবনকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেছিলাম। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকে ট্রেনিংও দেয়া হয়েছে।

তোমাদের কাছে যা অশ্লীলতা, আমাদের কাছে তা শিল্প, এক মোক্ষম অস্ত্র। ধর্ম কি জানি না, খোদার বিধান বুঝি না। শৈশব থেকে পরিচিত হয়েছি ক্রুশের সাথে। বলা হয়েছে ক্রুশ হচ্ছে খোদার চিহ্ন। খৃষ্টানদের মর্যাদার প্রতীক। সমগ্র বিশ্ব শাসন করার অধিকার কেবল ক্রুশধারীদের। মুসলমানরা হচ্ছে ক্রুশের দুশমন। ওদের কাছে এই হচ্ছে ধর্মের মূলনীতি।'

'ওদের ধর্মের মূলনীতি আমরা জানি। তোমার কাহিনী আমাকে বলার দরকার নেই, যা বলার কায়রো গিয়ে বলো।'

'রজব নামের কোন কমাণ্ডারকে চেনো?'

'সে ছিল খলিফার রক্ষী ফৌজের কমাণ্ডার। সুদানী ষড়যন্ত্রের সাথে সেও শরীক ছিল।'

'এখন কোথায়?'

'জানি না, আমাদের শুধু বলা হয়েছে, রজব সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে গেছে। দেখামাত্র যেন তাকে গ্রেফতার করি। পালাতে চাইলে তীর মেরে শেষ করে দেয়ার

অনুমতিও আছে। কেন? তুমি কিভাবে তাকে চেনো? সে এখন কোথায় তুমি জানো কিছু?'

'সে এখন সুদানে কাফ্রীদের কাছে। ওখানে আছে এক মনোরম স্থান। কাফ্রীরা ওখানেই যুবতীদেরকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলী দেয়। রজব ওখানেই আছে। ফিলিস্তিন থেকে তার সাথেই আমাদের তিনজনকে পাঠানো হয়েছে।'

'অন্য দু'জন কোথায়?'

'ওরা মারা গেছে।' তরুণীর কণ্ঠে বিষণ্ণতা, 'ওদের মৃত্যুই আমাকে বদলে দিয়েছে।'

'কিভাবে ওরা মারা পড়লো?'

কাফ্রীদের বলী দেয়ার চেষ্টা, রজবের ব্যবহার থেকে শুরু করে ওখান থেকে পালিয়ে আসা এবং ঝড়ের কবলে পড়ে দু'জনের মৃত্যুসহ সকল কাহিনী কমাণ্ডারকে খুলে বললো সে। মেয়েটা আরো বললো, 'একদিন এই আমি নিজেকে শাহজাদী মনে করতাম। আমি ছিলাম সম্রাটদের হৃদয়রাণী। খোদা বা মৃত্যু আছে এ কথা কখনো ভাবিনি। আমাদেরকে পাপের সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল, আমরাও সানন্দে তাতেই ডুবেছিলাম। সে ছিল ভোগ বিলাসের এক মোহময় জগত।

আমাদেরকে কুমীর দেখানো হলো, মস্তকবিহীন যুবতীদের দেহ যাদের আহার। কিনারে শুয়েছিল কুমীরগুলো। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। যে দেহের সামনে বড় বড় সম্রাটদের মাথা নুয়ে থাকে, সে দেহ হবে কুমীরের খাদ্য!

আমার মাথা কাটার জন্য যে সব কুৎসিত কাফ্রীরা এসেছিল আমি তাদের দেখেছি। চোখের সামনে ভেসে উঠলো মৃত্যুর বিভীষিকা। আমার বিবেক জেগে উঠলো। আত্মার ভেতর থেকে শব্দ হলো, নিজের অনন্য রূপ আর মাদকতাময় দেহের পরিণাম দেখো।

মরণ পণ করেই বেরিয়েছিলাম আমরা। আমাদেরকে রজবের হাতে তুলে দিয়ে বলা হয়েছিল, 'এ লোকটি তোমাদের হেফাজত করবে।' কিন্তু ও আমাদের দিকে লোভের হাত বাড়ালো, আমরা পালালাম।

ঝড়ের কবলে পড়ে ঘোড়াগুলো দিশেহারা হয়ে পড়লো। প্রথমে একটা মেয়ে পড়ে গেলো। তার ওপর পড়লো ঘোড়াটা। চেয়ে চেয়ে দেখলাম, কিছুই করার ছিল না। এরপর দ্বিতীয় মেয়েটা ঘোড়ার সাথে ঝুলতে ঝুলতে মারা গেলো। ওর কলজে ফাটা চিৎকার এখনো আমি শুনতে পাচ্ছি। যতদিন বেঁচে থাকবো আমার কানে বাজতে থাকবে ওর সেই বুকফাটা আর্তচিৎকার।

আমার ঘোড়াটা ছুটছিল, কিন্তু আমার বশে ছিল না। আমি তখন একা। দু'টি মেয়েকে মেরে খোদা আমাকে আমার পরিণতি বুঝিয়ে দিলেন। ওরা ছিল আমারচে সুন্দরী এবং হাসি খুশী। রূপ যৌবন নিয়ে ওদেরও অহংকার ছিল। কত রাজা বাদশাহকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচিয়েছে ওরা। কিন্তু মরার পর কেউ জানলও না, বালির পরিচয়হীন কবরে ওরা সমাহিত হয়ে আছে।

আমি নিঃসঙ্গ। ঝড়ের ভেতর থেকে ভেসে এলো মৃত্যুর অট্টহাসি। ডানে বাঁয়ে ওপরে এবং নিচে প্রেতাত্মা আর ভূতপ্রেতের ক্রুর হাসি শোনা যাচ্ছিল। আমি বুঝতে

পারছিলাম, এ সবই আমার পাপের ফল। খোদাকে মনে পড়লো। পাপের জন্য তার কাছে বার বার ক্ষমা চাইলাম। বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য চাইলাম তার কাছে। এরপর অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম আমি তোমার কব্জায়।

তোমার সাদা চামড়া দেখে খুশী হয়েছিলাম। তুমি ইউরোপীয়, আমি ফিলিস্তিনের। নিজের ভাষায় নিজের পরিচয় দিলাম। যখন বুঝলাম মুসলমানের হাতে পড়েছি, দমে গেলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ঝড় থেকে বেঁচে এলাম শত্রুর কাছে!

আমাদের বলা হয়েছিল, মুসলমানরা মেয়েদের সাথে পশুর মতো ব্যবহার করে। কিন্তু আমি ধারণাও করিনি, তুমি এমন ব্যবহার করবে। তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো আমার দেয়া স্বর্ণ। গ্রহণ করোনি আমার দেহের সৌরভ।

আমি ছিলাম আতংকিত। যে কেউ আমাকে আশ্রয় দিলে তাকে বুকে স্থান দিতাম। তোমার উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে তখনো আমার ধারণা ছিল না। ভেবেছিলাম রাতে বিরক্ত করবে।

স্বপ্নে কুমীর দেখলাম, কাফ্রী এবং ঝড় দেখলাম। জেগে গেলাম আতংকে। তুমি শিশুর মতো আমায় অভয় দিলে। তোমার গল্প শুনতে শুনতে আমার সব ভয় দূর হয়ে গেলো। ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জাগলাম তুমি নামাজ পড়ছো। দোয়া করার জন্য হাত তুললে, তোমার নিমীলিত চোখে আমি দেখেছি এক অনাবিল প্রশান্তি, এক অবিশ্বাস্য আলোর ঝলক। সন্দেহ হলো, তুমি মানুষ না দেবদূত। কোন মানুষ সোনা আর আমার মতো নারীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, এ আমার কাছে অবিশ্বাস্য।

তোমার চেহারার প্রশান্তি এবং আনন্দের দ্যুতি আমার চোখে অশ্রু এনে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম, তোমাকে কে দিয়েছে এ প্রশান্তি!

তোমাকে ভুলের মধ্যে রাখতে মন চাইলো না। ইচ্ছে হলো আমার ব্যাপারে সব কথা তোমাকে খুলে বলি। বিনিময়ে তুমি আমাকে তোমার সে প্রশান্তি দাও, দূর করে দাও আমার সকল ভীতি, যে আতংক এখনো আমাকে পিষ্ট করছে। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলে না। কর্তব্যবোধ তোমার কাছে সবচে প্রিয়।'

রেশমা আহমদ কামালের হাত ধরে বললো, 'হয়তো এসব কথা তুমি প্রতারণার নতুন কৌশল মনে করছো। তুমি যা ইচ্ছে ভাবতে পারো, কিন্তু আমি আমার আত্মার সাথে প্রতারণা করতে পারবো না।

আমার হৃদয়ের গভীরে তোমার জন্য যে ভালবাসা জন্ম নিয়েছে সে জন্য কি আমি দায়ী? আমি তো তোমাদের খুন করতেই এসেছিলাম, কিন্তু তোমার ব্যবহার আর তোমার হৃদয়ের প্রশান্তি দেখে আমারও লোভ জাগলো সে প্রশান্তিময় জীবনের প্রতি। আমার মনে হয়, এ জীবনে আমি তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো বাঁচতে পারবো না। কাল তোমাকে পাপের জন্য আহবান করেছিলাম। এখন! জীবন ভর তোমার পায়ের কাছে বসে থাকবো। আমায় দাসী হিসেবে গ্রহণ করো, বিনিময়ে সে প্রশান্তি দাও, যা নামাজ পড়ার সময় তোমার মধ্যে দেখেছি।'

আহমদ কামাল মুখ খুললো। বললো, 'আমি বলবো না, তুমি আমার সাথে প্রতারণা করছো। তবে এটুকু তোমাকে জানিয়ে দেয়া দরকার, আমি আমার জাতি এবং ফৌজকে

ধোঁকা দিতে পারবো না। তুমি আমার কাছে আমানত। এ আমানতের খেয়ানত আমি করতে পারি না। তোমার সাথে যে ব্যবহার করেছি তা ছিল আমার কর্তব্য। কায়রোর নির্দিষ্ট ঠিকানায় তোমাকে পৌঁছে দিতে পারলেই আমার দায়িত্ব শেষ। এরপর আমাকে নির্দেশ দেয়া হবে, 'কামাল, এবার তুমি ফিরে যাও।'

রেশমার চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছিল। কান্না একটু সামলে ওঠে মিনতি ঝরা চোখে তাকালো কামালের দিকে। বললো, 'তোমার কাছে আমার একটা ছোট্ট আবেদন, তোমাদের সুলতান আমাকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেবেন তখন তুমি আমার হাত ধরে পাশে শুধু দাঁড়িয়ে থেকো।'

রেশমার চোখ আবারো জলে ভরে উঠলো। কান্নাভেজা কণ্ঠে বললো, 'এখন আর ফিলিস্তিন পৌঁছে দিতে তোমাকে অনুরোধ করবো না। বাঁধা হয়ে দাঁড়াবো না তোমার কর্তব্যের সামনে। শুধু একবার বলো, তুমি আমার ভালবাসা গ্রহণ করেছো।

এ অপবিত্র দেহ নিয়ে তোমার কাছে স্ত্রীর মর্যাদা চাই না, ট্রেনিং দিয়ে আমাদের হৃদয়টাকে পাথরে পরিণত করা হয়েছিল। ভাবতাম, আমাদের মধ্যে মানবিক অনুভূতি বলে কিছু নেই। কিন্তু খোদা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, মানুষ পাথর নয়, কোন একদিন কাউকে না কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয়, মুসাফির, পথ আর কত দূর? ঠিক পথে চলছি তো! এসো না দু'জনে হাতে হাত রেখে আরো কিছু পথ চলি নীরবে।'

রাত এগিয়ে যাচ্ছে, কথা বলছে দু'জন। আহমদ কামাল প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের মতো মেয়েদেরকে ওরা আমাদের দেশে পাঠায় কেন? মেয়েরা কি কাজ করে এখানে?'

'অনেক কাজ। মুসলমান আমীর ওমরাদের হারেমে মুসলমানের ছদ্মবেশে ঢুকিয়ে দেয়া হয় মেয়েদের। ওরা আমীর ওমরা এবং মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের হাত করে নেয়। খৃষ্টানদের পছন্দের লোককে ক্ষমতায় বসাতে সহযোগিতা করে। খৃষ্টান বিরোধী আমীর ওমরাদের হত্যা করতে বা ক্ষমতাচ্যুত করতে প্ররোচিত করে।

মুসলিম যুবতীদের রূপের অহমিকা থাকলেও ওরা ততোটা চতুর নয়। ইহুদী বা খৃষ্টান মেয়েরা কৌশলে ওদের দাসীবাঁদীতে পরিণত করে। ওদের কারণে আমীর, মন্ত্রী এবং কেল্লাদারদের অধিকাংশ থাকে আমাদের পক্ষে। কোন কোন মেয়ে পদস্থ ও বড় লোকদের রক্ষিতা হয়ে থাকে। এরা যুবক-যুবতীদের চরিত্র নষ্ট করে। যুবকদেরকে অশ্লীলতার পথে টেনে নিয়ে আসে। সংস্কৃতির নামে নারী পুরুষকে বেহায়াপনার শেষ সীমানায় পৌঁছে দেয়।

আমার মতো অভিজাত ও রূপসী খৃষ্টান মেয়েরা তোমাদের পদস্থ লোকদের কাছে আসে গোপনে। তখন কর্মকর্তারা হয় খৃষ্টানদের হাতের পুতুল। গোপন অভিসারে আমরা ওদের প্রেম নিবেদন করি, ভালবাসার নামে দেই নানা উপহার, মূল্যবান সামগ্রী আর স্বর্ণমুদ্রা। যারা আমাদের কাছে আসে ওদের কেউ যেন ধরা না পড়ে, এ জন্য মেয়েদের লুকিয়ে রাখা হয় এমন সব বাড়ীতে, যেখানে কারো সন্দেহের নজর পড়ে না। সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও নিরাপদ অবস্থানে থেকে আমরা দেশের বাঘা বাঘা মানুষগুলোর মাথা মাটির সাথে মিশিয়ে দেই। যে একবার আমাদের চক্করে পা দেয় সে আর কোন দিন বেরিয়ে

যেতে পারে না এ চক্কর থেকে। আমাদের তিনজনকে পাঠানো হয়েছে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এবং নূরুদ্দিন জঙ্গীর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি এবং তাদের নিকেশ করে ফেলার জন্য।'

খৃষ্টানদের গোপন তৎপরতার কাহিনী বলে যাচ্ছে মেয়েটা, নীরবে শুনছে আহমদ কামাল।

সূর্য ডোবার খানিক আগেই কায়রো পৌঁছলো কাফেলা। কমাণ্ডার গোয়েন্দা প্রধানের সাথে দেখা করলেন। মেয়েটার ব্যাপারে সব কথা বলে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। আরো বললেন, 'রজব কাফ্রীদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। থাকে দেবতার আশ্রমে। অনুমতি দিলে তাকে জীবিত বা মৃত ধরে আনার জন্য অভিযান চালাবো।'

আলী চারজন কমাণ্ডো সৈন্য তাকে দিয়ে বললেন, 'এখন বিশ্রাম করোগে।'

গোয়েন্দা প্রধান আলী মেয়েটাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। প্রশ্নের জবাবে ও বললো, 'আহমদ কামাল আমার সামনে বসে থাকলে সব প্রশ্নের জবাব দেবো। তা না হলে আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিলেও মুখ খুলবো না।'

আলী বিন সুফিয়ান আহমদ কামালকে ডাকলেন। বললেন, 'তুমি ওর পাশে বসো।'

মৃদু হেসে রেশমা বলতে শুরু করলো। সবকিছুই খুলে বললো সে, কিছুই গোপন করলো না। শেষে বললো, 'আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন দুঃখ নেই, কিন্তু আমার একটা শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে হবে। আমি আহমদ কামালের হাতে মরতে চাই।'

'আহমদ কামাল তোমার একজন শত্রু সৈন্য, তার হাতে মরতে চাচ্ছো কেন?'

আহমদ কামালকে কেন এত ভালবাসে তা খুলে বললো ও। আলী ওকে জেলে না পাঠিয়ে আহমদ কামালের হাতে তুলে দিলেন। নিজে ছুটলেন সুলতানের কাছে। মেয়ের বলা কথাগুলো সুলতানকে শোনালেন। বললেন, 'সুলতান! আপনার বিশ্বস্ত ফয়জুল ফাতেমী আমাদের দুশমন। মেয়েরা তার কাছেই আসছিল।'

'মিথ্যে কথা।' সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কণ্ঠে ঝাঁঝ, 'মেয়েটা মিথ্যে কথা বলে তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে। ফয়জুল ফাতেমী এমন হতেই পারেন না।'

'সম্মানিত সুলতান! সে ফাতেমী বংশের, আপনি তা ভুলে গেছেন? সম্ভবত এও ভুলে গেছেন, ফাতেমীরা ঘাতকদলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওরা আপনার অনুগত হতেই পারে না। খলিফা আল আযেদও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাকে আপনার শত্রু বলে উল্লেখ করেছিলেন।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। কাকে আর তিনি বিশ্বাস করবেন! কিছুক্ষণ পর বললেন, 'আলী, প্রমাণ ছাড়া ফয়জুল ফাতেমীকে গ্রেফতার করার অনুমতি তোমাকে দেবো না। প্রমাণসহ সুযোগ মতো ধরতে হবে তাকে, সে সুযোগ সৃষ্টি করা তোমার দায়িত্ব। আমি হাতেনাতে ধরতে চাই তাকে। ফয়জুল সেনা প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা। যুদ্ধের সব গোপন পরিকল্পনা সে জানে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রমাণ পেশ করো।'

'সুলতান, এ জন্য আমি এক পরিকল্পনা পেশ করছি। মেয়েটার ওপর দিয়ে ভয়ানক ঝড় বয়ে গেছে। আতংক জড়িয়ে আছে ওর মন মস্তিষ্কে। আহমদ কামালের জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে সে। আহমদ কামাল তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে, এ

জন্য কৃতজ্ঞ সে। তা ছাড়া তার ব্যবহারেও সে চমৎকৃত হয়েছে। আহমদ কামালের অনুপস্থিতিতে সে কথাই বলতে চায়নি। আশা করি মেয়েটার এ দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ওকে ব্যবহার করতে পারবো।'

'চেষ্টা করে দেখো। তবে মনে রেখো, বাস্তব প্রমাণ ছাড়া ফয়জুল ফাতেমীকে গ্রেফতার করার অনুমতি তুমি পাবে না।'

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েটার কাছে গেলেন। বুঝিয়ে বললেন উদ্দেশ্য।

'কামাল বললে আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারবো।'

আলী চাইলেন আহমদ কামালের দিকে। চোখে চোখে কথা হলো দু'জনের।

'হ্যাঁ, উনি যেভাবে বলেন করো।' আহমদ কামাল বললেন, 'কি করতে হবে বুঝে নাও।'

'আমি সফল হলে আমাকে কি পুরস্কার দেয়া হবে?'

'তোমাকে নিরাপদে ফিলিস্তিনের সুবাক কেল্লায় পৌঁছে দেয়া হবে।' বললেন গোয়েন্দা প্রধান, 'এখানে যতদিন থাকবে, সম্মানের সাথে রাখা হবে।'

'না, এ বিনিময় খুবই নগণ্য। আমি আরো বড় পুরস্কার চাই। আমি মুসলমান হবো। আমায় বিয়ে করবে আহমদ কামাল।'

আহমদ কামাল এ প্রস্তাব সরাসরি অস্বীকার করলেন। তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন গোয়েন্দা প্রধান। বুঝিয়ে বললেন প্রস্তাবে রাজি হতে।

আহমদ কামাল বললেন, 'জানি ও মুসলমান হবে। এরপরও ওকে আমি ইসলামের শত্রুই মনে করবো।'

'ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে নয়, আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকাই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য। ও আমার চাইতেও খাঁটি ঈমানদার হবে না এমন কথা আমি বলতে পারি না। দীলের মালিক আল্লাহ, ও ইসলামে ফিরে এলে শত্রুর অনেক গোপন খবর জানতে পারবো আমরা। বিয়েটা যদিও তোমার একান্ত নিজের পছন্দের ব্যাপার, তবু দেশ এবং জাতির স্বার্থে তোমাকে এ ত্যাগ স্বীকার করতে আমি অনুরোধ করবো।'

গোয়েন্দা প্রধানের কথা মেনে নিলেন আহমদ কামাল। ওরা আবার ভেতরে গেলেন। আহমদ কামাল মেয়েটাকে বললেন, 'তোমাকে এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। যদি তুমি আমার জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারো, আমার ধর্মের প্রতি অনুরাগী হও, তোমাকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই।'

মেয়েটা আলী বিন সুফিয়ানকে বললো, 'বলুন কি করতে হবে। দেখবো মুসলমান প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে কি না। তবে ওকে আমার সাথে থাকতে হবে।'

আলী বিন সুফিয়ান তার এ শর্তও মেনে নিলেন। একজন অফিসারকে ডেকে ওদের থাকার ব্যবস্থা করতে বললেন। দরজা বন্ধ করে আহমদ কামালের সামনে ওকে দায়িত্ব বুঝাতে লাগলেন তিনি।

তিন দিন পর। উটে চড়ে দেবতার আশ্রমে পৌঁছলো ছ'জন সৈন্য। পরণে সামরিক পোশাক। হাতে তীর ও বর্শা। কোমরে ঝুলানো তরবারী। মেয়েটার বর্ণনা শুনে এভাবেই এদের পাঠিয়েছেন আলী।

আশ্রম প্রাঙ্গণে ঢুকতেই একটা বর্শা এসে ওদের সামনে মাটিতে গেঁথে গেলো। থেমে গেলো ওরা। এগিয়ে এলেন পুরোহিত। সাথে তিনজন কাফ্রী। হাতে বর্শা।

কাফ্রীরা বললো, 'তোমরা এখন তীরন্দাজদের আওতার মধ্যে। নড়াচড়া করলে সবাইকে হত্যা করা হবে।'

কাফ্রীদের সামনে ওরা অস্ত্র ফেলে দিল। নেমে এলো উটের পিঠ থেকে। দলনেতা পুরোহিতের সামনে এসে বললো, 'আমরা তোমাদের বন্ধু। বন্ধুত্ব নিয়ে এসেছি, ফিরে যাবো বন্ধুত্ব নিয়ে। তোমরা কি তিনটি মেয়েকে বলী দেয়ার কাজ শেষ করেছো?'

'আমরা কোন মেয়ে বলী দেইনি!' পুরোহিতের কণ্ঠে ক্ষোভ, 'তোমরা এ প্রশ্ন করছো কেন?'

'আমরা মিশরের বিদ্রোহী সৈন্য। মুসলমানরা তোমাদের দেবতার অপমান করেছে, এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যে ফৌজ তৈরী হয়েছে আমরা সে দলের। আমরা পরাজিত হয়েছি। তোমাদের লোকেরা বলেছে, মেয়ে বলী দেয়া হয়নি বলে দেবতা আমাদের অভিশাপ দিয়েছেন।

আমরা ছিলাম রজবের সঙ্গী। একটার পরিবর্তে তিনটা ফিরিঙ্গী মেয়ে অপহরণ করে তার হাতে তুলে দিলাম। অনেক দূর থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে লোভ দেখিয়ে ওদের এনেছি। রজব ওদের এখানে নিয়ে এসেছে। গত পরশু ওর ফিরে যাবার কথা ছিল। ও ফিরে না যাওয়ায় মেয়েদেরকে বলী দেয়া শেষ হয়েছে কি না আমরা তা দেখতে এসেছি।'

দল নেতার কথায় গলে গেলেন পুরোহিত। বললেন, 'রজব আমাদের সাথে বজ্জাতি করেছে। মেয়েদের এখানে এনে তার নিয়ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে ওদের এখান থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা তাকে পালাতে দেইনি, শাস্তি দিয়েছি। মেয়েরা আমাদের হাত থেকে পালিয়ে গেছে। তোমরা কি আরো দুটো মেয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে? দেবতা আমাদের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট।'

'অবশ্যই করবো। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা নতুন দুটো মেয়ে নিয়ে ফিরে আসবো। দেবতাকে অসন্তুষ্ট করে বারবার আমরা পরাজিত হতে চাই না। রজব বেঈমানী করে থাকলে ওকে আমরা খুন করে ফেলবো। আমাদেরকে রজবের কাছে নিয়ে চলো। দেখি বেঈমানটা কি বলে?'

পুরোহিত সকলকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। মাটির তৈরী একটা ভাঁড়ের কাছে গিয়ে থামলেন তিনি। অন্য একটা পাত্র দিয়ে ঢাকা ভাঁড়, পুরোহিত ঢাকনা তুলে ভেতরে হাত ঢুকালেন। ধীরে ধীরে বের করে আনলেন হাত।

হাতে রজবের কাটা মাথা। অক্ষত চেহারা, আধখোলা চোখ, মুখ বন্ধ। চুল থেকে পানি ঝরছে। নষ্ট না হওয়ার জন্য মাথাটা ওষুধে ডুবানো হয়েছে।

পুরোহিত বললেন, 'ওর দেহটা কুমীরকে খেতে দিয়েছি। সঙ্গী দুটোকে ঝিলে ছেড়ে দিয়েছি জীবন্ত। আমার কুমীরগুলো ক্ষুধার্ত।'

'মাথাটা আমাদের দিতে হবে। আমরা এ মাথা আমাদের সকল সঙ্গীকে দেখাবো। ওদের বলবো, আংগুকের দেবতার অপমান করলে এই পরিণতিই হবে। ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করতে সাহস পাবে না কেউ।'

'নিতে পারো, তবে আগামীকাল সূর্যাস্তের আগেই ফেরত দিতে হবে। আংগুকের দেবতা এ মস্তিষ্কের মালিক। ফিরিয়ে না দিলে তোমাদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।'

দু'দিন পর সৈনিকরা ফিরে এসে সুলতানের পায়ের কাছে রেখে গেলো রজবের কাটা মাথা। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন সুলতান আইয়ুবী।

গভীর রাত। আহমদ কামাল ঘুমিয়েছিল নিজের কামরায়। তার পাশের বিছানায় শুয়ে আছে রেশমা। এ কক্ষে তাদের দু'দিন কেটে গেছে। রেশমা বার বার বলেছে, 'আমি মুসলমান হবো। তুমি আমায় বিয়ে করো।'

'আগে কর্তব্য পালন করো।' আহমদ কামালের স্পষ্ট জবাব।

আহমদ কামাল ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করেছেন এ দু'দিন। তাই তার সাথে প্রতারণা করা হতে পারে বলে কয়েকবার সন্দেহ প্রকাশ করলো রেশমা।

'তোমার এ সন্দেহ ভিত্তিহীন। যে নীতি-নৈতিকতার কারণে তোমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকছি সে নীতিই ওয়াদা পালনে আমাকে বাধ্য করবে। তুমি তোমার কাজ শেষ করো, আমি আমার ওয়াদা পালন করবো।'

আহমদ কামালের এসব কথায় ওর মনের ভয় ও সন্দেহ দূর হয়ে গেলো। তার মাঝে ফিরে এলো স্বাভাবিক চিন্তা করার শক্তি। গভীর ভাবনায় ডুব দিল ও।

এক রাতে দু'জন বারান্দায় শুয়ে আছে। বাইরে সেন্ট্রি। মাঝ রাত। সেন্ট্রি হাঁটতে হাঁটতে একদিক থেকে আরেক দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সহসা পেছন থেকে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো কেউ। সাথে সাথে অন্য দু'জন এসে কাপড় দিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেললো। শক্ত করে বেঁধে ফেললো হাত-পা।

অন্ধকারে চারজন বাড়ীর ফটকে গিয়ে দাঁড়ালো। ফটক বন্ধ। একজন দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। অন্যজন তার কাঁধে পা রেখে দেয়াল টপকালো। ভেতর থেকে খুলে দিল ফটক। ভেতরে ঢুকলো তিনজন।

একজন মেয়েটার মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেললো। তুলে নিল কাঁধে। অন্য তিনজন আহমদ কামালকে রশি দিয়ে খাটের সাথে শক্ত করে বাঁধলো। প্রতিরোধ করার কোন সুযোগই তিনি পেলেন না।

বাইরে গিয়ে মেয়েটার গায়ে কম্বল চাপিয়ে দিল লোকগুলো। একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল চারটি ঘোড়া। চারজন চারটি ঘোড়ায় চেপে বসলো। একজন তার সাথে তুলে নিল মেয়েটাকে। কেউ যেন সন্দেহ করতে না পারে সে জন্য নির্জন পথ ধরে ওরা শহর থেকে বেরিয়ে এলো।

শহরের পাঁচ মাইল দূরে 'ফারাও' পাহাড়ে ফেরাউনের আমলের পতিত ভাঙা বাড়ী। বাড়ীটা বিশাল এক পাথুরে টিলায়। টিলা কেটে বানানো হয়েছে কামরা, একটা দুটো নয়, অনেকগুলো।

এ কামরাগুলোর নিচের দিকে এগিয়ে গেছে সিঁড়ি। সে সিঁড়ি ভেঙে নিচে গেলে উপরের মতোই পাওয়া যাবে সারি সারি কামরা, পেঁচানো বারান্দা, এক কামরা থেকে অন্য

কামরায় যাওয়ার অপ্রশস্ত পথ। অচেনা লোক কখনো ওখানে গেলে পথ চিনে ফিরে আসা কষ্টকর।

বাড়ীটি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ভয়ংকর সব কথা প্রচলিত আছে বাড়ীটি সম্পর্কে। ভয়ে কেউ ও পথ মাড়ায় না। কাছে গেলেই কেমন গা ছমছম করে। সবাই মনে করে ওখানে জ্বিন ভূতের আড্ডা আছে। বিষাক্ত সাপের ভয়ে ভেতরে ঢোকার সাহস করে না কেউ। এমনকি দিনের বেলায়ও কেউ বাড়ীটার ধারে কাছে যায় না।

অপহরণকারীরা মেয়েটিকে নিয়ে ভূতুড়ে বাড়ীটার ভেতর প্রবেশ করলো। ওরা এমনভাবে হাঁটতে লাগলো, যেন ওটা ওদের নিজের বাড়ী। অবলীলায় পথ ভেঙে অতিক্রম করছে কামরার পর কামরা। সামনে মশালের আলো ধরে হাঁটছে একজন। পায়ের শব্দে চামচিকা, বাদুর, টিকটিকি ছুটে পালাচ্ছে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে মাকড়সার জাল।

পাথরের তৈরী বিশাল এক কামরায় প্রবেশ করলো ওরা। মশালবাহী লোকটি দেয়ালের এক জায়গায় হাত রাখলো। এক কোণার মেঝের খানিকটা জায়গার পাথর সরে গেলো।

বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গ সিঁড়ি। নিচের দিকে নেমে গেছে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো ওরা। উপরের কামরার মতো বিশাল কামরা এখানেও। কামরায় ফরাশ বিছানো। ফরাশে চমৎকার চাদর। সাজানো গুছানো কক্ষ।

কামরায় পৌঁছে মেয়েটার মুখের কাপড় খুলে দিল ওরা। মুখ খুলতেই রাগের সাথে চেঁচিয়ে উঠলো ও, 'কেন আমাকে ধরে এনেছো তোমরা? কি চাও আমার কাছে? বদমতলব থাকলে শুনে রাখো, মরে যাবো, তবুও কাউকে কাছে আসতে দেবো না।'

'এভাবে তুলে না আনলে আগামীকাল ভোরে ওরা তোমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিত। আমার নাম ফয়জুল ফাতেমী। আমার কাছেই তোমাদের আসার কথা ছিল। অন্য দু'জন কোথায়? রজব কোথায়? তুমি একা ধরা পড়লে কিভাবে?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেয়েটা বললো, 'খোদার শোকর তিনি আমাকে এক ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পেরেছি।'

এরপর ফয়জুল ফাতেমীকে রজব এবং কাফ্রীদের কথা, ঝড়, আহমদ কামালের হাতে ধরা পড়া, সব ঘটনা খুলে বললো ও। শোনালো দুটো মেয়ের মৃত্যুর করুণ কাহিনী। ফয়জুল তাকে শান্ত্বনা দিলেন।

অপহরণকারী চারজনকে ছ'টি করে স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বললেন, 'যে যার স্থানে চলে যাও। আমিও বেরিয়ে যাবো একটু পর। ও এখানে তিন চার দিন থাকবে। প্রতি রাতেই আমি আসবো। বাইরে ওর খোঁজাখুজি শেষ হলে নিয়ে যাবো নিরাপদ আশ্রয়ে।'

লোক চারজন বেরিয়ে গেলো। লুকিয়ে রইলো বাড়ীর পাশে। ফয়জুল ফাতেমীর সাথে রইলো একজন সেনা কমাণ্ডার। ফয়জুলের খুশীর অন্ত নেই। তার অভিযান সফল হয়েছে। মেয়েটার কাছ থেকে দুটো মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনে যদিও তিনি দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না।

রজবের পরিণতি তিনি জানেন না। বললেন, 'রজবকে ওখান থেকে বের করে আনতে হবে। সে সালাহউদ্দিন এবং আলীকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেছে। ঘাতক দলের

সাথে কি কথা হয়েছে আমি জানি না। যতশীঘ্র সম্ভব এ দুটো লোককে হত্যা করতে হবে।'

তারপর রেশমার দিকে ফিরে বললেন, 'এখন নতুন করে পরিকল্পনা করবো। অন্যদের সাথে কথা বলে তোমাকে কি করতে হবে কাল জানাবো। এখন বিশ্রাম করো, আমাকে জরুরী কাজে ফিরে যেতে হচ্ছে। তোমার দেখাশোনার জন্য লোক থাকবে এখানে, কোন অসুবিধা হবে না।'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আপনাকে কতোটা বিশ্বাস করেন?' প্রশ্ন করলো রেশমা।

'নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আমার সাথে পরামর্শ করেন।'

'শুনেছি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে সুলতান আইয়ুবীর অনুগতদের সংখ্যা বেশী। সেনাবাহিনীও তার অনুগত।'

'একথা ঠিক!' এবার কথা বললো কমাণ্ডার, 'তার গোয়েন্দা সংস্থা অত্যন্ত সতর্ক। কেউ কোথাও মাথা তুললে সাথে সাথে ওরা টের পেয়ে যায়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যারা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের কথা সম্মানিত ফয়জুল ফাতেমী আপনাকে বলবেন।' ফয়জুল ফাতেমী ওদের নাম উল্লেখ করে মৃদু হাসলেন।

'তোমাকে উঁচু পর্যায়ে কাজ করতে হবে। দু'জনের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করতে হবে। দু'জনকে খাওয়াতে হবে বিষ। এ দুটো কাজই তোমার জন্য সহজ। তবে সমস্যা হলো, তোমাকে কোন জলসা বা সভায় নেয়া যাবে না। পর্দানসীন মুসলমান মেয়েদের মতো বোরকা না পরলে ধরা পড়ে যেতে পারো। তা না হয় তোমাকে ফিলিস্তিন ফেরত পাঠিয়ে অন্য কোন অপরিচিত মেয়ে নিয়ে আসতে হবে। তবে একটু সমঝে চললে আশা করি কোন অসুবিধা হবে না।

আমার গ্রুপ অত্যন্ত তৎপর এবং চৌকস। ওরা সবাই প্রায় কমাণ্ডার পর্যায়ের। যে চারজন সাহসের সাথে তোমাকে তুলে এনেছে ওরাও আমার নিজের লোক। আইয়ুবীর সেনাবাহিনীতে আমরা অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি। ফৌজের বিরুদ্ধে জনগণের মাঝে ঘৃণার বিষ ছড়িয়ে দেয়ার কাজও চলছে।'

'সিরীয় এবং তুর্কী সৈন্যদেরকে মানুষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখছে। সুদানীদের পরাজিত করায় শহরের লোকজনও সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা করে বলে শুনেছি।'

'সাধারণ মানুষের এ অনুভূতিতে আঘাত করতে হবে। সেনা অফিসারদের অপদস্ত করতে হবে। তা না হলে খৃষ্টান বা সুদানীরা আমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। এ ব্যাপারেও আমাদের কিছু পরিকল্পনা আছে, তবে এখনি সব বলা যাবে না।'

'আমি এ কয়দিন ওদের হাতে থেকে বুঝেছি, আইয়ুবীর বাহিনী বাইরের যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে একদিক থেকে খৃষ্টান বাহিনী অন্যদিক থেকে সুদানীরা আক্রমণ করলেও পরাজিত হবে। জনগণ সেনাবাহিনীর সাথে মিশে কায়রোকে এমন দুর্গে পরিণত করবে, যা জয় করা সম্ভব হবে না।'

'তুমি ঠিকই বলেছো। কায়রো জয়ের জন্য আমাদেরকে ময়দান তৈরী করতে হবে। সাধারণের মাঝে বিদ্বেষ ছড়াতে হবে। ধ্বংস করে দিতে হবে যুবকদের চরিত্র এবং নৈতিকতা।'

'আমাকে বলা হয়েছে দু'বছর থেকেই এ কাজ চলছে।'

'আমরা যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছি। বেহায়াপনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আইয়ুবী দেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। খোতবা থেকে খলিফার নাম সরিয়ে ইসলামের সত্যিকার রূপ তুলে ধরা হচ্ছে প্রতি জুম্মায়। তা ছাড়া আইয়ুবী মেয়েদেরকেও সামরিক ট্রেনিং দেয়া শুরু করেছে। তার এসব তৎপরতা আমাদের কিছুটা ক্ষতি করছে।'

'এখন বাইরে যাবেন না।' পাহারাদারদের একজন ভেতরে এসে বললো, 'মনে হয় কিছু সমস্যা হয়েছে।'

ভয় পেয়ে গেলেন ফয়জুল ফাতেমী। মশাল নিভিয়ে লোকটার সাথে বেরিয়ে এলেন কি হয়েছে দেখার জন্য।

ফকফকা জ্যোৎস্না বাইরে। একটা উঁচু বেদীর ওপর লুকিয়ে তিনি চারদিকটা দেখলেন ভাল করে। বললেন, 'তোমরা যথেষ্ট সতর্কতার সাথে কাজ করতে পারোনি। মনে হয় সৈন্যরা ঘেরাও করে ফেলেছে বাড়ী। অশ্বারোহীও আছে ওদের সাথে। দেখো, কোন দিক দিয়ে বেরোনোর উপায় বের করা যায় কি না।'

'আমরা চারদিকই ভাল করে দেখেছি। ওরা আমাদের ঘেরাও করে ফেলেছে। আপনি ভেতরে যান। আলো জ্বালাবেন না। কক্ষ থেকে বের হবেন না। ওরা ভেতরে ঢুকতে চাইলে বাঁধা দেবো আমরা, কেউ ওখানে যেতে পারবে না।'

বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন ফয়জুল ফাতেমী। উপর থেকে নেমে এলো এক পাহারাদার। ভেতরে না ঢুকে অন্ধকারে পা টিপে টিপে দেয়াল ঘেঁষে বেরিয়ে এলো বাইরে।

পঞ্চাশজন পদাতিক ও জনাপঁচিশেক ঘোড়সওয়ার ঘিরে রেখেছে বাড়ীটা। পাহারাদার একজন সৈন্যকে জিজ্ঞেস করে আলী বিন সুফিয়ানের কাছে পৌঁছলো। আলীর পাশে দাঁড়িয়েছিল কমাণ্ডার আহমদ কামাল।

পাহারাদার বললো, 'ভেতরে কোন সমস্যা নেই। আপনার সাথে দু'জন লোকই যথেষ্ট, আমার সাথে আসুন।'

আলী দুটো মশাল জ্বালালেন। হাতে কোষমুক্ত তরবারী। আহমদ কামাল এবং চারজন সিপাইকে সাথে নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লেন তিনি। ওরা ভেতরে পা দিতেই অন্য একজন পাহারাদার অন্দরের দিকে দৌড় দিল। আলীর সঙ্গী পাহারাদার বললো, 'এ লোকটা ওদের নিজস্ব। সবাইকে সাবধান করার জন্য গেছে।'

'তাড়াতাড়ি চলো।'

ছুটে যাওয়া পাহারাদারের পিছু নিয়ে ছুটলেন ওরাও। সঙ্গী লোকটি না থাকলে আঁকাবাঁকা পথে এতোক্ষণে ওরা হারিয়ে যেতো। একদিক থেকে ভেসে এলো ছুটন্ত মানুষের পায়ের আওয়াজ। কেউ একজন অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, 'আমি আগে আগে যাচ্ছি, আপনারা দ্রুত আসুন।'

দলটি পাথুরে কক্ষে পৌঁছলো। এখান থেকে সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। কেউ একজন বলছে, 'আমাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। অপহরণকারীদের দু'জন ওদের লোক ছিল।'

তলোয়ারে তলোয়ারে টক্কর খেতে লাগলো। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লো দু'দল। ভেতর থেকে শব্দ এলো, 'ওকেও শেষ করে দাও। যেন সাক্ষী দিতে না পারে।'

আলী এবং আহমদ কামাল লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙলেন। কক্ষের মেঝেতে রক্ত বইছে। দু'হাতে পেট চেপে ধরে বসে আছে রেশমা। তার মুখ ঢেকে রেখেছে তার এলোমেলো রেশমী চুল। ফয়জুল ফাতেমী ও তার সঙ্গী কমাণ্ডার দুই পাহারাদারের সাথে লড়ছে। বিপক্ষের তলোয়ারগুলো দেখে দমে গেলেন ফয়জুল ফাতেমী। অস্ত্র ছেড়ে দিলেন।

রেশমার কাছে গেলেন আহমদ কামাল। পেট চিরে ফেলা হয়েছে তার। বিছানার চাদর চিরে কষে বেঁধে আলীকে বললেন, "অনুমতি দিলে ওকে বাইরে নিয়ে যাবো।"

রেশমাকে কোলে তুলে নিলেন আহমদ কামাল। ব্যথা ভুলে গেলো সে। মুচকি হেসে বললো, 'আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি, ধরিয়ে দিয়েছি অপরাধীকে।'

অপহরণকারী দলের দু'জন সহ ফয়জুল ফাতেমীকে গ্রেফতার করা হলো। বাকী দু'জন ছিল আলীর লোক।

সুলতান আইয়ুবী বলেছিলেন, 'খোঁড়া অজুহাত দিয়ে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।'

আলী বিন সুফিয়ান রেশমার কাছ থেকে পারস্পরিক পরিচিতির নির্দিষ্ট সংকেত জেনে নিয়ে তিনজন চৌকস গোয়েন্দা পাঠালেন ফয়জুল ফাতেমীর কাছে। তিনজনের একজন কমাণ্ডার। ওরা নির্দিষ্ট সংকেত ব্যবহার করে ফয়জুল ফাতেমীর সাথে দেখা করলো। বললো, 'একটা মেয়ে ধরা পড়েছে। ওরা তাকে একটা ঘরে বন্দী করে রেখেছে। একটু চেষ্টা করলেই মেয়েটাকে বের করে আনা যায়।' ওরা আরো বললো, 'মেয়েটাকে উদ্ধার করার জন্য রজব আমাদের পাঠিয়েছেন।'

গোয়েন্দাদের বিশ্বাস করলেন ফয়জুল ফাতেমী। তিনি ভাবলেন, নির্যাতনের মুখে মেয়েটা তাদের পরিচয় প্রকাশ করে দিতে পারে। আত্মরক্ষার স্বার্থেই ওকে অপহরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কমাণ্ডারকে রাখলেন নিজের কাছে।

আলীর পাঠানো দু'জনের সাথে অন্য দু'জন সহ চারজনকে অপহরণের দায়িত্ব দেয়া হলো। মেয়েটাকে তুলে ওরা ভাঙা বাড়ীটায় চলে যাবে। কিছুদিন থেকে এ বাড়ীটা তাদের গোপন অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অপহরণের বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো গোয়েন্দা প্রধানকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আহমদ কামাল মেয়েটাকে নিয়ে রাতে বারান্দায় ঘুমালো, বাইরে পাহারায় রইলো একজন গোয়েন্দা কর্মী। রাতে ফয়জুল ফাতেমী যথাসময়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন ভূতুড়ে বাড়ীতে। পাহারাদারকে ঘায়েল করে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকলো অপহরণকারীরা।

আহমদ কামাল ঘুমের ভান করে ধরা দিলেন ওদের হাতে। ওরা তরুণীকে ভাঙা বাড়ীতে পৌছে দিল। ওরা বেরিয়ে যেতেই আলী গিয়ে আহমদ কামাল এবং প্রহরীর বাঁধন খুলে দিলেন।

একটু পর পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে ঘিরে ফেললেন ভূতুড়ে বাড়ী। ফয়জুল ফাতেমীকে হাতেনাতে ধরার জন্যই কেবল এ নাটকের অভিনয় করা হয়েছিল।

ফয়জুল ফাতেমী এবং তার সঙ্গীদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে

রাখা হলো ওদের। প্রত্যেককে দেখানো হলো রজবের কাটা মাথা।

'বন্ধুর পরিণাম দেখে নাও।' আলী বললেন, 'এখনি চূড়ান্ত শাস্তি দেবো ভেবে থাকলে ভুল করেছো। ষড়যন্ত্রে জড়িত সব কটা লোকের নাম না বলা পর্যন্ত শাস্তি চলবে। মরতেও দেবো না, আবার বাঁচবেও না।'

রেশমার অবস্থা ছিল আশংকাজনক। বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করা হলো। অবস্থা প্রতি মুহূর্তে খারাপের দিকে যাচ্ছিল, তবুও ও ছিল নির্বিকার। চোখে মুখে ছিল প্রশান্তির ছাপ। আহমদ কামালকে বললো, 'তুমি আমার কাছে বসে থাকো।'

সুলতান ওকে দেখার জন্য এলেন। সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াতে গেলো আহমদ কামাল, মেয়েটা ওর হাত ধরে বললো, 'না, তুমি উঠো না। আমার পাশে বসে থাকো।'

সুলতানের সামনে ওর কাছে বসতে আহমদ কামাল দ্বিধা করছিলেন। সুলতান বললেন, 'তুমি ওর পাশে বসো।'

সুলতান ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন সুস্থতার জন্য।

তৃতীয় রাতে যুবতীর পাশে বসে আছেন আহমদ কামাল। আবেগ জড়িত কণ্ঠে ও বললো, 'আহমদ! তুমি আমি আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি, তুমিও তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছো। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, নইলে তোমাকে আমার কাছে পাঠাতেন না। আমি কি ভাগ্যবতী, আমার সব আশা ও স্বপ্ন আল্লাহ পূরণ করেছেন। তুমি আমার পাশে বসে থাকলে মরতে আমার মোটেই কষ্ট হবে না।'

কথা জড়িয়ে গেলো ওর। আহমদ কামালের হাত মুঠোয় চেপে ধরলো। ধীরে ধীরে ঢিলে হয়ে গেলো তার হাতের বাঁধন। আহমদ কামাল 'ইন্নালিল্লাহ' বলে ঢেকে দিলেন ওর মৃতদেহ। পরদিন সুলতানের নির্দেশে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে সমাহিত করা হলো।

দু'দিন পর ফয়জুল ফাতেমী এবং তার সঙ্গীরা অন্য সদস্যদের নাম বলে দিতে বাধ্য হলো। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী গ্রেফতার করা হলো ওদের। ফয়জুল ফাতেমীর মৃত্যুদণ্ডের কাগজে দস্তখত দেয়ার সময় সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

৩

কায়রোর উপশহরের এক মসজিদ। একদিন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে শহরতলীর সে মসজিদের কাছে এসে থামলো আটজন অশ্বারোহী। মসজিদ থেকে সামান্য দূরে এক সরাইখানার ফটকে এসে ঘোড়া থেকে নামলো ওরা। ঘোড়াগুলো তুলে দিল সরাইখানার লোকজনের হাতে। তারপর দু'জন দু'জন করে চারটে দলে ভাগ হয়ে ওরা মসজিদের চারদিকটা ভাল করে ঘুরে দেখলো।

এশার নামাজের আযান হলো। ওরা একে একে এসে প্রবেশ করলো মসজিদে। প্রথম সারিতে নামাজ পড়লো চারজন, চারজন দাঁড়ালো মসজিদের ভেতরের সর্বশেষ কাতারে। নামাজ শেষ হলো। মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন ইমাম সাহেব। লোকজন প্রতিদিনের মতো আজো ইমাম সাহেবের ওয়াজ শোনার জন্য যে যার জায়গায় বসে পড়লো।

ওয়াজ শুরু করলেন ইমাম সাহেব। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, 'ইমাম সাহেব! আল্লাহ আপনার জ্ঞানের আলো আরো বাড়িয়ে দিক। আপনার খ্যাতি শুনে আমরা আটজন অনেক দূর থেকে এসেছি। সমস্যা মনে না করলে জিহাদের বিষয়ে কিছু বলুন। জিহাদের তাৎপর্য আমরা বুঝি না। লোকজন বলছে আমাদের নাকি জিহাদের ভুল অর্থ বুঝানো হয়েছে।'

'আমরা জিহাদ সম্পর্কে আপনার বয়ান শুনতে চাই।' সাতটি কণ্ঠ একসঙ্গে প্রতিধ্বনিত হলো। একজন বললো, 'এ হচ্ছে সময়ের দাবী। আমাদের জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা শোনানো হয়েছে। আমরা সঠিক অর্থ জানতে চাই।'

'কোরানের নির্দেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।' ইমাম সাহেব বললেন, 'কোরানের বাণী মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া আমার দায়িত্ব। একবার নয়, হাজার বার আমি আপনাদের কাছে জিহাদের তাৎপর্য তুলে ধরতে প্রস্তুত। জিহাদের অর্থ অন্যের জমি দখল করা বা কারো গলা কাটা নয়। হত্যা, মারামারি বা খুনাখুনিও জিহাদ নয়।' তিনি কোরানের আয়াত পড়ে বললেন, 'এ আমার কথা নয়, খোদার কালাম। সর্বোত্তম জেহাদ হচ্ছে নিজের নফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তাইতো আমি বলি, পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই হচ্ছে আসল জিহাদ। তোমরা শোননি, ইসলাম তরবারীর জোরে নয়, প্রেম এবং ভালবাসা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? পরবর্তী সময়ে জিহাদের অর্থ বদলে গেছে। এর অর্থ পরিবর্তন করেছে ক্ষমতালোভীরা। খৃস্টানরা অন্যের দেশ দখল করাকে ধর্মযুদ্ধ বলে। মুসলমানও একই উদ্দেশ্যে লড়াই ও যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে। আর এসব কথা বলে ক্ষমতাসীন শাসকরা। তারা এসব বলে তাদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। মানুষকে ধর্মের কথা বলে যুদ্ধে লিপ্ত করে রাজা বাদশাহরা। এতে রাজাদের শাসন ক্ষমতা

পাকাপোক্ত হয় কিন্তু প্রাণ যায় সাধারণ মানুষের।'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীও কি মানুষকে অন্যায়ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়েছেন?' প্রশ্ন করলো একজন।

'না। তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। বড়োরা তাকে যা বলেছে, আন্তরিকতার সাথে তাই তিনি পালন করছেন। খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তার মনে ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে। ভেবে দেখো, খৃষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়! দু'জন নবীর কথাইতো এক। হযরত ঈসা (আ.) প্রেম ভালবাসার কথা বলেছেন। আমাদের নবীও মানুষকে ভালবাসতে বলেছেন। তাহলে এসব যুদ্ধ বিগ্রহ এলো কোত্থেকে! আল্লাহর জমিনে যারা নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে গোলামে পরিণত করতে চায় এসব তাদের আবিষ্কার।

আমি মিশরের সম্মানিত আমীরের কাছে যাবো। তাকে বোঝাবো জিহাদের সত্যিকার তাৎপর্য। অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে তিনি যা করছেন এ হচ্ছে সত্যিকারের জিহাদ। খোতবা থেকে খলিফার নাম মুছে তিনি বড় জিহাদ করেছেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে। শিশুদেরকে খোদার নামে যুদ্ধবিগ্রহ শেখানো হচ্ছে। এদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে তীর ও তরবারী। এ তীর ও তরবারী ওরা কোথায় ব্যবহার করবে? অবশ্যই কিছু মানুষ দেখিয়ে বলতে হবে, এরা তোমাদের শত্রু। এদের নিশ্চিহ্ন করো।'

ইমাম সাহেবের কণ্ঠে ছিল অবর্ণনীয় আকর্ষণ। যাদুগ্রস্তের মতো আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল শ্রোতারা। তিনি আবার শুরু করলেন, 'তোমাদের শিশুদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। নইলে তাদের সাথে তোমরাও আগুনে পুড়বে। তোমরাই ওদেরকে পাপের পথে নিক্ষেপ করছো। সেনাপতি এবং সম্রাটরা তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যেতে পারবে না। শুধু দ্বীন ইসলামের প্রদীপধারী ইমাম এবং আলেমরাই স্বর্গ দিতে পারবে। সমগ্র জীবন নামাজ পড়লে এবং ভাল কাজ করলেও মানুষের রক্তে রঙ্গীন হাত দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে।

তোমরা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাকাত প্রদান করো। কোষাগার হলো সরকারের, সরকার গরীব নয়। যাকাত হলো গরীবের অধিকার। তোমাদের যাকাতের টাকায় অস্ত্র এবং ঘোড়া কিনে মানুষকে হত্যা করা হয়। যাকাত দিয়ে তোমরা বেহেশতে যাবে, অথচ এখন পাপের ভাগী হচ্ছো। এ জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাকাত দেয়া যাবে না।'

ইমাম সাহেব আলোচনার বিষয় ঘুরিয়ে বললেন, 'অনেক কথা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। বলারও কেউ নেই। মানুষের মধ্যে রয়েছে একটা কামজ রিপু। এ এক জৈবিক সত্তা। তোমাদের কি নারীর প্রয়োজন হয় না! এ হচ্ছে স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা। আল্লাহই মানুষের মধ্যে এ চাহিদা তৈরী করে দিয়েছেন। তোমরা এ চাহিদা পূরণ করে আল্লাহর পরিকল্পনাকেই বাস্তবায়ন করো মাত্র। আল্লাহ একসঙ্গে চার স্ত্রী ঘরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের প্রয়োজন ও সামর্থের কথা বিবেচনা করে। যাদের সামর্থ কম তারা এক স্ত্রী রাখবে। বিয়ের মাধ্যমে তোমরা একজন নারীর সারা জীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নাও বলে সে নারী তোমার জন্য হালাল হয়ে যায়। একজন স্ত্রীও যদি না রাখতে পারো তবে টাকার বিনিময়ে কোন নারীর কাছে আকাঙ্খা পূরণ করতে যাওয়া

অপরাধ হবে কেন? এ চাহিদা, এ আকাঙ্ক্ষাতো খোদারই দান। তাই নিরুপায় হয়ে তোমরা যদি এ চাহিদা মেটাতে অন্ধগলিতে যাও তা অপরাধ নয়। তবে সামর্থ অনুযায়ী সে নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমাকে বহন করতেই হবে। যদি একদিনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নাও তবে তুমি তাকে পাবে একদিনের জন্য আর এক মাসের দায়িত্ব নিতে পারলে পাবে এক মাসের জন্য। এটাই ইনসাফের দাবী। আর ইসলাম টিকে আছে এই ইনসাফের জন্য। ইসলামের সার কথা হলো, এরপরও পাপ থেকে বেঁচে থেকো, কোন পুরুষের কাছে যেয়ো না। কারণ, কোরানে আছে, পুরুষের কাছে যাওয়ার অপরাধে আল্লাহ আ'দ ও সামুদ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

এক থেকে চার পর্যন্ত যত ইচ্ছে বিয়ে করতে পারো। নিজের স্ত্রী এবং মেয়েদেরকে ঘরের ভেতর রাখবে। আমি শুনেছি, যুবতী মেয়েদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শেখানো হচ্ছে ঘোড়সওয়ারী, অসি চালনা এবং আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসা দানের পদ্ধতি। ওরা যুদ্ধে যাবে। আহতদের সেবা করবে। প্রয়োজনে যুদ্ধ করবে। ফলে পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হবে। এ চরম পাপ। এ পাপ থেকে নিজে বেঁচে থাকো। যারা মসজিদে আসে না তাদেরকেও বলো। খোদার বিধানে কেউ হস্তক্ষেপ করো না। এটা বড়ই গুণার কাজ।'

ইমাম সাহেবের ওয়াজ শেষ হলো। বসার স্থান না পেয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেক শ্রোতা। একজন একজন করে হুজুরের সাথে হাত মিলিয়ে সবাই ফিরে যেতে লাগল। কেউবা ঝুঁকে তাঁর হাতে চুমো খেলো।

ইমাম সাহেবের সামনে দু'জন লোক বসা। পরণে জুব্বা। মাথায় পাগড়ী। জরির কাজ করা রুমালে ঢাকা মুখের একাংশ। কাল দীর্ঘ দাড়ি। পোশাকে আশাকে মধ্যবিত্ত মনে হয়। একজনের এক চোখ হলুদ কাপড়ে বাঁধা। তিনি বললেন, 'হুজুর, জিহাদ সম্পর্কে আরো কিছু বলুন।'

'তোমার চোখে কি হয়েছে?'

'হুজুর, আমার এক চোখ খারাপ।'

ইমাম সাহেব তাকালেন তার সঙ্গীর দিকে। সঙ্গীটির মুখের একাংশ রুমালে ঢাকা, ঘন দাড়ি। এ দু'জন ছাড়া সবাই চলে গেছে।

'তোমাদের সন্দেহ এখনো দূর হয়নি?' মৃদু হেসে ইমাম সাহেব প্রশ্ন করলেন।

'সন্দেহ দূর হয়েছে।' জবাব দিল একচোখা লোকটি। 'আমরা সম্ভবত আপনাকেই খুঁজছি। মিশরের অর্ধেকটা চষে বেড়িয়েছি আপনার জন্য। আমাদেরকে ভুল ঠিকানা দেয়া হয়েছিল।'

'অর্ধেক মিশরেও আমার মতো আলেম পাওনি?'

'খুঁজছি তো আপনাকে। আমরা কি সঠিক স্থানে আসিনি? ওয়াজ শুনে মনে হলো আমরা আপনাকেই চাইছি।'

বাইরের দিকে তাকালেন ইমাম সাহেব। বললেন, 'আবহাওয়া কেমন হবে জানি না।'

'বৃষ্টি আসবে।' একচোখা লোকটির জবাব।

'পরিষ্কার আকাশ।'

'আমরা মেঘের সৃষ্টি করবো।' বলেই হেসে উঠলো লোকটি। ইমাম সাহেব মুচকি হেসে ফিসফিস করে বললেন, 'কোত্থেকে এসেছো?'

'এক মাস ছিলাম ইস্কান্দারিয়া, তার আগে সুবাক।'

'মুসলমান?'

'ঘাতক দলের সদস্য। মুসলমান মনে করতে পারেন।'

এবার দু'জনই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

'আপনাকে ওস্তাদ মানছি।' লোকটির সঙ্গী বললো 'আপনিই যে আমাদের কাঙ্খিত ব্যক্তি আপনাকে দেখে আমার তা বিশ্বাসই হচ্ছিল না।'

'আপনি ব্যর্থ হতে পারেন না।' বললো অপরজন।

'সাফল্য অতো সহজ নয়।' ইমাম সাহেব বললেন, 'আইয়ুবীকে তোমরা চেনো না। আমি জিহাদ এবং জীবন সম্পর্কে এদের চিন্তাধারা বদলে দিয়েছি। কিন্তু আইয়ুবীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের সফল হতে দিচ্ছে না। জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য তোমরা কেন আমাকে বারবার চাপ দিচ্ছিলে?'

'সুবাক থেকে আমাদের বলা হয়েছে, এটিই আপনার বড় পরিচয়।' জবাব দিল একচোখা লোকটি। 'আপনার বলা প্রতিটি কথাই ওখানে আমাদের শোনানো হয়েছে। আমাদের আরো বলা হয়েছে, আপনার ওয়াজে অবশ্যই যৌনতার প্রসঙ্গ থাকবে। এসব শিখতে আপনি নিশ্চয় অনেক পরিশ্রম করেছেন?'

'আমার নাম কি?'

'আপনি কি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন? সন্দেহ করছেন আমাদের? পরস্পরের পরিচিতির জন্য নাম নয়, আমরা বিভিন্ন সংকেত ব্যবহার করি।'

'তোমরা কি জন্য এসেছো?'

'ঘাতকদল কি কাজ করে?'

'আমার কাছে পাঠানো হয়েছে কেন?'

'একটা উষ্ট্রীর জন্য। আপনার কাছে দু'টি রয়েছে। আপনার কাছে আসার কথা ছিল না। আপনি হয়তো খবর পেয়েছেন, আইয়ুবীর এক কমাণ্ডার রজবের কাছে সুবাক থেকে তিনটি উষ্ট্রী দেয়া হয়েছিল। একটা ছিল আমাদের জন্য। কিন্তু তার দুটোই মারা গেছে। রজবের কাটা মাথা আর সবচে সুন্দরী উষ্ট্রীটা আইয়ুবীর হাতে পৌঁছেছে। ওটাও শেষ।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।' ইমাম সাহেবের বিষণ্ণ কণ্ঠ। 'আমাদের অনেক ক্ষতি হলো। সালাহউদ্দীনের এক শক্তিশালী সেনাপতি আমাদের হাতে ছিল। তাকেও জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। ভেতরে চলো, এসব কথার জন্য এ স্থান উপযুক্ত নয়।'

দু'জনই ইমাম সাহেবের সাথে বেরিয়ে গেলো।

ইমাম সাহেব দু'জনকে নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। বাড়ীটি পরিচ্ছন্ন। দু' তিনটি কামরা পেরিয়ে একটি কামরার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ওদের সামনে পুরনো এক দরজা। দরজায় তালা লাগানো। মনে হয় দীর্ঘ দিন থেকে খোলা হয়নি। এক পাশে জানালা। ইমাম সাহেব হাত লাগালেন। জানালার পাল্লা খুলে গেলো। সবাই ভেতরে

তাকাল। সাজানো গোছানো কক্ষ। দেয়ালে ঝুলছে সোনার তৈরী ক্রুশ। একপাশে যিশুর, অন্যদিকে মা মেরীর হাতে আঁকা ছবি। ইমাম সাহেব বললেন, 'আমার গীর্জা। আমার আশ্রয়।'

'আকস্মিক বিপদ থেকে বাঁচার জন্য কি ব্যবস্থা রেখেছেন?' একচোখা লোকটি প্রশ্ন করলো। 'ক্রুশ এবং ছবিগুলো এভাবে রাখা ঠিক হয়নি।'

'এখানে আসার দুঃসাহস কেউ করবে না।' ইমাম সাহেব হেসে বললেন, 'মুসলমানরা সরল এবং আবেগপ্রবণ জাতি। হালকা যুক্তি এবং আবেগময় কথায় ওরা জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। জৈবিক চাহিদা মানুষের বড় দুর্বলতা। আমি এ দুর্বলতা উস্কে দিচ্ছি। ওদের শিখাচ্ছি চারটে বিয়ে করা ফরজ। ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছি অশ্লীলতার দিকে। ধর্মের নামে মুসলমানকে দিয়ে ভাল-মন্দ দুটোই করানো যায়। হাতে কোরান দেখলে এরা মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নেয়। এ আমার সফল অভিজ্ঞতা। আমি এমন একদল লোক তৈরী করবো, যারা কোরান হাতে নিয়ে মসজিদে বসেই জিহাদ এবং সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমি মেয়েদের ব্যাপারে ওদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। আইয়ুবী মেয়েদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। আমি ওদের ঘরের কোণে বন্দী রেখে অর্ধেক জনশক্তি বেকার করে দেবো।'

'সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও ঘৃণা ছড়ানো উচিত।' একচোখা লোকটির সঙ্গী বললো, 'আইয়ুবীর বড় সাফল্য, তিনি ফৌজ এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। এ মুহূর্তে যদি ঘোষণা করেন, ফিলিস্তিন জয় করবো, তবে মিশরের সব মানুষ তার সঙ্গী হবে।'

'তিনি এমন ঘোষণা দেবেন না। কারণ তিনি বুদ্ধিমান। আবেগপ্রবণ লোক তিনি পছন্দ করেন না। একশ' উত্তেজিত জনতার চেয়ে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিককে তিনি বেশী প্রাধান্য দেন। তিনি সস্তা শ্লোগান দিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করার লোক নন, তিনি বাস্তববাদী। মানুষকে বাস্তবতা আর প্রশিক্ষণ থেকে দূরে রেখে আবেগপ্রবণ করাই আমাদের কাজ। চিন্তা ছেড়ে দেবে মুসলমানরা। অবাস্তব আবেগে উত্তেজিত হবে। থমকে যাবে শত্রুর নিক্ষিপ্ত প্রথম তীর দেখে। আবেগ ছাড়া ওদের সব কিছুই আমরা নিঃশেষ করে দেবো। দেখোনি ওয়াজে আমি আইয়ুবীর কেমন প্রশংসা করেছি।'

'এসব কথা পরে হবে। আমরা উষ্ট্রী দুটো দেখতে চাই। তারপর বলুন, আমাদের কিভাবে আশ্রয় দেবেন। ওই দু'জন ছাড়া এখানে কি অন্য কোন লোক থাকে?'

'না, এখানে আর কেউ থাকে না।'

ইমাম সাহেব এখন সন্দেহমুক্ত। আলাপচারিতা থেকে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন, এরা গোপন ঘাতক দলের সদস্য। তিনি তালা খুলে কামরায় প্রবেশ করে বসতে দিলেন ওদের।

'আপনারা বসুন, আমি ওদের নিয়ে আসছি।'

কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। একটু পর ফিরে এলেন সঙ্গে দুই অপরূপা যুবতীকে নিয়ে। দু'জনই আরব্য রজনীর পরীদের মতো অপূর্ব সুন্দরী। পরণে মখমলের কালো ঘাগরায় সোনালী জরির কাজ, উপরে দুধে-আলতা রংয়ের হাতাকাটা মিনি ব্লাউজের ওপর পাতলা রেশমী ওড়না। চোখে মুখে স্নিগ্ধ কমনীয়তার কোমল পরশ। কচি লাউ

ডগার মতো সতেজ আর পেলব ত্বক।

লোকজন জানে এরা ইমাম সাহেবের স্ত্রী। আপাদমস্তক বোরকায় ঢেকে ওদের এখানে আনা হয়েছিল। এখন বোরকা নেই। দেহের বেশীর ভাগ উন্মুক্ত। ওদের সাথে যুবতীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আলমারী থেকে মদের বোতল বের করলেন ইমাম সাহেব। গ্লাস ভরলেন। লোক দু'জন ছুঁল না, এমনকি এক নজর দেখেই চোখ ধাঁধানো যুবতীদের দিক থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

'আগে কাজের কথা বলি, তারপর এসব হবে।' বললো একচোখা লোকটি।

'আমরা দু'জনকে হত্যা করতে চাই।' সঙ্গীর কণ্ঠ, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এবং আলী বিন সুফিয়ান। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাদের আমরা কখনো দেখিনি। ওদেরকে চিনিয়ে দেবেন। আপনি কি দেখেছেন কখনো?'

'এতোবেশী, এখন অন্ধকারেও ওদের চিনতে পারবো। ওদের চেনাই ছিল আমার এ অভিযানের প্রথম কাজ। আলী ভীষণ ঘাগু। ছদ্মবেশ ধারনে ওস্তাদ। তবে ছদ্মবেশে এলেও আমি তাকে ঠিকই চিনতে পারবো।'

'আইয়ুবীর ব্যাপারে কি অভিমত?' একচোখা লোকটি বললো।

'তাকেও চিনতে কষ্ট হবে না।'

একচোখা লোকটি কানের কাছে তুলে আনলেন হাত। এক ঝটকায় খুলে আনলেন কৃত্রিম দাড়ি, গোঁফ। ছুঁড়ে ফেললেন দূরে। টেনে ছিঁড়ে ফেললেন চোখের হলুদ পর্দা। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন ইমাম সাহেব। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। বিস্ফারিত চোখ। আতংকিত মেয়ে দুটো একবার তাকাচ্ছে ছদ্মবেশী লোকটির দিকে, আবার দেখছে ভয়ে পাংশু হয়ে যাওয়া ইমাম সাহেবের মুখের দিকে। ভয়, আতংক আর উদ্বেগ মেশানো কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে উঠলো ইমাম সাহেব, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী!'

'হ্যাঁ বন্ধু! আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, তোমার খ্যাতি শুনে ওয়াজ শুনতে এসেছিলাম।'

সঙ্গীর দাড়ি মুঠোয় চেপে এক ঝটকায় খুলে ফেললেন সুলতান আইয়ুবী।

'ইমাম সাহেব ওকেও নিশ্চয়ই চেনেন?'

'হ্যাঁ চিনি।' ইমামের কণ্ঠে পরাজয়। 'আলী বিন সুফিয়ান।'

অকস্মাৎ মেয়ে দুটো ঘুরে পেছনের আলমিরার ওপর থেকে ছুরি টেনে নিল। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও আলী বিন সুফিয়ান ওদের ক্ষিপ্রতা দেখে মোটেও অবাক হলেন না। ওরা যে সব রকমের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তা ওদের ক্ষিপ্রতা দেখেই বুঝে নিলেন।

ওরা যখন মেয়েদের তৎপরতা দেখছিলেন সেই ফাঁকে ইমাম সাহেব পেছনে হাত চালিয়ে বের করে আনলেন তরবারী। চোখের পলকে আঘাত করলেন আইয়ুবীর মাথায়।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এ আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। চকিতে সরে দাঁড়ালেন তিনি। ততোক্ষণে দু'জনই জুব্বার ভেতর থেকে তরবারী বের করে নিয়েছেন।

তরবারী চালনায় দক্ষ হলেও আরবের বিখ্যাত দুই বীরের সামনে দাঁড়াতে পারলো না ওরা। আলী মেয়েদের ছুরি ধরা হাতের কনুই বরাবর ঝেড়ে লাথি চালালেন। সাঁই করে ছুটে গিয়ে ছুরি দুটো দেয়ালে ঠক করে বাড়ি খেলো।

আইয়ুবীর তলোয়ার স্পর্শ করলো ইমামের তরবারী। তলোয়ারে তলোয়ার ঠেকিয়ে চাপ বাড়ালেন তিনি। পেছনে সরে যেতে চাইলো ইমাম। সালাহউদ্দিন ওর দু'পায়ের ফাঁকে নিজের পা ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে আরেকটু ঠেলে দিলেন পিছনে। ফলে তাল সামলাতে না পেরে কাত হয়ে পড়ে গেলো ছদ্মবেশী ইমাম। হাত থেকে ছিটকে পড়লো তলোয়ার।

আলী এগিয়ে এসে অস্ত্রগুলো তুলে নিল এক এক করে। আইয়ুবী আলীকে বললেন, 'বাইরে তোমার যে বন্ধুরা আছে, ডাকো তাদের।'

বেরিয়ে গেলেন আলী। ফিরে এলেন অস্ত্রধারী ছ'জন সঙ্গীকে নিয়ে। এতোক্ষণ এরা বাইরে পাহারা দিচ্ছিল।

পরদিন মসজিদের সামনে জনতার প্রচণ্ড ভীড় জমে উঠলো। ইমাম সাহেব এবং মেয়ে দুটোকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো জনতার সামনে। ছদ্মবেশী ইমাম সাহেব কিভাবে জিহাদ আর যৌনতার বিরূপ ও ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছিল তা তুলে ধরা হলো ওদের সামনে।

আইয়ুবী আবেগময় ভাষায় বললেন, 'মুসলিম ভাইয়েরা আমার! আমার কাছে ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কালাম ও রাসূলের সুন্নাহ। প্রিয় নবী (সা.) যা বলেছেন ও করেছেন ইসলাম বলতে আমি তাকেই বুঝি, এর বেশীও না, কমও না। পরহেজগারীর নামে দিনরাত মসজিদ ও খানকায় পড়ে থাকার নাম ইসলাম হতে পারে না। আল্লাহ যেমন জামাতে নামাজ পড়ার কথা বলেছেন, তেমনি বলেছেন নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এটাই ইসলাম।

আপনারা দেখতে পেয়েছেন কিভাবে সুফী ও দরবেশ সেজে আমাদেরকে কর্মবিমুখ করার সুগভীর চক্রান্তে মেতে উঠেছে শয়তানরা। যেখানে প্রিয় নবীর সহধর্মিনীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, ছুটে গেছেন জেহাদের ময়দানে, পুণ্যময়ী মহিলা সাহাবীগণ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন, সেখানে পর্দার নামে আমাদের অর্ধেক জনশক্তিকে গৃহবন্দী করার পাঁয়তারা করছে দুশমন। যেন রাসূলের চাইতে তারা ইসলাম বেশী বোঝে, সাহাবীদের চাইতেও তারা বেশী মুত্তাকী ও পরহেজগার। এ ধরনের আলেমদের ব্যাপারে আপনারা সতর্ক থাকবেন। এরা আলেম নয়, আলেমের বেশধারী খৃষ্টানদের চর। ইসলাম কোন ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না। আমাদের মেয়েরা অবশ্যই পর্দা করবে, তবে ততটুকুই, যতটুকু করার জন্য ইসলাম তাদের নির্দেশ দিয়েছে। আবার আমাদের মেয়েরা সামাজিক ক্রিয়াকর্মেও অংশ গ্রহণ করবে, তবে ততটুকুই, যতটুকু করার অধিকার ইসলাম তাদের দিয়েছে।

ঘরে আগুন লাগলে পর্দার জন্য মেয়েদের ঘরের ভেতর পুড়ে মরতে হবে, ইসলাম যেমন এ কথা বলে না, তেমনি খোলামেলা শরীরে রাস্তায় ঘুরে বেহায়াপনা ছড়িয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অবাধ লাইসেন্সও দেয় না ইসলাম। ইসলাম সর্বাবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে আমাদের। আমরা আমাদের মাতা-ভগ্নিদেরকে বাজারের পণ্য বানাতে পারি না। এ ধরনের যে কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। সেই সাথে শরিয়ত নির্ধারিত পন্থায় ব্যাপকভাবে সামাজিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণের সকল সুযোগ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে তাদের মর্যাদা ও অধিকারকেও নিশ্চিত করতে

হবে।

বন্ধুরা আমার, ওরা আমাদের ভালবাসার মন্ত্র শোনায়, মানবতার কথা বলে। আমরা ওদের মতো ঘৃণার বেলুনের ওপর ভালবাসার রঙিন মোড়ক লাগাই না। আমরা মানুষকে ভালবাসি হৃদয়ের গভীর মমতা দিয়ে। আমাদের আদর্শ সেই মহামানব, প্রতিদিন চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখার পরও নিঃসঙ্গ অসুস্থ বুড়িকে সেবা দিয়ে যিনি আপন করে নিতে পারেন।

ভালবাসা ও সেবার ক্ষেত্রে জাত-পাতের কোন ভেদাভেদ করতে শিখিনি আমরা। আমাদের নবী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে যে ব্যক্তি পেট পুরে খায়, সে আমার উম্মত নয়। এরচে' অধিক মানব প্রেমের কথা কে কবে বলেছে? যার মাঝে এতটুকু মানব প্রেমের সৃষ্টি না হবে, সে মুসলমান হবে কেমন করে? ভেবে দেখুন, যদি আমরা নবীর উম্মতই হতে না পারলাম, তবে আমাদের এতোসব এবাদত বন্দেগী কোন কাজে লাগবে?

তাইতো আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে মানবতারই জয় ঘোষিত হয়। ইসলাম চায় মানুষ যেন অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। তাই মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা একজন মুজাহিদের পবিত্র দায়িত্ব। মানুষের আহার, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য চেষ্টা করা আমাদের কাছে নিছক দুনিয়াবী কাজ নয়, বরং একজন সত্যিকার মুজাহিদের কাছে এটুকু ইসলামের ন্যূনতম দাবী। এ দাবীকে পাশ কাটিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি না আমরা। আবার আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা বাদ দিয়ে কেবল দুনিয়াবী সমস্যার সমাধান করাকেও আমরা ইসলাম মনে করতে পারি না।

প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের সংগ্রাম তাই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর সংগ্রাম। ওরা আমাদের অস্ত্রের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলে আমরা রক্তপিপাসু। না, ক্ষমার মহত্তম দৃষ্টান্ত আমরাই দেখাতে পারি। এক ফোটা রক্ত না ঝরিয়েও আমরা মক্কা জয় করতে পারি।

হয়তো অনেকে বলবেন, আমাদের নবীকে অর্ধ শতাধিক লড়াই পরিচালনা করতে হয়েছিল। কিন্তু কি জন্য? এর জবাব খুব পরিষ্কার। মানবতার অপমান আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। মানুষের অধিকারের প্রশ্নে আমরা আপোষ করতে পারি না। আমরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছি নিপীড়িত মজলুম মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। চোর যদি ধর্মের কাহিনী শুনতো তবে আমাদের হাতে অস্ত্র নেয়ার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু আমরা জানি, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য আমাদের এ লড়াই অব্যাহত থাকবে। খৃষ্টানদের যে কোন হামলা ও ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেয়ার জন্য সবসময় সজাগ ও প্রস্তুত থাকার জন্য আমি আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।'

আইয়ুবীর বক্তৃতার পর খৃষ্টান গোয়েন্দাদের মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। অবাক বিস্ময়ে জনতা শুনলো ছদ্মবেশী ইমাম এবং মেয়ে দুটোর স্বীকারোক্তি।

তারপর জনতাকে একজন একজন করে লাইনে দাঁড় করিয়ে ইমাম সাহেবের ঘরে

নিয়ে দেখানো হলো ক্রুশ, মেরী আর যিশুর মূর্তি। সাধারণ মানুষের সামনে খুলে গেলো এক ছদ্মবেশী খৃষ্টান গোয়েন্দার অপকর্মের নমুনা।

সুলতানের নির্দেশে সমগ্র দেশে গুপ্তচরের নিশ্ছিদ্র নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন আলী বিন সুফিয়ান। খৃষ্টান গোয়েন্দায় ভরে গিয়েছিল দেশ। ইসলামী সংস্কৃতি বিনষ্ট করার গভীর ষড়যন্ত্র সুলতানকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।

একজন ইমাম ইসলামী চিন্তাধারা পাল্টে দিচ্ছে সংবাদ পেয়েও তিনি তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেননি। বলেছিলেন, 'আলী! ধর্ম আজ বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হতে শুরু করেছে। ইমাম সাহেব হয়তো এমন কোন উপদলের লোক। অথবা তিনি মনগড়া তাফসীর করছেন। ধর্মীয় ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমি প্রশাসক-আলেম নই, যদি তাকে গুপ্তচর মনে করো ভালভাবে যাচাই বাছাই করে নাও। আমার চাইতে একজন ইমামের মর্যাদা অনেক উর্ধে।'

গোয়েন্দা হলে চিনে ফেলতে পারে এ জন্য আলী নিজে মসজিদে যাননি। ক'জন লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দশ থেকে বার দিন গিয়েছে ওরা। আলীকে শুনিয়েছে ইমামের বক্তৃতার হুবহু বর্ণনা। আলী সুলতানকে বললেন, 'লোকটা গোয়েন্দা না হলেও ভ্রান্ত আকিদার। তাকে ধরা উচিত। সে এমনভাবে জিহাদের ব্যাখ্যা করছে যা শুধু ইসলামের একজন শত্রুর পক্ষেই করা সম্ভব।'

সুলতান মনযোগ দিয়ে আলীর কথা শুনে বললেন, 'ব্যাপারটা মসজিদ এবং ইমাম সম্পর্কে। কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে আরেকটু যাচাই করা দরকার।'

অবশেষে সুলতান সিদ্ধান্ত নিলেন, আলীসহ নিজেই যাবেন ইমামের ওয়াজ শুনতে।

আহমদ কামালের গ্রেফতার করা মেয়েটার কাছ থেকে আলী জেনে নিয়েছিলেন খৃষ্টান গোয়েন্দাদের ব্যবহৃত গোপন কোড। মেয়েটা বলেছিল, 'গোয়েন্দারা কেউ কারো নাম বলে না। 'আমরা মেঘ নিয়ে আসবো' বলে পরস্পরকে পরিচিত হতে হয়। সুলতান তাই করেছিলেন। ধরা পড়লো ইমাম।

ওদের তিনজনকে কারাগারে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করলেন গোয়েন্দা প্রধান। তদন্তে জানা গেলো, কায়রো উপশহরের এ মসজিদে মুসল্লীর অভাব নেই। এলাকাটায় মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত লোকের বাস। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় এখানকার লোকগুলো জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত। ফলে বেশিরভাগ লোকই কুসংস্কারে বিশ্বাসী। ওরা সহজেই মন ভোলানো আবেগময় কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ছ'সাত মাস ধরে এলাকার এ মসজিদের কথা সবার মুখেমুখে। নতুন ইমাম এশার পর এমন ওয়াজ করেন যা কেবল মর্মস্পর্শীই নয়, অভিনব এবং চিত্তাকর্ষকও।

ঘটনার বিবরণে জানা গেলো, 'একদিন দু'জন স্ত্রীসহ একজন লোক এলো গাঁয়ে। উঠলো এক ব্যক্তির ঘরে। দেখতে আলেমের মতো। মসজিদে আসা যাওয়া করতে লাগলেন তিনি। ধীরে ধীরে ইমাম সাহেবের ভক্ত হয়ে গেলেন নতুন আলেম।

পনেরো ষোল দিন পর একদিন ইমাম সাহেব মসজিদে এলেন না। খবর নিয়ে জানা

গেলো তিনি অসুস্থ। হাকীম সাহেব তার বাসায় গিয়ে দেখলেন ইমাম সাহেবের পেটে ব্যথা। তিনি অষুধ দিলেন কিন্তু কোন ওষুধে কাজ হলো না। তিন দিন পর মারা গেলেন ইমাম সাহেব। ইমাম সাহেব যেদিন অসুস্থ হন সেদিন আগন্তুক আলেম গ্রামে ছিলেন না, আগে যেখানে থাকতেন সেখান থেকে জিনিসপত্র আনতে গেছেন।

ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর দিন ফিরে এলেন তিনি। পরণে লম্বা জুব্বা, ফর্সা চেহারা, ধুসর দাড়ি, মধুর তেলাওয়াত। ইমাম সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুর খবর শুনে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বললেন, 'আহা! অমন ভাল লোক আর হয় না। উনি তো চলে গেলেন, এখন আমাদের কি হবে?'

'কি হবে মানে?'

'না, বলছিলাম, এখন তো আমাদের একজন ইমাম দরকার।'

'তা দরকার বৈকি। তবে কিছু মনে না করলে বলবো, আপনার যা এলেম-আমল, এ দায়িত্বটা যদি আপনি নেন তবে আমাদের আর কোন দুশ্চিন্তা থাকে না।'

তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনারা সবাই চাইলে এ দায়িত্ব আমি নিতে পারি। এখানে থাকলে নিরিবিলিতে কিছু এবাদত বন্দেগীর সুযোগ পাবো। যদিও শহরে ইমামতি করেই দিন কাটাতাম কিন্তু হৈ-হাঙ্গামা এ বয়সে আর ভাল্লাগেনা বলেই এখানে চলে এসেছি।'

তার কথায় লোকজন খুবই খুশী হলো। ইমাম হিসাবে এমন একজন অভিজ্ঞ আলেম পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। এলাকার গণ্যমান্য লোকজন সামান্য পরামর্শের পর তাকেই ইমাম হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল।

বেতন নিয়ে তিনি কোন দরকষাকষি করলেন না। বললেন, 'আপনারা যা বিবেচনা করে দেবেন তাতেই আমার হবে। তবে কারো দেয়া নজরানা, হাদিয়া বা তোহফা আমি গ্রহণ করতে পারবো না। আমার দরকার শুধু খাওয়া-পরা ও স্ত্রীদের নিয়ে পর্দা পুশিদা মতো থাকার মতো একটা বাড়ী।'

লোকজন মসজিদের পাশেই কয়েক কামরার একটি বাড়ী খালি করে দিল। সবার সামনে তিনি বাড়ীতে এসে উঠলেন। সাথে দুই স্ত্রী। স্ত্রী দু'জনই বোরকা পরা, হাতে দস্তানা, পায়ে মোজা। লোকজন হুজুরের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করলো। তার ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হলো সবাই। সকলকে মোহিত করলো তার সুরেলা কণ্ঠের যাদু।

মসজিদে আযান দিলেন মৌলভী সাহেব। আযানের শব্দে নীরবতা ছেয়ে গেলো সমগ্র এলাকায়। যেন ইথারে ভেসে বেড়াচ্ছে পবিত্র এক সুর। সুরের মূর্চ্ছনায় মসজিদে ছুটে এলো মানুষ। যারা বাড়ীতে নামাজ পড়তেন ছুটে এলেন তারাও। এশার পর সমবেত মুসুল্লীদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ করলেন তিনি। বললেন, প্রতিরাতে এভাবে ওয়াজ করবেন।

সুরেলা কণ্ঠে প্রতিদিন রাতে এশার নামাজের পর নিয়মিত ওয়াজ করে যাচ্ছেন ইমাম সাহেব। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার খ্যাতি। ছ'সাত মাসের মধ্যে তিনি পুরো এলাকায় সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। তার ভক্তের সংখ্যা বেড়ে চললো প্রতিদিন। অনেকে মুরিদও হলো। এ মসজিদে আগে জুম্মা পড়া হতো না, তিনি প্রথম জুম্মা চালু করলেন।

চারদিকে ইমাম সাহেবের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে ওয়াজ শুনতে ছুটে আসতে লাগলো দূর-দূরান্তের লোকেরাও। তার আলোচনায় স্থান পেতো ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো। ইবাদাতই ছিল প্রধান বিষয়। যুদ্ধবিগ্রহ, ঝগড়া ফ্যাসাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করতেন তিনি। মানুষকে বুঝাতেন, মানুষ নিজে তার ভাগ্য গড়তে পারে না। মানুষ এক দুর্বল কিটাণুকীট। খোদার হাতেই মানুষের ভাগ্য। ওয়াজের সময় পবিত্র কোরান থাকতো তার হাতে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রোতারা তার কথা শুনতো। তিনি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর প্রশংসা করে বলতেন, 'মিশরের সৌভাগ্য যে, তার মতো এমন এক ব্যক্তিত্বকে পেয়েছে শাসক হিসাবে।'

তিনি জিহাদের নুতন ব্যাখ্যা দিলেন। মানুষ নির্দ্বিধায় তা মেনে নিল।

সুলতান আইয়ুবী খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে জেহাদে শরীক হওয়ার আহবান জানালে দুটো কারণে এ এলাকার লোকেরা ব্যাপকভাবে তাতে সাড়া দিয়েছিল। প্রথম কারণটি ছিল অর্থনৈতিক। সুলতান সৈন্যদের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দিতেন।

দ্বিতীয় কারণ, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দেয়া জ্বালাময়ী ভাষণ। তিনি যখন বললেন, 'খৃষ্টানরা পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের চিহ্ন মুছে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হলো জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া' তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের ঈমানের শিখা জ্বলে উঠলো। জিহাদ যে প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ সুলতান ওদেরকে তা ভালভাবেই বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে ইসলামের জন্য জীবন দেয়ার উদগ্র বাসনা নিয়েই ওরা সুলতানের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিল। এদের বিশ্বাসে চিড় ধরাবার জন্যই ইমামরূপী গোয়েন্দা এখানে আশ্রয় গেড়েছিল।

গোয়েন্দা ইমামের ঘরে তল্লাশী নেয়া হলো। পাওয়া গেলো অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং পোটলা ভরা বিষ। কুকুরকে খাওয়ানো হলো সে বিষ। তিনদিন পর্যন্ত গড়াগড়ি করে মারা গেলো কুকুরটা।

সুলতানের সামনে তদন্তের রিপোর্ট পেশ করলেন আলী।

'ওদের বন্দী করে রাখো।' সুলতান বললেন, 'ভীষণ বিরক্ত করবে এবং আতংকের মধ্যে রাখবে। আমি ওদের জল্লাদের হাতে তুলে দেবো না, বন্দী করেও রাখবো না।'

'তাহলে কি করবেন?'

'স্বসম্মানে দেশে পাঠিয়ে দেবো।'

আলী হতবাক দৃষ্টি নিয়ে সুলতানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমি একবার ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাই আলী। এখন আমাকে কোন প্রশ্ন করো না। একটা নতুন খেলা খেলবো আমি। দেখি এ খেলার ফল কি হয়।' খানিক থেমে আবার বললেন, 'কাল দুপুরে সেনাপতি, সেনা উপদেষ্টা, সেনা কমাণ্ডার এবং সচিবদের মিটিং। তুমিও উপস্থিত থেকো।'

ছদ্মবেশী ইমামের নাম ছিল ডিউক। রাতে তার মুখোমুখি হলেন গোয়েন্দা প্রধান। প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কতজন এসেছো?'

ডিউক নিরুত্তর।

আলী আবার জানতে চাইলেন, 'মেয়েদের কি জন্য এনেছো?'

ডিউক এবারও নিরুত্তর রইলো।

আলী বললেন, 'ডিউক, কয়েকটা বিষয় আমাদের জানা খুব জরুরী। তুমি কি আমাদের কোন সহযোগিতা করবে না?'

'শোন আলী! আমরা দু'জন একই যুদ্ধের সৈনিক। আমার বিশ্বাস, তুমি আমার হাতে ধরা পড়লে জীবন দিতে, তবুও জাতির সাথে বেঈমানী করতে না। আমিও তাই করবো। আমার পরিণতি আমি জানি। তোমাকে সব তথ্য দিলেও আমাকে ক্ষমা করবে না। এখানেই মরতে হবে আমাকে। হোক নির্যাতনের মুখে বা জল্লাদের হাতে। তবে কেন আমার জাতির সাথে প্রতারণা করবো?'

'আমার বিশ্বাস, তুমি তোমার ইচ্ছে পরিবর্তন করবে। তুমি কি এ মেয়ে দুটোর সম্ভ্রম রক্ষার খাতিরেও আমার প্রশ্নের জবাব দেবে না?'

'সম্ভ্রম! এদের কাছে রূপ, সৌন্দর্য আর মেকি প্রেম ছাড়া কিছু নেই। প্রেমের অভিনয় দিয়ে এরা শুকনো পাথরকে গলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ওদের কাছে সম্ভ্রম বলে কিছু নেই। ওদেরকে সম্ভ্রম ও সতীত্ব বিসর্জন দেয়ার ট্রেনিং দেয়া হয়েছে সেই কিশোর বয়সে। ওসব মূল্যবোধ অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই এখানে এসেছে ওরা। ওদের সাথে যা ইচ্ছে করো। আমার সামনেই ওদের সম্ভ্রম নষ্ট করলেও কিছুই বলবো না আমি। মেয়েরাও কিছু বলবে না।'

'গোয়েন্দা মেয়েদেরকে আমরা মৃত্যুদণ্ড দেই। ওদের সম্ভ্রম নষ্ট করি না। তবে তুমি সহযোগিতা করলে তোমাদের বিষয়টি সুলতান হয়তো সহনশীলতার সাথে বিবেচনা করতে পারেন।'

'বন্ধু, আমাকে তুমি ভালবাসার লোভ দেখাচ্ছো। দেখাচ্ছো নির্যাতনের ভয়। বিনিময়ে তোমার দেশের মূলোৎপাটনের জন্য আমার যেসব সঙ্গীরা কাজ করছে তাদের নাম জানতে চাচ্ছো। কিন্তু আমি দুঃখিত, এর কিছুই আমি বলতে পারবো না। তুমি কথা দিয়েছো, তোমাকে সবকিছু বললে মেয়েদের সাথে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে। তোমাকে শুধু আমি এতটুকু বলতে পারি, এ লড়াই তোমার আর আমার নয়। এ যুদ্ধ ইসলাম আর ক্রুশের যুদ্ধ।

আমি সংবাদ আদান প্রদান করার মতো সাধারণ গোয়েন্দা নই। আমি অনেক উঁচু স্তরের গুপ্তচর। আমি একজন আলেম। নিজের এবং তোমার ধর্ম গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। কোরানের গভীর পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছি। স্বীকার করি, তোমাদের ধর্ম সহজ সরল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রতিটি মানুষ তা সহজেই অনুসরণ করতে পারে। এর মধ্যে কোন শত্রুতা নেই, নেই কারো প্রতি ঘৃণার বীজ। এ জন্যই তোমার ধর্ম এতো গ্রহণযোগ্য।

তোমাদের শত্রুরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের মনে এমন সব প্রশ্ন ও ভুল ধারনার জন্ম দিয়েছে, যার কারণে ইসলামের আসল রূপ জনগণ কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না। দিন যতো যাবে, এ বিভ্রান্তি কেবল বাড়তেই থাকবে।

ইহুদীরা মুসলিম আলেমের ছদ্মাবরণে এতে জুড়ে দিয়েছে অপ্রয়োজনীয় সব

বিধানাবলী। ইসলামে কুসংস্কারের স্থান নেই, কিন্তু আজ মুসলমানরা সবচে' বেশী কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। মাথা নোয়ায় পীর অলীর মাযারে। শিন্নী মানে দরগায়। এমন আরো অনেক নতুন জিনিস তোমাদের ধর্মে সংযোজন করে দেয়া হয়েছে।

আমরাও দীর্ঘ দিন থেকে তোমাদের চিন্তাধারা বদলে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমরা জানি, পৃথিবীতে টিকে থাকবে হয় খৃষ্টবাদ, নয়তো ইসলাম। যে কোন একটি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত দু'দলের কেউ থামবে না। তরবারীর জোরে বা বিরোধিতা করে কোন ধর্ম নিঃশেষ করা যায় না। কোন ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার একটাই মাত্র পথ, ভেতর থেকে তার রুহটাকে কেড়ে নিয়ে তার সেই মৃত দেহের ওপর রঙের প্রলেপ মাখানো। তুমি কি বলতে পারো, কিসের জোরে গুটিকয় মুসলিম পারস্যের প্রতাপশালী সম্রাটের বিশাল দরবারে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসীর মতো বলেছিল, ইসলাম গ্রহণ করো, না হয় জিজিয়া দাও। আর যদি এ দুটোর কোনটাতেই সম্মত না হও তবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে ফয়সালা করবে এ তরবারী। এ ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই আমাদের মাঝে।'

দুনিয়ার স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধির বিচারে এ ছিল স্রেফ আহাম্মকী। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, ওটা আহাম্মকী ছিল না, তাদের এ দুঃসাহসই ছিল ইসলামের অগ্রযাত্রার চাবিকাঠি। দুনিয়ার মানুষের সাথে মুসলমানতো কেবল এ তিন ধরনের সম্পর্কই সৃষ্টি করতে পারে। হয় ওরা হবে মুসলমানদের ভাই, নইলে অনুগত, আর নয় শত্রু। আমরা কেবল এ আকিদাটুকুই নষ্ট করতে চাই, যাতে মুসলমানরা শত্রু-মিত্র ও আপন-পর ভেদাভেদ করতে না পারে। আমরা সে পথেই এগিয়ে যাচ্ছি।

এ পথে আমি একা নই, বিরাট একটা দল তোমাদের সভ্যতার ওপর আঘাত করে যাচ্ছি। সংস্কৃতির উপর আঘাত করে যাচ্ছি। তোমরা অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতার ঘোড়া ছুটাতে থাকবে আর আমরা চুপিসারে তোমাদের ঈমান ও আকিদাটুকু বস্তায় ভরে সটকে পড়বো।'

আলী পায়চারী করছিলেন। মন দিয়ে শুনছিলেন গোয়েন্দা ডিউকের কথা। তিনি ভেবেছিলেন হাত-পা শেকলে বাঁধা গোয়েন্দাটি নির্যাতনের মুখে সব স্বীকার করবে। কিন্তু তার কথা শুনে বুঝলেন, এর কাছ থেকে কথা আদায় করাটা এতো সহজ হবে না।

আলী একজন কারারক্ষীকে ডেকে তার হাত পায়ের শিকল খুলে দিতে বললেন। বাঁধন মুক্ত হলে খাবারের ব্যবস্থা করে বললেন, 'কথা বের করার ফন্দি মনে করো না, যে ধর্মেরই হোক, আমি আলেমদের সম্মান করি। তোমাকে আমি কোন প্রশ্ন করবো না। তবে তোমার কোন কথা থাকলে তা তুমি বলতে পারো।'

'আমি তোমাকে সম্মান করি আলী! আগেও তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তোমার ভেতর রয়েছে গোয়েন্দা শিল্পের যোগ্যতা, আবেগের উত্তাপ। খৃষ্টান সম্রাটরা কেন তোমাকে হত্যা করতে চায় এবার আমি বুঝতে পেরেছি।

আমি স্বীকার করছি, তুমি সালাহউদ্দিন এবং নুরুদ্দিন জঙ্গীর সম পর্যায়ের। তোমার জন্য এরচে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে!

আলী! শত্রু হলেও তুমি বুদ্ধিমান দুশমন। তোমার অন্ততঃ এটুকু বুঝা উচিত, কোন

জাতির সংস্কৃতি বদলে দাও, তার ধ্বংসের জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না। জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে অশ্লীলতার প্রসার ঘটাও। বিশ্বাস না হলে মুসলিম শাসকদের দিকে তাকিয়ে দেখো।

আত্মসংযম তোমার নবীর শিক্ষা। এ কথা আজ কে মানছে? ইহুদী সুন্দরীরা রূপের মায়াজাল বিছিয়ে তোমার জাতিকে বিভ্রান্ত করছে। আজ বেহায়াপনা আর অশ্লীলতায় ডুবে আছে তোমার জাতি। মুসলমান, সে বিত্তহীন হোক বা বিত্তশালী, একাধিক বিয়ে করতে চায়। কিছু টাকা হাতে এলেই যুবতীদের দিয়ে হারেমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

পোপ ও পাদ্রীরা তোমাদের চিন্তা-চেতনায় যৌনতাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তোমরা তোমাদের নবীর নির্দেশ পালন করলে মুসলমান পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ জুড়ে থাকতো। এখন মুসলমান নামেমাত্র টিকে আছে। সংকীর্ণ হচ্ছে তোমাদের সালতানাত, এ সবই হচ্ছে আমার মতো আলেমদের তৎপরতার ফলে।

বন্ধু আমার! এ তৎপরতা চলতে থাকবে। আমি ভবিষ্যতবাণী করছি, একদিন পৃথিবীতে ইসলাম থাকবে না। থাকলেও তা হবে বিকৃত। জীবন্ত ইসলামের পরিবর্তে থাকবে ইসলামের রঙচঙা লাশ। ইসলামের অনুসারীরা অশালীনতায় ডুবে যাবে। যে কেউ সালাহউদ্দিন বা নূরুদ্দিন জঙ্গী হতে পারে না। এ দু'জনকে একদিন মরতে হবে। আগামী প্রজন্মকে আমরা জৈবিক চেতনার সাগরে ভাসিয়ে দেবো। ওরা হবে নফসের গোলাম। বিবেক বলে কিছু থাকবে না ওদের কাছে।

আমাকে মেরে ফেলতে পারবে, কিন্তু মরবে না আমাদের এই তৎপরতা। মানুষ মরে গেলেই তার উদ্দেশ্যের মৃত্যু হয় না। আরেকজন এসে আমার স্থান দখল করবে। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করেই তবে আমরা থামবো। এবার ইচ্ছে করলে আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে পারো। আমি আর কিছুই বলবো না।'

আলী তাকে আর কোন প্রশ্ন করেননি। হয়তো ভাবছিলেন, কত কঠিন, কত বন্ধুর তার চলার পথ। খৃস্টান গোয়েন্দার প্রতিটি কথা, প্রতিটি বর্ণ সত্য। এক ঝাঁক জীবানু জাতির নৈতিকতাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। আরবের আমীর ওমরারা তো শেষ হয়েই গেছে। বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছেন আইয়ুবী। কিন্তু ওরা এমন একদিক থেকে আক্রমণ করছে যা বন্ধ করা সুলতানের পক্ষে দুঃসাধ্য।

কারাকক্ষের দরজা বন্ধ করে মেয়েদের কক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আলী। তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো মেয়ে দুটো। আলী কতোক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে। এরপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জরুরী মিটিং ডেকেছেন সুলতান আইয়ুবী। উপস্থিত সদস্যরা গোয়েন্দাদের গ্রেফতারের কথা জানতো। জানতো, এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় সে পরামর্শের জন্যই এ সভা। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আসন গ্রহণ করে সবার দিকে তাকালেন। মনে হলো খুঁজছেন কাউকে।

'বন্ধুগণ!' তিনি বললেন, 'আপনারা শুনেছেন এক মসজিদ থেকে এক খৃস্টান গোয়েন্দাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে ছিল সে মসজিদের ইমাম।'

সুলতান সবার সামনে গোয়েন্দাকে কিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে সে ঘটনা শোনালেন। ইমামরূপী গোয়েন্দা ডিউক আলীকে যা বলেছে তাও বললেন।

'খৃষ্টান গোয়েন্দাদের অপতৎপরতা থেকে সতর্ক থাকুন, এ ওয়াজ করার জন্য আপনাদের ডাকিনি। যারা শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা জাহান্নামে যাবে, এ কথাও বলবো না। এখন থেকে কোন গাদ্দারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে মুক্তি দেবো না। গাদ্দারের সামনে এবং পেছনে 'আমি গাদ্দার' লিখিত সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে তাকে বাজারের অলিগলিতে ঘুরানো হবে। চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মৃত্যু হবে ক্ষুধা তৃষ্ণায়। কাউকে তার জানাযা বা দাফন করার অনুমতি দেয়া হবে না।'

'আমার প্রিয় বন্ধুরা! এতে শত্রুর কোন ক্ষতি হবে না। ওরা অন্য গাদ্দার তৈরী করে নেবে। যতদিন ওদের কাছে নারী, বেহায়াপনা আর অর্থ আছে আমাদের দুর্বল ঈমানের লোকেরা গাদ্দার হতেই থাকবে। বেঈমান কোরান হাতে নিয়ে আপনাদের মসজিদে আপনাদের নবীর বাণী বিকৃত করছে, এ কি আপনাদের বিবেকের জন্য চ্যালেঞ্জ নয়?

একবার ভেবে দেখুন, যে সব মেয়েদের গুপ্তচরবৃত্তির জন্য এদেশে পাঠানো হয়, তার অধিকাংশই মুসলমান। শিশুকালে ওদের তুলে নেয়া হয়েছে কোন কাফেলা থেকে। ওদের নানা রকম ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। শেখানো হয়েছে পুরুষ ঘায়েল করার কায়দা কানুন। ট্রেনিং দিয়েছে বেহায়াপনার।

অমুসলিমরা ফিলিস্তিন দখল করে রেখেছে। মুসলমানদের ওপর চলছে সীমাহীন অত্যাচার। লুণ্ঠিত হচ্ছে মুসলমানদের সম্পদ। প্রতিবাদী কণ্ঠগুলোকে কারাগারে অকথ্য নিষ্পেষণে স্তব্ধ করে দেয়া হচ্ছে। সুন্দরী শিশু অপহরণ করে বেহায়াপনা আর গোয়েন্দা বৃত্তির ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। এরপর পাঠানো হচ্ছে মুসলিম জনপদে।

ওরা নিজের মেয়েদেরও এ কাজের জন্য ব্যবহার করে। খৃষ্টানদের কাছে নৈতিকতা বা ইজ্জত-আব্রুর কোন বালাই নেই। ফিলিস্তিন দখল করে ওরা নতুন বিপ্লব এনেছে, সে বিপ্লব হলো নির্বিচারে মুসলিম হত্যা, লুটপাট, মুসলিম শিশুদের অপহরণ। যুবতীদের ইজ্জত বিকাতে বাধ্য করা। সুন্দরী যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলিম আমীর ওমরাদের হারেমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। এমনকি মুসলিম শিশুদের গলায় ওরা ক্রুশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছে। মুসলিম দেশ সমূহে আশ্রয়প্রার্থী অসংখ্য কাফেলাকে পথিমধ্যে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। ইজ্জত হরণ করেছে আমাদের বোনদের, আমাদের মেয়েদের। আমাদের ভায়েরা বাঁধা দেয়নি।

খৃষ্টানরা চায় পৃথিবীতে নামমাত্র মুসলমান থাকুক। মুসলিম মেয়েদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসুক ক্রুশধারী খৃষ্টান। আমরা ভুলে গেছি সে সব নির্যাতীত বোনদের। ওরা আমাদের অভিশাপ দিচ্ছে। বলছে, খৃষ্টান বর্বরতার শিকার শহীদদের কথা আমাদের মনে নেই। কোন নির্দেশ দেয়ার পূর্বে আমার প্রশ্ন, বলুন এখন আপনারা কি করবেন? আপনাদের মধ্যে রয়েছেন অভিজ্ঞ সেনা কমাণ্ডার, যোগ্যতর প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সম্মানিত আমীর!'

আইয়ুবী থামলে একজন কমাণ্ডার বললেন, 'প্রতিবেশী মুসলমান নির্যাতীত হলে তাদের সহযোগিতা করা ফরজ। এ হচ্ছে খোদার হুকুম। এ ফরজ আদায় করা থেকে

রাখতে পারেন না। অনতিবিলম্বে মজলুম ভাইদের সাহায্যে
আপনি আমাদের বিরু আমার মনে হয়, মুহূর্তমাত্র কালবিলম্ব না করে আমাদের ফিলিস্তিন
এগিয়ে যাওয়া জরুরী।
আক্রমণ করা উচিত।' ন একজন সহকারী সেনাপ্রধান। আবেগ ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন,
এবার উঠে দাঁড়াল মণ করার পূর্বে আমাদের উচিত গাদ্দার মুসলিম শাসকদেরকে
'অমুসলিমদেরকে আক লজ্জার কথা হলো, আমাদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতক রয়েছে।
আক্রমণ করা। সবচে লোক গাদ্দারী করলে কাকে আর বিশ্বাস করবো আমরা? একজন
ফয়জুল ফাতেমীর মতো র জন্য সমগ্র জাতিকে যেখানে মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দেয়ার
মুসলিম যুবতীর ইজ্জতে নারীর ইজ্জত নষ্ট করা হচ্ছে, আর আমরা এখনো ঘরের মধ্যে
কথা, সেখানে অসংখ্য কি করা যায়?
বসে ভাবছি কি করবো, মেয়েদের অশ্লীল কাজের ট্রেনিং দিয়েছে আর আমরা আমাদেরই
খৃষ্টানরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। সম্মানিত আমীর! আমার কথাগুলোকে
মেয়েদের সাথে অশ্লী বলে বলবো, এ মুহূর্তেই আমাদের ফিলিস্তিন দখল করা উচিত।
উদ্বেলিত ভাবাবেগ না এরা কুকর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে।'
আমাদের প্রথম কিবলা
আরো একজন উ ঠে দাঁড়ালেন। হাতের ইশারায় তাকে বসিয়ে দিলেন সুলতান।
বললেন, 'আপনাদের মুখে এ কথাই আমি শুনতে চেয়েছি। যারা আমার কাছে থাকেন
নিশ্চয়ই জানেন আমা প্রথম লক্ষ্য ফিলিস্তিন। মিশরের দায়িত্ব নেয়ার পরই আমি
ফিলিস্তিন আক্রমণ করত চেয়েছিলাম। দু'বছর চলে গেছে। বেঈমানদের অপতৎপরতায়
আমি সময়ের চোরাবালি তে আটকে গেছি।
গত দু'বছরের ঘ নাবলী স্মরণ করুন। আপনারা খৃষ্টান গুপ্তচর আর গাদ্দারদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আমাদের লোকেরাই সুদানীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার
করেছে। সুদানের কাছ দের দিয়ে মিশর আক্রমণ করিয়েছে আমাদের সেনাপতি এবং
কমান্ডাররাই। এরা রাষ্ট্রী য় কোষাগার থেকে বেতন গ্রহণ করে। দেশের মানুষ আল্লাহর
নামে এ টাকা কোষাগারে জমা দেয়।
বেঈমানদের নিশ্চি করে আমি ফিলিস্তিন আক্রমণ করবো এ আশায় আমি দু'বছর
কাটিয়েছি। কিন্তু এখন বুঝেছি, খৃষ্টানদের গোয়েন্দা তৎপরতা কখনো শেষ হবে না। এ
জন্য আমি এর মূলে আ ঘাত হানতে চাই। আমাদের মধ্যে গাদ্দার তৈরী করার জন্য
আমরাই খৃষ্টানদের সুযো গ দিচ্ছি।
আজ আপনাদের স ামনে আমি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করছি, সহসাই আমরা
ফিলিস্তিন আক্রমণ করতে যাচ্ছি। সেনা প্রশিক্ষণ আরো জোরদার করুন। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ
থাকার এবং অবরোধ ক বার মতো ট্রেনিং দিয়ে প্রস্তুত করুন তাদের।
তুর্কী এবং সিরীয় ব বন্ধুদের আমি বিশ্বাস করি। মিশরী এবং অনুগত সুদানী সৈন্যদের
মাঝে জেহাদের জযবা সৃ সৃষ্টি করতে হবে। শত্রুর বিরুদ্ধে ওদের অনুভূতি শানিয়ে তুলুন।
ওদের বলুন, তোমাদের মা-বোন খৃষ্টান পশুদের হাতে নির্যাতীত। তোমাদের মেয়েদের
ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খে লছে ওরা। ওদের বিবেকের দুয়ারে আঘাত করে ওদের জাগিয়ে
তুলুন।

এ সময় প্রশাসন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অনেক। ইমাম সাহেবদেরকে প্রতিটি মসজিদে জিহাদের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে বলুন। যুবকদের সামরিক ট্রেনিং নেয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইমাম সাহেবদেরকে ওয়াজ করতে বলবেন। কোন ইমাম ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোন কথা বললে তাদের ইমামতি থেকে সরিয়ে দেবেন। আমাদের নৈতিক মনোবল দৃঢ় হলে কেউ আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। খেয়াল রাখতে হবে, কেউ যেন অলস বসে থাকতে না পারে। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। ওখানে শত্রু তাড়াতাড়ি বাসা বাঁধতে পারবে। কবে এবং কখন ফৌজ রওনা করবে সময় মতো জানিয়ে দেয়া হবে সবাইকে। আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন।'

সাতদিন পর। গোয়েন্দা ডিউক এবং মেয়ে দুটোকে সুলতান আইয়ুবীর সামনে হাজির করা হলো। ওদের হাতে বেড়ি, পায়ে শিকল। সুলতানের নির্দেশে পাশের কক্ষে রাখা হলো ওদের। সুলতানের খাস কামরা আর ওদের কক্ষের মাঝে একটি দরজা। দরজার পাল্লা দুটো আলতো করে ভেজানো। মাঝখানের সামান্য ফাঁক, ভাল করে খেয়াল না করলে কারো নজরে পড়ার কথা নয়।

সুলতান কক্ষে পায়চারী করছিলেন। বললেন, 'সিদ্ধান্ত নিয়েছি ক্রাক আক্রমণ করবো।'

ক্রাক ফিলিস্তিনের একটি অঞ্চল, আরেক বিখ্যাত অঞ্চল সুবাক। সুবাকে রয়েছে খৃষ্টানদের সুদৃঢ় কেল্লা, যাকে কেন্দ্র করে খৃষ্টানরা তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। খৃষ্টান সেনানায়ক এবং সম্রাটরা এখানেই মিলিত হন। এখানেই গোয়েন্দা সংস্থার হেড কোয়ার্টার, ওদের ট্রেনিংও হয় এখানেই।

সেনানায়ক এবং প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সুলতান প্রথম সুবাক আক্রমণ করবেন। খৃষ্টানদের কেন্দ্র পরাভূত করতে পারলে ওদের কোমর ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু প্রথম কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি কেন আক্রমণ করতে চাইছেন তিনি তা কারো বুঝে আসছিল না।

একজন সেনাপতি বললেন, 'সম্মানিত আমীর। আপনার নির্দেশ আমরা নির্দ্বিধায় পালন করবো। তবে আমার মনে হয়, আগে সুবাক দখল করলে ভাল হতো। দুশমনের কেন্দ্রশক্তি প্রথম ধ্বংস করা উচিত। সুবাক হাতে এলে ক্রাক দখল করা আমাদের জন্য পানির মতো সহজ হয়ে যাবে। ক্রাকে আমাদের শক্তি ক্ষয় হলে সুবাক দখল করা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।'

দরজার ফাঁক দিয়ে পাশের কক্ষের সবকিছুই শোনা যাচ্ছিল। সুলতানের কণ্ঠ ছিল পরিষ্কার। গোয়েন্দা ডিউক উৎকর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো দরজার কাছে।

সুলতান বললেন, 'আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হবো। সুবাকের চাইতে ক্রাক দখল করা সহজ হবে। তখন ওখানেই আমরা আমাদের কেন্দ্র করতে পারবো। এরপর সামরিক শক্তি সঞ্চয় করে পূর্ণ শক্তিতে সুবাক আক্রমণ করবো। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী সুবাকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত দৃঢ়। সুবাক আক্রমণ করলে আমাদের হয়তো দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখতে হবে। আমার ধারণা, ক্রাকে আমাদের বেশী শক্তি ক্ষয় হবে

না। প্রথমে আমাদের এমন এক কেন্দ্র প্রয়োজন, যেখান থেকে সহজে সামরিক সাহায্য এবং রসদ পাওয়া যায়।'

গোয়েন্দা ডিউক দরজায় কান লাগিয়ে কথা শুনছিল। মেয়ে দুটোও এসে দাঁড়ালো তার পাশে। এমন গোপন তথ্য পাশের কক্ষ থেকে শুনতে পেয়ে পুলকিত হলো ওরা। ভাবলো, আলী হয়তো খেয়াল করেননি বা তিনি ভেবেছেন এরা তো আর ফিরে যাবে না, শুনলেইবা কি?

ডিউক মেয়েদের কানে কানে বললো, 'ইস্! আমাদের একজনও যদি বেরিয়ে যেতে পারতাম! মূল্যবান তথ্য। আগেভাগে সুবাক পৌঁছতে পারলে পথেই ওদের শেষ করা যেতো, ওদের আর ক্রাক যেতে হতো না।'

'আমাদেরকে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।' সুলতানের কণ্ঠ। 'খৃষ্টানরা আগেভাগে টের পেলে আমরা ক্রাক পৌঁছতে পারবো না। পথেই বাঁধা দেবে। সমস্যা হলো ওদের চাইতে আমাদের সেনা শক্তি দুর্বল। অস্ত্রশস্ত্রও কম। আমাদের তীরন্দাজরা ওদের বর্মধারীদের মোকাবিলা করতে পারবে না। খোলা ময়দানে যুদ্ধ করলে পেছন থেকে ওরা আমাদের রসদের পথ বন্ধ করে দেবে। তখন আমাদেরকে পিছিয়ে আসতে হবে, নয়তো বরণ করতে হবে পরাজয়। সে জন্য আমরা এগুবো জারিবের পার্বত্য পথে। বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকায় ওদের মুখোমুখি হওয়া ঠিক হবে না। পথে বাঁধাপ্রাপ্ত হলে আমাদেরকেই পরাজয় মেনে নিতে হবে।

ফৌজকে তিন ভাগে ভাগ করবো। প্রথম দল মার্চ করবে সন্ধ্যা রাতে। মাঝ রাতে যাবে দ্বিতীয় দল। তৃতীয় দল যাত্রা করবে শেষ রাতে। দিনে কোন তৎপরতা থাকবে না।'

আলী বললেন, 'পথে অপরিচিত কাউকে দেখলে আটক করতে হবে। ক্রাক দখল করার আগ পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে ওদের। এভাবেই ঠেকাতে হবে ওদের গোয়েন্দা তৎপরতা।'

একদিকে পাশের কামরায় বসে যুদ্ধের গোপন পরিকল্পনা শুনছিল তিন গোয়েন্দা। অন্যদিকে সুবাক কেল্লায় চলছিল খৃষ্টান রাষ্ট্র প্রধানদের গোপন মিটিং। মিটিংয়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিল হাতেম আল আকবর।

আকবর একজন মিশরীয় মুসলমান। খলিফা আল আযেদ, রজব, তিনটি গোয়েন্দা মেয়ে এবং ফয়জুল ফাতেমীর মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ শোনাল সে। বললো, 'ডিউক গুপ্তচর মেয়ে দুটোসহ ধরা পড়েছে।'

'এতে বুঝা যায়, আইয়ুবীর গোয়েন্দা সংস্থা অত্যন্ত সতর্ক।' খৃষ্টান সম্রাট এবং সেনানায়ক কোনার্ড বললেন, 'মেয়ে দুটোকে মুক্ত করা কি সম্ভব নয়? দীর্ঘ সময়, শ্রম আর অর্থ ব্যয় করে এ মেয়েগুলোকে ট্রেইণ্ড করা হয়েছে। এর একেকটা মেয়ে আমাদের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান।'

'ক্রুশের জন্য এ ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।' খৃষ্টান সেনাপতি লুজিনাম বললেন। 'ওদের বাঁচাতে গেলে মারা পড়বো আমরা নিজেরাও। যারা ধরা পড়েছে ওদের ভুলে যান।

ওখানে পাঠাতে হবে অন্য লোক। ধরা পড়া মেয়ে দুটো এবং রজবের নামে পাঠানো মেয়ে তিনটে কোত্থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল?'

'ওদের দু'জন ছিল খৃস্টান।' গোয়েন্দা প্রধানের জবাব, 'খৃস্টান দুটো ইটালীর। মুসলমান তিনটাকে শৈশবেই তুলে এনেছিলাম। ওরা যে মুসলমান এখন ওদের তা মনেও নেই। ছোট থেকেই ওদের ট্রেনিং শুরু করেছি। এ জন্য ওরা আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে এ সন্দেহ করা যায় না।'

'হলোই বা মুসলমান।' হাতেম আল্ আকবরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো কোনার্ড, 'আমাদের প্রিয় বন্ধুও তো মুসলমান। সে তো ধর্মের ধার ধারে না।'

মদের গ্লাস হাতেমের হাতে তুলে দিয়ে আবার বললো, 'হাতেম জানে আইয়ুবী মিশরকে দাসত্বের শৃংখলে বন্দী করতে চায়। কার্য সিদ্ধি করতে চায় ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে। আমরা চাই মিশরকে মুক্ত করতে। এর একটাই পথ, আইয়ুবীকে নিশ্চিন্তে বসতে দেয়া যাবে না।'

মদে মাতাল হাতেম মাথা দুলিয়ে সায় দিল। 'ওখানে এমন ব্যবস্থা করবো, তোমাদের কোন লোক আর ধরা পড়বে না।' হাতেমের জড়ানো কণ্ঠ।

'মিশরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না রাখলে অনেক পূর্বেই আইয়ুবী আমাদের আক্রমণ করে বসতো।' বললো এক কমাণ্ডার।

'তার শক্তি তার লোকদের মধ্যে নিঃশেষ করলেই আমরা সফল।'

কোনার্ড প্রশ্ন করলো, 'আলীকে নিকেশ করার কোন ব্যবস্থা এখনো হলো না?'

'কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছে।' জবাব দিল গোয়েন্দা প্রধান। 'কিন্তু সফল হয়নি। আলী এবং সালাহউদ্দিন দু'জনই পাথর। মদও ছোঁয় না, মেয়েদের প্রতিও লোভ নেই। এ জন্য মদের সাথে কিছু মিশিয়ে বা মেয়েদের দ্বারা ওদের হত্যা করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমরা এক অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছি। ঘাতক দলের চারজন সদস্যকে তার দেহরক্ষীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সুযোগ পেলেই ওরা আলী বা আইয়ুবীকে শেষ করে দেবে।'

'আমাদের এদিকেও কি আইয়ুবীর গুপ্তচর রয়েছে বলে মনে করো?' লুজিনাম প্রশ্ন করলেন।

'অবশ্যই রয়েছে। যেদিন থেকে আমরা মিশর এবং সিরিয়ায় গুপ্তচরগিরি শুরু করেছি, তিনিও শুরু করেছেন তখন থেকেই। আইয়ুবীর দু'জন গোয়েন্দা ধরা পড়েছে। মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য করতে করতে মরে গেছে, তবু কারো নাম বলেনি।'

'এ ক্ষেত্রে তিনি কদ্দুর সফলতা লাভ করেছেন?'

'অনেক। ক্রাকে আমাদের রসদে ওরাই আগুন লাগিয়েছে। আমাদের যুদ্ধের সব খবরই আইয়ুবী পেয়ে যায়। জীবন বাজি রেখে তার গোয়েন্দারা কাজ করে। এ জন্য ওরা ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।' এভাবে ওদের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ চললো। হাতেম আইয়ুবীর দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরলো। সিদ্ধান্ত হলো, মিশর এবং সিরিয়ায় গুপ্তচরবৃত্তির কাজ আরো জোরদার করতে হবে। গোয়েন্দা কাজের জন্য আপাততঃ হাতেমকে দেয়া হবে তিনজন উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতী।

কক্ষে আলী এবং দু'জন কমাণ্ডার। ক্রাক আক্রমণের ব্যাপারে কথা বলছিলেন সুলতান আইয়ুবী। তিনি আক্রমণের সময় নির্ধারণ করলেন বিশ দিন পর।

গোয়েন্দা ডিউক এবং মেয়ে দুটো সব কথাই শুনছিল। মেয়েদের দিকে তাকালেন ডিউক। কণ্ঠে একরাশ দুঃখ, 'এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েও সুবাক পৌঁছাতে পারছি না!'

এক যুবতী বললো, 'চেষ্টা করবো আইয়ুবীর মন ভুলানোর? সামান্য সময়ের জন্য ওকে একা পেলে দেখতাম ও কেমন পুরুষ। কোন জীবন্ত মানুষ আমার ফাঁদ কেটে বেরিয়ে যাবে তা হতেই পারে না। শুধু একটিবার সুযোগ পেলে তার বুদ্ধি বিবেক আপন হাতের মুঠোয় বন্দী করা কোন ব্যাপারই না।'

'জানি না কেন আমাদের ডেকেছেন।' ডিউক বললো, 'মনে রেখো, একজন একজন করে ডাকলে তাকে পশুতে পরিণত করতে হবে। এতো মদ খাওয়াবে, যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এখান থেকে পালিয়ে কার কাছে যাবে নিশ্চয়ই জানো? মসজিদের সোজা উল্টো দিকে তার বাড়ী।'

'চিনি।' মেয়েটা বললো, 'মেহদি আবদাল।'

'হাঁ, তার কাছে পৌঁছুতে পারলে ও-ই তোমাকে সুবাক পৌঁছে দেবে। আমার পালানোর তো প্রশ্নই উঠে না। তোমরা আইয়ুবীর পরিকল্পনা শুনেছো। রওনা হওয়ার তারিখ মনে রেখো। ওরা চলবে রাতে। দিনে কোন তৎপরতা দেখাবে না। আক্রমণ করবে ক্রাক। আগেভাগে সংবাদ পেলে পথেই সৈন্যদের থামিয়ে দেয়া যাবে। পথে আক্রমণ হতে পারে বলে আইয়ুবী শংকিত। একটা কথা অবশ্যই বলবে, আইয়ুবীর লোকবল কম। সে খোলা ময়দানে সামনাসামনি যুদ্ধ করতে চায় না।'

মিটিং শেষ হয়েছে। কমাণ্ডাররা বেরিয়ে যাচ্ছেন, তিন গোয়েন্দাই পূর্বের স্থানে ফিরে এসে বসে রইলো হাঁটুতে মাথা রেখে। যেন ওরা কিছুই জানে না। কক্ষে কারও পায়ের শব্দ শোনা গেলো। কারো হাতের আলতো স্পর্শে মাথা তুললো গোয়েন্দা ডিউক।

'উঠে এসো।' আলী তিনজনকে সুলতানের কক্ষে নিয়ে গেলেন।

'আমি তোমার জ্ঞান এবং মেধার প্রশংসা করছি।' ডিউককে বললেন সুলতান আইয়ুবী। 'ওদের শিকল খুলে দাও আলী।'

আলী ওদের শিকল খুলে দিল। সুলতান চেয়ারের দিকে ইংগিত করে বললেন, 'তোমরা এখানে বসো।'

বেরিয়ে গেলেন আলী বিন সুফিয়ান। সুলতান আবার বললেন 'কিন্তু তোমার সে জ্ঞান শয়তানী কাজে ব্যয় করছো। এখানে এসে আপন ধর্মের প্রচার করলে হৃদয়ের গভীর থেকে তোমাকে ধন্যবাদ দিতাম। তোমার ধর্ম কি তোমাকে বলেছে অন্য ধর্মের ইবাদতখানায় দাঁড়িয়ে তার ধর্মকে বিকৃত করো? এ মহা পাপ করতে গিয়ে কি পবিত্র ক্রুশ, হযরত ঈসা (আঃ) এবং মা মরিয়মের কথা একবারও মনে পড়েনি তোমার?'

'এভাবে বিকৃত করা আমাদের কর্তব্য। যা করেছি পবিত্র ক্রুশের জন্যই করেছি।'

'তুমিই বলেছো, বাইবেল এবং কোরান গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছো তুমি। দুই কিতাবের কোথাও কি যুবতীদেরকে অশ্লীল কাজে নিয়োজিত করার অনুমতি দিয়েছে?

অনুমতি দিয়েছি কি ওদেরকে পর পুরুষের সঙ্গী করে গোপন উদ্দেশ্য সাধন করতে? মেয়েদের ইজ্জত আব্রু অন্যের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করার অধিকার কি বাইবেল তোমাকে দিয়েছে? মুসলিম মেয়েদেরকে কোরআন এবং ইসলামের নামে পর পুরুষের কাছে নিজের ইজ্জত বিকাতে দেখেছো কখনো?'

'ইসলামকে আমরা খৃস্টবাদের শত্রু মনে করি। যে বিষ হাতে পাবো তাই ইসলামের স্নায়ুতন্ত্রীতে ঢুকিয়ে দেবো।'

'তোমাদের এ বিষ গুটিকতক মুসলমানের নৈতিকতাকে বিপন্ন করতে পারবে, কিন্তু ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

মেয়েদের দিকে ফিরলেন তিনি। বললেন, 'বলতে পারো তোমরা কোন বংশের মেয়ে, জানলে আমায় বলো।'

দু'জনকে নীরব দেখে সুলতান আবার বললেন, 'তোমরা নিজের চরিত্র নষ্ট করেছো। এখনো ইচ্ছে করলে কোন সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানিতা স্ত্রী হতে পারো।'

'আমি সম্মানিত স্ত্রী হতে চাই।' একটা মেয়ে বললো, 'আপনি কি আমায় গ্রহণ করবেন? তা না হলে আমাকে একজন সম্মানিত স্বামী দিন। আমি মুসলমান হয়ে পাপের জন্য ক্ষমা চাইবো।'

সুলতান আইয়ুবী মৃদু হাসলেন। খানিকটা ভেবে নিয়ে ডিউকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি চাই না তোমার জ্ঞান জল্লাদের তরবারীর রক্তে ডুবে যাক। এই যুবতীদের অনন্য রূপ যৌবন কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিঃশেষ হয়ে যাক, তাও চাই না। শোন মেয়েরা! সত্যিই যদি পাপের ক্ষমা চাও তোমাদেরকে তোমাদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ওই দেশ তোমাদের নয়, আমাদের। একদিন না একদিন তোমাদের সম্রাটদের কাছ থেকে আমরা আমাদের দেশ ছিনিয়ে আনবোই। দেশে গিয়ে তোমরা কাউকে বিয়ে করো। আমি তোমাদের তিনজনকেই মুক্তি দিচ্ছি।'

অবাক বিস্ময়ে চমকে উঠলো তিন গোয়েন্দা। যেন ওদের গায়ে কাঁটা ফোটানো হয়েছে।

কামরায় এলেন আলী। সুলতানের নির্দেশে খুলে দেয়া হলো ওদের হাত ও পায়ের বেড়ি।

'আলী! আমি ওদের মুক্ত করে দিয়েছি।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে সুলতানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আলী!' সুলতান বললেন, 'ওদের জন্য তিনটে উট এবং চারজন সশস্ত্র রক্ষীর ব্যবস্থা করো। রক্ষীরা হবে সাহসী এবং মেধাবী। তিনজনকে সুবাক কেল্লায় রেখে ওরা ফিরে আসবে। পথের খাবার এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে দিয়ে দিও। আজই রওনা করিয়ে দাও ওদের।'

ডিউকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওখানে গিয়ে আবার বলো না আইয়ুবী গোয়েন্দাদের ক্ষমা করে দেয়। গোয়েন্দাকে আমি যাঁতাকলে পিষে হত্যা করি। তুমি আলেম বলে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার জ্ঞানের আলোর দিকটা দেখার সুযোগ দিচ্ছি। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, কোরআনের যে জ্ঞান তোমার আছে তাই তোমাকে

একদিন ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসবে। বিশ্বাস করো, এ পথেই তোমার মুক্তি। যদি কোন দিন ইসলামের পথে ফিরে আসো, চেষ্টা করো তোমার এ বোনদেরকে সে পথে আনতে। ইসলামের অনেক বড় খাদেম হতে পারবে তুমি। তোমার সুবুদ্ধি এলে আমাকে জানিও, আমি তোমাকে দ্বীনের তাবলীগে লাগাতে চাই। তোমাদের মুক্তি দিয়ে আমি দাওয়াতের যে নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা করতে চাই, আশা করি আমি তাতে সফল হবো। আল্লাহ আমার স্বপ্ন পূরণ করুন, খোদা হাফেজ।'

এখনো সূর্য ডুবেনি। উটে সওয়ার হলো মুক্তিপ্রাপ্ত খৃষ্টান গোয়েন্দা ডিউক ও যুবতীদ্বয়। সাথে চারজন দেহরক্ষী।

আলী বললেন, 'যে করেই হোক ওদেরকে খৃষ্টান কমাণ্ডারের কাছে পৌঁছাতে হবে। পথে মরু ডাকাতের ভয় আছে জানি। সে জন্যই তোমাদের সতর্ক করা জরুরী মনে করছি। সব সময় চোখ-কান খোলা রেখে পথ চলবে।'

ওরা রওনা হলো। উটের পিঠে পথ চলার সামগ্রীসহ চড়েছে গোয়েন্দারা। উন্নত জাতের তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছে রক্ষী চারজন।

আইয়ুবীর এ দীল-দরিয়ায় সবাই আশ্চর্য। গোয়েন্দাদের তিনি কখনো ক্ষমা করেননি। আলী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি এমন সিদ্ধান্ত কেন নিতে গেলেন?'

'বলেছিলাম না নতুন একটা খেলা খেলতে চাই।' সুলতানের জবাব। 'এ সেই খেলা। হেরে গেলে শুধু তিনটে গোয়েন্দা হারাবো, এর বেশী নয়।'

বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন আলী। 'সময় এলে দেখতে পাবে' বলে এড়িয়ে গেলেন সুলতান।

মুক্তিপ্রাপ্ত তিন বন্দীর অন্তরে খুশীর অন্ত নেই। শুধু মুক্তির জন্য নয়, মূল্যবান গোপন তথ্য নিয়ে যাচ্ছে ওরা সাথে করে।

কায়রো পেরিয়ে অনেক দূর চলে এসেছে ওরা। উট তিনটি পাশাপাশি চলছে। রক্ষীদের দু'জন সামনে, দু'জন পেছনে। গোয়েন্দারা আঞ্চলিক ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। রক্ষীরা সে আঞ্চলিক ভাষার কিছুই বুঝতে পারছিল না।

ডিউক মেয়েদের বললো, 'পবিত্র যিশুর মাজেযা দেখলে! বুঝা যাচ্ছে তিনি আমাদের ভালবাসেন। বিজয় আমাদেরই হবে। সালাহউদ্দিন আর আলী বে-আক্কেলের মতো বিপজ্জনক তথ্য আমাদের শুনিয়ে দিল। আমাদের সেনাবাহিনীকে সব কথা বললে ওরা আইয়ুবীর সৈন্যদেরকে মরুভূমিতেই শেষ করে দেবে। আইয়ুবী জিন্দেগীতে আর ক্রাক পৌঁছার সুযোগ পাবে না।'

'আমার বিশ্বাস, সেনাপতি ওদেরকে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হবে না। সহজেই ফৌজ শূন্য মিশরও দখল করে নেবে, কি বলেন?' বললো এক যুবতী।

অন্য যুবতী বললো, 'আপনি একজন অভিজ্ঞ আলেম। আপনার বিবেচনাই হয়তো ঠিক। তবু আপনার দেখা মাজেযায় আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। রক্ষীরা হয়তো আমাদের হত্যা করে ফিরে যাবে। সালাহউদ্দিন আমাদের সাথে উপহাস করেছেন। জল্লাদের হাতে

তুলে দেয়ার পরিবর্তে আমাদেরকে এদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এরা আমাদেরকে নষ্ট করে শেষে মেরে ফেলবে।'

ডিউক এ কথার প্রতিবাদ করলো না। আশঙ্কার মেঘ তার মনেও ভিড় করেছে। সে সায় দিয়ে বললো, 'তাছাড়া আমরা নিরস্ত্র। তোমার ধারনাই হয়তো ঠিক। কোন শাসকই শত্রুর গুপ্তচরকে ক্ষমা করতে পারে না। মুসলমানরা যা কামুক, তোমাদের মতো সুন্দরী মেয়েদের এভাবে ছেড়ে দেবে, ভাবা যায় না।'

এতোক্ষণের খুশী খুশী ভাব হঠাৎ করেই আবার তাদের চেহারা থেকে সরে গেল।

'রাতে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।' বললো এক যুবতী।

দ্বিতীয় মেয়েটা বললো, 'রাতে ঘুমালে ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের শেষ করতে হবে। শুধু একটু সাহসের প্রয়োজন।'

'এ সাহস আমাদের করতেই হবে।' ডিউক বললো, 'এবং আজ রাতেই। সকাল পর্যন্ত আমরা অনেক দূর চলে যেতে পারবো।'

রক্ষীরা গল্প গুজব করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল। দু'জন সুন্দরী যুবতী ওদের হাতের মুঠোয়, যেন এ কথা কারো মনেই নেই। সূর্য ডুবে যাচ্ছে, এগিয়ে চলেছে কাফেলা। গভীর হচ্ছে মরুভূমির রাত। তিন গোয়েন্দা চলছে পাশাপাশি। রক্ষীদের হত্যার পরিকল্পনা করছে ওরা। সামনে শ্যামল ভূমি দেখে রক্ষীরা থেমে গেল। তাঁবু টানিয়ে প্রথমে গোয়েন্দাদের খেতে দিল। এরপর নিজেদের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো তিনজন রক্ষী সেনা। একজন রইলো পাহারায়।

এক তাঁবুতে শুলো রক্ষীরা, পাশের তাঁবুতে ডিউক এবং মেয়েরা। ডিউক রক্ষীদের তাঁবুর দিকে ফিরে নিজেদের তাঁবুর পাশ ঘেঁষে শুয়ে রইলো। দৃষ্টি তার রক্ষীদের তাঁবুর দিকে। ষষ্ঠইন্দ্রিয়ে টানটান সতর্কতা। তাঁবুর চারপাশে ঘুরছে একজন সেন্ট্রি। দুই ঘন্টা পর ঘুমন্ত এক রক্ষীকে জাগালো সে। তাকে পাহারায় রেখে নিজে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আগের মতোই সেন্ট্রি তাঁবুর চারপাশ ঘিরে চক্কর দিতে লাগলো।

ডিউক মেয়েদের বললো, 'আমরা সফল হতে পারছি না। বদমাইশটা শুধু ঘোরাঘুরি করছে। যা হবার হবে, এখন ঘুমিয়ে পড়ো।'

তিনজনই একসময় ঘুমিয়ে পড়লো। ভোরের হালকা আলো ফুটতেই রক্ষীরা ওদের ডেকে তুললো। আবার রওনা হলো কাফেলা। আগের নিয়মে এগিয়ে চলছে ওরা। তিন গোয়েন্দা পাশাপাশি। রক্ষীদের দু'জন সামনে, দু'জন পেছনে। রক্ষীরা সন্দেহজনক কোন কথা বলেনি। এখন পর্যন্ত কারো সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। এমন কোন আচরণ করেনি যাতে ওদেরকে বদমাশ বলা যায়।

সূর্য উপরে উঠে এলো। অভিযাত্রী দল প্রবেশ করলো এক পার্বত্য এলাকায়। পাহাড়ের গা দেয়ালের মতো খাঁড়া। গিরিপথে পাহাড়ের ঘন ছায়া। মেয়েগুলো ভয় পেয়ে গেলো। ফ্যাকাশে হয়ে গেলো ওদের চেহারা। হত্যা করার জন্য উপযুক্ত স্থান। কিন্তু রক্ষীরা ওদের দিকে ফিরেও চাইলো না।

'ওদেরকে বলুন আমাদের সাথে কথা বলতে।' ডিউককে বললো একটি মেয়ে। 'ওরা নীরব কেন? আমাদের ব্যাপারে ওরা এতো উদাস কেন! মারতে হলে মেরে ফেলতে

বন্ধু। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ভীষণ কষ্টকর।'

ডিউক নীরব রইলো, কোন কথাই বলতে পারলো না সে। বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা আর যে কোন সময় মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শের আশঙ্কা ওকে যেন বোবা করে দিয়েছে। এখন সে মেয়েদের কোন সাহায্য করতে পারছে না। তিনজনই রক্ষীদের দয়ার ওপর বেঁচে আছে।

সূর্য মাথার উপর উঠে এসেছে। থামলো ওরা। এখানে পাহাড় ছাদের মতো নুয়ে আছে। ফলে ছায়া রূপ নিয়েছে আঁধারের। শঙ্কায় বুক শুকিয়ে এলো গোয়েন্দাদের। চেহারা থেকে সরে গেলো রক্ত।

'ঈশ্বর, তুমি আমাদের জন্য মৃত্যুকে সহজ করে দাও।' স্বগতোক্তির মতো বললো ডিউক।

কিন্তু না, তেমন কিছুই ঘটলো না। রক্ষীরা আগের মতোই নির্বিকার। ওরা ওখানে সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলো। গোয়েন্দারা ভাবলো, মারার আগে শেষবারের মতো খাইয়ে নিচ্ছে। মৃত্যুভয় ওদের ক্ষুধা দূর করে দিল, কিছুই খেতে পারলো না ওরা।

এক রক্ষী বললো, 'কি ব্যাপার, তোমরা খাচ্ছো না কেন?'

ডিউক বলতে চাচ্ছিল, 'আর খাওয়ার দরকার নেই, তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন করো, হত্যা করতে চাও তাড়াতাড়ি করে ফেলো। শুধু শুধু আমাদের পেরেশানী বাড়াচ্ছো কেন?' কিন্তু কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'তোমরা আমাদের সাথে কথা বলছো না কেন?'

'কর্তব্যের মধ্যে নয় এমন কথা আমরা বলি না।' কমাণ্ডার বললো, 'কোন বিশেষ কথা থাকলে বলতে পারো, জবাব দেবো।'

'আমাদের পরিচয় তোমরা জানো?'

'তোমরা গোয়েন্দা। মেয়েগুলো নষ্ট। আমাদের বিরুদ্ধে যাদের ব্যবহার করতে চাও, এদেরকে দিয়ে তাদের পাকড়াও করো। সুলতান কেন তোমাদের ক্ষমা করেছেন জানি না। তোমাদেরকে সুবাক পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা এখন সে নির্দেশ পালন করছি। কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করছো কেন?'

'তোমাদের সাথে কথা বলতে মন চাচ্ছে। দীর্ঘ সফর। আমাদের ব্যাপারে তোমরা কেমন যেন উদাসীন। তোমাদের এ ছাড়া ছাড়া ভাব আমাদের খুব কষ্ট দিচ্ছে। আমাদের সাথে কথা বলতে বলতে চলো।'

'আমরা সবাই সহযাত্রী। কিন্তু আমাদের পথ ভিন্ন। দু'দিন পর আমরা ভিন্ন হয়ে যাবো।'

ডিউক কমাণ্ডারের কথা শুনলো কি শুনলো না, তার দৃষ্টি ছুটে গেলো দূরে। সে ছিল মরুভেদী। মরুর বিপদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

তাকিয়ে রইলো সে। আতংকে বিস্ফারিত চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে যেন। ডিউকের দৃষ্টি অনুসরণ করলো কমাণ্ডার। চোখ বড় হয়ে গেলো তারও। শ'খানেক গজ দূরে উঁচু জায়গায় দুটো উট। পিঠে দু'জন লোক, নেকাবে ঢাকা মুখ। মাথায় কাপড় বাঁধা।

উটের পা দেখা যাচ্ছে না। ঢালে দাঁড়িয়ে আছে, আরোহীরা নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে কাফেলার দিকে।

'বলতে পারো ওরা কারা?' কমাণ্ডার ডিউককে প্রশ্ন করলো।

'মরু দস্যু। জানি না ওরা ক'জন।'

'তা দেখা যাবে।' কমাণ্ডার এক সঙ্গীকে ইশারা করে বললো, 'আমার সাথে এসো।'

দুটো ঘোড়ায় চেপে দস্যুদের দিকে এগিয়ে গেলো দু'জন। তরবারী ছাড়াও ওদের হাতে বর্শা।

ওদের দু'জনকে এগুতে দেখে উষ্ট্রারোহীরা ঢালের দিকে নেমে গেলো। গোয়েন্দাদের একা রেখে বাকী দু'জন রক্ষীও পাহাড়ে উঠে গেলো অবস্থা বুঝতে।

ডিউক মেয়েদের বললো, 'আমার ধারণা এবং তোমাদের আশংকাই ঠিক। ওরা দস্যু নয়, সালাহউদ্দীনের পাঠানো লোক। দেখলে না, নির্ভয়ে এরা ওদের কাছে চলে গেছে। আইয়ুবী তোমাদেরকে চরম অপমান করবে। আমার তো মৃত্যু অবধারিত, তোমাদের ভাগ্যেও রয়েছে কঠিন শাস্তি।'

'এর অর্থ আমরা মুক্ত নই?' একটা মেয়ে বললো, 'আমরা এখনো বন্দিনী?'

'তাইতো মনে হয়।' দ্বিতীয় মেয়েটার জবাব।

দস্যুদের কাছ থেকে ফিরে এলো দু'জন রক্ষী সেনা। সবাই তাদের ঘিরে ধরলো। কমাণ্ডার হাদিদ বললো, 'ওরা মরু দস্যু। ওদের দু'জনের সাথে দেখা করেছি, পাহাড়ের আড়ালে আছে বাকীরা। ওদের সংখ্যা কত জানি না। যে দু'জনকে তোমরা দেখেছো তাদের কথা অনুযায়ী ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে সকাল থেকে। ওরা আমাকে বললো, 'তোমরা সরকারী সৈন্য। মুসলমান। মেয়ে দুটো মুসলমান নয়। ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও, আমরা তোমাদের আর বিরক্ত করবো না।' আমি বলেছি, 'এ মেয়েগুলো যে ধর্মেরই হোক, ওরা এখন আমাদের হেফাজতে। তাদের ইজ্জত, সম্মান এবং জীবন সবকিছু আমাদের কাছে আমানত। দেহে প্রাণ থাকতে ওদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো না।'

ওরা বললো, 'দুটো মেয়ের জন্য নিজের জীবন নষ্ট করো না।'

আমি বলেছি, 'আগে আমাদের মারবে তারপর মেয়েদের নেবে। তোমরা কি অস্ত্র চালাতে পারো?' ডিউককে প্রশ্ন করলো কমাণ্ডার।

'আমরা প্রতিটি মেয়েকেই অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেই। তোমাদের কাছে তরবারী, বর্শা এবং তীর ধনু আছে। এর যে কোন একটা আমাদের দাও।'

'এখন নয়।' কমাণ্ডার বললো, 'ওদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধলে দেবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ এলাকা ছেড়ে আমাদের চলে যাওয়া উচিত। উটের সাথে ঘোড়া দিয়ে এখানে আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে না।'

রওনা হলো ওরা। রক্ষীরা হাতে নিল তীর ধনু। হাদিদ সবার আগে। একজন রক্ষী তাকে বললো, 'গোয়েন্দাদের হাতে অস্ত্র দেয়া ঠিক হবে না। শত হলেও ওরা আমাদের শত্রু। ডাকাতদের সাথে মিশে আমাদেরকেই হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে।'

ডিউক মেয়েদের বললো, 'এদের উদ্দেশ্য খারাপ। নইলে আমাদেরকে অস্ত্র দিতে অস্বীকার করতো না। আসলে দস্যুরা ওদেরই লোক। তোমাদেরকে ডাকাতদের হাতে তুলে দেবে। আমাকেও মেরে ফেলবে।'

ডাকাত এবং রক্ষীদের ভয়ে ওরা ছিল পেরেশান। হাদিদ রক্ষীদের বললো, 'মুখোশ পরা কাউকে দেখলে তীর মারবে। আমার অনুমতি নিতে হবে না। ওদের সাথে অবশ্যই আমাদের সংঘর্ষ হবে। কখন এবং কোথায় তাই দেখতে হচ্ছে।'

দ্রুত চলছিল ওরা। মাঝে মাঝে উট ঘোড়াকে বিশ্রাম এবং দানাপানি দেয়ার জন্য থামতে হচ্ছে। বিপদসংকুল পথ আর ফুরোয় না। দীর্ঘ পার্বত্য এলাকার উঁচু-নীচু ও আঁকাবাঁকা পথ ধরে যথাসম্ভব দ্রুত ছুটছে ওরা। হাদিদের ভয় হচ্ছিল, ওরা ওপর থেকে তীর ছোঁড়া শুরু করে দিতে পারে। তাই গোয়েন্দাদের তাড়া দিয়ে বললো, 'উটগুলো ঘোড়ার গতিতে চালাও। পাহাড়ের ওপর নজর রেখে এগিয়ে চলো।'

পাহাড়ী এলাকা পেরিয়ে গেলো কাফেলা। কোন দস্যু নজরে আসেনি। পশ্চিমে নেমে যাচ্ছে সূর্য। অনেক দূরে দেখা গেলো দুটো উট ওদের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চলছে ওরাও। পথে পানি পাওয়া গেলো। উট ঘোড়াকে খাওয়াল। নিজেরাও তৃষ্ণা নিবারণ করলো। সামান্য বিরতি দিয়ে এগিয়ে চললো আবার।

সূর্য ডুবে গেলো। আঁধারে ছেয়ে গেলো মরু প্রকৃতি। কমাণ্ডার থেমে গেলো। বললো, 'যুদ্ধের জন্য এ জায়গাটা উপযুক্ত। আশপাশে কোন বাঁধা নেই।'

ঘোড়ার পিঠে বাঁধা রইলো জিন। খাওয়া শেষে মেয়েদেরকে ডেকে নিয়ে কমাণ্ডার বললো, 'সতর্ক থেকো।'

ধনুতে তীর জুড়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো রক্ষীরা। ঘুমালো না কেউ। কমান্ডারের দৃঢ় বিশ্বাস, দস্যুরা রাতে আক্রমণ করবেই।

নিঝুম রাত। আচম্বিত দেখা গেলো চারপাশে কালো কালো ছায়া মূর্তি। উটের ভারী পদশব্দে মাটি কাঁপছে। সংখ্যায় দশের অধিক। প্রতি উটে একজন আরোহী। কাফেলাকে আতংকিত করতে চাইছে ওরা। তিন চার বার চারপাশ চক্কর দিয়ে এক আরোহী ধমকের সুরে বললো, 'মেয়েদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও। তোমাদের আমরা কিছুই করবো না।'

শুয়ে শুয়েই তীর ছুঁড়লো হাদিদ। চিৎকার দিয়ে পড়ে গেলো একজন। হাদিদ মেয়েদের বললো, 'পালাতে যেও না। মাটির সাথে মিশে যাও। আমাদের কাছাকাছি থাকো। আমরা জায়গা বদল করলে তোমরাও অনুসরণ করো।'

উষ্ট্রারোহীদের মধ্য থেকে কেউ একজন চিৎকার করে বললো, 'আক্রমণ করো। কাউকে জীবিত রেখো না। মেয়েদের তুলে নাও।'

জোসনা না হলেও রাতের মরুভূমি বেশ ফর্সা থাকে। অনেক দূরের জিনিসও দেখা যায়। উষ্ট্রারোহীরা লাফ দিয়ে নীচে নামলো। শুরু হলো দু'দলের সংঘর্ষ। রাতের নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে দিল তরবারীর ঝনঝনাৎ শব্দ। মেয়েদের পিছনে সরিয়ে দিয়ে মুখোমুখি লড়ছিল রক্ষীরা।

মেয়েরা পিছন থেকে বার বার বলতে লাগলো, 'আমাদেরও কিছু একটা দিন।'

হাদিদ একজনকে বললো, 'আমার তরবারী খুলে নাও।'

তরবারী হাতে নিয়ে একজন মেয়ে সামনে না এসে পিছন দিকে সরে গেলো। হাদিদ বললো, 'দূরে যেয়ো না। তোমাদেরকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্যই ডাকাতদের এ আক্রমণ। বিচ্ছিন্ন হলে আর রক্ষে থাকবে না।'

ডিউকের কোন সাড়া শব্দ নেই।

দু'দলই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে এদিক-ওদিক। লড়াই করতে করতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে দল থেকে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো বিক্ষিপ্ত হাতাহাতি যুদ্ধ। এ অবস্থা চললো অনেকক্ষণ। রক্ষীরা পরস্পরকে ডেকে ওরা যে এখনো টিকে আছে তার অস্তিত্বের জানান দিচ্ছিল। একসময় থেমে গেলো ডাকাডাকির শব্দ। যুদ্ধ শেষ।

হাদিদ সঙ্গীদের ডাকলেন, জবাব এলো না। একটু পর শোনা গেলো এক নারী কণ্ঠ, অনেক দূর থেকে তাকেই নাম ধরে ডাকছে।

হাদিদ কান পাতলো। ভেসে এলো মৃদু অশ্ব ক্ষুরধ্বনি। হাদিদ বুঝলো, ডাকাতরা উটের পরিবর্তে রক্ষীদের ঘোড়ায় করে কোন মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছে। হাদিদ দৌড়ে নিজের ঘোড়ার কাছে গেল। এরপর পালিয়ে যাওয়া ঘোড়ার শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলো। অন্য মেয়েটা কোথায় তিনি জানেন না।

তার উন্নত জাতের তাজি ঘোড়া তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। সামনের ঘোড়া উন্নত জাতের হলেও ওতে আরোহী দু'জন। ফলে হাদিদ আশা করলো, দ্রুতই ওদের ধরতে পারবে সে।

কিছুদূর যাওয়ার পর মাইল খানেক দূরে ওদের দেখতে পেলো হাদিদ। গতি বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত কমিয়ে আনলো দূরত্ব। হাদিদের মনে হলো পেছনে আরেকটি ঘোড়া আসছে। পেছনের ঘোড়াটি রক্ষী না দস্যুদের বুঝার উপায় নেই।

হাদিদ পেছনে তাকালো। ঘোড়া এগিয়ে এসে কাছাকাছি হলো।

'কে?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইলো হাদিদ। জবাব এলো না।

হাদিদ সামনের ঘোড়সওয়ারকে ধরার জন্য ঘোড়া ছুটালো আবার। সামনের দস্যুটা সোজা এগিয়ে যাচ্ছিল, ও কাছাকাছি হতেই বার বার ডানে বায়ে ঘুরে এগুতে লাগলো। কমে যেতে লাগলো গতি। সম্ভবত মেয়েটি বলগা হাতে নিয়েছে।

দস্যুর কাছে পৌঁছলেন হাদিদ। হাতের বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন দস্যুর পিঠে। ঘোড়া একদিকে সরে গেলো। দস্যুটা বেঁচে গেলেও আঘাত লাগল ঘোড়ার পিঠে। ঘুরলেন হাদিদ। দস্যুটা ঘোড়া ঘুরিয়ে নিতে চাইলো। মেয়েটা বাঁধা দিচ্ছে। হাদিদ মেয়েটাকে ডাক দিল। ও আরো সাহসী হয়ে উঠলো।

যুবতীকে সাথে নিয়ে ঘোড়া থেকে লাফ দিল দস্যু। ঢাল হিসাবে ব্যবহার করলো নিজের ঘোড়া। হাদিদ আঘাত করতে চাইলেই যুবতীকে সামনে এগিয়ে ধরছে। ঘোড়া থেকে নেমে এলো হাদিদ। ততোক্ষণে পৌঁছে গেছে পেছনের আরোহী। রক্ষী নয় দস্যু। সেও ঘোড়া থেকে নামলো। হাদিদ ধমকের সুরে বললেন, 'তোমরা যুবতীকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

এক ডাকাত ওকে ধরে রেখেছে। লড়ছে দ্বিতীয় জন। মেয়েটা নিরস্ত্র। হাদিদের

সামনে টিকতে পারছে না দস্যুটা। তাই দেখে মেয়েটাকে ছেড়ে দু'জন একত্রে হাদিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাদিদ মেয়েটাকে বললেন, 'ঘোড়া নিয়ে তুমি সুবাকের দিকে পালিয়ে যাও। এদের আমি ঠেকাচ্ছি।'

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো তরুণী। দস্যু দু'জন বার বার বলছিল, 'একটা রমনীর জন্য নিজের জীবন হারিও না। তুমি পালাতে চাইলে আমরা তোমাকে বাঁধা দেবো না।'

'অসম্ভব। ওকে নিতে হলে আগে আমাকে মারতে হবে, তারপর ওকে পাবে।' হাদিদের স্পষ্ট জবাব।

তিনি কয়েকবারই যুবতীকে পালিয়ে যেতে বললেন। ও বললো, 'তোমাকে একা ফেলে রেখে আমি যাবো না।'

আহত হলেন হাদিদ। আবার যুবতীকে বললেন, 'আমি আহত, মারা যাচ্ছি আমি। আমি আবারো বলছি, পালাও তুমি। আমি আরো কিছুক্ষণ ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবো। দেরী করো না, এখনো বলছি, পালাও।'

যুবতী পালিয়ে যায় কিনা তা দেখার জন্য ওদিকে ফিরলো এক দস্যু। এ সুযোগে তার পাজরে বর্শা মারলেন হাদিদ। পড়ে গেলো সে। অন্য দস্যুটার তরবারীর আঘাত লাগলো তার কাঁধে।

তরুণী পড়ে যাওয়া ডাকাতের তরবারী তুলে নিয়ে পেছন দিক থেকে দ্বিতীয় ডাকাতের পিঠে আমূল বসিয়ে দিল। আহত কাঁধ নিয়েই পাঁই করে ঘুরলো হাদিদ। পেছন থেকে যুবতীর তরবারী যখন আঘাত করছিল দস্যুটাকে তখন হাদিদের বর্শাও তার বুক ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে। দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো দস্যু।

যুদ্ধ শেষ। ডাকাত দু'জন নিহত। দাঁড়াতে পারছিল না হাদিদ। পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেললো যুবতী। হাদিদ বললেন, 'তুমি সুস্থ? আমাকে ছেড়ে একটা ঘোড়া নিয়ে এক্ষুণি সুবাক রওনা করো। সঙ্গীদের দিকে যেয়ো না। ওদের কেউ হয়তো বেঁচে নেই।'

'কোথায় আঘাত লেগেছে আপনার?'

'আমাকে মরতে দাও, চলে যাও তুমি। আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব তুমিই পালন করো। ডাকাতদের কেউ আবার এদিকে এসে পড়লে আর পালাতে পারবে না।'

যুবতীর মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। ও বুঝেছে, তার জন্যই লোকটা নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। সে তাকে একা রেখে যেতে অস্বীকার করলো। দৌড়ে গেল ঘোড়ার কাছে। জিনের সাথে বাঁধা মশক এনে হাদিদকে পানি পান করালো। বললো, 'দেখি, আপনার আঘাতটা কোথায় লেগেছে?'

হাদিদ ক্ষতস্থান দেখালেন। যুবতী তাড়াতাড়ি তার ওড়না ছিঁড়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল।

'আপনি আমার জন্য আপনার জীবন বিপন্ন করেছেন। আপনাকে একা রেখে আমি কিছুতেই এখান থেকে যাবো না। যদি আমার ভাল চান তবে উঠুন। ভাগ্য ভাল হলে আমরা বেঁচে যেতেও পারি।'

'তুমি...'

'আমার নাম সিনথিয়া।'

হাদিদ তাকিয়ে দেখলেন যুবতীকে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, ও যা বলেছে তাই করবে। বললেন, 'কিন্তু সিনথিয়া, আমার যে যাওয়ার শক্তি নেই।'

যুবতী হাদিদকে ধরে দাঁড় করালো। ধীরে ধীরে নিয়ে গেলো ঘোড়ার কাছে। এরপর অনেক কষ্টে ঘোড়ার পিঠে বসালো। নিজে অন্য ঘোড়ায় উঠতে গেলে হাদিদ বললো, 'আমি একা বসতে পারবো না।'

দুটো ঘোড়ার রশি একটার জিনের সাথে বেঁধে তরুণী হাদিদের পেছনে উঠে বসলো। যুবতী হাদিদের মাথা নিজের কাঁধে নিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'সুবাক কোন দিকে?'

হাদিদ আকাশের দিকে তাকিয়ে ডানদিকে ইশারা করে বললেন, 'ওদিকে চলো।'

এগিয়ে চললো ঘোড়া। হাদিদ আবার বললেন, 'হয়তো আমি বাঁচবো না। ক্ষতস্থান থেকে এখনো রক্ত ঝরছে। যেখানেই আমার মৃত্যু হয় মাটি চাপা দিয়ে রেখো। আমার ব্যাপারে কোন সন্দেহ হয়ে থাকলে তা দূর করে আমায় ক্ষমা করে দিও। আমি আমানতের খেয়ানত করিনি। আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দিন।'

'আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে তুলুন। দয়া করে এখন আর কথা বলবেন না।'

ঘোড়া এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে সময়। জনমানবহীন সুনসান দুস্তর মরুভূমিতে শেষ রাতের হিমেল ঠান্ডা। সে শীতার্ত ঠান্ডা মাড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে আহত মুসলিম কমান্ডার হাদিদের মাথা কোলে নিয়ে এগিয়ে চলেছে সিনথিয়া নামের এক খৃষ্টান গোয়েন্দা যুবতী। একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা তার কাছে মনে হচ্ছে এক দুঃস্বপ্ন।

হাদিদের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু অত্যধিক রক্ত ঝরায় দুর্বল হয়ে পড়েছেন। জ্ঞান হারাচ্ছিলেন বার বার। মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছিলেন।

ছোট এক খেজুর বাগানের কাছে এসে থামলো তরুণী। আলগোছে নামালো তাকে। পানি পান করালো। জিনের সাথে বাঁধা থলে থেকে খাবার এনে দিল। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেলো হাদিদের। স্বগতোক্তি করে বললেন, 'আগে ছিলাম যুবতীর রক্ষী, এখন বন্দী।'

সিনথিয়া তাকে শুইয়ে দিল। বিশ্রামের পর অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন হাদিদ।

'আমরা সুবাকের কাছে চলে এসেছি। আর মাত্র একদিনের পথ।' হাদিদ বললেন, 'একটা ঘোড়া নিয়ে তুমি চলে যাও। আমি এখান থেকেই ফিরে যাবো।'

'তুমি একা যেতে পারবে না। মরে যাবে। এখান থেকে ফিরে যেতে চাইলে আমাকে সাথে নাও। তুমি আমাকে একা ছাড়োনি, আমিও তোমাকে নিঃসঙ্গ যেতে দেবো না।'

'আমি পুরুষ। একজন নারী আমার হেফাজত করছে এ কথা মানতে পারছি না। এরচে মরে যাওয়াই ভাল।'

'যারা ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকে আমি তেমন মেয়ে নই। ওরা পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া এক পাও চলতে পারে না। মনে করো আমি এক পুরুষ সৈন্য। পার্থক্য, আমার অস্ত্র আমার রূপ, যৌবন, চোখের কটাক্ষ, মুখের হাসি আর কণ্ঠের মধু। তোমার

মতো আমিও কষ্ট সইতে পারি। ইচ্ছে করলে পায়ে হেঁটেও সুবাক যেতে পারবো।'

'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। সিনথিয়া, তোমার এ আবেগকে আমি সম্মান করি। আমার প্রতি তোমার এ সহৃদয়তার কারণ কৃতজ্ঞতাবোধ। দস্যুরা আমাদের দু'জনকে অনেক কাছে নিয়ে এসেছে। অথচ আমরা উভয়েই জানি আমাদের দু'জনের পথ ভিন্ন। তুমি আমার জাতির মূল উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছো, আর আমি ক'দিন পর তোমার দেশ আক্রমণ করার স্বপ্ন দেখছি।'

'আপাততঃ আমার বন্ধুত্ব গ্রহণ করো। তুমি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে গিয়ে শত্রুতার কথা ভেবো।'

হাদিদের ঘাড়ের নীচে হাত দিয়ে যুবতী তাকে শোয়া থেকে তুললো। হাদিদ এখন হাঁটতে পারছেন। ঘোড়া পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন তিনি। সিনথিয়া তাকে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করলো। ঘোড়ায় উঠে বসলেন হাদিদ। সিনথিয়া তার পেছনে উঠতে চাইলো। হাদিদ বাঁধা দিলেন।

'তুমি অন্য ঘোড়ায় উঠো। আমি এখন একা চলতে পারবো।'

'না।' যুবতীর কণ্ঠে সিদ্ধান্তের সুর, 'আমি এ ঘোড়ায়ই উঠবো। তুমি লেগে থাকবে আমার বুকের সাথে।'

যুবতী হাদিদের পেছনে উঠে বসলো। এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো যুবতী। বাঁধা দিল হাদিদ।

'আমাকে আমার শক্তিতে বসতে দাও।'

সিনথিয়া তার এ কথায় মোটেই আমল দিল না। জোর করে তাকে ধরে রাখলো। হাদিদের মাথা রাখলো নিজের কাঁধে। বললো, 'জানি, বাজে মেয়ে মনে করে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছো।'

'না, তা নয়। তুমি এক যুবতী। বাজে হও, ভাল হও, সব অবস্থায় তোমার থেকে দূরে থাকা আমার কর্তব্য। আমি আমার পৌরুষের হেফাজত করতে চাই। ভেবে দেখো, তোমাকে কাছে পেতে চাইলে যে দু'রাত তুমি আমার বন্দিনী ছিলে, সে সময় যা ইচ্ছে তাই করতে পারতাম। কিন্তু আমি শয়তানকে কাছে আসতে দেইনি। এখন মনে হচ্ছে আমি আমানতের খেয়ানত করছি। আমার ভেতর পাপের বীজ অংকুরিত হচ্ছে। তাই তোমার কাছ থেকে সরে থাকতে চাচ্ছি।'

'তুমি তো আর পাথর নও। প্রতিটি পুরুষই আমার দিকে তাকায় কামনার দৃষ্টি নিয়ে। সামান্য বিনিময়ের পরিবর্তে তোমার জাতির লোকদের ঈমান কিনে নেয়ার অভিজ্ঞতা আমার নতুন নয়। কিন্তু তোমার কাছে তো আমি কোন বিনিময় দাবী করছি না।'

'কিসের বিনিময়ে ঈমান ক্রয় করো তুমি?'

'আমার কাঁধে মাথা রাখার, একটু পাশে বসার সুযোগ দিয়ে।'

'ওদের কাছে ঈমানই ছিল না।'

'যা-ই ছিল আমি নিয়ে নিয়েছি। ওদের রক্তে ঢুকিয়ে দিয়েছি গাদ্দারী। আপন জাতির বিরুদ্ধে ওদের হৃদয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি ঘৃণা।'

'ওরা কারা?'

'এখন বলবো না। তোমার কর্তব্য তোমার কাছে যেমন প্রিয়, আমার কর্তব্যও আমার কাছে।'

হাদিদ চুপ করে রইলেন। ক্রমশঃ আবার তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। ক্লান্তি অনুভব করলেন তিনি। তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল, তিনি চোখ বন্ধ করে নিলেন।

সিনথিয়া তাকে শক্ত করে ধরে আছে। যুবতীর দেহের উষ্ণ পরশ অনুভব করলেন তিনি। ওর রেশম কোমল চুল বাতাসে উড়ছে। ছুয়ে যাচ্ছে হাদিদের গাল, মুখ।

ঝিমুতে লাগলেন হাদিদ। অনেকক্ষণ পর চোখ খুললেন। দেখলেন, সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে।

তিনি তৃষ্ণা অনুভব করলেন। বললেন, 'সিনথিয়া, একটু পানি।'

সিনথিয়া পানি এগিয়ে দিল। পানিটুকু পান করে তিনি আবার তাকালেন সূর্যের দিকে। বললেন, 'সিনথিয়া, ঘোড়া জোরে ছুটাও। আরেকটু দ্রুত গেলে আশা করি সূর্যাস্তের পরপরই আমরা সুবাক পৌঁছে যেতে পারবো।'

ঘোড়া ছুটালো যুবতী। দ্রুত পেছনে সরে যেতে লাগল মরুভূমির বিশাল বিস্তার।

সূর্য ডুবে গেছে। দরবার কক্ষে খৃষ্টান সম্রাট এবং সেনাপতিরা বসে আছেন। ডিউক মুখ খুললো, 'মেয়ে দুটোর কি হয়েছে জানি না। আমি ওদের রক্ষা করার চেষ্টা করিনি। আপনাদের কাছে মূল্যবান তথ্য পৌঁছানো জরুরী মনে করে সুযোগ পাওয়ামাত্র একটা ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে এসেছি। ডাকাতদের আক্রমণের পর মেয়েদের দিকে একবারও তাকাইনি। তাকানোর কোন সময় ও পরিবেশ ছিল না। আমি যে আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারবো তারও কোন আশা ছিল না। যিশুর অসীম দয়ায় ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছি। নইলে এমন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

কেউ আমাকে অনুসরণ করেনি। আমার মনে হয় ওরা দস্যু নয়, সুলতানের পাঠানো লোক। ভেবে পাই না, তিনি কেন আমাদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে মেয়েদেরকে নষ্ট করার এ পথ বেছে নিলেন। এখন বুঝতে পারছি, এর পুরোটাই ছিল সাজানো নাটক। মেয়েদের জন্যই এ নাটক সাজানো হয়েছিল। ওদেরকে হত্যা না করে এখনো হয়তো ওদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে পশুগুলো।'

'ডিউক, ওদের মুক্ত করার কোন ব্যবস্থা এখন আমরা নিতে পারছি না। এ ত্যাগ আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের কাছে তো মেয়ের অভাব নেই। যুবতীদের ব্যবহার করে আমরা যে সাফল্য লাভ করেছি সে কথা বিবেচনা করে আমরা আরো অনেক মেয়েকে ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করেছি। ওদের কথা বাদ দিয়ে এবার তোমার মূল্যবান গোপন সংবাদের কথা বলো।' বললেন এক সেনাপতি।

ডিউক সব কথা খুলে বললো। সুলতানের আক্রমণের তারিখ উল্লেখ করে বললো, 'সালাহউদ্দিন ক্রাক আক্রমণ করবে শুনে একজন কমাণ্ডার বলেছিল, 'আগে সুবাক দখল করা উচিত।'

কিন্তু সালাহউদ্দিন এখানে শক্তি ক্ষয় করতে চাচ্ছেন না। ক্রাককে দুর্বল মনে করে

আগে ক্রাক দখল করবেন। ক্রাক হবে তার কেন্দ্র। ওখান থেকেই চারদিকে আক্রমণ পরিচালনা করবেন। আমাদের অজ্ঞাতে তিনি আক্রমণ করতে চাচ্ছেন। কারণ, তার সৈন্য সংখ্যা কম। অস্ত্রশস্ত্র ওদের চেয়ে আমাদের বেশী।

তিনি সকলকে সতর্ক করে বলেছেন, 'খৃষ্টান ফৌজ পথে বাঁধা দিলে পরাজয় অনিবার্য। কোন অবস্থাতেই খোলা মাঠে যুদ্ধ করবে না। সম্মুখ লড়াইয়ের পথ এড়িয়ে আমরা ক্রাকে ঝটিকা হামলা করবো। ওরা প্রস্তুত হওয়ার আগেই আমাদের বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।' ডিউক থামলো।

এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে মেয়েদের প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেলো। আইয়ুবীকে প্রতিরোধের ব্যাপারে আলাপ শুরু হলো। ওরা স্বীকার করলো, আইয়ুবী নিঃসন্দেহে দূরদর্শী এবং যুদ্ধবাজ। ক্রাক আক্রমণের পরিকল্পনা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। পথে যুদ্ধ করে শক্তি ক্ষয় করতে না চাওয়াও তার যুদ্ধ পলিসির উজ্জ্বল দিক।

'পবিত্র যিশুর দয়ায় আমরা আগেভাগেই তার পরিকল্পনা টের পেয়েছি। নয়তো ক্রাক দখলে রাখা আমাদের জন্য সমস্যা হতো।' বললো এক সেনাপতি।

আইয়ুবীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পরিকল্পনা তৈরী হতে লাগলো। সিদ্ধান্ত হলো, সুবাকে থাকবে কেন্দ্রীয় কমাণ্ড। রসদও থাকবে এখানে। ক্রাকে আরো সৈন্য পাঠিয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। ক্রাক থেকে অনেক দূরে পার্বত্য স্থানে আইয়ুবীকে বাঁধা দেয়া হবে। অশ্বারোহী এবং উষ্ট্রারোহী সৈন্যের পরিমাণ থাকবে বেশী। পানির ঝর্ণাগুলো আগেভাগেই দখল করে নিতে হবে। আইয়ুবীর বাহিনীকে ঘেরাও করে শেষ করে ফেলতে হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হলো। সবাই ভীষণ খুশী। এই প্রথম সুলতান আইয়ুবীর গোপন পরিকল্পনা ওরা আগেভাগে জানতে পেরেছে। তার মতো একজন দূরদর্শী যোদ্ধাও যে সময়ে ভুল করতে পারে তার প্রমাণ এবারের অসতর্কতা। সুলতানের এ অসতর্কতার সুযোগে মূল্যবান গোপন তথ্য পাওয়ার আনন্দে ওরা বিভোর সবাই।

ফ্রান্সের সৈন্য ছিল অনেক দূরে। সিদ্ধান্ত হলো, ওদেরকে নূরুদ্দিন জঙ্গীর আসার পথে পাঠিয়ে দিতে হবে। একজন অফিসার ভেতরে এসে গোয়েন্দা প্রধানের কানে কানে কি যেন বললো। তিনি সকলকে শুনিয়ে বললেন, 'দু'জন মেয়ের একজন ডাকাতের হাত থেকে বেঁচে এসেছে। সাথে রয়েছে একজন মুসলমান রক্ষী সেনা।'

সর্ব প্রথম ডিউক কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। কামরা থেকে বেরিয়ে ও দেখতে পেলো বারান্দায় হাদিদকে শুইয়ে পাশে বসে আছে মেয়েটা। দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে হাদিদের ক্ষতস্থান থেকে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সে।

খৃষ্টান কমাণ্ডারদের কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করলো না। তাদের বলা হয়েছিল ডাকাতের আক্রমণ ছিল এক নাটক। একজন সেনা অফিসার এগিয়ে গেলো। মেয়েটাকে বললো, 'সিনথিয়া, ভেতরে এসো।'

সিনথিয়া বললো, 'এর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ না বাঁধা পর্যন্ত আমি ভেতরে যাবো না।'

গোয়েন্দা প্রধান হরমুন ছিলেন একজন জার্মান। কামরা থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তিনি। সিনথিয়ার কথা শুনে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি ওই

সাপের বাচ্চাকে ব্যাণ্ডেজ করাতে চাচ্ছো? জীবন নিয়ে ফিরে এসেছো এ-তো তোমার সৌভাগ্য। এ জানোয়াররা তোমাদেরকে ডাকাতদের হাতেই তুলে দিতে চাচ্ছিল।'

'মিথ্যে কথা।' যুবতীর কণ্ঠে দৃঢ়তা। 'প্রথমে আমিও তাই মনে করেছিলাম। এ যুবক আমার সব সন্দেহ দূর করে দিয়েছে। একা দু'জন দস্যুকে হত্যা করে সে আমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

যুবতী হরমুনকে সব ঘটনা খুলে বললো। 'দেখুন! লোকটা বার বার আমাকে বলেছে, আমাকে এখানেই মরতে দাও। পালিয়ে যাও তুমি।'

মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের হৃদয়ে ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। হাদিদের চিকিৎসার কথা কেউ বললো না। বললো না ডিউকও। মেয়েটা ওর চিকিৎসা ছাড়া ভেতরে যাবে না।

সিনথিয়ার জিদ দেখে এক অফিসার ক্ষোভের সাথে বললো, 'মুসলমানটাকে নিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দাও।'

হাদিদকে নিয়ে গেলে যুবতী হাঁটা দিল অফিসারের সাথে। অফিসার তাকে নিয়ে কামরায় ঢুকলেন। সম্রাট ও কয়েকজন সেনাপতি তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওরা কামরায় ঢুকলে একজন বললো, 'বলতো মেয়ে কিভাবে বেঁচে এলে?'

মেয়েটা পথের সব ঘটনা বর্ণনা করলো ওদের সামনে।

'তুমি খুব ইন্টারেস্টিং গল্প শোনালে।' বললো এক সেনাপতি। 'এমন মজাদার কাহিনী শোনার পর একটু আনন্দ না করলে গুনাহ হবে।'

সম্রাট বললেন, 'সত্যিই আজ বড় আনন্দের দিন। এসো, সবাই মিলে প্রাণ ভরে খাও এবং পান করো।'

ওদের সামনে খাবার এবং মদ পরিবেশন করা হলো। মেয়েটা বললো, 'আহত লোকটির খাওয়া হলে আমি খাবো। আমি ওকে একটু দেখে আসি।'

উঠতে যাচ্ছিল সিনথিয়া, হরমুন কণ্ঠে ঝাঁঝ মিশিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও সিনথিয়া। তুমি এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ফৌজি নির্দেশ অমান্য করলে। প্রথমবার তোমাকে ভেতরে আসতে বলা হলো, তুমি বললে, আহত ব্যক্তির চিকিৎসা না হলে আমি ভেতরে যাবো না। এখন কারো অনুমতি ছাড়াই বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছো। এখানে সম্মানিত সেনাপতিগণ ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন মহামান্য সম্রাট। তুমি জানো তোমার এ নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি কি?'

'দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।'

'শত্রুর সামান্য একজন কমাণ্ডারের জন্য তুমি আমাদের নির্দেশ অমান্য করেছো। এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।'

'লোকটি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রু শিবিরের একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দার জীবন বাঁচিয়েছে, খৃষ্টান সম্রাট এবং সেনা অফিসারগণ কি তাকে এর জন্য কোন প্রতিদান দেবেন না? আমি জানি যে ও শত্রুদের সেনা কমাণ্ডার। আমি তখনই তাকে দুশমন ভাববো, যখন সে নিজ সেনাবাহিনীতে ফিরে যাবে।'

'দুশমন সব সময়ই দুশমন থাকে।' একজন কমাণ্ডার চিৎকার দিয়ে বললো, 'আমরা ফিলিস্তিনে ক'জন মুসলমানকে বাঁচতে দিয়েছি? ওদের বংশ কেন শেষ করছি আমরা?

কারণ ওরা আমাদের জাতির শত্রু, ওরা আমাদের ধর্মের শত্রু। পৃথিবীতে শুধু খৃষ্টানদের শাসন থাকবে। আমাদের কাছে একজন আহত মুসলমানের কোন মূল্য নেই। তুমি বসো।'

বসে পড়লো যুবতী। তার দু'চোখ ফেটে বেরিয়ে আসা অশ্রুর বন্যা রোধ করার জন্য সে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো।

সুবাকের কাজকর্ম চলছে স্বাভাবিক গতিতে। সেনাবাহিনীতে চলছে অন্য তৎপরতা। কেল্লা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দলে দলে সৈন্য। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে উট। ওদের পিঠে চাপানো হচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র এবং খাদ্য সামগ্রী। অফিসাররা সবাই ব্যস্ত, কারো হাতে একদণ্ড সময় নেই। উর্ধতন ক'জন সামরিক অফিসার ইতিমধ্যেই ক্রাক রওনা হয়ে গেছেন। সিনথিয়া নির্লিপ্ত। যেন এ তৎপরতার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

গতকালের সেনা সম্মেলন শেষ হয়েছিল মাঝ রাতে। সিনথিয়া ছিল ক্লান্ত-শ্রান্ত। একজন অফিসার ওকে বলেছিল, 'আহত ব্যক্তিকে ডাক্তারের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। দুশ্চিন্তার কারণ নেই।'

ফেরার পথে দেখা হলো গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান হরমুনের সঙ্গে। তিনি সিনথিয়াকে বললেন, 'সিনথিয়া, তোমার আচরণ সত্যি খুব আবেগপ্রবণ। তোমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হলে এ ধরনের আবেগকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না।'

'আমাকে মাফ করবেন। হয়তো আমি সত্যি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি। কিন্তু সে আমার জীবন বাঁচিয়েছে এ কথা আমি ভুলবো কেমন করে? তবে আমি আমার দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন আছি। ও নিয়ে আপনাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এখন আপনার অনুমতি পেলে আমি ওকে একটু দেখতে চাই।'

'সিনথিয়া, তুমি জানো, কোনার্ড এবং লুজিনাম কাউকে ক্ষমা করেন না। রাতের ব্যাপার না হলে ওরা তোমাকে তখনই জেলে পাঠিয়ে দিতেন। তোমার রক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তোমার জন্য নির্দেশ হলো, তার সাথে দেখা করতে পারবে না।'

'কেন?' সিনথিয়ার হতবাক কণ্ঠ। 'আমি কি তাকে কৃতজ্ঞতাও জানাতে পারবো না!'

'না, পারবে না। কারণ সে শত্রু বাহিনীর। তোমার দায়িত্বের কথা তুমি জানো। আমি তার সাথে দেখা করার অনুমতি তোমাকে দিতে পারি না। তোমার কাছে সংস্থার দাবীও তাই। আমি দেখতে পাচ্ছি, তার ব্যাপারে তুমি মাত্রাতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছো। তোমাকে আমি এতোটা আবেগপ্রবণ হওয়ারও অনুমতি দিতে পারি না।'

'আমাকে শুধু বলুন, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিৎসার পর তাকে নিরাপদে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

'সিনথিয়া!' হরমুনের কণ্ঠে ক্রোধ। 'তোমার সে ইচ্ছে পূরণ করা হবে। তুমি এক বিপজ্জনক অভিযান থেকে এসেছো। এখন তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। তোমাকে এক মাস ছুটি দেয়া হলো। এখন গিয়ে আরাম করো।'

কনফারেন্স শেষে হরমুনের সঙ্গে এসব কথা হওয়ার পর রাতে নিজের কামরায় ফিরে গেলো সিনথিয়া। গোয়েন্দা মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা ছিল সেনা হেডকোয়ার্টার থেকে

অনেক দূরে। এদের অভিযান ছিল বিপজ্জনক, দায়িত্ব পালন কালে ধরা পড়লে মৃত্যু অবধারিত। তাই এদের জন্য সব রকম বিলাস উপকরণের ব্যবস্থা ছিল। বলতে গেলে ওরা থাকতো রাজকুমারীর মতো।

রুমে গিয়েই শুয়ে পড়লো সিনথিয়া। ক্লান্ত দেহটা বিছানায় ঠেকাতেই ঘুমিয়েও পড়লো। ঘুম ভাঙলো পরদিন সকালে। বিছানা ছাড়তে মন চাচ্ছিল না তার। তবুও উঠে নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়লো। বেরোতেই দেখা হয়ে গেলো লুজিনার সাথে। লুজিনা ওর পাশের কামরায় থাকে। ও কায়রোর অভিযানের কথা শুনতে চাইলো।

'লুজি, আমাকে এখনই একটু বাইরে যেতে হচ্ছে। ঘুরে আসি, তারপর সব বলবো তোকে।' সিনথিয়া হাঁটা দিল হাসপাতালের দিকে।

একটু এগুতেই সিনথিয়া ওর এক বান্ধবীর সামনে পড়লো। সেও থাকে পাশের কক্ষেই। দূর থেকে ওকে দেখেই নেমসি চিৎকার করে ডাকল, 'হ্যালো সিন!'

সিনথিয়া হেসে বললো, 'হাই।'

নেমসি এগিয়ে এলো ওর কাছে। বললো, 'আরে সিনথিয়া! কখন ফিরলি? যাচ্ছিস কোথায়? তোকে কেমন উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে! একি ক্লান্তি না অন্য কিছু! ছুটি পাসনি?'

হেসে ফেলল সিনথিয়া। 'এক মাস ছুটি পেয়েছি। তবে..' তার চেহারায় আবার চিন্তার ভাঁজ পড়লো।

'তবে কি?' উদ্বেগের স্বরে জানতে চাইলো সে।

'একটা বিশেষ কারণে আমি আসলেই চিন্তিত।'

ওরা আরেকটু হেঁটে একটা গাছের নীচে গিয়ে বসলো।

'কি ব্যাপার! কী ঘটেছে বলতো শুনি।'

সব কথা ওকে খুলে বললো সিনথিয়া। অফিসাররা যে শাসিয়েছে তাও বললো। সবশেষে বললো, 'আমি হাদিদের সাথে দেখা করতে চাই। মনে হয় ওরা তার চিকিৎসা করেনি। না হয় শহর থেকে বের করে দিয়েছে। এমনও হতে পারে, মারার জন্য কোন কক্ষে বন্দী করে রেখেছে।'

'তোকে না তার সাথে দেখা করতে নিষেধ করা হয়েছে? ধরা পড়লে কি শাস্তি দেবে তা জানিস?'

'ওর জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত। তোকে তো বলেছি, আমার জন্যই ও নিজের জীবন বিপন্ন করেছে। আমার তো জীবনের কোন ভয় ছিল না। ডাকাতরা ক'দিন ব্যবহার করে কোন আমীরের কাছে হয়তো বিক্রি করে দিত। এ কথা হাদিদও জানতো। আমার ইজ্জতের জন্যই নিজেকে বিপদে ফেলেছিল সে। দস্যুরা বলেছিল, 'মেয়েটাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে তুমি চলে যাও। আমরা তোমাকে কিছুই বলবো না।' আমি যে খারাপ মেয়ে তাও ওর জানা ছিল। কিন্তু তবু আমার ইজ্জত রক্ষা করাকে ওর আমানত মনে করেই ও নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে রক্ষা করেছে।'

'মনে হয় ওকে তুই ভালবেসে ফেলেছিস?'

'হাঁ, কথাটা তুই মিথ্যে বলিসনি। হরমুনের সামনে আমার এ আবেগ প্রকাশ করতে

পারি না। কিন্তু আমার মনের সব কথাই তো তোকে বলতে পারি। তুই আমার বান্ধবী। নারী হৃদয়ের আবেগ তুই বুঝিস। আমাদের জীবনটা কি? চোখ ধাঁধানো তরবারী, মিষ্টি বিষ। পুরুষদের ধোঁকা দেয়াই আমাদের পেশা। আমরা ট্রেনিং নিয়েছি প্রতারণার ফাঁদ পাতার।

কিন্তু একথা আগে কখনো ভাবিনি, আমরাও মানুষ। আমাদের যে হৃদয় আছে ভুলেই গিয়েছিলাম। ওর সংস্পর্শে এসে আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছি। ওকে দেখে আমার আবেগের দরিয়ায় ঝড় উঠলো। ওর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় গলে গেলো আমার এ ছোট্ট হৃদয়। এই প্রথমবার মনে হলো আমি কারও মেয়ে। আবার আমি কারো মা-ও হতে পারি। এতোদিন আমি নিজকে রাজকুমারী মনে করতাম। ওর পরশ পেয়ে আমি মানুষের মধ্যে ফিরে এসেছি।

আমাদের গোয়েন্দা বৃত্তির ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। সম্রাটরা আমাদের চোখের ইশারায় উঠবস করে। কিন্তু এতে খুশী হওয়ার কিছু দেখি না আমি। এরা তো আমাদেরকে পণ্যে পরিণত করেছে। আমি অন্ধগলির মেয়ে না হলেও যেসব মেয়েরা প্রতিরাতে নতুন নতুন খদ্দের খোঁজে আমি তো তাদেরই মতো একজন।

হাদিদ আমাকে এ পর্যায় থেকে অনেক উপরে তুলে দিয়েছে। আমি ছিলাম ওর বন্দিনী। ইচ্ছে করলে ও আমাকে সহজেই ব্যবহার করতে পারতো। কিন্তু ও আমাদের এড়িয়ে গেছে। আমার ইজ্জত রক্ষার জন্য ও যখন আহত হলো, আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। ওকে জায়গা করে দিয়েছি বুকের মধ্যে। আমি হয়ে গেছি এক সাধারণ মেয়ে। যার হৃদয় আছে, আবেগ ও উচ্ছ্বাস আছে।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি কোন সম্মানিত লোককে বিয়ে করছো না কেন?' তখন মনে হয়েছিল এ মুসলমান সম্রাট কত গবেট। এখন অনুভব করছি, আমাদের শত্রু কত মূল্যবান কথা বলেছেন।

আমি আর গোয়েন্দার কাজ করতে পারবো না। শৈশব থেকে দেয়া আমার সব ট্রেনিং হারিয়ে গেছে মরুভূমির ভয়ংকর রাতের আঁধারে। ডাকাতের ভয়, ওর শরীরের উষ্ণতা আর রক্তের গন্ধ আমার এতোদিনের সব শিক্ষা মুছে দিয়েছে।'

'এতো কথা না বললেও তোর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তবু চরম বাস্তবকে উপেক্ষা করা যায় না। ওকে চলে যেতে হবে। আর ও এখানে কোন কষ্টের মধ্যে থাকলেও তোর করার কিছুই নেই। তার সাথে দেখা না করার জন্য তোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ অমান্য করার পরিণাম কত ভয়াবহ তা কি তোর অজানা?'

'ধরা পড়লে এক সঙ্গে দু'জনই মরবো, তবু তার সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। আমাকে ভুল বুঝিস না বোন, তুই আমাকে একটু সাহায্য কর।'

মিনতি ঝরে পড়লো সিনথিয়ার কণ্ঠ থেকে।

'বুঝেছি সিন, তুই মরেছিস। কিন্তু তবু বলবো, এমন কিছু করিস না, যাতে দু'জনকেই বিপদে পড়তে হয়। যা-ই করিস ভেবেচিন্তে করিস। আমার মনে হয় না এ অবস্থায় তার সাথে তোর দেখা করা ঠিক হবে।'

'কিন্তু ওর কোন খোঁজ না নিয়ে চুপচাপ আমাকে বসে থাকতে বলিস?'

'আচ্ছা, আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

'প্লিজ, খোঁজ নিয়ে দেখ ও কোথায় আছে। সুস্থ হয়ে ও ফিরে গেছে শুনলেও আমি স্বস্তি পাবো।'

'ঠিক আছে। তুই রুমে ফিরে যা, আমি ওর খোঁজ নিচ্ছি।'

উঠে দাঁড়ালো দু'জন। পরস্পর বিদায় নিয়ে দু'দিকে হাঁটা দিল। হাসপাতালে না গিয়ে সিনথিয়া ফিরে এলো তার রুমে।

কায়রোর সেনাবাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে। ছাউনীর বাইরে চলছে সৈন্যদের ট্রেনিং। তৈরী করা হচ্ছে কমাণ্ডো বাহিনী। তাদের শেখানো হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধের নিয়ম কানুন।

সুলতান নিজে সব দেখাশোনা করছেন। তিন-চার দিন পর অফিসারদের দরবার বসেছে। যুদ্ধের মানচিত্র নিয়ে যুদ্ধ পলিসি ব্যাখা করছেন আইয়ুবী।

তিনি বললেন, 'যুদ্ধের মূলনীতি হবে অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমণ করা। অস্ত্রের চাইতে বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে বেশী। সামনাসামনি আক্রমণ করবে না। একশজন সৈন্য দু'তিনটে যুদ্ধে যে সাফল্য লাভ করতে পারে, দশ-বারো জনের একটা কমাণ্ডো বাহিনী ঠিকমতো আঘাত করতে পারলে সফলতা লাভ করতে পারে তারচে' বেশী।'

দুর্গ অবরোধ এবং প্রাচীর ভাঙ্গার পদ্ধতি শিখানো হলো সৈনিকদের। দুর্বল উট, ঘোড়া এবং খচ্চরগুলো বাছাই করে সরিয়ে রাখা হলো।

ফিলিস্তিন পুনর্দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আইয়ুবী। অন্যদিকে আইয়ুবীকে পথে বাঁধা দেয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করছিল খৃস্টান বাহিনী। প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছে দু'দলই পরস্পরকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য পাগলপারা। খৃস্টান বাহিনী তাদের সৈন্য ছড়িয়ে দিয়েছিল সুবাক থেকে মিশরের সীমানা পর্যন্ত। বাহ্যত মনে হচ্ছিল, সুলতান আইয়ুবীর বেঁচে আসার সকল পথ রুদ্ধ। আগেভাগে সুলতানের পরিকল্পনা জানার কারণেই এভাবে প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয়েছে।

সেনা প্রস্তুতির বাইরে সুবাকে চলছে অন্য এক তৎপরতা। হাদিদের সংবাদের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিল সিনথিয়া। নিজের কক্ষে ছটফট করছিল ও। নেমসি মেয়েটা দু'দিন থেকে হাদিদকে খুঁজছে। হাদিদ অফিসারদের হাসপাতালে নেই। সাধারণ সৈন্যদের হাসপাতালেও পাওয়া যায়নি তাকে।

গোয়েন্দা হওয়ায় সেনা অফিসাররা ওদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। মেয়েটা হাদিদের কথা অনেককে জিজ্ঞেসও করেছে। কেউ কিছু বলতে পারেনি।

তৃতীয় দিন একজন অফিসার ওকে গোপনে বললো, 'ব্যাণ্ডেজ করে তাকে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট বেগার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

নেমসি ছুটে এলো সিনথিয়ার কাছে। সংবাদ শুনে সিনথিয়া থ' মেরে বসে রইলো। চোখে মুখে ফুটে উঠলো আতংক। মুসলমানদের বেগার ক্যাম্প এক ভয়ংকর স্থান। যুদ্ধবন্দী ছাড়াও বিজিত এলাকার নিরপরাধ মুসলমানদেরকে রাখা হয়েছে এখানে। মুসলমানদের কাফেলা লুট করে যাদের ধরে আনা হতো ওদেরকেও এখানে এনে রাখা

হতো। কারাগার নয় বলে ক্যাম্পে পাহারার কড়াকড়ি ছিল না। এখানে রাখা বন্দীদের কোন তালিকা করা হতো না।

এদের সাথে আচরণ করা হতো পশুর মতো। কোথাও সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন হলে এদেরকে পশুর মতোই তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। খাবার দেয়া হতো বেঁচে থাকার মতো। রাখা হতো তাঁবুতে। সাধারণ রোগে চিকিৎসা করা হতো। বেশী অসুস্থ হলে মেরে ফেলতো বিষ খাইয়ে। এখানে বন্দী হওয়ার জন্য কোন অপরাধ করার দরকার হতো না। ও মুসলমান, এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে!

হাদিদকে এ ক্যাম্পেই পাঠানো হয়েছিল। হরমুন বুঝেছিলেন, সিনথিয়া তার জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। এ জন্য হাদিদের সাথে সিনথিয়ার দেখা সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

সিনথিয়া মনে প্রাণে এ নির্দেশ গ্রহণ করতে পারেনি। যখন ও শুনলো হাদিদ বেগার ক্যাম্পে, বান্ধবীকে বললো, 'আমি ওকে মুক্ত করবো।'

ওকে সহযোগিতা করতে রাজি হলো মেয়েটা। সিনথিয়া শহরের এক প্রাইভেট ডাক্তারের সাথে দেখা করলো। বললো, 'একজন আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করতে হবে। শর্ত হচ্ছে এ কথা কাউকে বলা যাবে না।'

'কেন?'

'কারণ লোকটি একজন গরীব মুসলমান। ও আমার বংশের অনেক উপকার করেছে। কোথাও ঝগড়াঝাটি করে আহত হয়েছে। চিকিৎসা করার মতো সামর্থ নেই। ডাক্তারদের সবাই খৃষ্টান। বিনে পয়সায় কেউ ওর চিকিৎসা করতে চাচ্ছে না।

ব্যাপারটা গোপন করার দ্বিতীয় কারণ হলো, প্রশাসন যদি জানতে পারে মুসলমানরা ঝগড়াঝাটি করেছে, তবে ওদের বেগার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে। ওদের বন্দী করার জন্য তো একটা বাহানামাত্র প্রয়োজন।

সে আমার পরিবারের যে উপকার করেছে আমি তার প্রতিদান দিতে চাচ্ছি। আমি তাকে নিয়ে আসবো রাতে। বলুন আপনাকে কত দিতে হবে? গোপনীয়তা রক্ষার মূল্যও আমি দেবো।'

ডাক্তার সিনথিয়ার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলো। চোখে জ্বলজ্বলে কামনা।

সিনথিয়া এক ভদ্রঘরের মেয়ে হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। ডাক্তার ওর দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। রূপসী তরুণীর কাছে বিনিময় চাওয়ার ভাষা হারিয়ে ফেললো ডাক্তার।

ডাক্তারের চোখের ভাষা বুঝে ফেললো সিনথিয়া। নিজের প্রশিক্ষণকে কাজে লাগালো। গলে গেলো ডাক্তার।

সিনথিয়া তার হাতে চারটি স্বর্ণ মুদ্রা ধরিয়ে দিল। ডাক্তার সিনথিয়ার হাত ধরে বললো, 'তোমার চাইতে দামী মুদ্রা আর কিছুই হতে পারে না।'

মৃদু হাসল সিনথিয়া। 'আপনি যা চাইবেন দেবো, আগে আমার কাজ করুন।'

ডাক্তার বুঝলো ব্যাপার বিপদজনক। কিন্তু সিনথিয়াকে দেখে যে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি হলো সে। বললো, 'আজ রাত বা কাল রাত, যখন ইচ্ছা নিয়ে এসো। এ দু'দিন

আমি কোন বাইরের কলে এটেও করবো না। আমি ঘুমিয়ে থাকলে জাগিয়ে দিও।'

ডাক্তার এক হাতে স্বর্ণ মুদ্রা এবং অন্য হাতে সিনথিয়ার হাত ধরে ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

হাদিদকে ক্যাম্প থেকে বের করাটাই ছিল বড় সমস্যা। ক্যাম্পে পাহারার কড়াকড়ি নেই ঠিক, কিন্তু সিনথিয়াকে সেখানে দেখলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ষোল আনা।

ওখানে যারা থাকে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ওদের বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। ক্যাম্পে আনা হয় সূর্যাস্তের পর।

একজন প্রহরী প্রতিদিন পাশের ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতো আহত বা অসুস্থ বন্দীদের।

পরদিন নেমসিকে নিয়ে ক্যাম্পের কাছে গেলো সিনথিয়া। পঁচিশ ত্রিশজন রোগীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ডাক্তারের কাছে। প্রহরীর হাতে লাঠি। দ্রুত চলার জন্য সে রোগীদের পিটাচ্ছিল।

মেয়ে দু'জন চলে এলো রোগীদের কাছে। ভাব দেখাচ্ছে, যেন এ দৃশ্য উপভোগ করছে ওরা। সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। হঠাৎ করেই চমকে উঠলো সিনথিয়া। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে হাদিদ। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তার। চেহারায় আগের সেই জৌলুস নেই। ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটছে। কাপড়ে চটচটে রক্তের দাগ।

কান্না পেলো সিনথিয়ার। অশ্রু এসে জমা হতে লাগলো দু'চোখ ভরে। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল হাদিদ। সামনে চলে গেল রোগীর দল। নেমসি প্রহরীর সাথে কথা জুড়ে দিল। কথার মাঝে প্রকাশ পাচ্ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা।

ওদের বাকচাতুর্যে পটে গেলো প্রহরী। দুই যুবতীর কাণ্ডকারখানা দেখছিল প্রহরী, সিনথিয়া হঠাৎ করেই বললো, 'এই, ওদের সাথে আমাদের একটু আনন্দ করতে দেবে?'

নেমসি বললো, 'ও মাই গড, কি বিচ্ছিরি! তুই যা, আমি ওদের কাছে যাবো না।'

সিনথিয়া এগিয়ে গেলো রোগীদের পাশে। প্রহরী কোন আপত্তি করলো না। নেমসি প্রহরীর সাথে গল্পে মেতে উঠলো।

ডিসপেনসারিতে রোগীদের প্রচণ্ড ভীড়। বন্দীদেরকে বাইরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। নেমসি তখনো প্রহরীর সাথে গল্প চালিয়ে যাচ্ছে। বন্দীদের নিয়ে তামাশা করছে সিনথিয়া।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে হাদিদ। ফ্যাকাশে চেহারা। সিনথিয়া তাকে চোখের ইশারায় কাছে ডাকলো। নিয়ে গেলো আড়ালে। বললো, 'কর্তৃপক্ষ তোমার সাথে দেখা করতে আমাকে নিষেধ করেছে। বসো, আমরা যে কথা বলছি কেউ যেন বুঝতে না পারে।'

'তোমার কর্তৃপক্ষ আর তোমার ওপর গজব পড়ুক।' ক্ষোভের সাথে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো হাদিদ। 'কোন প্রতিদানের আশায় তোমাকে দস্যুদের কবল থেকে রক্ষা করিনি। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। কর্তব্যপরায়ণ সব লোকদের সাথেই কি তোমরা এমন ব্যবহার করো?'

'চুপ করো হাদিদ।' সিনথিয়ার কান্না ভেজা কণ্ঠ, 'এসব কথা পরে হবে। রাতে তুমি কোথায় থাকো? আজই তোমাকে এ নরক থেকে বের করতে হবে।'

হাদিদ ওর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিল না। সিনথিয়ার চোখে বেদনার সুনীল টলমলে জল দেখে বুঝলো, ও আসলেই প্রতারণা করছে না। হাদিদ শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করলো ওকে। রাতে কোথায় থাকে বললো। বললো, 'এখান থেকে পালানো কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু যাবো কোথায়?'

এরপর পালাবার একটা পরিকল্পনা তৈরী করলো ওরা, যা এ দু'জন ছাড়া আর কেউ টেরও পেল না।

বেগার ক্যাম্পে মরার মতো ঘুমিয়ে আছে বন্দীরা। প্রহরীও ঘুমিয়ে আছে। এখান থেকে কেউ কখনো পালায়নি। পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? বন্দীদের কোন রেজিষ্টার নেই বলে দু'একজন পালালেও কেউ জানতে পারে না।

রাতের প্রথম প্রহর শেষ হয়েছে। পুরনো ছেঁড়া এক তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর আড়ালে চলে গেলো। এখন প্রহরী সজাগ থাকলেও তাকে আর দেখতে পাবে না। ক্যাম্পের গেট পেরিয়ে এগিয়ে চললো লোকটি।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। সামনে খেজুর বাগানের নীচে আঁধার আরো ঘন। কিছুই দেখা যায় না। ও খেজুর বাগানের দিকে পা চালাল। ওখানে আপাদমস্তক মোটা কাপড় শরীরে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক ছায়ামূর্তি।

তাঁবু থেকে বের হওয়া লোকটা বাগানে ঢুকতেই সন্তর্পনে এগিয়ে এলো ছায়ামূর্তি। কাছে এসে বললো, 'দ্রুত হাঁটতে পারবে হাদিদ?'

'চেষ্টা করবো।'

সিনথিয়া হাদিদের হাত চেপে ধরে বললো, 'তাহলে চলো। সাবধানে হাঁটতে হবে, নাইটগার্ডের চোখে পড়লে বিপদ হবে।'

ক্যাম্প পিছনে ফেলে অনেক দূরে চলে এলো ওরা, সামনে বিশাল অনাবাদী ভূমি। হাদিদ দ্রুত হাঁটতে পারছে না। সিনথিয়া ওকে সাহায্য করছে হাঁটতে। চলতে চলতে গোয়েন্দা প্রধান এবং অফিসাররা কি কি বলেছে, একে একে সব বললো সিনথিয়া। হাদিদের সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

সামনে শহর। শহরে প্রবেশ করেই একটা গলিতে ঢুকলো ওরা। কিছুদূর এগিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে ডাক্তারের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

হাদিদকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে গেলো সিনথিয়া। দরজার কড়া নাড়লো তিন চারবার।

ভেতরে কারো পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো। এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন ডাক্তার। দরজা খুলতেই সিনথিয়া দ্রুত হাদিদকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো। হাদিদের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, 'সুস্থ হতে কমপক্ষে দিন বিশেক লাগবে।'

সমস্যায় পড়লো সিনথিয়া। হাদিদকে এতোদিন কোথায় লুকিয়ে রাখবে? বেগার ক্যাম্পে নেয়া যাবে না। সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি লোপ পেলো ওর।

ততোক্ষণে ডাক্তার হাদিদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছেন। বললেন, 'ওকে ভাল খাবার দিতে হবে।'

সিনথিয়া ডাক্তারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো, 'ও তো, গরীব। ও ভাল খাবার পাবে কই? আর ওর এমন কেউ নেই যে ওকে দেখাশোনা করবে। আমার বাড়ীতেও ওকে নিতে পারছি না। এক কাজ করুন, ওকে বরং এখানেই রাখুন। তাতে বারবার ওকে আনা নেয়ার ঝামেলাও কমবে, আর ঠিকমতো দেখাশোনা করারও সুবিধা হবে। আমার কাছে বিনিময় এবং পারিশ্রমিক যা চাইবেন দেবো।'

ডাক্তার অস্বাভাবিক পারিশ্রমিক দাবী করলো। শুনে চোখ কপালে তুলল সিনথিয়া। বললো, 'ও মাই গড, বলেন কি আপনি?'

ডাক্তার বললো, 'আমাকে দিয়ে একটা বিপজ্জনক কাজ করাচ্ছেন। আমি জানি একে বেগার ক্যাম্প থেকে আনা হয়েছে। ও একজন মিশরীয় সৈনিক। আপনার সাথে ওর সম্পর্ক কি, পারিশ্রমিক বেশী হলে এ গোপন তথ্য আমার ঘরের বাইরে যাবে না।'

'আমি রাজি। তবে এ গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়লে আপনিও বাঁচতে পারবেন না। ওর পরিচয় যখন পেয়েছেন তখন আশা করি আমার পরিচয়ও আপনার জানা আছে।'

ডাক্তার হাদিদকে অন্য এক কক্ষে নিয়ে গেল। বললো, 'সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকবে।'

দুধ এবং ফল এনে দিল ভেতর থেকে। দরজা বন্ধ করে ফিরে গেলো সিনথিয়ার কাছে।

পরদিন সিনথিয়া এবং তার বান্ধবী হাঁটতে হাঁটতে ক্যাম্পের কাছে গেলো। দেখল ঘুরে ফিরে। কথা বললো প্রহরীর সাথে। কথায় কথায় জেনে নিল হাদিদ যে পালিয়েছে কেউ টের পায়নি।

দিন গিয়ে রাত এলো। সিনথিয়ার মতো পারিশ্রমিক পেয়ে ডাক্তার মহাখুশী। মন দিয়ে হাদিদের চিকিৎসা করছে, প্রয়োজনীয় খাবার দিচ্ছে। নিজেই সেবা শুশ্রূষা করছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ডাক্তারখানায় আসতো সিনথিয়া। হাদিদের সাথে কথা বলতো। সময় কাটাতো ডাক্তারের ঘরে। এভাবে বিশদিন কেটে গেলো। হাদিদ এখন সুস্থ। সিনথিয়া ডাক্তারকে বললো, 'কাল রাতে ওকে নিয়ে যাবো।'

সিনথিয়ার প্রতি দুর্বল ছিল একজন জুনিয়র অফিসার। ওকে ব্যবহার করলো সিনথিয়া। অফিসারকে ভালবাসার কথা বললো, মদ খাওয়ালো তাকে।

অতিরিক্ত মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো অফিসার। তার দেহ থেকে সামরিক উর্দি খুলে নিয়ে হাদিদকে পরালো সে পোশাক।

শহরের চারপাশে ছিল মাটির উঁচু দেয়াল। ফটক খোলা হতো দিনে। রাতে থাকতো বন্ধ। আইয়ুবীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সৈন্যরা ছিল বেজায় তৎপর। ওরা ফটক দিয়ে যাওয়া আসা করছিল হরদম।

সূর্য এখনো ডুবেনি। দুর্গের মূল ফটকের দিকে যাচ্ছে এক অশ্বারোহী। পরণে খৃষ্টান সেনাবাহিনীর উর্দি। কোমরে ঝুলানো খৃষ্টান সৈন্যদের তরবারী। ঝুলছে মুসলমানদের মতো বাঁকা করে নয়, সোজা। খোলা ফটক। উটের বহর যুদ্ধের রসদ নিয়ে বাইরে যাচ্ছে।

অশ্বারোহী পৌঁছলো ফটকে। এ সময় খৃষ্টানদের গোয়েন্দা প্রধান ভেতরে ঢুকছিলেন, তাকালেন অশ্বারোহীর দিকে। মৃদু হাসলেন তিনি। অফিসার জবাবে হাসল না, বরং তাকে অগ্রাহ্য করেই যেন ফটক পেরোলো।

হরমুনের কি মনে হলো, ঘোড়ার বলগা টেনে ধরলেন তিনি। কয়েক কদম এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ঘোড়া। তিনি ঘোড়ার মুখ ঘুরালেন। সিনথিয়া দাঁড়িয়ে আছে শ'তিনেক গজ দূরে। হরমুনকে দেখে আড়ালে সরে গেলো সে।

ফটকের দিকে ঘোড়া ছুটালেন গোয়েন্দা প্রধান। একটা সন্দেহ দূর করতে চাচ্ছেন। বাইরে এসে দৃষ্টি ছুঁড়লেন। অশ্বারোহী অনেক দূর চলে গেছে। তাকিয়ে রইলেন তিনি, ঘোড়সওয়ার হারিয়ে গেলো দৃষ্টির আড়ালে।

সিনথিয়ার সহযোগিতায় হাদিদ পালিয়ে গেছে এ কথা আর জানা হলো না হরমুনের। কিন্তু সন্দেহটা মনের ভেতর খচখচ করতে লাগল।

ঘোড়া ঘুরিয়ে গোয়েন্দা প্রধান ছুটলেন বেগার ক্যাম্পের দিকে। হাদিদের হুলিয়া বর্ণনা করে কমাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন কেউ আছে তোমার এখানে?'

কমাণ্ডার খোঁজ নিল। দেখা গেলো এমন কোন লোক নেই এখানে। হরমুনের সন্দেহ গাঢ় হলো। ফটকে যাকে দেখেছেন, সে হাদিদ কিনা আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি সিনথিয়ার কক্ষে গেলেন।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে কাঁদছে মেয়েটা।

'তুমিই কি ওকে পালাতে সাহায্য করেছো?' গর্জে উঠলো হরমুন।

সিনথিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুললো।

'মিথ্যে বলো না, আমি তদন্ত করে সব প্রমাণ করবো।'

'আপনার তদন্তের প্রয়োজন নেই। আমার মিথ্যে বলারও কিছু নেই। আমার জীবনটাই রাজকীয় মিথ্যা, আমি হচ্ছি চোখ ধাঁধাঁনো প্রতারণা। আমার আত্মার মুক্তির জন্য সত্য কথা বলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালো সিনথিয়া। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তার। পাশের টেবিলে শূন্য গ্লাসে কয়েক ফোটা পানি।

কাঁপা হাতে গ্লাস তুলে হরমুনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'আমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। গ্লাসের অবশিষ্ট ক'ফোটা পানি এর সাক্ষী। আমি জাতির সাথে বেঈমানী করেছি বা বন্দী শত্রুকে পালাতে সাহায্য করেছি বলে এ শাস্তি নেইনি। বরং এ অপবিত্র দেহ দিয়ে এমন মানুষের সাথে প্রতারণা করেছি যারা প্রতারণা বা ধোঁকা বুঝে না।

আমাদের তো কোন সম্ভ্রম নেই। কিন্তু ওরা চারজন আমাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য দশ বারোজন দস্যুর মোকাবিলা করেছে। দ্বিধাহীন চিত্তে বরণ করে নিয়েছে আপন মৃত্যু। অথচ আমাদেরকে ডাকাতের হাতে তুলে দিলে ওরা কোন ক্ষতিরই সম্মুখীন হতো না।

এরপর এক ব্যক্তি নিজে আহত হয়ে আমাকে দস্যুদের কবল থেকে মুক্ত করেছে। সে জানতো, আমি তার শত্রু, তবু আমার জন্য সে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। অথচ আমার প্রতি তার কোন লোভ ছিল না।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝেছি সত্য মিথ্যার ফারাক। ঘৃণা এবং

ভালবাসার পার্থক্য। আমি সত্য প্রকাশ করে মরতে পারছি, এ জন্য আমি আনন্দিত। এ মৃত্যু প্রশান্তির, এ মৃত্যু গৌরবের।'

ও পড়ে যাচ্ছিল, গ্লাসসহ ওকে ধরে ফেললো হরমুন। ঝটকা মেরে হরমুনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে সরে গেলো ও। অস্ফুট স্বরে বললো, 'আমার দেহ স্পর্শ করো না। এ দেহ এখন তোমাদের কোন কাজে আসবে না। তোমাদের প্রয়োজন এক অপবিত্র দেহ। এ বিষে আমার দেহ পবিত্র হয়ে গেছে।

ওকে আমি পালাতে সাহায্য করেছি। বিশ দিন লুকিয়ে রেখে চিকিৎসা করিয়েছি। অস্ত্র ও উর্দি চুরি করে ওকে দিয়েছি। আমার নিজের ঘোড়া দিয়েছি ওকে। ওর সাথে আমি যেতে পারছি না, ওকে ছাড়া থাকতেও পারছি না– এ জন্য বিষ খেয়েছি।'

বিছানায় পড়ে গেলো ও। হরমুনের কানে বাজতে লাগল তার অন্তিম শব্দগুলো।

সত্য বলার পর মৃত্যু কত প্রশান্তির হয় তাই তাকিয়ে দেখছিল হরমুন। চির শান্তির কোলে ঘুমিয়ে পড়লো সিনথিয়া, সেদিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলো হরমুন।

সিনথিয়ার শেষকৃত্যের পর একজন অফিসার বললো, 'ওর কোন আত্মীয় স্বজন থাকলে মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দেয়া উচিত।'

'আমরাই ওর আত্মীয়।' জবাবে বললো হরমুন। 'ওর বয়স যখন এগারো, এক কাফেলা থেকে ওকে অপহরণ করা হয়েছিল।'

সুলতানের সেনাবাহিনী মিশর ছেড়েছে তিনদিন আগে। পথে বাঁধা দেয়ার জন্য খৃস্টানদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সুবাকের বেশীর ভাগ সৈন্য পাঠানো হয়েছে ক্রাকে। নূরুদ্দিন জঙ্গীকে ঠেকানোর জন্য কিছু গেছে সিরিয়ার দিকে। সুসজ্জিত খৃস্টান বাহিনী আইয়ুবীকে বাঁধা দেয়ার জন্য এখন পুরোপুরি প্রস্তুত।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিজের বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করলেন। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে ওদের এগিয়ে চলতে নির্দেশ দিলেন। তিন দলের কমান্ডারদেরকে ডেকে পাঠালেন নিজের তাঁবুতে।

সবাই তাঁবুতে একত্রিত হলো। সুলতান বললেন, 'এবার গোপন তথ্য প্রকাশ করার সময় এসেছে। আমি বলেছিলাম ক্রাক আক্রমণ করবো। কিন্তু তোমাদেরকে অন্য পথে নিয়ে এসেছি। এতে তোমরা নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছো। আসলে আমি ক্রাকে আক্রমণ করবো না। আমাদের লক্ষ্য হলো সুবাক।

খৃস্টান গোয়েন্দাদেরকে পাশের কামরায় রেখে যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছিলাম, মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ওদের মুক্তি দিয়েছিলাম, ওদেরকে সুবাক পৌঁছে দেয়ার জন্য দেহরক্ষী দিয়েছিলাম– এর সবকিছুতেই তোমরা আশ্চর্য হয়েছো।

এবার শোন এর হাকীকত। ওদের সাথে যে চারজন রক্ষী দিয়েছিলাম, ওদের একজন কাল রাতে সুবাক থেকে ফিরে এসেছে। ডিউক গিয়ে আমাদের কাছ থেকে শোনা যুদ্ধের সব পরিকল্পনা ওদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। আমি জানতাম এমনটি হবে।

আমি যেভাবে চেয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই ওরা সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন

আমাদের ফৌজের বায়ের অংশ থেকে চার মাইল দূরে রয়েছে খৃষ্টানদের বিশাল বাহিনী।'

বাম অংশের কমাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি দু'মাইল সোজাসুজি এগিয়ে যাবে। এরপর বায়ে মোড় নেবে। চার মাইল এগিয়ে আবার বায়ে মোড় নেবে, দেখবে শত্রু সৈন্য বিশ্রাম নিচ্ছে। তীব্র গতিতে কমাণ্ডো হামলা করবে ওদের ওপর। পথের সবকিছু তছনছ করে আগের জায়গায় ফিরে আসবে।

দ্বিতীয় দল সন্ধ্যার পর আট মাইল সোজা এগিয়ে বায়ে মোড় নেবে। ওদের রসদ এবং খাদ্য সামগ্রী পাবে ওখানে। তোমরা তখন থাকবে শত্রুর পেছন দিকে। দিনে দুশমনের বাম অংশের পিছনে ধাওয়া করবে, কিন্তু সামনা সামনি যুদ্ধ করবে না। ওরা মোকাবেলা করতে শুরু করলে পিছু হটবে। আস্তে আস্তে অনেক দূর পেছনে চলে আসবে। যেখানে এসে দেখবে দুটো পাহাড় এক জায়গায় মিলেছে, পাহাড়ের সেই সন্ধিস্থলে নিয়ে আসবে শত্রু সেনাদের। তারপর পাথরকুচির ফাঁক গলে সরে যাবে আরো পেছনে।

মূল আক্রমণ করবে রাতে। খৃষ্টান সেনাবাহিনী এগিয়ে এলে মাঝের অংশ পেছন থেকে ওদেরকে আক্রমণ করবে। আমি এক অংশ নিয়ে রাতেই রওনা করবো। কাল দুপুর নাগাদ সুবাক অবরোধ করবো। বাকী দু'ভাগ মরুভূমির বিশাল এলাকায় ওদের ব্যস্ত রাখবে।

ওদের কাছে যেন রসদ পৌঁছতে না পারে। পানির সবগুলো ঝর্ণা দখল করে নেবে। আক্রমণ করবে একপাশ থেকে। যুদ্ধ করার জন্য কোথাও দাঁড়াবে না। সুইসাইড স্কোয়াড প্রতি রাতেই ওদের রসদ, পশু এবং খাদ্য বহরের উপর অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করবে।'

সুবাক অবরোধ করলেন সুলতান আইয়ুবী। ওখানকার বেশীর ভাগ খৃষ্টান ফৌজকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল ক্রাকের পথে। মরুভূমিতে মুসলিম সেনাবাহিনী ওদের এখান থেকে ওখানে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

রসদ নেই, পানি নেই। মুসলমানরা সামনাসামনি যুদ্ধ করছে না। সুবাক রক্ষার জন্য এগিয়ে যাবে, মুসলিম বাহিনী সে সুযোগও দিচ্ছে না। বলতে গেলে খৃষ্টান বাহিনীর এখন ত্রিশংকু অবস্থা।

সুবাক কেল্লার অল্প সংখ্যক খৃষ্টান সৈন্য পাঁচিলে উঠে তীর নিক্ষেপ করছিল সর্বশক্তি দিয়ে। কিন্তু স্রোতের মতো টুটে পড়লো মুসলিম ফৌজ।

একবার এদিক থেকে আবার ওদিক থেকে অব্যাহত হামলা চালাতে থাকলো। দেড় মাস অবরোধের পর দেয়াল ভেঙ্গে শহরে প্রবেশ করলেন সুলতান আইয়ুবী।

পাহাড় ও মরুভূমিতে ধাওয়া খাওয়া বিচ্ছিন্ন খৃষ্টান বাহিনী ধীরে ধীরে সমবেত হলো ক্রাকের দুর্গে। কখন সুলতান ক্রাক আক্রমণ করবেন সে অপেক্ষায় বসে রইলো ওরা।

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়। সুবাক দুর্গ আইয়ুবীর পদানত হয়েছিল ডিসেম্বরে। শহর এখনো অশান্ত। কিছু কিছু খৃষ্টান পরিবার এখনো পালানোর চেষ্টা করছে।

এতোদিন মুসলমানরা ওদের জন্য শান্তিতে থাকতে পারেনি। শহর ছেড়ে পালিয়ে

গিয়েছিল অনেক পরিবার। সুবাকের মাটি লাল হয়ে উঠেছিল মুসলমানদের রক্তে। শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লুণ্ঠিত হয়েছিল তাদের ঘরবাড়ী।

মুসলমানরা সুবাক দখল করে নিয়েছে। অত্যাচারিত মুসলমানদের প্রতিশোধের ভয়ে পালাচ্ছে এখন খৃষ্টানরা। সুলতান ঘোষণা করলেন, 'কোন খৃষ্টান পরিবারকে পালাতে হবে না। নিশ্চিন্তে ওরা নিজেদের বাড়ীতে থাকতে পারবে। ওদেরকে কেউ উত্যক্ত করবে না।'

তিনি পলায়নপর খৃষ্টানদের বাঁধা দেয়ার জন্য মুসলিম সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে সৈন্যরা তৎপর হয়ে উঠলো।

ওরা কাউকে পালিয়ে যেতে দিচ্ছে না। যারা পালিয়ে গেছে তাদের খুঁজে আনছে মরুভূমি আর উপত্যকা থেকে। ওদের ছেড়ে যাওয়া বাড়ী ঘর ওদের বুঝিয়ে দিয়ে বলছে, 'তোমাদের কোন ভয় নেই। মুসলমানরা তোমাদের ওপর কোন প্রতিশোধ নেবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত, স্বাধীন।'

খৃষ্টানরা তবুও ভয় পাচ্ছিল। মুসলমানদেরকে ওরা শান্তিতে থাকতে দেয়নি। প্রায় দু'হাজার মুসলমান এখনো বেগার ক্যাম্পে মানবেতর কাল কাটাচ্ছে।

সুবাক দখল করে সুলতান আইয়ুবী প্রথমেই গিয়েছিলেন বেগার ক্যাম্পে। দু'হাজার বন্দী যেন মৃত লাশ। ওদের পশুর মতো খাটানো হয়েছে। শহরের নোংরা আবর্জনা বহন করেছে ওরা। অনেকে এসেছে যৌবনে। এখন বৃদ্ধ। ভুলে গেছে ওরাও স্বাধীন মানুষ ছিল এককালে।

খৃষ্টানদের সাথে প্রথম যুদ্ধে যেসব মুসলমান বন্দী হয়েছে তাদেরকে যেমন এখানে রাখা হয়েছে, তেমনি শহর থেকে জোর করে ধরে আনা বন্দীদেরও এখানেই রাখা হয়েছে।

তবে কাফেলা থেকে অপহরণ করে আনা বন্দীর সংখ্যাই এখানে বেশী। এদের কেউ ছিল ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, কেউ সুন্দরী যুবতী। খৃষ্টানরা ওদের ধন সম্পদ কেড়ে নিয়েছে এবং যুবতী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে। এদের একমাত্র অপরাধ, এরা মুসলমান।

খৃষ্টানদের ভয়ে শহরের মুসলমানরা সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতো। ওরা নামাজ পড়তো গোপনে, কোরআন তেলাওয়াত করতো অনুচ্চ স্বরে। মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে যেতে দিত না। কোন মুসলিম পরিবারের সুন্দরী মেয়ে ওদের চোখে পড়লে রক্ষে নেই। যে কোন বাহানায় তুলে নিয়ে যাবে।

সম্ভ্রান্ত মুসলমানদেরও একজন সাধারণ খৃষ্টানকে ঝুঁকে কুর্নিশ করতে হতো। এসব অত্যাচারের কথা মনে ছিল বলেই এখন প্রতিশোধের আশঙ্কায় খৃষ্টানরা সপরিবারে পালিয়ে যাচ্ছিল।

বেগার ক্যাম্পের দু'হাজার জীবন্ত লাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন সুলতান। তার চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু। এক সময় আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, 'এদের মুক্ত করার বিনিময়ে আমি সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ছেড়ে দিতে পারি।'

তিনি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, 'এরা এখানেই থাকবে। তোমরা এদের থাকা

খাওয়া এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করো। এরা আগে সুস্থ হোক, তারপর সিদ্ধান্ত নেবো এদের কি করা যায়।'

সুলতানের যুদ্ধপলিসির কাছে খৃষ্টানরা হেরে গেছে। বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে মুসলমানদের কমান্ডো হামলা ওদের অতিষ্ঠ করে তুলছে। বিপদে পড়ে পেছনে সরে যাচ্ছে ওরা।

সুলতান আশংকা করলেন ক্রাক দুর্গ থেকে খৃষ্টান সেনাবাহিনী ওদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। ওদের বাঁধা দেয়ার জন্য সুলতানের কাছে পর্যাপ্ত সৈন্য নেই। এ মুহূর্তে মিশর থেকেও সৈন্য আনা সম্ভব নয়। ফাতেমী খেলাফতের পতনের পর মিশর হয়ে পড়েছে ষড়যন্ত্রের লীলাভূমি। গাদ্দাররা যে কোন সময় প্রশাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

এ পর্যন্ত গাদ্দারী আর ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তিনি যাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, তাদের অধিকাংশই মুসলমান, এ জন্য সুলতানের হৃদয় ছিল বেদনাভারে জর্জরিত।

সুবাক কেল্লার পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুলতান আইয়ুবী, সাথে সামরিক বেসামরিক উপদেষ্টাবৃন্দ।

শহরের মুসলিম অধিবাসীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে ছিল শহীদদের বহনকারী উটের সারি। সুলতান গভীর চিন্তায় ডুবেছিলেন।

আনন্দ মিছিল থেকে ভেসে এলো শানাইয়ের সুর ঝংকার। উল্লসিত জনতা পাঁচিলের পাশে এসে থামলো। সেদিকে তাকিয়ে রইলেন আইয়ুবী।

তার নির্বাক ঠোঁটে কোন হাসি নেই। তিনি দেখছিলেন মুসলমানদের উচ্ছসিত আনন্দ। ওরা নাচছে পাগলের মতো। মিছিল থেকে কেউ কেউ চিৎকার দিয়ে বলছে, 'নাজমুদ্দিনের ছেলে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, সুবাকে তোমাকে স্বাগতম। তুমি এক মুক্তিদূত। তুমি সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান।'

মিছিল থেকে শ্লোগান উঠলো, 'কুর্দের কৃতি সন্তান আইয়ুবী আমরা তোমায় সিজদা করি।'

জেগে উঠলো আইয়ুবীর ঈমানী চেতনা। দরাজ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমায় গুনাহগার করো না বন্ধুরা। আমি আল্লাহর এক নগন্য গোলামমাত্র। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা বৈধ নয়।'

কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিল বলে মনে হলো না। তারা আগের মতোই লাফাচ্ছে, শ্লোগান দিচ্ছে।

একজন সেনা অফিসারকে ডেকে তিনি বললেন, 'ওদের এসব বলতে নিষেধ করো। বলবে, এসব শ্লোগানে সুলতান রাগ করেন।'

সেনা অফিসার হাঁটা দিতেই আবার তাকে ডেকে বললেন, 'শোন, ওদের ধমকের সুরে নয়, শান্তভাবে বলবে। ওরা যেন মনে ব্যথা না পায়। ওদের নাচতে দাও, গাইতে দাও। ওরা জুলুমের জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছে সে জন্য আমিও খুশী। আমার জীবন এই মজলুম মানুষগুলোর জন্যই। কিন্তু আমার নামে শ্লোগান দেয়ার দরকার নেই।

বিশেষ করে আমাকে সিজদা করার মতো নাজায়েয কথা যেন কেউ না বলে।'

তিনি আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো তার কণ্ঠ। তিনি আর কিছুই বলতে পারলেন না। আবেগে চোখে এসে জমা হলো অশ্রুরাশি। উদগত অশ্রু আড়াল করার জন্য তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

একটু পর সবার দিকে নজর বুলিয়ে বললেন, 'আমরা এখন ফিলিস্তিনের আঙ্গিনায় পা রেখেছি। মঞ্জিল এখনো অনেক দূরে। এ মরুভূমি রোম উপসাগর ঘুরে সেখান থেকে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে, আমাদের যেতে হবে সেখান পর্যন্ত। শত্রুদের ক্রুশ ডুবিয়ে দিতে হবে রোম উপসাগরের অথৈ জলে।'

সুলতান শহর-প্রধানকে বললেন, 'প্রতিটি অলিগলিতে ঘোষণা করে দাও, 'কোন অমুসলমানের প্রাণ-ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার দরকার হবে না। কেউ তাদের উত্যক্ত করবে না। যদি কোন নাগরিক কাউকে বিরক্ত করে সরাসরি দুর্গের ফটকে এসে অভিযোগ করবে। প্রশাসন প্রতিটি নাগরিকের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করবে।

আমি আবারও বলছি, আমরা কাউকে কষ্ট দিতে আসিনি। আসিনি কারও বিপদের কারণ হতে। আমরা এসেছি স্নেহ ও ভালবাসার বারতা নিয়ে। ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতার বিচার ইসলামী আইনেই করা হবে। এ আইন মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য সমান।

শহরে যদি খৃষ্টানদের কোন গুপ্তচর লুকিয়ে থেকে থাকে আশ্রয়দাতাসহ তাকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়ার জন্য আমি জনসাধারণের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।'

উপদেষ্টাদের নিয়ে পাঁচিল থেকে নেমে এলেন সুলতান। প্রথমেই গোয়েন্দাদের সদর দপ্তরে তল্লাশী নেয়া হলো। কোন কাগজপত্র পাওয়া গেলো না। খৃষ্টানদের গোয়েন্দা প্রধান হরমুন এবং তার সঙ্গীরা পালিয়ে গেছে।

আটজন তরুণী গোয়েন্দা পালাতে পারেনি। তাদেরকে আলী বিন সুফিয়ানের হাতে তুলে দেয়া হলো। জবানবন্দীতে ওরা বললো, 'মেয়েদের সবাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পালিয়েছে। কোন পুরুষ ওদের সহযোগিতা করেনি।' ওরা আরো জানালো, 'সিনথিয়া নামে আমাদের এক সঙ্গিনী ছিল। একজন মুসলমান সৈন্যকে পালাতে সাহায্য করে সে নিজে আত্মহত্যা করেছে।'

আলী ওদের নিরাপদ স্থানে আটকে রাখলেন।

নিরাপত্তা এবং শান্তি রক্ষার জন্য সুলতানের নির্দেশে তৎপর হলো সুবাকের প্রশাসন।

ক্রাকের খৃষ্টান শিবিরে চলছিল সুবাক আক্রমণের পরিকল্পনা। কিন্তু আইয়ুবীর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে তা নিশ্চিত না হয়ে চটজলদি কিছু করে বসার বোকামী করতে আর রাজী নয়, তাই ওদের তৈরী হতে দেরী হচ্ছিল।

বিশেষ করে সুবাকের বিপর্যয় তাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে। যেখানে গোয়েন্দাদের কাছ থেকে তারা নিশ্চিত রিপোর্ট পেয়েছিল সুলতান আইয়ুবী ক্রাক আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কায়রোসহ অন্যান্য এলাকার গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকেও একই রকম তথ্যই পাওয়া যাচ্ছিল, তারা এ খবরও পেয়েছিল যে আইয়ুবীর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী ক্রাকের দিকে যাত্রা করেছে এবং তারা দ্রুত এগিয়ে আসছে। ফলে আইয়ুবীর উদ্দেশ্য

ছিল তাদের কাছে স্পষ্ট। এ জন্য পথেই মুসলিম বাহিনীকে বাঁধা দেয়ার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু এ সবই যে ছিল সুলতানের সাজানো খেলা, বিস্ময়কর যুদ্ধ চাল, তা কে জানতো।

শেষ মুহূর্তে দেখা গেলো সুলতান ক্রাককে আক্রমণ না করে সুবাকে হামলা করলেন। মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযান রোধ করার জন্য যাদের পাঠানো হয়েছিল, পথে ওঁৎ পেতে থাকা সেই সব খৃস্টান সৈন্যরা অযাচিত কমাণ্ডো হামলার শিকার হলো। অথচ যুদ্ধের সমুদয় প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল গোয়েন্দাদের নিশ্চিত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই।

ক্রাকের খৃস্টান শিবিরে কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। কয়েকজন সম্রাট এবং সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা এতে শরীক হয়েছেন। অপরাধীর বেশে এসেছেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন। আলেমরূপী গোয়েন্দা ডিউককে আনা হয়েছে হাতে হাতকড়া পরিয়ে। তার ভুল তথ্যের কারণে খৃস্টান সৈন্যরা পরাজিত হয়েছে, হাতছাড়া হয়েছে সুবাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ।

এ তথ্য কিভাবে পেয়েছে ডিউক আবার কনফারেন্সে তা শুনালো। সব শেষে বললো, 'আমার দেয়া তথ্যে সন্দেহ হলে আপনারা সে অনুযায়ী কাজ করলেন কেন? গোয়েন্দা সংস্থা এ নিয়ে কেন যাচাই বাছাই করেনি?'

হরমুনকে প্রশ্ন করা হলো, 'গোয়েন্দাবৃত্তিতে অভিজ্ঞ হওয়ার পরও কিভাবে আপনি এ ভুল করলেন?'

হরমুন বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার অনেক কিছু বলার আছে। অবশ্যই আমি গুপ্তচরবৃত্তি এবং গোয়েন্দা কাজে অভিজ্ঞ। এরপরও কোন কোন ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা এবং পরিশ্রমকে ওভারলুক করা হয়েছে। আমাদের পরাজয় আমার একার ভুলে হয়েছে এ কথা বলার কোন অবকাশ নেই। সত্য প্রকাশের খাতিরে আমাকে কিছু তিক্ত কথা বলতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত।

আমি সেই সব সেনাপতি ও শাসকদের হুকুমের সামনে অসহায় ছিলাম, যারা আমার পরামর্শের তোয়াক্কা না করে আমার যোগ্যতাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এখানে তিনজন সম্রাট এবং সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। কেন আমরা পরাজিত, সুবাক হাত ছাড়া হলো কেন, এক বিশাল এলাকা কেন আমাদেরকে হারাতে হলো, এক্ষেত্রে আমাদের ভুলগুলো কি ছিল তা কনফারেন্সে তুলে ধরা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি।

যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ের সাথে বলতে চাই, আমরা সবাই ক্রুশ হাতে নিয়ে শপথ করেছিলাম। শপথ করেছিলাম ক্রুশের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেবো। ব্যক্তিগত মর্যাদা নয়, ক্রুশের মর্যাদা বৃদ্ধিই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু আমরা অনেকেই আমাদের শপথের মর্যাদা রক্ষা করতে পারিনি।'

কোনার্ড, গে অব লুজিনাম এবং শাহ অগাস্টাসের মতো আত্মম্ভর সম্রাটরাও হরমুনের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে বলার সাহস পেতেন না। গোয়েন্দা জগতে তার ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতা। যে কোন শাসককেই তিনি গুপ্তভাবে হত্যা করতে পারতেন।

কনফারেন্সের পিনপতন নীরবতার মাঝে হরমুন প্রশ্ন করলেন, 'বুঝতে পারছি না শত্রুর গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য মেয়েদের ব্যবহার করা হচ্ছে কেন?'

'কারণ নারী হচ্ছে মানুষের সবচে বড় দুর্বলতা।' কোনার্ড বললেন, 'মানুষের চরিত্র নষ্ট করার জন্য নারীর বিকল্প নেই। হোক সে রক্ত মাংসের মানুষ বা সাহিত্যের মোড়কে নারীর শারীরিক বর্ণনা। তুমি কি অস্বীকার করতে পারো হরমুন, নারীদের দিয়েই আমরা আরবের অনেক আমীর ওমরাকে আমাদের গোলামে পরিণত করেছি?'

'না অস্বীকার করি না। কিন্তু এখন মুসলিম শাসন আমীর ওমরাদের হাতে নয়, সেনাবাহিনীর হাতে। মিশরের শাসক একজন গভর্ণর হয়েও খলিফাকে বরখাস্ত করেছেন। নূরুদ্দিন জঙ্গী একজন সেনাপতি এবং মন্ত্রী। তিনিও কেন্দ্রীয় নির্দেশের তোয়াক্কা করেন না।

এ জন্য ক'জন আমীর ওমরাকে হাত করলে বড়জোর ক'জন গাদ্দার বৃদ্ধি পাবে। ওরা দেশের এক ইঞ্চি মাটিও আপনাদের দিতে পারবে না।

এখন সেনাবাহিনীর হাতেই সর্বময় ক্ষমতা। আইয়ুবী জঙ্গী সৈন্যদেরকে এমন ট্রেনিং দিচ্ছে, নারীদের দিয়ে আপনারা ওদের নৈতিক স্খলন ঘটাতে পারছেন না এবং পারেননি। ইসলাম মদ হারাম করেছে। ফলে সৈন্যদের জন্য মদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই কেউ বিবেকশূন্য হয় না। আইয়ুবী মদে অভ্যস্ত হলে বিজয়ী হয়ে নয়, সুবাক আসতো বন্দী হয়ে।'

'হরমুন,' বিরক্তি প্রকাশ করলেন এক সেনাপতি, 'তোমার কথা মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখো। মুসলমানের প্রশংসা শোনার জন্য আমরা এখানে আসিনি।'

'আমি বলতে চাই, গুপ্তচরবৃত্তিতে মেয়েদের ব্যবহার করে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। গত দু'বছরে মিশর পাঠিয়ে আমরা অনেক মুল্যবান মেয়ে হারিয়েছি। মনে রাখতে হবে, মেয়েরা সাধারণভাবেই আবেগপ্রবণ। যত ট্রেনিং-ই দেয়া হোক, ওরা পুরুষের মতো কঠিন হতে পারে না।

আমরা ওদেরকে ঝুঁকিপুর্ণ কাজে ব্যবহার করি। কখনো অবস্থা পাল্টে যায়। যুবতীদেরকে ভোগ না করে বরং নিরাপদ আশ্রয় দান করে মুসলমানরা। এর ফলে মেয়েদের ভেতর প্রচণ্ড আবেগ জন্ম নেয়। ওদের চারিত্রিক দৃঢ়তায় অভিভূত হয়ে অনেকেই তাদের ভক্ত হয়ে যায়।

কিছুদিন পূর্বে সালাহউদ্দীনের এক কমাণ্ডার আমাদের একটা মেয়েকে দস্যুর কবল থেকে মুক্ত করে নিজে আহত হয়ে পড়ে। মেয়েটা কমাণ্ডারকে সুবাক নিয়ে এসেছিল। আমরা তাকে বেগার ক্যাম্পে স্থানান্তর করেছিলাম। মেয়েটা আমাদের এক অফিসারের উর্দি পরিয়ে তাকে দুর্গ থেকে পালাতে সাহায্য করেছে। হোস্টেলে ফিরে নিজে বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে।

মৃত্যুর সময় আমি ওর পাশে ছিলাম। আমাদের শাস্তির ভয়ে ও আত্মহত্যা করেনি। প্রতারণার জালে আটকে গিয়ে নিজের দেহ ব্যবহার করেছে, এ অনুভূতি ওকে বিষপানে বাধ্য করেছে।

এ প্রসঙ্গে আমি আরো দু'একটা উপমা দিচ্ছি। আমাদের বেশীর ভাগ গোয়েন্দা

মেয়েকে শৈশবে কোন মুসলিম কাফেলা বা মুসলমানদের বাড়ী থেকে অপহরণ করে এনেছি। পরে ওদেরকে আমাদের ধর্মের রঙে রাঙিয়ে ট্রেনিং দিয়েছি। যৌবনে এসে মেয়েরা ভুলে গেছে তাদের অতীত, তাদের মৌলিক অস্তিত্ব। ওরা জানে না, ওরা মুসলিম ঘরের সন্তান। আমরা ওদের নাম, ধর্ম এবং কর্ম বদলে দিয়েছি, কিন্তু ওদের রক্ত পরিবর্তন করতে পারিনি।

আমি মানুষের সাইকোলজি বুঝি। মুসলমানের মানসিকতা অন্য সব ধর্মের অনুসারীদের মানসিকতারচে ভিন্ন। এসব মেয়েরা কোন মুসলমানের হাতে পড়লে অস্তিত্বে নতুন অনুভূতির জন্ম নেয়। সে তখন ভাবে, আমার দেহেও বইছে মুসলিম পিতার রক্ত। মুসলিম রক্ত থেকে ইসলামকে কোন ভাবেই আলাদা করা যায় না।'

'তাহলে কি তুমি কোন মেয়েকে গোয়েন্দা কাজে পাঠাতে চাচ্ছো না?' এক সেনাপতি প্রশ্ন করলেন।

'না, কারণ সে সব মেয়ের দেহে মুসলিম রক্ত বইছে। আমার সংস্থা থেকে মেয়েদের বাদ দিলেই বরং ক্রুশের জন্য ভাল হবে। আপনারা মুসলমান আমীর ওমরাদের হারেমে মেয়েদের পাঠিয়ে সহজেই ওদের শিকার করতে পারছেন। কারণ ওরা যুদ্ধের ময়দান দেখেনি। আমাদের তরবারীর সাথে ওদের তরবারীর সংঘর্ষ হয়নি। শুধু সৈন্যরাই আমাদের চেনে। সেনাবাহিনীই কেবল দুশমন এবং বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এ জন্য ওরা আমাদের প্রতারণার ফাঁদে পা দেয় না।'

সম্রাট অগাস্টাস ছিলেন জটিল ও কুটিল মনের অধিকারী। মুসলমানদের বিরোধিতায় অন্যদের তুলনায় এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন তিনি। বললেন, 'তোমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হরমুন। তুমি দেখছো নূরুদ্দিন জঙ্গী এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম। আমরা এ ধর্মটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই। এ জন্য প্রয়োজন ওদের নৈতিকস্খলন।

ওদের চিন্তা চেতনায় সন্দেহ সৃষ্টি করতে হবে। মুসলমানদেরকে এক আকর্ষণীয় সংস্কৃতির জালে আটকে ফেলতে হবে। আমরা বেঁচে থাকতেই এ উদ্দেশ্য পূরণ হতে হবে এমন কোন কথা নেই। পরবর্তী প্রজন্মের হাতে দিয়ে যাবো আমাদের দায়িত্ব। এরপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের নাম নিশানাও থাকবে না। থাকলেও সে ধর্ম থেকে জন্ম নেবে না কোন নূরুদ্দিন জঙ্গী বা সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি, ধর্ম হবে মুসলমানের নিজস্ব, কিন্তু তার দেহে থাকবে আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পোশাক। আমাদের চিন্তা চেতনায় রঙ্গীন হবে ওই ধর্ম।

হরমুন, দৃষ্টিকে প্রসারিত করো।'আজ থেকে শত বর্ষ পরের ছবি কল্পনা করো। সামরিক যুদ্ধের জয়-পরাজয় ক্ষণস্থায়ী। আবার আমরা সুবাক জয় করতে পারবো। মিশরে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দাও। ফাতেমী, সুদানী এবং কাফ্রীদের সাহায্য করো। ব্যবহার করো গুপ্ত ঘাতকদের। বিজয়ী আমরাই হবো। ওদের সভ্যতা সংস্কৃতি, ওদের চিন্তা চেতনা এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব হবে আমাদের।'

কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করলো এক খৃষ্টান অফিসার। ধুলোমলিন চেহারা। আইয়ুবীকে পথে বাঁধা দেয়ার জন্য পাঠানো একটা দলের কমাণ্ডার। এরা মুসলিম কমাণ্ডো

বাহিনীর চাপে ক্রাকের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিল।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কমান্ডার বললো, 'আমাদের সৈন্যদের অবস্থা ভাল নয়। এ পরিস্থিতিতে আমি একটা প্রস্তাব পেশ করতে চাই।'

'কি তোমার প্রস্তাব?' কোনার্ড বললেন।

'ক্রাকে অবস্থানকারী সৈন্যদের সাথে আরো কিছু সৈন্য যোগ করে এ মুহূর্তে সুবাক আক্রমণ করা উচিত। এতে মুসলমানরা সামনাসামনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে। কেন্দ্রের নির্দেশে আমাদের ফৌজ ক্রাকের দিকে পিছিয়ে আসছে। মুসলমানদের কমান্ডো বাহিনী রাতে আচম্বিত আক্রমণ করে পালিয়ে যায়। তীরন্দাজ গ্রুপ হঠাৎ করেই তীর বর্ষণ শুরু করে। ওদের টার্গেট আমাদের ঘোড়া এবং উট। আহত পশুগুলো বেসামাল হয়ে দিকবিদিক ছুটতে থাকে। আমরা জওয়াবী হামলা করতে যাবো, ততোক্ষণে ওরা হাওয়া হয়ে গেছে।'

অফিসার বললো, 'ওরা সামনাসামনি যুদ্ধ করছে না। ওদের পছন্দের স্থানে নিয়ে ওরা আমাদের অনেক সৈন্য হত্যা করেছে। সাহস হারিয়ে ফেলছে আমাদের সৈন্যরা। এভাবে আর কতদিন চলবে? এজন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে, সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে আমরা ওদেরকে মুখোমুখী যুদ্ধ করতে বাধ্য করবো।'

এ বিষয়ের ওপর আলোচনা শুরু হলো। এ মুহূর্তে আক্রমণ করার জন্য ওদের সামনে বড় সমস্যা হলো, লড়াকু সৈনিকের বেশীর ভাগই বিস্তৃত মরুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ভীষণ বিপদে আছে ওরা। মুসলিম ফৌজ দিনে লুকিয়ে থেকে রাতে গেরিলা আক্রমণ করছে। সুবাকের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পাঠানো খৃষ্টান ফৌজের কোন কাজ ছিল না। আবার নুরুদ্দিন জঙ্গীর আক্রমণের ভয়ে ওদের আনাও যাচ্ছে না।

অন্যদিকে নগণ্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সুবাকে অবস্থান করছিলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। তিনি জানেন, খৃষ্টানদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু বিভিন্ন তৎপরতার মাধ্যম তিনি খৃষ্টানদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। যার ফলে খৃষ্টান বাহিনী প্রতি-আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিতে সাহস পায়নি।

খৃষ্টানদের পরিকল্পনা জানার জন্য ক্রাকে অনেক গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন সুলতান আইয়ুবী। খৃষ্টানদের ছদ্মবেশে ওরা ক্রাকে প্রবেশ করেছিল। তিনি গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সমগ্র মরুভূমিতে। ওরা সুলতানকে নিয়মিত যুদ্ধের সংবাদ সরবরাহ করছিল। সুবাকের আশপাশের এলাকা থেকে নতুন সৈন্য ভর্তি শুরু করে দুর্গেই ওদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলেন সুলতান। ওদের দেয়া হলো খৃষ্টান বাহিনীর ফেলে যাওয়া উট, ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র।

মরুভূমিতে যুদ্ধরত সৈন্যদের তিনি নির্দেশ পাঠালেন, 'পশুগুলো না মেরে দুর্গে পাঠিয়ে দিও।'

ক্রাকের কনফারেন্সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মেয়েদের ব্যবহার না করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলো। ছেড়ে দেয়া হলো আলেম গোয়েন্দা ডিউককে। তাকে বলা হলো, 'মুসলমানদের সংস্কৃতি এবং চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করো।'

হরমুনকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'সুবাকে এখন কতজন গোয়েন্দা রয়েছে?'

জবাবে হরমুন বললেন, 'কয়েকজন মেয়ে এবং পুরুষ মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছে। পুরুষদের বেশীর ভাগই সুবাক রয়ে গেছে। কয়েকজন গোয়েন্দা পালিয়ে এসেছে। গুটি কতক মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। মুসলমানদের ছদ্মবেশে কাজ করার জন্য আমি পুরুষ গোয়েন্দাদের খবর পাঠিয়েছি।'

কোনার্ড বললেন, 'বন্দী মেয়েদের হয়তো মুক্ত করা যাবে না। তবে খৃষ্টানদের ঘরে যে সব মেয়ে আত্মগোপন করে আছে তাদেরকে বের করে আনা উচিত।'

সিদ্ধান্ত হলো, সুলতান আইয়ুবীর কমান্ডো বাহিনীর মতো বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী আত্মত্যাগী একটা গ্রুপ তৈরী করে সুবাক পাঠাতে হবে। ওরা বলবে, 'ক্রাকের খৃষ্টান নির্যাতনের কারণে আমরা পালাতে বাধ্য হয়েছি।' ওদের কাজ হবে গোয়েন্দা মেয়েদের খুঁজে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়া।

সুলতান আইয়ুবীর ফৌজ বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। কেউবা পথ ভুলে পাহাড়ের ফাঁকে ক্ষুৎপিপাসায় মৃত্যু বরণ করছিল। খৃষ্টান বাহিনী ইচ্ছে করলেই প্রতি-আক্রমণ করে সুবাক ফিরিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যাপারে মনোযোগ দিতে গিয়ে এ দিকে তারা দৃষ্টি দিতে পারেনি।

আইয়ুবীকে দুর্বল করার জন্য নূরুদ্দিন জঙ্গীর সাথে আইয়ুবীর সম্পর্ক নষ্ট করার প্রয়োজন ছিল। এ জন্য গোয়েন্দারা ছিল তৎপর। নূরুদ্দিন জঙ্গীকে বুঝানো হলো, আইয়ুবী কোন খেলাফতের তোয়াক্কা করে না। নিজেই স্বাধীন সুলতান হওয়ার জন্য রাজ্য বিস্তারে মন দিয়েছে। এ সংবাদ আইয়ুবীর পিতা নাজমুদ্দিনের কানে গেলো। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি সুবাকের পথ ধরলেন। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে একদিন তিনি সুবাক পৌঁছলেন। উদ্দেশ্য, খবরের সত্যতা যাচাই করা।

পিতাকে সুবাকে দেখে আশ্চর্য হলেন সুলতান। ভাবলেন, সুবাক বিজয় করায় তিনি ধন্যবাদ দিতে এসেছেন। মোসাফেহা করে তার হাতে চুমো খেলেন।

মুখ খুললেন নাজমুদ্দিন আইয়ুব। 'আমার মতো এক অখ্যাত ব্যক্তির সন্তানকে মিশরের গভর্ণর করে জঙ্গী কি ভুল করেছেন? নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমার ছেলে জঙ্গীর শত্রু হয়ে গেছে, এ কথাও আমাকে শুনতে হলো! যাও, গিয়ে নূরুদ্দিন জঙ্গীর কাছে ক্ষমা চাও।'

সুলতান পিতাকে বুঝালেন। বললেন, 'আমি মাননীয় জঙ্গীর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে চেয়েছি।'

তিনি নূরুদ্দিন জঙ্গীর কাছে চিঠি লিখে ইসা আল হুকারীর হাতে দিয়ে পিতার সাথে রওনা করিয়ে দিলেন। সাথে সুবাকের কিছু উপহার সামগ্রী। তিনি লিখলেন, 'সবচে মূল্যবান সুবাক দুর্গ আপনার পদতলে নিবেদন করছি। ইনশাল্লাহ ক'দিন পর ক্রাকের দুর্গও আপনার খেদমতে পেশ করবো। খৃষ্টান ষড়যন্ত্রের সাথে কিছু মুসলিম আমীর ওমরাও জড়িত। বিধর্মীদের চাইতে ওরাই ইসলামের বড় ক্ষতি করছে।

ইসলামের জন্য লড়াই করছে সেনাবাহিনী। মরুর বালুকারাশি শুষে নিচ্ছে ওদের তাজা রক্ত। মরুর নেকড়ে আর শকুনের আহার হচ্ছে ওদের লাশ। আপন আত্মীয় স্বজন

ছেড়ে মরুর বিশাল বিস্তারে শত্রুর পেছনে ঘুরে মরছে ওরা। ওরা ইসলামের মর্যাদা যদ্দুর বুঝতে পারে, অন্য কেউ তা পারে না।

অসামরিক আমীররা যুদ্ধের ময়দান থেকে অনেক দূরে নিরাপদে অবস্থান করে। ইসলামের জন্য, দেশের জন্য ওদের রক্ত ঝরে না। ওরা হারেমের আনন্দে ডুবে থাকে সর্বক্ষণ। ইসলামের দুশমনের সাথে হাত মিলিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।

আমি যখন ফিলিস্তিনের আঙ্গিনায় পা রেখেছি ফিলিস্তিন শত্রুমুক্ত না করে ফিরবো না ইনশাআল্লাহ। এ সময় বেসামরিক প্রশাসনের দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

প্রতিটি মসজিদে ঘোষণা করে দিতে হবে, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বাগদাদ খেলাফতের অধীন। খেলাফতের আনুগত্য প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। কিন্তু জুম্মার খোৎবায় খলিফার নাম নেয়া যাবে না। শিয়া সুন্নীর বিভেদ উসকে দেয়া হচ্ছে। এ দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।'

নূরুদ্দিন জঙ্গী সুলতান আইয়ুবীর চিঠি পেয়ে অত্যন্ত প্রীত হলেন।

খৃষ্টানদের কেন্দ্রীয় সামরিক কমাণ্ড মরুভূমিতে ছড়িয়ে থাকা সৈন্যদের কাছে সংবাদ পাঠালো মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ না করে ধীরে ধীরে ক্রাকে ফিরে আসতে। এরপর চল্লিশ সদস্যের কমাণ্ডো বাহিনী তৈরী করা হলো। ওরা মুসলমানদের ছদ্মবেশে সুবাক প্রবেশ করবে এবং মেয়েদের মুক্ত করার চেষ্টা করবে।

আইয়ুবী মিশরে নেই। তার অনুপস্থিতিতে মিশরে গোয়েন্দা তৎপরতা আরো বৃদ্ধি করার জন্য হরমুনকে নির্দেশ দেয়া হলো। গোয়েন্দারা সুদানী এবং ফাতেমীদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে মিশরে আক্রমণ করার জন্য সব রকম সাহায্য করবে।

সুবাক এবং ক্রাকের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সবটাই মরুভূমি ছিল না। কোথাও বালিয়াড়ি, কোথাও পাথুরে পর্বত, আবার কোথাও পাহাড় শ্রেণী। পথ ভুলে কেউ পাহাড়ের ফাঁকে ঢুকে পড়লে আর বেরোবার রাস্তা খুঁজে পেতো না। তাকে মরতে হতো ওখানেই। এভাবে দু'বাহিনীর সৈন্যরাই মারা যাচ্ছিল। সুবাক থেকে পালিয়ে আসা লোকজনও মরছিল এসব পাহাড়ের গোলকধাঁধায় পড়ে।

আকাশে উড়ছিল শকুনের ঝাঁক। পার্বত্য শৃগাল আর নেকড়েরা ছিঁড়ে খাচ্ছিল নিহতদের লাশ। মরুভূমির কোথাও ছিল খর্জুর বীথি এবং পানির ঝর্ণা। ক্লান্ত শ্রান্ত সৈনিকরা গভীর তৃষ্ণায় ছুটে আসতো সে সব পানির উৎসের কাছে।

আরমান হাশেমী মুসলিম বাহিনীর একজন কমাণ্ডার। নিজেকে পরিচয় দিত সিরীয় হিসেবে। তার হৃদয়ে ছিল খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা। এ ঘৃণার সাথে ছিল প্রচণ্ড প্রতিশোধ স্পৃহা।

সবাই জানত আরমান এতিম। তার আপন বলতে কেউ নেই। কিন্তু আরমানের ধারণা, সে পিতৃহীন নয়। পিতা তার সামনে মরেননি।

ও বাড়ী ছেড়েছে চৌদ্দ বছর বয়সে। থাকতো সুবাক। তার স্পষ্ট মনে আছে, তখন খৃষ্টান সৈন্যরা সুবাক দখল করে মুসলিম নিধনে মেতে উঠেছে। খৃষ্টানদের নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেই বড় হয়েছে সে। দেখেছে নিরপরাধ মুসলিম বন্দীদের। নিহত হতে

দেখেছে অসহায় মানুষ। দেখেছে মুসলমানদের সুন্দরী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। যুবকদের পাঠাচ্ছে বেগার ক্যাম্পে।

সুবাকের মুসলমানরা বলতো, "খৃষ্টান সৈন্যরা কোথাও পরাজিত হলে আমাদের ওপর তার প্রতিশোধ নেয়া শুরু করে।"

আরমানের পরিবারও নিরাপদ ছিল না। সাত আট বছর বয়েসী এক বোনের কথা মনে আছে ওর। ভীষণ সুন্দরী ছিল। মনে হতো পুতুল। পিতা এবং বড় একজন ভাই ছিল।

ছোট বোন একদিন খেলতে বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। পরে একজন মুসলমান প্রতিবেশী বলেছে, ওকে খৃষ্টান সৈন্যরা তুলে নিয়ে গেছে।

আরমানের পিতা শহর প্রধানের কাছে অভিযোগ পেশ করলেন। তিনি মুসলমান শুনে জ্বলে উঠলো শহর প্রধান। শাসক জাতির বিরুদ্ধে এতো বড় অপবাদ!

তার পিতা বাড়ী ফিরে এলেন। বড় ছেলেকে নিয়ে মহল্লার সবাইকে জানালেন ঘটনা। এক রাতে তাদের বাড়ী আক্রান্ত হলো। বড় ভাই এবং মা নিহত হলো আরমানের চোখের সামনে।

আরমান পালিয়ে একজন মুসলিম প্রতিবেশীর ঘরে আশ্রয় নিল। তার আর ঘরে ফেরা হয়নি। তাকেও মেরে ফেলতে পারে ভেবে কয়েকদিন ওখানেই লুকিয়ে রইলো সে। কয়েকদিন পর সেই প্রতিবেশী আরমানকে আরেকজন মুসলমানের হাতে তুলে দিল। লোকটি গোপনে তাকে শহর থেকে বের করে এক কাফেলার সঙ্গী করে দিল।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কাফেলা পৌঁছলো সিরিয়া। আরমান একজন আমীরের বাড়ীতে চাকরী পেয়ে গেলো।

বেঁচে থাকার তাগিদে আরমান আমীরের বাড়ীতে চাকরী করছে। ধীরে ধীরে বয়স বাড়লো তার। হৃদয়ে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। এ চাকরী ছেড়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য মন তার ছটফট করছিল।

আমীরের চাকরী ছেড়ে ও একজন সেনা কমাণ্ডারের বাড়ীতে কাজ নিল। কমাণ্ডারকে শুনালো তার অতীত কাহিনী। আবেদন জানালো সেনা ফৌজে ভর্তি হওয়ার জন্য।

ষোল বছর বয়সে কমাণ্ডার আরমানকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে দিলেন। তিন চারটে যুদ্ধে শরীক হলো ও। সুলতান আইয়ুবীর অনুরোধে নূরুদ্দিন জঙ্গী যে ফৌজ মিশর পাঠিয়েছিলেন ও ছিল তাদের সঙ্গে।

ও এখন আটাশ বছরের টগবগে তরুণ। মিশরে কাটলো দু'বছর। আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেছেন।

সুবাক দুর্গে অভিযানকারী বাহিনীর সাথে ওকেও নেয়া হলো। হৃদয়ে ওর ঝড় বইছিল। কিছুদিন পরই যুদ্ধ হবে খৃষ্টান বাহিনীর সাথে।

আরমানের কমাণ্ডো বাহিনী প্রতিপক্ষের ওপর শিকারী বাজের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তো। মুখে মুখে ছড়িয়ে পেলো তার নাম। অশ্বারোহী যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে মরুময় ঘুরে বেড়াতো আরমান। খৃষ্টান সৈন্য দেখলেই চিতাবাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তো।

তার হৃদয়ের আগুন এতে নিভলো না। একমাস পর। তার গ্রুপের চারজন মাত্র

বেঁচে আছে এখন। বাকীরা শহীদ হয়ে গেছে যুদ্ধ করে।

এক রাতে সে ওই চারজন নিয়েই পঞ্চাশ জনের একটা দলকে আক্রমণ করে বসলো। দিন ভর লুকিয়ে অনুসরণ করেছে ওদের। কিন্তু আক্রমণ করেনি। দিনের বেলা পঞ্চাশ জনকে আক্রমণ করা চারজনের পক্ষে সম্ভব নয়।

খৃষ্টান সেনা দলটি অনেক দূর এগিয়ে গেলো। রাতে থামলো ওরা। ছাউনি ফেললো বিশ্রামের জন্য। ক'জন সান্ত্রীকে পাহারায় রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

মাঝ রাতে ছাউনির মাঝ বরাবর ঘোড়া ছুটালো আরমান। ডানে বায়ে তরবারীর আঘাত করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ঘোড়ার পায়ের চাপে থেতলে গেলো ক'জন খৃষ্টান সৈন্যের দেহ। পাহারাদাররা তীর ছুঁড়লো। অন্ধকারে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো তীর।

সামনে গিয়ে সঙ্গীদের থামালো আরমান। ধীরে ধীরে পিছিয়ে এলো। একবারও ভাবলো না, শত্রু এতোক্ষণে সতর্ক হয়ে গেছে।

ছাউনির কাছে গিয়ে আবার ঘোড়া ছুটালো ওরা। সৈন্যদের দলেপিষে বেরিয়ে গেলো অন্য পাশ দিয়ে। ওরা এখন তিনজন। দু'জন শহীদ হয়েছে খৃষ্টানদের তীরের আঘাতে। আরমানের রক্তে আগুন ধরে গেলো। সঙ্গীদের বললো, 'এবার প্রতিশোধ নেবো।'

এ ছিল এক ভয়ংকর দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে আরমান আবার ফিরে এলো ছাউনির কাছে।

ততোক্ষণে জেগে উঠেছে খৃষ্টান ছাউনির সকল সৈন্য। আরমানদের ঘোড়াগুলো ক্লান্ত। আবারো ঘোড়া ছুটালো ওরা। এবার খৃষ্টান সৈন্যরা হামলে পড়লো ওদের ওপর। নিমেষে তার সঙ্গী দু'জন শহীদ হয়ে গেলো।

এখন বেঁচে আছে শুধু আরমান। তাকে ধাওয়া করছে দু'জন খৃষ্টান সৈন্য। পেছন থেকে ভেসে এলো খৃষ্টানদের সতর্কবাণী, 'থামো! পালাতে পারবে না, তুমি এখন একা।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল ও। তরবারী দিয়ে আক্রমণ করলো দুই ধাওয়াকারীকে। বর্শা দিয়ে একাই দু'জনের মোকাবিলা করলো আরমান। দীর্ঘ সময় ধরে চললো মুখোমুখি যুদ্ধ। কাফেলা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা। শেষ পর্যন্ত আরমানই বিজয়ী হলো। নিহত হলো ধাওয়াকারী দুই খৃষ্টান সৈন্য।

সুবাক পাঠানোর জন্য ওদের ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিল ও। বুঝতে পারছে না কোথায় এসেছে। ঘোড়াটা ক্লান্ত। বিশ্রাম প্রয়োজন। আরো কিছু দূর এগিয়ে এক পাহাড়ের কোলে থামলো আরমান। খৃষ্টান সৈন্যরা যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে ভেবে রাতভর জেগে রইলো।

আকাশের নক্ষত্র দেখে সুবাক এবং ক্রাক কোন দিকে নির্ধারণ করলো ও। কোন দিকে গেলে মুসলিম সৈন্যদের পাওয়া যাবে, তাও বুঝলো আরমান।

ভোরের আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়লো ও। মরুভূমিতেই ও বড় হয়েছে, সুতরাং পথ হারাবার ভয় নেই। ও এক অভিজ্ঞ কমাণ্ডো সদস্য। দূর থেকেই বিপদের গন্ধ পায়। অনেক দূরে খৃষ্টান সৈন্যদের কয়েকটা দলকে যেতে দেখলো ও। অতিরিক্ত ঘোড়া দুটো সাথে না থাকলে একাই আক্রমণ করে বসতো ওদের।

খৃষ্টান সৈন্যদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে এগিয়ে চললো আরমান। পথের বিভিন্ন স্থানে পড়ে আছে উট, ঘোড়া এবং খৃষ্টান সৈন্যদের মৃত লাশ। শিয়াল ও শকুন খাবলে নিচ্ছে লাশের মাংস। ও পথ চলছে, মাথার উপর উঠে এসেছে সূর্য। সামনে পাহাড় শ্রেণী। এখানে পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে।

পাহাড়ের ফাঁকে খৃষ্টান সৈন্যদের লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ওরা রাতে বিশ্রামের জন্য এখানে থামতে পারে।

সূর্য ডোবার পূর্বেই পার্বত্য এলাকা পেরিয়ে যেতে চাইছে ও। চোখ-কান সতর্ক। কোন টিলা থেকে যে কোন সময় ছুটে আসতে পারে শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে যাচ্ছে আরমান। সামনের পথ পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ঘুরে গেছে। এলাকাটা ভয়াবহ দুর্গম।

আচম্বিত ভেসে এলো ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ। কেউ পাশের টিলার আড়ালে লুকিয়েছে কি না দেখার জন্য দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ও টিলার ওপাশে পৌঁছলো। সামনে বেরোবার পথ নেই। স্থানটি এক বিশাল গর্তের মতো।

আরমানের বিশ কদম দূরে লম্বা জুব্বা পরে এক ব্যক্তি উপরে উঠার চেষ্টা করছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। লোকটির মাথাও ঢাকা। ওখানে আর কেউ নেই। আরমান ওকে ডাকলো। কিন্তু লোকটি পাহাড়ে উঠার চেষ্টা থামালো না। এগিয়ে গেলো আরমান।

লোকটি দ্রুত উপরে উঠার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু হঠাৎ তার ক্লান্ত হাত ফসকে গেলো। লোকটি এসে পড়লো আরমানের ঘোড়ার পায়ের কাছে।

মুখের কাপড় সরে গেলো লোকটার। আরমানের হতবাক দৃষ্টি অপলক তাকিয়ে রইলো সে চেহারার দিকে। এ-তো এক সুন্দরী যুবতী। এমন অপরূপা নারী ও জীবনে দেখেনি।

আরমান ঘোড়া থেকে নামলো। মেয়েটিকে পতন অবস্থা থেকে টেনে তুলে বসিয়ে দিল। ভীতা হরিণীর মতো কাঁপতে লাগলো মেয়েটি।

'কে তুমি?' আরমান প্রশ্ন করলো। জবাবে পানি চাইলো ও। আরমান ঘোড়ার সাথে বাঁধা মশক থেকে পানি এনে দিল। মেয়েটি ঢক ঢক করে পানি পান করলো। ক্লান্তি বা ভয়ে বন্ধ হয়ে আসছিল মেয়েটির চোখের পাতা। চোখ বন্ধ করে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লো মেয়েটি।

আরমান এগিয়ে ওর চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিল। জ্ঞান ফিরলো ওর। আরমান থলে থেকে কিছু খাবার এনে তুলে দিল মেয়েটির হাতে। খাওয়া শেষে কিছুটা স্বাভাবিক হলো মেয়েটা।

আরমান বললো, 'আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কি তোমার পরিচয়। তুমি কোথেকে এসেছো?'

'সুবাক থেকে আমার পরিবারের সাথে এসেছি।' মেয়েটির দুর্বল কণ্ঠ, 'মুসলিম সৈন্যদের আক্রমণে পরিবারের সবাই মারা গেছে। বেঁচে আছি আমি একা।'

আরমান বললো, 'তুমি ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছো কেন? তুমি যা বললে এর সবটাই মিথ্যে। আমাকে তোমার আসল পরিচয় দিচ্ছো না কেন?'

'মিথ্যা হলে হলো।' একই সাথে আতংক ও ঝাঁঝ মিশ্রিত কণ্ঠে বললো মেয়েটি। তারপর সুর সামান্য নরম করে বললো, 'আমি তোমার করুণা ভিক্ষা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্রাক পর্যন্ত পৌঁছে দাও।'

'সুবাক পর্যন্ত। আমি তোমায় সুবাক পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি, ক্রাক নয়। দেখতেই পাচ্ছো আমি মুসলমান। তোমাকে ক্রাক পৌঁছাতে গিয়ে পথে খৃস্টান সৈন্যদের হাতে মরার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

'তাহলে আমাকে একটা ঘোড়া দাও।'

'তোমাকে ঘোড়াও দিতে পারছি না, এখানে একাও ছেড়ে যেতে পারছি না। তোমাকে সুবাক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া আমার দায়িত্ব।'

'ওখানে নিয়ে আমায় কি করবে?'

'কমাণ্ডারের হাতে তুলে দেবো।'

'আমি যুবতী বলেই কি আমাকে সুবাক নিতে চাচ্ছো?'

'ভয় নেই, তুমি যে আশংকা করছো তেমন ব্যবহার কেউ তোমার সাথে করবে না।'

মেয়েটা ক্রাক যাবার জন্য জিদ করছিল। আরমান বললো, 'পথে কারো হাতে পড়লে কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছো?'

'সুবাক গেলে অবস্থা তারচে ভাল হবে এর নিশ্চয়তা কি?'

'নিশ্চয়তা হচ্ছে আমাদের সুলতানের নির্দেশ। আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুবাক থেকে কোন খৃস্টান পরিবার যেন পালিয়ে যেতে না পারে। কাউকে পালিয়ে যেতে দেখলে ফেরত পাঠাতে বলা হয়েছে। সুলতান সবার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। তাছাড়া তুমি একা ক্রাক পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।'

তরুণী ভেবেছিল মুসলিম যুবকটি হয়তো তার সম্ভ্রম নষ্ট করবে। সে সিদ্ধান্ত নিল, দেহের লোভ দেখিয়ে এর কাছ থেকে একটা ঘোড়া বাগাতে হবে। কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল ও।

'আমি ভীষণ ক্লান্ত। আপনি চাইলে আমরা রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালে সুবাকের পথ ধরতে পারি। কিন্তু এখন আমার পক্ষে সফর করা সম্ভব নয়।'

আরমান নিজেও ক্লান্ত। ঘোড়াগুলোর ওপর অনেক ধকল গেছে। মেয়েটাকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওখানেই রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল আরমান।

এর আগে মেয়েটা তাকে ভালভাবে দেখেনি। ওর কাছে মুসলিম সৈন্য মানেই এক হিংস্র পশু। তার কাছে অনুকম্পা আশা করা যায় না। কিন্তু আরমান এখানেই রাত কাটাতে রাজি হওয়ায় ও বুঝলো, ওকে হয়তো বাগানো যাবে।

মেয়েটি এবার গভীর চোখে আরমানের দিকে তাকালো। আরমানও তাকালো মেয়েটির দিকে। ভাবলো, চারদিকে যুদ্ধের দামামা বাজছে। এর মাঝে অনিন্দ্য এক সুন্দরীর একা থাকা কত বিপদজনক। এমনও হতে পারে, এ মেয়েটার জন্যই কমাণ্ডাররা পরস্পর ঝগড়া করে নিহত হয়েছে। ও রয়ে গেছে একা। সেও তো একজন মানুষ!

ও তরুণীর চোখে চোখ রাখলো। মেয়েটা তার দিকে চেয়ে আছে। দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চাইলো আরমান, কিন্তু ওর মায়াভরা চোখ দুটো যেন আরমানের দৃষ্টি আটকে

ফেলেছে। দেহে খেলে গেলো এক অপরিচিত শিহরণ। চোখ সরিয়ে নিল ও।

পরক্ষণেই আবার দৃষ্টি স্থির হলো যুবতীর চোখে। হৃদয়ে উৎকণ্ঠিত তোলপাড়। মেয়েটার ঠোঁটে ফুটে উঠলো এক টুকরো মিষ্টি হাসি।

'সম্ভবত তুমি এখনো কুমারী।' অনুচ্চ কণ্ঠে বললো আরমান।

'হ্যাঁ।' মেয়েটি চটপট জবাব দিল। 'পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। তুমি আমাকে ক্রাক পৌঁছে দিলে আমি তোমায় বিয়ে করবো।'

আরমান সচকিত হয়ে বললো, 'এরপর বলবে তোমার ধর্ম ত্যাগ করো, যা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কেন, সুবাক গিয়ে মুসলমান হয়ে আমাকে বিয়ে করতে পারো না?'

'আমাকে অবশ্যই ক্রাক যেতে হবে। আমার সাথে চলো, তোমার পৃথিবী বদলে যাবে।'

মেয়েটা আরমানকে দেহের লোভ দেখালো। কিন্তু আরমানের ভাবনাগুলো ও বুঝতে পারছিল না।

ও চোখ তুলে তাকালো মেয়েটার দিকে। ওর চেহারা, রেশম কোমল চুল, ওর দুটো মায়াবী চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো অনেকক্ষণ। এরপর মাথা নুয়ে হারিয়ে গেলো ভাবনার গভীরে। যুবতীর কোন কথাই ওর কানে যাচ্ছিল না। জোৎস্নাহীন মেঘলা রাতের আঁধারে ছেয়ে গেলো ওর চেহারা।

উঠে দাঁড়ালো ও। ঘোড়ার পালানে বাঁধা থলে থেকে খাবার বের করে এনে মেয়েটাকে দিল। নিজেও কিছু খেলো। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছিল ওদের দেহ। পাথরে মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো দু'জনই।

শেষ রাতে হঠাৎ করেই যুবতীর চোখ খুলে গেলো। দু'হাতে চোখ ডলে সামনে তাকালো। আরমান নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে ক'কদম দূরে।

টিলার মাথায় শেষ রাতের চাঁদ। মরুর স্বচ্ছ জোৎস্নায় ঘোড়ার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল মেয়েটা। পিঠে জিন বাঁধা। ঘুমানোর পূর্বে আরমান ওগুলো খুলে রাখার প্রয়োজনও বোধ করেনি।

মেয়েটা আবার আরমানের দিকে তাকালো। সহসা জেগে উঠবে বলে মনে হয় না।

খাওয়া এবং বিশ্রামের ফলে নিজেকে ঝরঝরে মনে হচ্ছে। যুবতী জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো চকচকে খঞ্জর। শক্ত করে মুঠোয় চেপে ধরলো বাট।

ঝলমলে চাঁদনী রাতে আরমানকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যুবতী দৃষ্টি ফেরালো খঞ্জরের দিকে।

আরমান ঘুমের ঘোরে কি যেন বলছে। মেয়েটা ভাবলো, হয়তো অবচেতন মনে জেগে থাকা আত্মীয়কে স্মরণ করছে ও।

মেয়েটার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো আরমানের বুকে। অনুমান করছে হৃদপিণ্ড কোথায় হতে পারে। প্রথম আঘাতের পর দ্বিতীয় আঘাত করার সময় হয়তো পাওয়া যাবে না। মরতে মরতেও সে তাকে মেরে ফেলতে পারবে।

খঞ্জরের বাটে মেয়েটার হাত আরো শক্ত হলো। ঘোড়াগুলোর দিকে চাইলো

আরেকবার। পরিকল্পনাটা মনে মনে ঝালাই করে নিল। ওর বুকে খঞ্জর মেরে ছুটে যাবে ঘোড়ার কাছে। ঘোড়ার পিঠে চেপে দ্রুত পালিয়ে যাবে।

ও সৈনিক নয়, হলে এতো কিছু ভাবতে হতো না। নির্দ্বিধায় আরমানের বুকে খঞ্জর ঢুকিয়ে দিত। তাকে হত্যা করার বড় যুক্তি হচ্ছে, সে মুসলমান এবং তার শত্রু। কিন্তু ও যতোবারই আরমানের দিকে তাকিয়ে খঞ্জরের বাট শক্ত করে ধরতো, শুরু হতো হৃদকম্পন। ও শুনতে পেতো হৃদয়ের ধুকপুক শব্দ চিৎকার করে বলছে, না, না।

ঘুমের ঘোরে আবার বিড়বিড় করলো আরমান। আগেরচে পরিষ্কার। স্বপ্নেই ও বাড়ী গেছে। ডেকেছে মাকে, বোনকে। এর পরের শব্দগুলোতে মনে হলো ওদের কেউ হত্যা করেছে এবং তাকেও খুঁজছে।

কি এক অজানা অনুভূতি মেয়েটাকে বাঁধা দিচ্ছিল। ভয়ও হতে পারে।

আনচান করতে লাগল ও। না, তাকে হত্যা করবো না, মনে মনে ভাবল। আস্তে আস্তে ঘোড়ার কাছে গিয়ে একটা ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাবো। খঞ্জর হাতে নিয়ে ও ঘোড়ার দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু পা নড়ছে না। বালিতে আটকে গেছে যেন।

দাঁড়িয়ে আরমানের দিকে চাইতেই কতগুলো প্রশ্ন এসে ওকে জড়িয়ে ধরলো। এক সুন্দরী যুবতীকে বিজন মরুতে নিঃসঙ্গ পেয়েও কি তার মনে কোন অনুভূতি সৃষ্টি হয়নি। সে একবারও ভাবল না খৃষ্টান মেয়েটা ঘুমের ঘোরেই তাকে হত্যা করতে পারে!

লোকটা ঘোড়ার জিন খোলেনি, অস্ত্রগুলোও সাবধানে রাখেনি। কেন? সে কি আমায় বিশ্বাস করে। তার অনুভূতি কি এতোই ভোতা, আমার মতো রূপসী তরুণী তার আবেগ জাগাতে পারলো না। ওর মনে হলো লোকটা তাকে ঘোড়ার চাইতে বেশী মূল্যবান মনে করেনি।

ও ধীরে ধীরে পৌঁছলো ঘোড়ার কাছে। ডেকে উঠলো একটি ঘোড়া। চমকে আরমানের দিকে চাইলো ও। ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনিতেও আরমানের ঘুম ভাঙেনি।

ও এখন তিনটে ঘোড়ার আড়ালে। একটা ঘোড়ার পিঠে উঠতে যাবে, আচম্বিত পেছন থেকে শব্দ ভেসে এল, 'কে তুমি?'

চকিতে পেছন ফিরে চাইলো ও। দু'জন সৈনিক। এক ব্যক্তি শিস কেটে বললো, 'আমাদের সৌভাগ্য।'

হাসলো দ্বিতীয় জন। ভাষায় বুঝা যাচ্ছে এরা খৃস্টান সৈন্য। একজন মেয়েটার হাত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো। মেয়েটা বললো, 'আমি খৃস্টান।'

দু'জনই ওর কথায় শব্দ করে হেসে উঠলো। বললো, 'তবে তো তোমার পুরোটাই আমাদের।'

'আগে আমার কথা শোন।' যুবতী বললো, 'আমি সুবাক থেকে পালিয়ে এসেছি। নাম আইওনা। আমি গোয়েন্দা। ক্রাক যাচ্ছি। ওই দেখো একজন মুসলমান সৈন্য ঘুমিয়ে আছে। ও আমায় আটকে রেখেছিল। ওকে ঘুমে রেখেই আমি পালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে সাহায্য করো। এ ঘোড়াগুলো সাথে নাও আর আমাকে ক্রাক পৌঁছে দাও।'

খৃস্টানদের জন্য ও কত দামী সৈন্যদের বুঝিয়ে বললো আইওনা। একজন সৈন্য ওকে বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে বললো, [illegible] বললে পৌঁছে দেবো।'

দ্বিতীয়জন একটা অশ্লীল মন্তব্য করলো। বললো, 'চাইলে তোমায় সুখের স্বর্গে পৌঁছে দেবো।' দু'জনই ঠেলে ওকে টিলার অন্যদিকে নিয়ে যেতে লাগলো।

খৃষ্টান বাহিনীর পদাতিক দুই সেপাই মুসলিম কমাণ্ডোদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করার জন্য ওরা এ পাহাড় কুচিতে ঢুকেছে। যুবতীর রূপ ওদের পশুতে পরিণত করে দিল। ও যখন দেখলো খৃষ্টানের দোহাই দিয়েও বাঁচা যাচ্ছে না, জোরে জোরে চিৎকার শুরু করলো। তার চিৎকার শুনে আরমান হয়তো জেগে উঠবে।

হলোও তাই। ঘুম ভেঙ্গে গেলো আরমানের। চিৎকার শুনেই বুঝতে পারলো মেয়েটি বিপদে পড়েছে। সে সাবধানে উঠে বসলো।

হঠাৎ একজন ভয়ার্ত কণ্ঠে সঙ্গীর নাম নিয়ে বললো, 'সাবধান।' সৈন্যটি সতর্ক হবার পূর্বেই আরমানের বর্শা তার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

দ্বিতীয় লোকটির হাতে উঠে এল তরবারী। মেয়েটা তার পাঁজরে খঞ্জর সেঁধিয়ে দিল। পরপর কয়েকটা আঘাত করে চিৎকার করে বললো, 'তোমাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। তোমরা খৃষ্টান নামের কলংক।'

খৃষ্টান সৈন্যদের দুটো লাশ পড়ে আছে। আইওনা অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো। আরমান তাকে শান্তনা দিয়ে বললো, 'কেঁদো না। এখানে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। ওদের দলের অন্যরা এসে পড়তে পারে। আমরা এখুনি সুবাকের পথ ধরবো। ওরা কি তোমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল?'

'না, আমি জেগে ছিলাম। দাঁড়িয়ে ছিলাম ঘোড়ার কাছে।'

'ঘোড়ার কাছে কেন?'

'ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তোমার সাথে যাবার ইচ্ছে ছিল না।'

'এ খঞ্জর কোথায় পেয়েছো?'

'আমার কাছেই ছিল। আগেই বের করে নিয়েছিলাম।'

'আগেই বের করেছো! কেন? ও বুঝেছি, আমি যদি জেগে উঠি তাহলে মেরে ফেলবে?'

আইওনা আরমানের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। অনেকক্ষণ পর বললো, 'আমি তোমাকে হত্যা করে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে মেরে ফেলার আগেই বলছি, এ খঞ্জর তোমাকে হত্যা করার জন্যই বের করে ছিলাম। কিন্তু পারিনি।

তোমাকে কেন মারতে পারিনি জানি না। তোমার জীবন ছিল আমার হাতের মুঠোয়। আমি ভীতু নই। এরপরও তোমাকে হত্যা করতে পারিনি। কেন, আমি বলতে পারবো না। হয়তো তুমি বলতে পারবে।'

'জীবন এবং মৃত্যু আল্লাহর হাতে। তিনিই তোমার হাত স্তব্ধ করে রেখেছিলেন, তিনিই তোমার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন, আমি তো এক উপলক্ষ মাত্র। এখন একটা ঘোড়ায় চেপে বসো। আমরা রওনা করবো।'

মেয়েটা আরমানের দিকে খঞ্জর বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'রাখো। নয়তো আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি।'

'তার প্রয়োজন নেই। বরং আমার তরবারীও তুমি নিয়ে নিতে পারো। তুমি আমাকে

হত্যা করতে পারবে না।'

উপহাস নয়, দু'জনের কণ্ঠেই ছিল দৃঢ়তা। দু'জন দুটো ঘোড়ায় চেপে তৃতীয় ঘোড়াটা সাথে নিয়ে চলতে লাগলো।

সূর্যোদয়ের আগেই ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেলো। আশপাশে কোন খৃস্টান সৈন্য দেখা যায়নি। পথে একটা মুসলিম সেনাদলের দেখা পেয়েছিল ওরা। মুসলিম সেনাদলটির কাছে গিয়ে আরমান কি যেন বলে ফিরে এসে আবার চলতে লাগলো।

এপ্রিলের উত্তপ্ত সূর্য উঠে এসেছে মাথার ওপর। মুখ মাথা ঢেকে ওরা চলা অব্যাহত রাখলো। দূরের বালুকারাশি দেখে মনে হয় এক সাগর টলটলে স্বচ্ছ পানি। বামে পাথুরে পর্বত।

দু'জন নীরবে চলছে। কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। এদিকে ওদিক ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহ ওদের বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে। একটা লাশও অক্ষত নেই। শৃগাল ও শকুন খুবলে নিয়েছে ওদের মাংস। কোন কোন লাশের শুধু হাড়গুলো পড়ে আছে।

আরমান মেয়েটাকে বললো, 'এরা তোমার জাতির সৈনিক। বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালীসহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসে যে সব সম্রাটরা মুসলিম বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করতে চাচ্ছে, এরা তাদেরই ইচ্ছের বলী।'

মেয়েটা নিশ্চুপ। বার বার তাকাচ্ছে আরমানের দিকে। মাথা ঝুঁকিয়ে কি যেন ভাবছে আবার। আরমান পাহাড়ের দিকে গতি ফেরালো। সে জানতো, ওখানে পানি এবং ছায়া দুটোই পাওয়া যাবে।

পশ্চিম আকাশে নেমে এসেছে সূর্য। ওরা পার্বত্য এলাকায় পৌঁছলো। খুঁজে বের করলো ঘেসো জমিন। আশপাশে কিছু বৃক্ষও রয়েছে। পাহাড় কেটে বয়ে চলছে স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা।

ঘোড়া থেকে নামলো ওরা। নিজেরা পানি পান করলো। ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে ছেড়ে দিল ঘেসো মাঠে।

'কে তুমি?' যুবতী প্রশ্ন করলো। 'তোমার নাম কি? কোথায় থাকো?'

'আমি মুসলমান। নাম আরমান। থাকি সিরিয়া।'

'ঘুমের ঘোরে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে?'

'মনে নেই। হয়তো স্বপ্ন দেখছিলাম। সঙ্গীরা বলে, আমি নাকি ঘুমের মধ্যে কথা বলি।'

'তোমার মা আছে, বোন আছে? সম্ভবতঃ ঘুমে তাদেরকে স্মরণ করছিলে।'

'এক সময় ছিল।' আরমানের কণ্ঠে বিষণ্ণতা। 'এখনো ওদের স্বপ্নে দেখি।'

মেয়েটা আরো অনেক কিছু জানতে চাইলো। কিন্তু জবাব না দিয়ে আরমান বললো, 'তুমি নিজের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছো। আর তোমার পরিচয় জানতে চাইবো না। তোমাকে গোয়েন্দা সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে ফিরে আসবো। নিজের ব্যাপারে সত্য বলতে চাইলে বলতে পারো। তবে তুমি খৃস্টানদের গুপ্তচর নও একথা বলো না।'

'তুমি ঠিকই ধরেছো। আমি গোয়েন্দা, নাম আইওনা।'

'তুমি কি কাজ করো তোমার পিতা মাতা জানেন?'

'আমার পিতা মাতা নেই। কোনদিন আমি ওদের চেহারাও দেখিনি। গোয়েন্দা সংস্থাই আমার মা, গোয়েন্দা প্রধান হরমুন আমার পিতা।'

মেয়েটা প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'আমার সঙ্গী একটা মেয়ে একজন মুসলমান সৈন্যকে বাঁচানোর জন্য আত্মহত্যা করেছে। আমি তখন আশ্চর্য হয়েছিলাম। একজন খৃষ্টান যুবতী এক মুসলমানের জন্য এতোবড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারে! এখন বুঝতে পারছি, এমনটি হতে পারে।

সেই মুসলমান সৈন্যটিও তোমার মতো ডাকাতের সাথে যুদ্ধ করে মেয়েটির জীবন রক্ষা করেছিল। আহত হওয়ায় মেয়েটা তাকে সুবাক নিয়ে এসেছিল। তোমার মতোই সে মেয়েটার রূপ যৌবনের প্রতি দৃষ্টিও দেয়নি। অথচ ও ছিল ভীষণ সুন্দরী। আমিও ওর মতো তোমার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে পারি।'

'আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি। আমরা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করে থাকি। আমার কেন যেন বারবার মনে হচ্ছে, আগেও তোমায় কোথাও দেখেছি। হয়তো এ আমার আবেগপ্রবণ মনের কল্পনা, হয়তোবা সত্যি।'

'দেখে থাকবে। তুমি মিশর গিয়েছো না, ওখানেই দেখেছো হয়তো।'

'মিশর আমি গিয়েছি ঠিক, কিন্তু তোমাকে আমি মিশরে দেখিনি।'

মুচকি হেসে আইওনা বললো, 'আমার ব্যাপারে তোমার কি ধারনা। আমি কি সুন্দরী নই?'

'তুমি সুন্দরী অস্বীকার করি না।' আরমানের গাঢ় কণ্ঠ, 'বুঝেছি কেন এ প্রশ্ন করেছো। ভেবে আশ্চর্য হচ্ছো, তোমার খৃষ্টান ভায়েরা তোমার সাথে যে ব্যবহার করতে চেয়েছে আমি কেন তা করিনি। এখনো হয়তো মনে করছো আমি তোমার সাথে প্রতারণা করছি। সুবাক নিয়ে তোমাকে নষ্ট করবো। তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমায় বিয়ে করবো। অথবা বিক্রি করে দেবো। তোমার এ আশংকা অমূলক। নারী, সে নিজের ধর্মেরই হোক বা অন্য ধর্মের, আমি কাউকে খারাপ চোখে দেখতে অভ্যস্ত নই।'

আরমান বলছে, 'আমার বয়স যখন চৌদ্দ, আমার এক বোনকে অপহরণ করা হয়েছিল। ওর বয়স ছিল সাত বছর। ষোল বছর পেরিয়ে গেছে। ওকে অপহরণ করেছে খৃষ্টানরা। জানিনা বেঁচে আছে, না মরে গেছে। বেঁচে থাকলেও আছে কোন আমীরের হারেমে বা হয়তো তোমার মতো গোয়েন্দাগিরী করেই ফিরছে। এ জন্য প্রতিটি মেয়েকেই আমার বোন মনে হয়। তাকে খারাপ চোখে দেখি না। সে আমার বোনও তো হতে পারে।

শুধু তোমার নিরাপত্তার জন্যই তোমাকে সুবাক নিয়ে যাচ্ছি। আমি জানি মরুভূমিতে একা ছেড়ে দিলে তোমার কি অবস্থা হবে। কারো হাতে পড়লে তোমার খৃষ্টান ভায়েরা যা করতে চেয়েছিল, তাই হতো। আমাকে রূপের ফাঁদে জড়ানোর চেষ্টা করো না। সে অনুভূতির দিক থেকে আমি মৃত। খৃষ্টানদের পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের রক্ত দিয়ে মরুর বালুকারাশি ভিজিয়েই শুধু আমি আনন্দ পাই।'

হতবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো আইওনা। চোখে মদির আবেশ। তার সাথে তো এভাবে কেউ কথা বলেনি। ওকে অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার ট্রেনিং দেয়া

হয়েছে। ও নিজে এক চমৎকার প্রতারণা।

মদ্যপ হয়ে ওর রূপের মোহে ডুবে যায় মানুষ। ও নৈতিকতা আর সতীত্ব বঞ্চিত। ট্রেনিং শেষে অন্য মেয়েদের মতো ও নিজেকে পুরুষের হৃদয়রাণী ভেবেছে।

পিতা মাতার কথা ওর মনে নেই। বাড়ী কোথায় জানে না। আরমানের আবেগপ্রবণ কথাগুলো ওর ভেতর উসকে দিল নারীত্বের অনুভূতি। ভাবনার অতলে হারিয়ে গেলো ও। ভুলে গেলো আরমানের উপস্থিতি।

চিন্তার গহীন অতল থেকে ও বললো, 'এক ভয়ংকর স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। আমাকে কোন এক বাড়ী থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। তখন বয়স কত ছিল মনে নেই।'

দু'হাতে মাথা চেপে ধরল ও। দু মুঠোয় চুল চেপে মাথা ঝাঁকুনি দিতে লাগলো। হারানো অতীত স্মরণ করার চেষ্টা করছে। শেষে বিরক্ত হয়ে বললো, 'কিছু মনে আসছে না। মদ, বিলাসিতা আর অশ্লীলতার গহীনে হারিয়ে গেছে আমার অতীত। আমার পিতা মাতা কে, কেমন ছিলেন, কখনো ভাবিনি। বাবা মায়ের প্রয়োজনই হয়নি। কোন কালে আমার ভেতর মানবিক অনুভূতি ছিল না। পুরুষ যে পিতা এবং ভাইও হতে পারে জানি না।

পুরুষ আমাকে মনে করে ভোগের সামগ্রী। আমি ওদের ব্যবহার করি। আমার রূপ যৌবন দিয়ে যাকে বশ করতে না পারি তার জন্য রয়েছে মদ এবং হাশিশ। তুমি আমার ভেতর এমন অনুভূতি সৃষ্টি করেছো, যা মা, বাবা এবং ভাই বোনের স্নেহের পিয়াসী।'

ওর অস্থিরতা বেড়ে গেলো। কথা বলতে লাগলো থেমে থেমে। শেষে একদম চুপ হয়ে গেলো। কখনো তাকাচ্ছে আরমানের দিকে। কখনো দু'হাতে ধরে মাথা ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

ও ঘুরে ফিরছিল হারানো অতীত আর বর্তমানের মাঝে। আরমান বললো, 'চলো রওনা হই।'

সহজ সরল বালিকার মতো ও ঘোড়ায় চেপে বসলো। পার্বত্য এলাকা ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেলো ওরা। তখনো ও আরমানের দিকে তাকিয়ে আছে।

একবার শুধু হেসে বললো, 'পুরুষের কথা এবং প্রতিশ্রুতি আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি। বুঝতে পারছি না কেন যেন মনে হচ্ছে তোমার সাথে যাওয়া উচিত।'

আরমান ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল শুধু।

পরদিন সূর্যোদয়ের সময় ওরা সুবাক পৌঁছলো। মরুভূমিতে কেটেছে একরাত একদিন। ফটকে পৌঁছে আরমান নিজের পরিচয় দিল। এরপর গোয়েন্দা সংস্থার অফিসে যাবার কথা বলে ওরা এগিয়ে চললো।

শহরের রাজপথ মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। পথে দু'পাশের লোকেরা আইওনাকে দেখছে।

চলতে চলতে হঠাৎ একটা বাড়ীর সামনে থেমে গেলো আরমান। বাড়ীর ফটক বন্ধ। আইওনা প্রশ্ন করলো, 'থামলে কেন?'

জবাব না দিয়ে দরজার কাছে এলো আরমান। ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই দু'তিনবার

করাঘাত করলো। একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ দরজা খুললেন।

'এখানে কে থাকে?' আরমান আরবী ভাষায় প্রশ্ন করলো।

'কেউ না। একটা খৃষ্টান পরিবার ছিল। আমাদের সেনাবাহিনী আসার পর সবাই পালিয়ে গেছে।'

'এরপর আপনি দখল করেছেন?'

ভড়কে গেলো বৃদ্ধ। একজন সৈনিক তাকে জিজ্ঞেস করছে কেন এ বাড়ী দখল করেছেন। সুলতান ঘোষণা করেছেন কোন মুসলমান যদি কোন খৃষ্টানকে কষ্ট দেয় কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। বৃদ্ধ বললো, 'এ বাড়ী আমি দখল করিনি, হেফাজত করার জন্য এসেছি। এখনি বন্ধ করে দেবো। এ বাড়ীর মালিক মুসলমান। এখনো বেঁচে আছেন। পনেরো ষোল বছর ছিলেন খৃষ্টানদের বেগার ক্যাম্পে।'

'সুলতান কি তাকে ক্যাম্প থেকে মুক্তি দেননি?'

'সবাই মুক্ত। কিন্তু এখনো তিনি ক্যাম্পেই আছেন। অসুস্থ, দুর্বল। ওখানেই সুলতান ওদের জন্য ভাল খাবার এবং ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছেন। ডাক্তার সবসময় দেখাশোনা করেন। সুস্থ হলেই তাকে নিজের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

'তা আপনি এখানে কেন?'

'ওখানে যারা আছে তাদের আত্মীয় স্বজন প্রতিদিন ওদের সাথে দেখা করে। এ বাড়ীর মালিকও ক্যাম্পেই আছেন। একে তো বৃদ্ধ, তার ওপর দীর্ঘদিনের যন্ত্রণায় বেচারা শুধু বেঁচে আছে। আমি প্রতিদিনই দেখতে যাই। আশা করি কিছু দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবেন। বাড়ীটা খালি হয়েছে আমি তাকে বলে এসেছি।'

'তার আত্মীয় স্বজনরা কোথায়?'

'কেউ বেঁচে নেই।'

বৃদ্ধ হাত তুলে বা-দিকে দেখিয়ে বললেন, 'এখান থেকে চারটা বাড়ীর পরের বাড়ীটা আমার। এরা আমার প্রতিবেশী। আত্মীয়ও বলতে পারেন।'

ঘোড়া থেকে নেমে আরমান ভেতরে গিয়ে একটা কক্ষে ঢুকলো। আইওনাও নেমে এলো ঘোড়া থেকে।

আরমানের দিকে তাকাল ও। চোখ মুছছে।

আইওনা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করায় ও বললো, 'আমার শৈশবকে খুঁজছি। একদিন এ বাড়ী থেকেই পালিয়ে গিয়েছিলাম। এ-ই আমাদের বাড়ী।'

সাথে সাথে ওর চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো অশ্রুর বন্যা।

ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা আবার উঠোনে এলো। বৃদ্ধ তখনো সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে।

আরমান কান্না ভেজা কন্ঠে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো, 'আত্মীয় স্বজন মরে গেছে। এর কোন ছেলে মেয়ে ছিল না?'

'একটা মাত্র ছেলে বেঁচে ছিল। খৃষ্টান ডাকাতদের হাত থেকে পালিয়ে উঠেছিল আমার বাড়ীতে। আমি গোপনে তাকে সিরিয়া পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে থাকলে সেও মারা যেতো।'

আরমানের মনে পড়লো সে দুঃসহ রাতের কথা। পালিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ীতে

উঠেছিল। এই সে প্রতিবেশী।

বৃদ্ধকে সে বললো না, যে বালককে আপনি সুবাক থেকে গোপনে সিরিয়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সে বালকই আপনার সাথে কথা বলছে।

উদগত কান্না রোধ করা আরমানের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো। কিন্তু ও কঠিন হৃদয় সৈনিক। বৃদ্ধকে বললো, 'আমি বাড়ীর মালিকের সাথে দেখা করবো। তার নামটা বলুন।'

বৃদ্ধ তাকে তার পিতার নাম বললো। এ নামটি তার হৃদয়ের মনি কোঠায় অতি যত্নে রক্ষিত আছে।

'ছেলেটার এক বোন ছিল।' বৃদ্ধ বললেন, 'ছোট। খৃষ্টানরা ওকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তার কারণেই এ বাড়ীর সবাই নিহত হয়েছে।'

আইওনার দিকে ফিরল আরমান।

'পবিত্র ক্রুশের পূজারীদের কাহিনী তো নিজের কানেই শুনলে।'

আইওনা এর কোন জবাব দিল না। ও ছাদের দিকে তাকাতে লাগলো। দরজার একটা পাল্লা বন্ধ করে দেখলো কি যেন। কিছু আঁকিবুকি খোদাই করা।

বসে ও মনযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। আরমান তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

আইওনা আঁকাগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো ধীরে ধীরে। হঠাৎ কি হলো, ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ও ছুটে গেলো অন্য কক্ষে। ওখানকার দরজার পাল্লায়ও কি যেন খুঁজছে।

আরমান এগিয়ে প্রশ্ন করলো, 'কি দেখছো?'

মেয়েটা মৃদু হেসে বললো, 'তোমার মতো আমিও আমার শৈশব খুঁজছি। এটাই কি তোমাদের বাড়ী ছিল? তুমি কি এখান থেকেই পালিয়েছো?'

'হ্যাঁ, এ বাড়ী থেকেই আমি পালিয়েছিলাম।'

আরমান ওকে শোনালো তার পালাবার কাহিনী। কিভাবে খৃষ্টানরা এ বাড়ীতে আক্রমণ করে তার পিতা এবং ভাইকে হত্যা করেছিল তাও বললো। বললো, 'ভেবেছিলাম আব্বাকেও ওরা মেরে ফেলেছে। কিন্তু এ বৃদ্ধ বললেন তিনি বেঁচে আছেন।'

'বৃদ্ধকে কি বলেছো, যাকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন তুমিই সেই বালক?'

'এ মুহূর্তে এ কথা বলতে চাই না।'

আইওনা গভীর চোখে আরমানকে দেখতে লাগলো। বৃদ্ধ দূর থেকে ওদেরকে আশ্চর্য হয়ে দেখছিল। আরমান আনমনা হয়ে পড়লো। বৃদ্ধ এগিয়ে গেলো ওদের কাছে। বললো, 'আমার জন্য কি হুকুম?'

চমকে বাস্তবে ফিরে এলো আরমান। নির্দেশের ভঙ্গিতে বললো, 'এ বাড়ী এখন আপনার অধিকারে, এর হেফাজত করবেন। চলো, আইওনা।'

'তোমার পিতার সাথে দেখা করবে না?' অনুচ্চ কণ্ঠে বললো আইওনা।

'আগে আপন কর্তব্য পালন করবো। মরুভূমিতে অফিসার নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছেন। এতোক্ষণে হয়তো ভেবেছেন আমি মরে গেছি। ওখানে আমার প্রয়োজন রয়েছে। আমার সাথে এসো। এ আমানত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে আমাকে ফিরে যেতে

হবে।'

'নারী, নারী, নারী।' সুলতান আইয়ুবীর উত্তেজিত কণ্ঠ। গোয়েন্দা প্রধান আলীকে বললেন, 'বদমাশ খৃষ্টানগুলো কি পেয়েছে? ওরা কি আমার সামনে নারীদেহের প্রাচীর তৈরী করতে চায়? আমার সামনে যুবতীদেরকে নাচিয়ে কি সুবাক দুর্গ ফিরিয়ে নেবে?'

'সম্মানিত আমীর।' আলী বললেন, 'মেয়েরা দেয়াল নয়, নিষিদ্ধ গন্ধম। আপনার এবং জঙ্গীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করা হয়েছে ওদের মাধ্যমে। এ নারীই মুসলিম আমীর ওমরাদের হাতে তুলে দিচ্ছে মদ আর হাশিশ। ওদের দেহের উত্তাপে গলে যাচ্ছে আমীর ওমরার দল। ব্যবহৃত হচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে।'

'এ প্রসঙ্গে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। থাক ওসব কথা। এ মেয়েগুলোর ব্যাপারে কিছু বলো। ওরা আটজনই তো গোয়েন্দা! ওদের কাছ থেকে কোন তথ্য বের করতে পারলে?'

'ওরা বলেছে সুবাকে খৃষ্টানদের অনেক গুপ্তচর এখনো কাজ করছে। কারও ঠিকানা জানা নেই। ট্রেসও করা যাচ্ছে না। এদের তিনজন ক'দিন মিশরে ছিল। কি কাজ করেছে তা তো আপনাকে বলেছি।'

'এদেরকে কোথায় রেখেছো, জেলে?'

'না, আগের জায়গায়ই আছে। তবে পাহারার ব্যবস্থা করেছি।'

প্রহরী ভেতরে এসে স্যালুট দিয়ে বললো, 'আরমান নামে একজন কমাণ্ডার একজন খৃষ্টান মেয়েকে সাথে নিয়ে এখানে এসেছেন। মেয়েটাকে পেয়েছেন ক্রাকের পথে। ও নাকি গুপ্তচর।'

'দু'জনকেই ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

আরমান এবং আইওনা ভেতরে ঢুকলো। সুলতান আরমানকে বললেন, 'মনে হয় দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছো। তুমি কার সাথে ছিলে?'

'আমি সিরিয়ার ফৌজে ছিলাম। আমার অফিসারের নাম এহতেশাম বিন মুহম্মদ। আমি কমাণ্ডো বাহিনী 'আল বারক'-এর কমাণ্ডার।'

'আল বারক এখন কি অবস্থায় আছে?'

প্রশ্ন করেই সুলতান আলীকে বললেন, 'আল বারক অর্থ বিদ্যুৎ। আসলেও ওরা বিদ্যুৎ। আমরা যখন সুদানীদের আক্রমণ করেছিলাম, তখন কমাণ্ডো হামলায় ছিল আল বারক। ওরা তুলনাহীন।'

'মাননীয় সেনাপতি। গ্রুপের সবাই আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেছে। বেঁচে আছি শুধু আমি।'

'তোমার কারণে তো এতোগুলো জীবন নষ্ট হয়নি? মৃত্যু আর উৎসর্গের মধ্যে অনেক তফাৎ।'

'না, মাননীয় সেনাপতি! আল্লাহ সাক্ষী, আমরা প্রতিটি জীবনের বিনিময়ে অন্তত বিশজনকে হত্যা করেছি। ওদের দলের দু'একজন ক্রাক পৌঁছলেও আহত অবস্থায় পৌঁছেছে। খৃষ্টানদের রক্তে ফিলিস্তিনের মাটি রঙীন হয়ে গেছে।

আমাদের দ্বিতীয় দলটিও শত্রুর জন্য ছিল আতংক। খৃষ্টানদের মধ্যে পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার ক্ষমতা নেই।'

'আর তুমি?' যুবতীর দিকে তাকিয়ে সুলতান বললেন, 'তোমার ব্যাপারে সব কথা কি আমাদের খুলে বলবে?'

'সব কিছুই বলবো।' ওড়নায় চোখ মুছে বললো আইওনা।

'আরমান।' সুলতান বললেন, 'তুমি যাও। খাওয়া গোসল সেরে বিশ্রাম করো। কাল আবার নিজের দলের কাছে ফিরে যেতে হবে।'

'শত্রুর দুটি ঘোড়া এবং অস্ত্রও নিয়ে এসেছি।'

'ঘোড়াগুলো আস্তাবলে আর তীর তরবারী অস্ত্রাগারে জমা দাও।'

একটু ভেবে সুলতান বললেন, 'ওগুলো তোমার ঘোড়ার চাইতে ভাল হলে বদলে নিও। ময়দানের ঘোড়াগুলো কি অবস্থায় আছে?'

'চিন্তার কারণ নেই। আমাদের একটা ঘোড়া নষ্ট হলে খৃষ্টানদের কাছ থেকে দুটো ঘোড়া পেয়ে যাই।'

সালাম দিয়ে বেরিয়ে গেলো আরমান। আমানত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়েছে ও। কিন্তু ওর হৃদয় এক অব্যক্ত বেদনাভারে পিষ্ট হচ্ছিল। এ ছিল আবেগের ভার। শৈশবের হারানো স্মৃতির বেদনা। পিতা পুত্রের ভালবাসার ব্যথা।

যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও পিতার সাথে দেখা করতে চাচ্ছিল না। আশংকা ছিল পিতৃস্নেহ আর অতীত বেদনা কর্তব্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ঘোড়াগুলো সাথে নিয়ে ও আস্তাবলের দিকে হাঁটা দিল। আশপাশের কোন খেয়াল নেই। ও আনমনে হাঁটছে। সামনে সুবাকের অলিগলি। ওর জন্মস্থান। এখানে ওর শৈশব কেটেছে। দুরন্ত কৈশোর পেরিয়েছে। কিন্তু তাকে দেশছাড়া করা হয়েছিল। ওর উদাস চোখ দুটো বিষণ্ণ ব্যথায় ছলছল করে উঠলো।

'পথ ছাড়ো অশ্বারোহী!'

কারো ডাকে চমকে উঠলো ও। ঘুরে পেছনে তাকালো। একদল ঘোড়সওয়ার আসছে।

ও দ্রুত রাস্তার পাশে সরে গেলো। শেষ আরোহীটি অতিক্রম করার সময় ও বললো, 'বাইরে থেকে এসেছো? ময়দানের কি খবর?'

'আল্লাহর রহমতে সব ভাল দোস্ত। প্রতিদিনই শত্রু নিঃশেষ হচ্ছে। সুবাকের জন্য কোন বিপদ নেই।'

অশ্বারোহী দল সামনে চলে গেলে ডান দিকে মোড় নিল আরমান।

'আমি আপনার সামনে কিছুই লুকাইনি।' সুলতান এবং আলীর সামনে বসে আইওনা বললো। কোন প্রশ্ন ছাড়াই ও শোনালো গোয়েন্দাবৃত্তির বিস্তারিত কাহিনী।

নির্যাতনের পরও গোয়েন্দারা যা বলে না, ও বললো তারচে বেশী। সন্দেহে পড়ে গেলেন গোয়েন্দা প্রধান।

'আইওনা!' আলী বললেন, 'আমিও তোমার বিষয়ে পারদর্শী। স্বীকার করি তুমি উঁচু

স্তরের গোয়েন্দা। আমাদের নির্যাতন এবং জেল থেকে বাঁচার জন্য তোমার পদ্ধতি প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু আমি তোমার প্রতারণার জালে পা দেবো না।'

'আপনার নাম কি?'

'আলী বিন সুফিয়ান। হরমুনের কাছে আমার নাম শুনে থাকবে।'

আইওনা দাঁড়ালো। আলীর কাছে গিয়ে বসলো হাঁটু গেড়ে। আলীর ডান হাত তুলে নিল নিজের হাতে। চুমো খেয়ে বললো, 'আপনাকে জীবিত দেখে আমি ভীষণ খুশী হয়েছি। আপনার সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু বলা হয়েছে। হরমুন বলতো, আলী মরে গেলে যুদ্ধ ছাড়াই আমরা মুসলমানদের নিঃশেষ করে দিতে পারি।'

যুবতী আবার নিজের স্থানে গিয়ে বসলো।

'কায়রোতে আমি আপনাকে দেখার অনেক চেষ্টা করেছি। দেখা হয়নি। আমার সামনেই আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা জানার আর সুযোগ হয়নি, কারণ আমাকে তখনই সুবাক ডেকে আনা হয়েছিল।'

'আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো, তুমি যা বলেছো, সত্য বলেছো?' আলী বললেন।

'আমাকে বিশ্বাস করছেন না কেন?' আইওনার কণ্ঠে ঝাঁঝ।

'কারণ তুমি খৃষ্টান।' বললেন সুলতান আইয়ুবী।

'যদি বলি আমি খৃষ্টান নই মুসলমান, তাও হয়তো বিশ্বাস করবেন না। আমার কাছে এর কোন প্রমাণ নেই। ষোল বছর পূর্বে এ শহর থেকেই আমি অপহৃত হয়েছিলাম। এখানে এসে শুনেছি আমার পিতা ক্যাম্পে আছেন।'

আইওনা পিতার নাম উল্লেখ করে বললো, 'তার নামটাও এখানে এসে জেনেছি। আমি তো বলেছি আরমানকে হত্যা করতে গিয়ে আমার হাত উঠেনি। দিনে ওর চেহারা এবং চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। কেন যেন মনে হচ্ছিল, ওকে আমি কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু মনে করতে পারছিলাম না। জিজ্ঞেস করায় ও বলেছে, এ সম্ভব নয়। দু'জন খৃষ্টান সৈন্য আমার সম্ভ্রম লুটে নেয়ার চেষ্টা করেছে, তখনো ওরাই আমার আপন।

একজনকে আরমান হত্যা করলো, অন্যজনকে আমি। ওকে মেরে আমার সম্ভ্রম রক্ষা করেছি এ জন্য নয় বরং খুশী হয়েছি আরমানের জীবন বাঁচাতে পেরেছি বলে।

পথে ওর মুখে আবেগভরা কিছু কথা শুনে এই প্রথম আমার হৃদয়ে অনুভূতি জন্ম নিল। সমস্ত পথেই আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। স্মৃতির পাতা হাতড়ে এদ্দুর মনে হয়েছে, শৈশবে কেউ আমায় অপহরণ করেছিল।

আপনি তো জানেন, মেয়েদেরকে কিভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়। মন থেকে হারিয়ে যায় শৈশবের স্মৃতি। আমারও তাই হয়েছে। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হতে লাগল, আমি আরমানকে চিনি।

এ ছিল রক্ত সম্পর্কের দাবী। চোখ চোখকে এবং হৃদয় চিনেছে হৃদয়কে। হয়তো আরমানের হৃদয়েও এমন অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। তা নয়তো আমার মতো অপরূপা যুবতীকে আমলেই আনেনি। যেন সে একা। তার সাথে কেউ নেই। আমার দিকে অনেকবারই সে গভীর চোখে তাকিয়েছে।

সুবাক এসে আরমান একটা বাড়ীতে ঢুকলো। আমিও পিছু নিলাম। ভেতরে ঢুকে

আমার স্মৃতি জেগে উঠলো। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দরজার পাল্লায় খোদাই করা আঁকিবুকি চোখে পড়লো। দেখলাম। বড় ভাইজানের খঞ্জর দিয়ে আমি নিজেই দরজার পেছনে এভাবে খোদাই করেছিলাম।

আবার আরমানের দিকে তাকালাম গভীর চোখে। দাড়ি থাকলেও ষোল বছর পূর্বের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলাম।

ওকে বলিনি, আমি তোমার হারিয়ে যাওয়া বোন। ও এতো পবিত্র আর আমি কত অপবিত্র। ওকে বলে দিলে ও কি করতো জানি না।'

মেয়েটির বলার মাঝে আলী কয়েকবারই সুলতানের দিকে তাকালেন। এখনো ও সন্দেহের উর্ধে নয়। কিন্তু উচ্ছ্বসিত আবেগ, উদগত অশ্রু এবং বেদনামাখা বর্ণনায় দু'জনই প্রভাবিত হচ্ছিল। তার ফোঁপানির শব্দে মনে হচ্ছিল, ও সত্য কথাই বলছে।

শেষ পর্যন্ত তার বলা কথা এবং তথ্যাবলী যাচাই করার জন্য মেয়েটির দেয়া প্রস্তাব দু'জনেই মেনে নিলেন।

ও বললো, 'আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, জেলে পাঠান বা যা ইচ্ছে তাই করুন, আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। আমি বেঁচে থাকতে চাই না, যদি আপনারা অনুমতি দেন, পাপের প্রায়শ্চিত্য করে মরতে চাই।'

'কি করবে?' সুলতান প্রশ্ন করলেন।

'যদি আমাকে ক্রাক পৌঁছে দেন তবে খৃষ্টানদের চারজন সম্রাট এবং গোয়েন্দা প্রধান হরমুনকে হত্যা করতে পারি।'

'আমরা তোমাকে ক্রাক পৌঁছে দিতে পারি, তবে কাউকে হত্যা করার জন্য নয়। তাহলে ইতিহাস বলবে, সুলতান আইয়ুবী মেয়েদের দিয়ে প্রতিপক্ষকে হত্যা করে নিজে দুর্গে বসেছিলেন। না মেয়ে, এ অপবাদ নিয়ে আমি মরতে চাই না।

যদি সংবাদ পাই কোন খৃষ্টান সম্রাট অসুস্থ আমি তার কাছে আমার ডাক্তার পাঠিয়ে দেবো। তাছাড়া তোমাকে আমরা বিশ্বাসও করতে পারছি না। অবশ্য তুমি যদি ইচ্ছে করো, তোমাকে ক্ষমা করে ক্রাক পাঠিয়ে দেবো।'

'না। এমন কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি এখানেই মরবো। তবে আমার অনুরোধ, আরমান যেন জানতে না পারে আমি তার বোন। আমার পিতাকে দেখতে যাবো। তাকেও বলবো না আমি তার মেয়ে।'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো আইওনা।

আলী বিন সুফিয়ান ওকে আরো কয়েকটি প্রশ্ন করে সুলতানের দিকে তাকালেন।

'ওকে এখন কি করবো?'

কিছুক্ষণ ভেবে সুলতান বললেন, 'ওর আরাম আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রেখো। ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেবো।'

আলী ওকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন।

অন্যান্য গোয়েন্দা মেয়েরা যেখানে থাকে তার একটা কক্ষ দিলেন ওকে। আইওনা সেখানে থাকতে সরাসরি অস্বীকার করে বললো, 'এ কক্ষগুলোকে আমি ঘৃণা করি। যেখান থেকে আমি অপহৃত হয়েছিলাম, সে বাড়ীতে কি আমাকে রাখা যায় না?'

'না, আবেগের কারণে আমি নিয়ম কানুন বদলে দিতে পারি না।'

প্রহরী এবং চাকরবাকরদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ওকে রেখে ফিরে গেলেন আলী।

সামরিক বিশ্রামাগারে গোসল সেরে শুয়ে পড়লো আরমান। দেহ ক্লান্ত, অবসন্ন। তবু ঘুম আসছে না তার। হৃদয়ে চলছে তোলপাড় করা অন্তর্দ্বন্দ্ব। পিতার সাথে কি দেখা করবে?

নিজের অজান্তে উঠে দাঁড়ালো ও। কক্ষ থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পের দিকে হাঁটা দিল। লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে পিতার কাছে পৌঁছলো আরমান।

কংকালসার এক বৃদ্ধ শুয়ে আছেন বিছানায়। হাড় ছাড়া দেহে কিছু নেই।

বৃদ্ধের সাথে হাত মেলালো আরমান। বড় কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলো।

নিজের পরিচয় না দিয়ে তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বললো আরমান। ষোল বছরের অমানুষিক নির্যাতনের কারণে ভাল খাবার এবং ওষুধ কোন ক্রিয়া করছে না।

দুর্বল কণ্ঠে কথা বলছিলেন বৃদ্ধ। কিন্তু আরমানের মন ছুটে গিয়েছিল ষোল বছর পূর্বের সেই হারানো অতীতে। পিতার চেহারা তো ভোলার মতো নয়!

কয়েকবারই ভাবলো পিতার কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করবে। কিন্তু এতোবড় আনন্দ তার এ দুর্বল শরীর সইতে পারবে না ভেবে নিজের পরিচয় গোপন রাখলো সে।

তাছাড়া পিতৃস্নেহ যুদ্ধের ময়দানে যাবার পথে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। আবার পিতার সাথে করমর্দন করে ও ফিরে এলো।

বিশ্রামাগারে এসে ও কেন্দ্রের নির্দেশ পেল। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই থাকতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রে কি কাজ থাকতে পারে ভেবে আশ্চর্য হলো আরমান। নির্দেশ পাঠিয়েছেন গোয়েন্দা প্রধান।

আইওনার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন তিনি। ক্যাম্পে তার পিতার কাছেও খোঁজ নেয়া হলো। তিনি বললেন, 'ষোল বছর পূর্বে তার সাত বছরের একটি মেয়ে অপহৃত হয়েছে। খৃষ্টানদের হাতে নিহত হয়েছে বড় ছেলে এবং স্ত্রী। ছোট ছেলে পালিয়ে গেছে। পরে শুনেছি, সে সুবাক থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।'

নিশুতি রাত। আইওনার ঘুম আসছে না। সে বুঝতে পেরেছে, আলী তাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। এখন তার কি হবে! কিভাবে বিশ্বাস করাবে তার বলা প্রতিটি কথাই সত্য।

একই সাথে হৃদয়ে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। আরমানের সাথে বাড়ী গিয়ে শৈশবের হারানো স্মৃতি মনের কোণে ভীড় জমিয়েছে।

অপহরণের দিনটি তার স্বপ্নের মতো মনে পড়ছে। অপহরণের পর তাকে ভাল খাবার দেয়া হয়েছে। আদর যত্নের কোন অভাব ছিল না। এরপর পাপের সমুদ্রে তাকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।

ওর ভেতরের প্রতিশোধ স্পৃহা দৃঢ় হতে লাগলো। শোয়ার পরও ও দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। পিতার সাথে দেখা করার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কক্ষ থেকে বাইরে যাবার অনুমতি নেই। মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সেন্ট্রি।

ও বিছানা থেকে উঠলো। দরজা খুলে উঁকি দিল বাইরে। প্রহরী দু'জনকে দূরে দেখা যাচ্ছে। কথা বলছে ওরা। মাথা নীচু করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো আইওনা।

আরো দূরে সরে গেলো প্রহরী। ও আলতো পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। প্রাচীরের গা ঘেঁষে এগিয়ে চললো। বড় গেট পর্যন্ত স্থানটি ঘাসে ছাওয়া। ও বসে নিঃশব্দে বিড়ালের মতো হেঁটে ফটকে পৌঁছলো।

প্রহরী এদিকে আসেনি। বেরিয়ে গেলো ও। হাঁটা দিল ক্যাম্পের দিকে। এখন আর কোন সেন্ট্রির ভয় নেই। পিতার চেহারা ওর মনে নেই। এখানে এসে শুধু নাম শুনেছে। ও দ্রুত হাঁটতে লাগলো।

কারো পদশব্দে পেছনে তাকালো। কেউ নেই। আবার হাঁটতে লাগল ও। আবার কারো পদশব্দ শুনে ও দাঁড়িয়ে পড়লো।

আচম্বিত ওর মুখ কাল কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলো কেউ। শক্ত সামর্থ দুটি বাহু তুলে নিল ওকে। হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো আইওনা। নীরব রাতের সুনসান সড়ক ধরে এগিয়ে চললো অপহরণকারীরা।

সামনে গিয়ে ওরা ওকে কম্বল দিয়ে ঢেকে বস্তার মতো কাঁধে তুলে নিল। আধ ঘন্টা চলার পর ওকে কাঁধ থেকে নামিয়ে কম্বল সরিয়ে দেয়া হলো।

একটা কক্ষে চারজন লোক বসে আছে। পাশে দুটি মাটির প্রদীপ। ও হতবাক হয়ে চারজনের দিকে তাকালো।

'তোমরা এখনো এখানে? মিঃ ডিউক আপনিও?'

'আমরা গিয়ে আবার ফিরে এসেছি।' জবাব দিল ডিউক, 'তোমাদেরকে মুক্ত করার জন্য। তোমাকে পেয়ে ভালই হলো।'

গোয়েন্দা মেয়েদেরকে মুক্ত করার জন্য ক্রাক থেকে পাঠানো হয়েছে চল্লিশজন কমাণ্ডো সদস্য। মিঃ ডিউক এদের কমাণ্ডার। বৃটেনের অধিবাসী। নাশকতামূলক কাজে অভিজ্ঞ। এদের বলা হয়েছে সুবাকে যেসব গোয়েন্দা রয়ে গেছে তাদের সংগঠিত করে নাশকতামূলক কাজ করতে।

আস্তাবলে ঢুকে ঘোড়ার খাদ্যে বিষ মিশানো, ছাউনীর খাবারে বিষ মিশানো সহ বিভিন্ন প্রকার সন্ত্রাসী কাজ করবে ওরা।

এর আগেও একবার ডিউক আইওনাদের দলপতি ছিল। ডিউকের সাথে ছিল ওর ভাল সম্পর্ক। কিন্তু এখন তাকে দেখেই ওর মনে প্রচণ্ড ঘৃণা এবং প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু সংযত হলো ও। এখন ঘৃণা প্রকাশের সময় নয়।

ডিউক ভাবতেও পারেনি আইওনার পৃথিবী বদলে গেছে। ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছিলে?'

আইওনা বললো, 'সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এসেছি। আপনারা কি কিছু করতে পারলেন?'

'আমরা চল্লিশজন কমাণ্ডো গোয়েন্দা নির্যাতীত মুসলমানের ছদ্মবেশে সুবাক এসেছি। বিচ্ছিন্ন গোয়েন্দাদের অনেককেই একত্রিত করেছি।

তোমরা যেখানে থাকো দু'রাত থেকে সে বাড়ীতে নজর রাখা হচ্ছে। প্রহরীদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য আজও দু'জন গিয়েছিল। অযাচিতভাবেই তোমাকে পেয়ে গেছি। এবার বলতো, বাকীদেরকে বের করা যায় কিভাবে?'

'ওদেরকে বের করে আনাটা কষ্টকর হলেও অসম্ভব নয়। ওখানে মাত্র দু'জন প্রহরী থাকে। বিভিন্ন কক্ষে থাকে মেয়েরা।' আইওনা বললো।

রাতেই পরিকল্পনা তৈরী হলো। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ওদের বের করে আনা হবে। অভিযানে কতজন যাবে, অন্যরা কোথায় থাকবে তাও বলা হলো।

আইওনা বললো, 'তাহলে আমার ফিরে যাওয়া উচিত। আমাকে না পেলে অন্য মেয়েদের ওপর পাহারা আরো শক্ত হবে। তখন ওদের বের করা সম্ভব হবে না।'

ডিউকের পছন্দ হলো এ প্রস্তাব। এরপর নিজেই ওকে ফটকের কাছে রেখে এলো। মেয়েটিকে আসতে দেখে প্রহরী জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'ধারে কাছেই, বেশী দূরে যাইনি।'

সেন্ট্রি কোন উচ্চবাচ্য করলো না। তাদের দুর্বলতার কারণেই মেয়েটা বাইরে গিয়েছে। কমাণ্ডার শুনলে ওদের দু'জনেরই চাকরী যাবে।

পরদিন গোয়েন্দা প্রধান কি এক কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আইওনা সেন্ট্রিকে বললো, 'আমাকে আলী বিন সুফিয়ানের কাছে নিয়ে চলো।' অস্বীকার করলো প্রহরী। বললো, 'প্রয়োজন হলে তিনিই ডেকে পাঠাবেন।'

'দেখো, তার সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। যদি ক্ষতি হয় তোমাকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

শাস্তির কথা শুনে ভয় পেলো প্রহরী। গোয়েন্দা প্রধানের কাছে আইওনার সংবাদ পৌঁছে দিল। সাথে সাথেই ওকে তিনি ভেতরে ডেকে নিলেন। আইওনা তার কক্ষ থেকে আর বের হলো না।

গভীর রাত। সবাই ঘুমিয়ে আছে। সুনসান নিঝুম প্রকৃতি। সতর্ক পায়ে নিঃশব্দ রাতের আঁধার চিরে এগিয়ে চলেছে আটটি ছায়ামূর্তি। মূর্তিগুলো গোয়েন্দা প্রসাদের প্রধান ফটকে পৌঁছলো।

আশ্চর্য! কোন প্রহরী নেই। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলো ওরা। আইওনার দেয়া তথ্য অনুযায়ী দু'জন মেয়েদের কক্ষে ঢুকে পড়লো। অন্যরা সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলো বাইরে।

দু'জন সেন্ট্রিকে কাবু করা অসম্ভব হবে না, ভাবছে ডিউক। দলটিকে পাঠিয়ে দেয়ার পর থেকেই সে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরও ওরা ফিরে না আসায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে ডিউক। এতোক্ষণে ওদের ফিরে আসার কথা। পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিউকের সাথেই এ বাড়ীটিতে রয়েছে বিশজন উদ্ধার করা গোয়েন্দা। বাড়ীটা এক খৃষ্টান ব্যবসায়ীর। বিশাল বাড়ী। অন্যরা শহরের বিভিন্ন বাড়ীতে। সবাই ফিরে

যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। মেয়েরা এলেই ওরা ক্র্যাকের পথ ধরবে।

দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। পরিচিত শব্দ। তাড়াতাড়ি দরজার কবাট খুললো ডিউক। একটা পাল্লা খুলতেই কেউ তাকে টেনে বের করে নিল। সাথে সাথেই এক দল সৈন্য ভেতরে ঢুকে পড়লো। ভেতরে বসেছিল বিশজন। কেউ পালানোর সুযোগ পেলো না। বাড়ীর মালিকসহ সবাইকে গ্রেফতার করা হলো। একই সময়ে আক্রমণ করা হলো আইওনার চিহ্নিত এগারটি বাড়ীতে।

সকালে চল্লিশজন কমাণ্ডো সদস্য এবং চল্লিশজন গোয়েন্দাকে হাজির করা হলো সুলতান আইয়ুবীর সামনে।

বাড়ীগুলোতে তল্লাশী নিয়ে পাওয়া গেলো প্রচুর অস্ত্র, দাহ্য পদার্থ, বিষের পুটুলী, হাশিশ এবং নগদ টাকা পয়সা। বন্দীদের মধ্যে সবচে মূল্যবান বন্দী ছিল ডিউক। সুলতানের নির্দেশে ওদের জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। গোয়েন্দাদের সমস্যা শেষ করার পর আইওনা সে সব মুসলমানদের নাম উল্লেখ করলো, যারা গোপনে খৃষ্টানদের সাথে গাটছড়া বেঁধেছে। ও সুলতান এবং আলীকে বললো, 'এবার তো আমায় বিশ্বাস করা উচিত?'

আরমানকে ডেকে পাঠালেন আলী বিন সুফিয়ান। আরমান এলে তাকে বলা হলো, 'আরমান, ও আইওনা, তোমার হারিয়ে যাওয়া বোন।'

বোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ভাই। এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো তখন। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলো অশ্রুসজল চোখে। দু' ভাই-বোনকে পিতার সামনে হাজির করা হলো। আনন্দে অজ্ঞান হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। জ্ঞান ফিরলে দু'সন্তানকে জড়িয়ে ধরলেন বুকের সাথে। বললেন, 'ওর নাম আইওনা নয়, আশা।'

সুলতান বৃদ্ধের জন্য ভাতা নির্ধারণ করলেন। আলীকে বললেন, 'সবকটি গোয়েন্দা মেয়ের ব্যাপারে খোঁজ খবর নাও। খোঁজ পেলে ওদেরকে আত্মীয় স্বজনের হাতে তুলে দিও। এদেরকেও হয়তো খৃষ্টানরা কোন মুসলমানদের বাড়ী থেকে অপহরণ করেছে।'

বড় ধরনের বিপদ থেকে বেঁচে গেলেন সুলতান। এবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সৈন্যদের এক করতে হবে।

আইয়ুবী এবার তার হেডকোয়ার্টার স্থানান্তর করলেন মরুভূমিতে। অল্প ক'দিনের মধ্যেই সকল সৈন্য হেডকোয়ার্টারে জমায়েত হলো। সুলতান সেনাবাহিনীকে তিন ভাগ করলেন। এক ভাগ পাঠালেন সুবাকের প্রতিরক্ষার জন্য। এক ভাগ রাখলেন নিজের কাছে। তৃতীয় ভাগ ছেড়ে দিলেন বিশাল বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে পেট্রোল ডিউটির জন্য।

আলী সুলতানের কাজকর্ম দেখছিলেন আর ভাবছিলেন, খৃষ্টানরা কিছুতেই এ পরাজয় মেনে নেবে না। আবার তারা হামলা করবে। কিন্তু কোন পথে? তারা কি আমাদের সামনাসামনি লড়তে বাধ্য করবে, নাকি ভয়ংকর কোন ফাঁদ পাতবে আগের মতো?

৩

৪

দীর্ঘদিন থেকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মিশরে অনুপস্থিত। এই সুযোগে বেড়ে গেছে বিরোধীদের তৎপরতা। খৃষ্টানরা উস্কে দিচ্ছে পদচ্যুত ফাতেমী খেলাফতের অংশীদারদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন। খৃষ্টান গোয়েন্দায় ভরে গেছে সমগ্র কায়রো।

এই চক্রান্তের জালে আটকা পড়ে অর্থ আর নারী দেহের উষ্ণতায় নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে সুলতানের বিশ্বস্ত কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা। গোয়েন্দা ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইহুদী যুবতীদের কুটজালে ধরা দিয়েছে প্রশাসনের উচ্চাভিলাষী কতিপয় অফিসার। জাতির প্রতি ওদের মমত্ব ও ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে গেছে। ওখানে বাসা বেঁধেছে ক্ষমতার মোহ, লোভ ও লালসার কুটিল অন্ধকার।

এখন এসব লোকের হারেমগুলোর শোভাবর্ধন করছে খৃষ্টানদের লেলিয়ে দেয়া রূপসী যুবতীরা। এরা ছিল সবাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। ঘাতক দলের সদস্যরা ছিল আরো তৎপর। এ দলের কমান্ডোরা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে ছিল খুবই পারদর্শী।

এভাবেই মিশর হয়ে উঠলো ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্রের লীলাভূমি। অবস্থা এতটা নাজুক হয়ে গেলো যে, জাতির প্রতি মমতৃশীল প্রতিটি মানুষ ভাবতে লাগলো, কেবলমাত্র কোন অলৌকিক ঘটনাই মিশরকে রক্ষা করতে পারে।

খৃষ্টানদের সহযোগিতায় সুদানীরা মিশর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো। গোয়েন্দারা খবর দিল, সেনাবাহিনীর এক অংশ বিদ্রোহের জন্য তৈরী। ফলে, ভারপ্রাপ্ত গভর্ণরের চোখে ঘুম নেই। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সময় মতো না এলে মিশর রক্ষা করা যাবে না। এক সঙ্গে ভেতর এবং বাইরের মোকাবিলা করা ভারপ্রাপ্ত গভর্ণরের পক্ষে সম্ভব নয়।

খিজরুল হায়াত। দ্বীনদার এবং বিশ্বস্ত লোক হিসাবে পরিচিত সর্বমহলে। মিশরের অর্থ সচিব। সাদামাটা জীবন পছন্দ করেন। অমায়িক ব্যবহার। সুলতান নিজেই তাকে অর্থ সচিবের পদে নিয়োগ দিয়েছেন। যোগ্যতা এবং আন্তরিকতার সাথে মিশরের অর্থনীতি পুনঃ বিন্যাস করেছেন তিনি।

এক রাতে বাইরে থেকে ফিরছেন খিজরুল হায়াত। সবেমাত্র বাড়ীতে পা রেখেছেন, আঁধার ফুঁড়ে ছুটে এলো একটা তীর। বিধঁলো খিজরুল হায়াতের পিঠে। এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেলো তার দেহ। উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন তিনি। কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো ব্যথাভরা কণ্ঠের আর্তচিৎকার। চিৎকার শুনে ছুটে এলো চাকর-বাকররা ছুটে এলো। ছুটে এলো পরিবারের অন্যান্য লোকজন। ঘটনার আকস্মিকতায় থ' হয়ে গেছে সবাই। কারো মুখে কথা নেই। মারা গেছেন খিজরুল হায়াত।

একজন চাকর লক্ষ্য করলো, মৃত্যুর পূর্বে তিনি মাটিতে কিছু লেখার চেষ্টা

করছিলেন। চাকরটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মাটিতে লেখা মুসলেহ। 'হ' টা অর্ধেক লিখেছেন, হত্যাকারীর পুরো নাম লেখার পূর্বেই মারা গেছেন তিনি।

লেখাটা সংরক্ষণ করে লাশ তুলে নেয়া হলো। একজনকে পাঠিয়ে দেয়া হলো পুলিশ প্রধান গিয়াস বিলকিসের কাছে। গিয়াস বিলকিসও ছিলেন সুলতানের বিশ্বাসভাজনদের অন্যতম। আলী বিন সুফিয়ানের মতো অপরাধ দমনে অভিজ্ঞ। সংবাদ পেয়েই ছুটে এলেন গিয়াস বিলকিস। গভীর মনোযোগ দিয়ে নামটি দেখলেন। ততোক্ষণে উপ-রাষ্ট্রপ্রধান মুসলেহ উদ্দিনও ছুটে এসেছেন। গিয়াস বিলকিস দাঁড়িয়ে স্যালুট দিলেন তাকে। সন্তর্পণে মাটির লেখাটা পা দিয়ে মুছে ফেললেন।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হত্যাকারীকে খুঁজে বের করুন।' বললেন উপ-রাষ্ট্রপ্রধান। 'আগামীকাল ভোরেই আমি অপরাধীকে দেখতে চাই।'

'আমি অপরাধীকে খুঁজে বের করবো স্যার।' পুলিশ প্রধানের কণ্ঠ।

সবাই ফিরে গেলেন। রাতে গিয়াস বিলকিস খিজরুল হায়াতের সহকারী অফিস স্টাফসহ তার নিকটস্থ লোকদের ডেকে পাঠালেন। ওদের কাছে জানা গেলো, গতকাল খিজরুল হায়াত সচিবদের এক মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তার সহকারী ও অফিস স্টাফরা। মিটিংয়ে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপকালে সামরিক বাজেটের প্রসঙ্গ আসে। তখন খিজরুল হায়াত বলেন, 'সুলতান সুবাকে নতুন ফৌজ ভর্তি করছেন। ওদের বেতনাদি দিতে হলে মিশরে অপ্রয়োজনীয় বাজেট কমাতে হবে।'

এর বিরোধিতা করলেন উপ-রাষ্ট্রপ্রধান। বললেন, 'নতুন সৈন্য ভর্তি করার পূর্বে আমাদের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল। এমনিতেই সেনাবাহিনী সাদা হাতীতে পরিণত হয়েছে। মিশরের ফৌজ অশান্ত হয়ে আছে। তাদের অভিযোগ, সুবাকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল থেকে তাদেরকে কিছুই দেয়া হয়নি।'

'কথাটা ঠিক নয়। সাধারণ সৈন্যরা গনিমতের অংশ ঠিকই পেয়েছে। দেশের শিক্ষা বিস্তার ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সম্পদের একটা অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হয়েছে সঙ্গত কারণেই। গনিমতের অংশ পায়নি শুধুমাত্র উর্ধতন সেনা অফিসাররা। কারণ তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির চাইতে এ মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা করা জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই অপরিহার্য ছিল।'

উপ-রাষ্ট্রপ্রধান বললেন, 'চমৎকার সিদ্ধান্ত! যারা গনিমতের জন্য যুদ্ধ করে তাদেরকেই বঞ্চিত করার নিয়ম চালু করা হয়েছে?'

'দেখুন কোন মুজাহিদ গনিমতের সম্পদের জন্য যুদ্ধ করে না। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। শরিয়তের বিধান অনুযায়ীই গনিমতের মাল রাষ্ট্রীয় সম্পদ। স্বাভাবিক অবস্থায় এর একটা অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টনের সুযোগ থাকলেও তা রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজন পূরণের পরই দেয়া সম্ভব। নতুন সৈন্য ভর্তি না করলে যেখানে জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার ভয় প্রবল, সেখানে আপনি সেইসব অফিসারদের জন্য গনিমতের মাল দাবী করতে পারেন না, যারা সেনাবাহিনী থেকে ভাল বেতনভাতা পাচ্ছেন এবং আপনি জানেন এইসব অফিসাররা গনিমতের মাল ছাড়াই যথেষ্ট স্বচ্ছল আছেন।'

এক পর্যায়ে এ আলোচনা বিতর্কে রূপ নিল। উত্তেজিত হয়ে উপ-রাষ্ট্রপ্রধান বললেন, 'সুলতান মিশরের সৈন্যদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন না, যেমনটি করেন সিরীয় এবং তুর্কী সৈন্যদের সাথে।'

'মনে হচ্ছে খৃস্টান এবং ফাতেমীরা আপনার মুখ দিয়ে কথা বলছে।' বললেন খিজরুল হায়াত। এ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মধ্যেই মিটিং শেষ হলো।

অর্থ সচিবের সহকারী জানালো, 'মিটিং শেষে উপ-রাষ্ট্রপ্রধান স্যারের অফিসে এলেন। এখানেও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো। স্যার উপ-রাষ্ট্রপ্রধানকে বললেন, 'আমি সুলতানের কাছে এ প্রসঙ্গ তুলবো। বলবো, আপনি ভর জলসায় সবাইকে বুঝাতে চেয়েছেন, সেনাবাহিনী অশান্ত। আপনি বলেছেন, সুলতান সবার সাথে সমান ব্যবহার করেন না এবং গনিমতের মাল মিশরের সৈন্যদের না দিয়ে অন্য সৈন্যদের দিচ্ছেন। এছাড়া আপনি আমাকেও আপনার দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেছেন এবং সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।'

উপ-রাষ্ট্রপ্রধান কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বললেন, 'তুমি বেঁচে থাকলে তো সুলতানকে এসব জানাবে।'

উপ-রাষ্ট্রপ্রধানকে গিয়াস বিলকিস এসবের কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ পুলিশ বিভাগ তার অধীন। উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলার পূর্বে অবশ্যই প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকতে হবে। পুলিশ প্রধান বুঝলেন এ হত্যাকাণ্ড ব্যক্তিগত কারণে হয়নি। তিনি গোপনে এ হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা করতে শুরু করলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের দু'দিন পর। মুসলেহ উদ্দিন গভীর রাতে বাসায় ফিরলেন। প্রথম স্ত্রী তাকে ডেকে নিলেন নিজের কক্ষে। তিনি ঢুকতেই স্ত্রী বিশটা আশরাফি তার সামনে রেখে বললেন, 'খিজরুল হায়াতের হত্যাকারী এ বিশ আশরাফি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।'

স্ত্রী এক টুকরো কাগজ স্বামীর হাতে তুলে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'পঞ্চাশ আশরাফি এবং দু টুকরা স্বর্ণ দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু দিয়েছেন বিশ আশরাফি। আপনার স্ত্রীর কাছে দিয়ে গেলাম। আমাদের ধোঁকা দিয়েছেন। এখন একশ আশরাফি এবং দু'টি স্বর্ণের টুকরা দিতে হবে। তা নয়তো একটা তীর খিজরুল হায়াতের মতো আপনার হৃদপিণ্ডও গেঁথে যাবে।'

মুসলেহ উদ্দিনের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। নিজেকে সংযত করে বললেন, 'তুমি কি বলছো? ওরা কারা? কাউকে আমি কোন আশরাফি দেয়ার কথা বলিনি। বিশ্বাস করো, হায়াতের হত্যার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তুমিই হায়াতকে হত্যা করেছো। কি কারণে জানি না, তবে তুমি যে তার হত্যাকারী এতে কোন সন্দেহ নেই।'

মুসলেহ উদ্দিনের প্রথম স্ত্রী সাবেরা। বয়স ত্রিশের কোঠায়। সুন্দরী। দেহের গাঁথুনি এখনো অটুট। পুরুষকে আকর্ষণ করার মতো রূপ যৌবন সবই রয়েছে তার।

এমন রূপবতী স্ত্রীকে ঘরে রেখেই মাসখানেক আগে অপরূপা একজন তরুণীকে

বাড়ী নিয়ে এসেছিলেন মুসলেহ উদ্দিন। এরপর থেকেই প্রথম স্ত্রীর কক্ষে যাওয়া-আসা তার বন্ধ। কয়েক দিনই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সাবেরা, কিন্তু তিনি যাননি। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বেআইনী কিছু নয়। সে কালে স্ত্রীরাও এতে কিছু মনে করতো না।

হত্যাকারীর চিঠি পেয়ে ভড়কে গেলো সাবেরা। স্বামীর অকল্যাণ কল্পনায় কেঁপে উঠলো তার মন। এ জন্যই তাকে নিজের কক্ষে ডেকে এনেছিলেন।

'মুখ বন্ধ রাখবে সাবেরা।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মুসলেহ উদ্দিন। 'এ হচ্ছে আমার দুশমনদের একটা চাল। তারা তোমার এবং আমার মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।'

'আমার বিরুদ্ধে শত্রুতা ছাড়া তোমার মনে অন্য কিছু কি আছে?' সাবেরার ক্ষুব্ধ কণ্ঠ।

'তোমায় আমি ভালবাসি সাবেরা। সেই প্রথম দিনের মতো। তুমি কি ওদের কাউকে চিনতে পেরেছো?'

'ওরা মুখোশ পরে ছিল। তবে তোমার মুখোশ খুলে গেছে। তোমায় আমি চিনে গেছি।'

স্বামী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে থামিয়ে দিয়ে সাবেরা বললো, 'সম্ভবতঃ তুমি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ আত্মসাৎ করেছো। অর্থ সচিব তা জেনে ফেলেছে বলেই গোপন আততায়ীর মাধ্যমে তাকে খুন করেছো।'

'কেন আমাকে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছো? কোষাগারের অর্থ আমি কেন আত্মসাৎ করতে যাবো?'

'তোমার না হলেও যে ফিরিঙ্গী মেয়েটাকে বিয়ে ছাড়া ঘরে এনে তুলেছো, তার প্রয়োজন আছে। তোমার মদ কেনার জন্য টাকার দরকার। যদি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে চাও তবে বলো, ঘোড়ার গাড়ী বোঝাই করে কি এনেছো? তোমার হারেমে প্রতিদিন নতুন নর্তকী আসছে বিনে পয়সায়? তোমার মদের আসরে যে টাকা খরচ হয় তা কোত্থেকে আসে?'

'চুপ করো সাবেরা। ওরা কারা আমাকে একটু খোঁজ নিতে দাও। ইস্! কি ভয়ংকর চাল চেলেছে। ক'দিন পরই সত্যি ঘটনা তুমি বুঝতে পারবে।'

'না, আমি চুপ থাকবো না। আমার বুকে তুমি প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছো। মিশরের সব লোককে ডেকে ডেকে এ কথা বলবো আমি। অলি-গলিতে চিৎকার করে বলবো, তুমি খিজরুল হায়াতের হত্যাকারী। তুমি হত্যা করেছো আমার ভালবাসা। এ হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবো।'

স্ত্রীকে অনেক অনুনয় বিনয় করে মুসলেহ উদ্দিন বললেন, 'আমাকে দু'দিন সময় দাও। দু'দিনের মধ্যেই আমি ওদের খুঁজে বের করে প্রমাণ করবো হায়াতকে আমি হত্যা করিনি। পুলিশ প্রধান সন্দেহজনক কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আশা করি কয়েকদিনের মধ্যে আসল খুনীকেও পাকড়াও করতে পারবে।'

পেরিয়ে গেলো রাত। পরের দিনও। মুসলেহ উদ্দিন বাড়ী ফেরেননি। ফিরিঙ্গী মেয়েটাকেও কোথাও দেখা গেলো না।

এরপর দিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলেন মুসলেহ উদ্দিন। সোজা চলে এলেন স্ত্রীর কক্ষে।

আদুরে গলায় কথা বললেন। শোনালেন ভালবাসার কথা। সাবেরা তার ধোঁকার জালে পা দিতে চাইলো না। কিন্তু জাত-খেলুড়ে মুসলেহ উদ্দিনের কপট ভালবাসার ফাঁদে এক সময় ধরা দিলেন স্ত্রী।

'আমি দু'দিন পর্যন্ত ওই দু'জনকে খুঁজছি। এখনো পাইনি। আশা করি পেয়ে যাবো। আমি যে হত্যাকারী নই তখন তা প্রমাণ করতে পারবো।'

আরো অনেক কথা বললেন মুসলেহ উদ্দিন। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন সাবেরা। কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। চাকর-বাকরদের ছুটি দিয়ে দিলেন। সমগ্র বাড়ীতে নেমে এলো কবরের নীরবতা। পাহারাদার কুকুরটাকে বাড়ীর এক কোণে বেঁধে রেখে নিজের কক্ষে ফিরে এলেন মুসলেহ উদ্দিন।

মাঝ রাত। বাড়ীর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল এক মুখোশধারী। তার কাঁধে চড়ে দাঁড়াল দ্বিতীয় জন। তৃতীয় ব্যক্তি তার কাঁধে উঠে দেয়ালের ভেতর লাফিয়ে পড়লো। ভেতরে ঢুকেই সে ভেতর থেকে ফটক খুলে দিল। বাড়ীর করিডোরে উঠে এলো তিনজন। এগিয়ে চললো বিড়ালের মতো নিঃশব্দে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওরা সাবেরার কক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকলো তিনজন। একজন হাত ছোঁয়ালো সাবেরার মুখে। স্বামীর হাত ভেবে আঁকড়ে ধরে সে বললো, 'কোথায় যাচ্ছো?'

কোন জবাব না দিয়ে ওর মুখ বেঁধে ফেললো একজন। বেঁধে দিল হাত। পাজা কোলা করে একটা বস্তায় ঢুকিয়ে কাঁধে তুলে নিল। চাকর-বাকর কেউ বাড়ী নেই। বিনা বাঁধায় ওরা বেরিয়ে গেলো।

খানিক দূরে একটা গাছের সাথে তিনটে ঘোড়া বাঁধা ছিল। রশি খুলে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো তিনজন। বস্তাও তুলে নিল ঘোড়ার পিঠে। মিশর পেছনে ফেলে ইস্কান্দারিয়ার দিকে ছুটে চললো ঘোড়াগুলো।

সকালে চাকর-বাকররা ফিরে এলো। মুসলেহ উদ্দিন ওদেরকে সাবেরার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তন্ন তন্ন করে সারা বাড়ী খোঁজা হলো। সাবেরা কোথাও নেই। এক চাকরাণীকে একান্তে ডেকে নিলেন মুসলেহ উদ্দিন। অনেকক্ষণ কথা বললেন দু'জন। এরপর তাকে নিয়ে গেলেন পুলিশ প্রধানের কাছে।

মুসলেহ উদ্দিন বললেন, 'আমার স্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বিশ্বাস হায়াতকে ওই হত্যা করিয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে মুসলেহ লিখেছিলেন, আসলে লিখতে চেয়েছিলেন মুসলেহ উদ্দিনের স্ত্রী। কিন্তু পারেননি। এই চাকরাণীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

পুলিশ প্রধানের প্রশ্নের জবাবে চাকরাণী বললো, 'পরশু রাতে দু'জন লোক এসেছিল। আমার মুনিব তখন ছিলেন না। দেখলাম মুখোশ পরা দু'ব্যক্তি, ওরা বেগম সাহেবার সাথে দেখা করতে চাইলো। বাড়ীতে কোন পুরুষ না থাকায় আমি বললাম, 'এখন দেখা হবে না।'

ওরা বললো, 'বেগম সাহেবাকে এই বিশটি আশরাফি ফেরত দিতে এসেছি।'

আমি বেগম সাহেবাকে বলতেই তিনি ওই দু'জনকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

আমাকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'কেউ এলে আমাকে সতর্ক করে দিবি।'

বাইরে থেকে আমি শুনলাম দু'জন কঠোর ভাষায় কথা বলছে আর বেগম সাহেবা অনুনয় বিনয় করছেন। শেষে তিনি বললেন, 'আলি বিন সুফিয়ানের সহকারী হাসানকে হত্যা করতে পারলে পঞ্চাশ আশরাফি ও দু'টি স্বর্ণের টুকরা দেয়ার কথা ছিল। তোমরা তার পশমও ছিড়তে পারোনি, তবু এই বিশ আশরাফি দিয়েছি। তোমরা চুক্তি মোতাবেক কাজ না করে কিভাবে আমার কাছে চুক্তির সব টাকা দাবী করছো?'

ওরা পঞ্চাশ আশরাফী দাবী করে বললো, 'তুমি যে সময়ের কথা বলেছো ঠিক সে সময় এ লোকটি বাড়ীতে ঢুকেছিল। লোকটি হাসান না অন্য কেউ আমরা দেখিনি। আমরা তীর ছুঁড়ে পালিয়ে গেছি।'

পঞ্চাশ আশরাফি দেয়ার জন্য ওরা বেগম সাহেবাকে চাপ দিচ্ছিল। বেগম সাহেবা বললেন, 'আসল লোককে হত্যা করতে পারলে এই বিশ আশরাফি ছাড়াও পঞ্চাশ আশরাফি এবং দুটো সোনার টুকরা দেবো।' কিন্তু ওরা বললো, 'যে কাজ করেছি আগে তার বিনিময় দাও, তারপর অন্য কাজ।' বেগম সাহেবা অস্বীকার করায় ওরা বললো, 'টাকা কিভাবে ওসুল করতে হয় আমরা জানি।'

এরপর ওরা দু'জন চলে গেলো। বেগম সাহেবা আমাকে ডেকে বললেন, 'খবরদার, এসব কথা কাউকে বলবি না।' আমাকেও তিনি দুটো আশরাফি দিয়েছেন। আজ সকালে তার কক্ষে গিয়ে দেখি তিনি নেই। আমার মন বলছে টাকা না দেয়ায় সে লোক দু'জনই তাকে অপহরণ করেছে।'

পুলিশ প্রধান মুসলেহ উদ্দিনকে বসিয়ে রেখে চাকরাণীকে নিয়ে অন্য কক্ষে চলে এলেন।

'এবার বলো এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিয়েছে, মুসলেহ উদ্দিন, না সাবেরা?'

'এ জবানবন্দী আমার নিজস্ব।'

'সত্যি করে বলো সাবেরা কোথায়? কার সাথে গেছে?'

চাকরাণী ভয় পেয়ে গেলো। পুলিশ প্রধানকে কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারল না। গিয়াস বিলকিস বললেন, 'কিভাবে সত্যি কথা বের করতে হয় আমি জানি। তুমি এখন ফিরে যেতে পারবে না। পুলিশের টর্চার সেলের কথা শুনেছো?'

বিবর্ণ হয়ে গেলো চাকরাণীর চেহারা। সে জানতো, পুলিশের শাস্তি সেলে সত্য মিথ্যা আলাদা হওয়ার আগে দেহের হাড়গোড় আলাদা হয়ে যায়। সে কাঁদতে লাগলো।

'দেখুন, আমি এক গরীব মেয়ে। সত্যি কথা বললে মুনিব শাস্তি দেবেন, মিথ্যা বললে আপনারা।'

'তোমার কোন ভয় নেই। তোমার নিরাপত্তার জিম্মা আমি নিচ্ছি।'

চাকরাণী বললো, 'হত্যার দ্বিতীয় দিন একজন মুখোশধারী এসেছিল ঠিকই। মুনীব তখন বাড়ী ছিলেন না।

লোকটা ছিল ফটকের বাইরে, বেগম সাহেবা ভিতরে। কি কথা হয়েছে ওদের মধ্যে আমরা কেউ শুনিনি।

মুখোশধারী চলে গেলে বেগম সাহেবা ফিরে এলেন। হাতে ছিল একটা প্যাকেট। চিন্তাযুক্ত মলিন চেহারা নিয়ে তিনি কক্ষে চলে গেলেন। মালকিন যেদিন নিখোঁজ হন তার আগের রাতে মুনীব আমাদের সবাইকে এক রাতের জন্য ছুটি দিয়ে দিলেন।'

'ইতিপূর্বেও কি সবাইকে সারা রাতের জন্য ছুটি দিয়েছিলেন?'

'কখনো না। একজন ছুটিতে গেলে অন্য সবাই থাকতো। আরো আশ্চর্য হলো, কুকুরটাকে কখনো বেঁধে রাখা হয় না। ভয়ংকর কুকুর। অপরিচিত লোক দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে রাতে মুনীব নিজেই কুকুরটাকে বেঁধে রেখেছিলেন।'

'মুসলেহ উদ্দিনের সাথে সাবেরার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'ইদানীং খুব খারাপ। মুনিব একটা সুন্দরী ফিরিঙ্গী মেয়েকে বাড়ী আনার পর থেকে বেগম সাহেবার সাথে কথাই বলেন না।'

চাকরাণীকে বসিয়ে রেখে পুলিশ প্রধান উঠে গেলেন। ফিরে এলেন দু'জন সিপাই নিয়ে। কিছু বুঝে উঠার আগেই উপ-রাষ্ট্রপতি মুসলেহ উদ্দিন গ্রেফতার হয়ে গেলেন। পুলিশ তার দু'বাহু ধরে নিয়ে যেতে চাইলে প্রতিবাদ করলেন তিনি কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। পুলিশ প্রধান বললেন, 'একে জেলে নিয়ে যাও। তার বাড়ী সীল করে পাহারার ব্যবস্থা করো। বাড়ীর কাউকে বাইরে যেতে দেবে না।'

কায়রোর উত্তরে এক সবুজ শ্যামল প্রান্তর। কায়রো থেকে তার দূরত্ব অনেক। চারপাশে উঁচু নীচু পাহাড়। পাহাড় থেকে প্রান্তর ছুঁয়ে বয়ে গেছে ঝর্ণাধারা।

পূর্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। অপহরণকারীরা ঘোড়া থামালো সেই ঝর্ণাধারার কাছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলো তিনজন। বস্তার মুখ খুলে সাবেরাকে বের করে আনলো। মুখের কাপড় সরিয়ে হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিল।

সাবেরা অচেতন না হলেও অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করলো। চিৎকার করারও শক্তি নেই ওর।

ওরা তাকে পানি পান করালো। খেতে দিল খেজুর আর রুটি। শীতল বাতাসে ধীরে ধীরে ওর শক্তি ফিরে এলো। আচম্বিত সাবেরা উঠে দাঁড়ালো। দৌড়ে টিলার আড়ালে চলে গেল সে। একজন মুখোশধারী ঘোড়ায় চেপে ছুটলো ওর পেছনে। ক্লান্ত হয়ে পড়ে গেলো সাবেরা। মুখোশধারী তাকে ঘোড়ায় তুলে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলো।

'পালিয়ে যেতে চাইলে যাও।' বললো একজন, 'কোথায় যাবে? এখান থেকে একজন শক্তিশালী পুরুষও পায়দল কায়রো পৌঁছতে পারবে না।'

সাবেরা কেঁদেকেটে ওদের গালাগালি করতে লাগলো।

'কায়রো ফিরে যেতে চাইলে যাও। কিন্তু ওখানে গেলেও মরবে। তোমার স্বামীই তোমাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।'

'মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে নয়, সত্য। মজুরী হিসেবে তোমাকে দিয়েছেন। তোমার হাতে আমরাই আশরাফি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি তাকে বলেছো, সে সচিবকে হত্যা করেছে। তুমি আরো বলেছো, এসব কথা পুলিশ প্রধানকে বলে দেবে।

আগে থেকেই সে তোমার ওপর বিরক্ত। ফিরিঙ্গী মেয়েটা তার মন দখল করে রেখেছে। মেয়েটা কে, কোথা থেকে এবং কি জন্য এসেছে তোমাকে তা বলা যাবে না।

তোমার স্বামী আমাদের কাছে এলো। আস্ত বেঈমান। বলেছিল কাজটা করলে পঞ্চাশ আশরাফি আর দুটো সোনার টুকরো দেবে। কিন্তু কাজ শেষে পাঠালো বিশ আশরাফি।

আমরা তোমাকে ব্যবহার করলাম। তোমার কাছে টাকা দেয়ার অর্থ যেন তুমিও ব্যাপারটা জানতে পারো। বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে। পরদিন পঞ্চাশ আশরাফি দিল। স্বর্ণের টুকরা দিল না। আমরা বললাম, 'এখন পঞ্চাশে চলবে না। আরো বেশী দিতে হবে। না দিলে খবরটা পুলিশ প্রধানের কানে তুলে দেবো।'

তার জন্য সমস্যা ছিল ব্যাপারটা তুমি জেনে ফেলেছো। সে বললো, 'আমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও। ওকে বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে।'

সাবেরার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। সে হতভম্বের মতো তিন অপহরণকারীকে দেখতে লাগলো। মুখোশের মাঝখান দিয়ে দুটো করে চোখ দেখা যাচ্ছে। হিংস্র এবং ভয়ংকর। কিন্তু ওদের কণ্ঠে কোন হিংস্রতা নেই। ওরা বরং তাকে বুঝানোর চেষ্টা করছে, এখান থেকে পালানো সম্ভব নয়।

'আমি তোমাকে একবার দেখেছিলাম।' বললো একজন, 'তোমার স্বামীর প্রস্তাব শুনে ইস্কান্দারিয়ার বাজারে তোমাকে কত বিক্রি করা যাবে মনে মনে হিসাব করলাম। তুমি যুবতী, সুন্দরী। তোমাকে অনেক দামে বিক্রি করা যাবে। আমরা রাজি হলাম।'

তোমার স্বামী বললো, 'রাতে আমার চাকর-বাকররা থাকবে না। কুকুরটাকেও বেঁধে রাখবো। রাতে এসে ওকে তুলে নিও।'

এ পারিশ্রমিক না পেলে আমরা তাকে হত্যা করতাম। অপহরণ করতাম ফিরিঙ্গী মেয়েটাকে। তোমার বিনিময়ে ওরা জানে বেঁচে গেলো। তার কথামতোই আমরা রাতে গিয়ে তোমাকে তুলে নিয়ে এলাম।'

লোকটি বললো, 'তোমাকে এসব কথা বলার কারণ, তুমি স্বামীর ঘরের কথা ভুলে যাও। আমরা অসহায় কোন নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করি না। আমরা ব্যবসায়ী। অপহরণ এবং টাকার বিনিময়ে হত্যা করা আমাদের পেশা। তিনজন পুরুষ একজন নারীকে অপহরণ করে ভোগ করার মধ্যে গর্ব নেই।'

'তোমরা কি আমাকে ইস্কান্দারিয়ার বাজারে বিক্রি করবে?' কাঁপা কণ্ঠে সাবেরা জিজ্ঞেস করলো। 'শেষ পর্যন্ত এই কি হবে আমার কপালের লিখা?'

'না, খারাপ কাজের জন্য জংলী এবং বেদুইন মেয়েদের ক্রয় করা হয়। তুমি সম্মানিতা গৃহ বধূ। কোন আমীরের ঘরেই তুমি যাবে। আমরাও দামটা বেশী পাবো। এখন কান্নাকাটি বন্ধ করো। কাঁদলে চেহারার লাবণ্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে বাজারে-মেয়ে হিসাবেই বিক্রি করতে হবে। এবার শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও।'

সাবেরা আশ্চর্য হয়েছে, এদের কেউ এখনো তার সাথে কোন অশালীন আচরণ করেনি। মনে মনে স্বস্তিও পেয়েছে।

রাতভর বস্তাবন্দী থেকে সমস্ত শরীর ব্যথা করছে। চোখ বন্ধ করতেই ঘুমিয়ে

পড়লো ও। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো সাবেরার। তার মাথায় চেপে আছে ভয় এবং আতংক। মনের দিক থেকে সে এ পরিণতিকে গ্রহণ করতে পারছে না।

আড়চোখে তাকালো তিনজনের দিকে। ঘুমুচ্ছে ওরা। একবার ভাবলো খঞ্জর বের করে ওদের হত্যা করে। বাতিল করে দিল চিন্তাটা। একা তিনজনের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। চোখ পড়লো পাশে বাঁধা ঘোড়ার ওপর। পিঠে জিন বাঁধা। ও উঠে পড়লো। আলতো পায়ে এগিয়ে গেলো ঘোড়ার দিকে।

সূর্য নেমে গেছে টিলার ওপাশে। কায়রো কোন দিকে জানে না ও। তবুও বাঁচতে হলে পালাতে হবে ওকে। প্রয়োজনে বিশাল মরুর বিস্তারে ধুকে ধুকে মরবে, তবু এদের হাতে সম্ভ্রম নষ্ট হতে দেবে না। আলগোছে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো সাবেরা। ছুটিয়ে দিল ঘোড়া।

ঘোড়ার পদশব্দে তিনজনেরই ঘুম ভেঙে গেলো। দু'জন দুটো ঘোড়ায় চেপে ছুটলো তার পেছনে। টিলার বেষ্টনী থেকে বের হবার পথ জানা নেই সাবেরার। সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো এক পাহাড়। পেছনে তাকালো ও। ধাওয়াকারীরা কাছে চলে এসেছে।

ঘোড়াসহ পাহাড়ে উঠতে লাগলো সাবেরা। উপরে উঠে তাকালো বিপরীত দিকে, পথ পেয়ে গেলো। ওই পথ ধরে নীচে নেমে এলো সাবেরা। দেখলো ধাওয়াকারীরাও তার পেছনে আসছে।

ছুটলো সাবেরা। কিছুক্ষণ পর পেছনে তাকিয়ে দেখলো ধাওয়াকারীরা কাছে চলে এসেছে। সামনে সমুদ্র।

সমুদ্রের দিক থেকে চারজন উষ্ট্রারোহী এদিকেই আসছিল। ওদের দেখে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলো না সে। সাবেরা চিৎকার শুরু করলো, 'বাঁচাও, বাঁচাও, ডাকাতের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।'

সাবেরার ঘোড়া পৌঁছে গেল উষ্ট্রারোহীদের কাছে। উষ্ট্রারোহীদের দেখে মুখোশধারীরা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল অন্যদিকে। এবার ওদের পিছু নিল উটের আরোহীরা। একজন ধনুতে তীর জুড়ে তীর ছুঁড়লো ওদের লক্ষ্য করে। তীরটি বিঁধলো এক ঘোড়ার ঘাড়ে।

ঘোড়ার লাফালাফিতে পড়ে গেলো সওয়ার। চার জন মিলে অপর অশ্বারোহীকে ঘিরে ফেললো। একজনের পক্ষে চারজন তীরন্দাজের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, সে আত্মসমর্পণ করলো।

সাবেরা ওদের বললো, 'এদের একজন ওপাশে রয়েছে।'

আগন্তুকরা এ দু'জনকে বন্দী করেই ছুটলো তার সন্ধানে। একটু পর ওকেও ধরে নিয়ে এলো সেখানে।

এ চারজন উষ্ট্রারোহী ছিল সুলতান আইয়ুবীর সেনা সদস্য। সাগর উপকূল এবং বিশাল মরুভূমি জুড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনা দল পেট্রোল ডিউটি দিত। শত্রুর আকস্মিক হামলা মোকাবেলার জন্যই এ ব্যবস্থা। এর আগেও এরা বিপজ্জনক খৃস্টান গোয়েন্দাদের ধরে সুলতানের সামনে হাজির করেছে।

সাবেরা সৈন্যদেরকে অপহরণের পুরো কাহিনী শোনালো। বললো, 'উপ-রাষ্ট্রপতি

মুসলেহ উদ্দিন আমার স্বামী। এ ভাড়াটে খুনীদের দিয়ে তিনি অর্থসচিবকে হত্যা করিয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের খবর জেনে ফেলায় আমাকে তুলে দিয়েছেন এদের হাতে।'

অপহরণকারীদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হলো। হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দুটো ঘোড়ায় করে ওদেরকে সৈন্যরা কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে গেল।

সাবেরা বসলো উটের পিঠে। সূর্য ডোবার পূর্বেই এরা চার মাইল পথ অতিক্রম করলো। সামনের মরুদ্যানে তাঁবু টানানো। ডিউটিরত সেনা দলের ক্যাম্প ওখানেই। ওরা সাবেরাকে নিয়ে গেল কমাণ্ডারের সামনে। কঠোর পাহারায় তিন অপহরণকারীকে বসানো হলো তাঁবুর বাইরে। আগামী কাল এদের কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হবে।

খৃষ্টানদের পদতলে পিষ্ট হচ্ছিল প্রিয় ফিলিস্তিন। মুসলমানদের রক্তে ভিজে যাচ্ছিল পবিত্র ভূমির বালুকারাশি। দুর্দশার কালো মেঘ থেকে ঝরে পড়ছিল অত্যাচারের অগ্নি বৃষ্টি। অসহনীয় নির্যাতনের দুঃসহ ব্যথায় কাৎরাচ্ছিল তৌহিদী জনতা। এমনি এক দুঃসময়ে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী পা রাখলেন ফিলিস্তিনের মাটিতে।

সুবাক এখন মুসলমানদের দখলে- দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এ সংবাদ ফিলিস্তিনের মুসলমানদের হৃদয়ে জ্বেলে দিল আশার প্রদীপ। অনাগত মুক্তির আনন্দে হিল্লোলিত হলো প্রাণ।

কিন্তু ওদের এ অব্যক্ত আনন্দ দুর্বিসহ বেদনা হয়ে দেখা দিল অচিরেই। খৃষ্টানরা প্রতিশোধের আগুনে পুড়িয়ে দিল জেরুজালেম ও আশপাশের অঞ্চলগুলোর মুসলিম বসতি। মুসলমানদের ওপর এভাবেই সুবাক দুর্গ হারানোর শোধ তুলতে লাগলো ওরা।

মুসলমানদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার ঘৃণ্য তৎপরতায় মেতে ওঠা খৃষ্টানরা সুবাকের পর ক্রাক নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়লো। আইয়ুবী যেন ক্রাক আক্রমণ করতে না পারে এ জন্য ক্রাকে চালালো নির্বিচারে মুসলিম গণহত্যা।

বুদ্ধির খেলায় হেরে গেছে ওরা। হাতছাড়া হয়ে গেছে সুবাক দুর্গ। ক্রাক হাতছাড়া করা যাবে না। স্তব্ধ করে দিতে হবে আইয়ুবীর অগ্রযাত্রা। ক্রাকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করার পাশাপাশি তাই ওরা স্থানীয় মুসলমানদের শিরদাড়া ভেঙে দেয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। এখানেও খোলা হলো বেগার ক্যাম্প। সামান্য সন্দেহ হলেই মুসলমানদেরকে নিক্ষেপ করতে লাগলো সে ক্যাম্পে।

'ফিলিস্তিন বিজয় আমাদের মহান উদ্দেশ্য। কিন্তু ক্রাক থেকে নির্যাতীত মুসলমানদেরকে বের করে আনা তারচে বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।' সুলতান আইয়ুবীকে বললো গোয়েন্দা সংস্থার একজন কমাণ্ডার, তালাত চেঙ্গিস।

তালাত একজন তুর্কী মুসলমান। সুবাক থেকে পালিয়ে যাওয়া খৃষ্টানদের ছদ্মবেশে ক্রাকে পৌঁছে ছিল সে। ফিরে এসেছে তিন মাস পর।

গোয়েন্দা প্রধানের সামনেই তালাত সুলতানকে ক্রাকের রিপোর্ট দিচ্ছিল, 'যে সব খৃষ্টান সৈন্য লুকিয়ে ক্রাক পৌঁছেছে ওদের অবস্থা ভাল নয়। সহসা যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে পারবে না ওরা। তবে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছে ওরা স্থানীয় মুসলমানদের ওপর। পুরুষদেরকে এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার করছে। মেয়েরা বাড়ী থেকে বের হতে পারছে না।

আমরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য ওখানকার মুসলিম যুবকদেরকে গোপনে সংগঠিত করতে শুরু করেছিলাম। কিছু যুবক পালিয়ে এসে ভর্তিও হয়েছে। কিন্তু চারদিকে খৃষ্টান সৈন্য থাকায় অধিকাংশই ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আসতে পারছে না। তাছাড়া পরিবার ছেড়ে আসতেও অনেকের অসুবিধা হচ্ছে। সবচে বিপদের কথা হলো', বললো তালাত, 'কারো ওপর সন্দেহ হলেই তাকে বেগার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এখনই ক্রাক আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে এ নির্যাতনের হাত থেকে উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য।'

এর আগে গোয়েন্দারা বলেছিল, সুলতান ক্রাক আক্রমণ করলে রিমাণ্ড তার বাহিনী নিয়ে পেছন থেকে আক্রমণ করবেন। সুলতানও সেনা অফিসারদের কাছে পূর্বেই এমন আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন। এ জন্য সেনা সদস্য বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল।

সুলতান আইয়ুবী তালাতকে বিদায় দিয়ে আলীকে বললেন, 'আবেগের দাবী হচ্ছে, এ মুহূর্তেই ক্রাক আক্রমণ করা। ওখানকার মুসলমানরা কি কষ্টের মধ্যে আছে আমি বুঝি। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, শক্তি সঞ্চয় না করে আক্রমণ করো না। নিশ্চিত না হয়ে আক্রমণ করা যুদ্ধনীতির পরিপন্থী।

আলী! আমাদের মা-বোনদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে পুরুষদের। ইসলামের ইতিহাসে ওরা হচ্ছে নামহারা শহীদ। যে কোন জাতিকেই মহত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমন কোরবানী দিয়ে যেতে হয়। ওদের আব্রু, জীবন এবং ওদের দ্বীনের হেফাজতের জন্যই আমি ফিলিস্তিন শত্রুমুক্ত করতে চাই।

সাধারণভাবে যুদ্ধের উদ্দেশ্য আক্রমণ ও লুটপাট ছাড়া কিছুই নয়। যারা নিজ জাতির সন্তানদের ভুলে যায়, মুখ বুঁজে সহ্য করে শত্রুর নির্যাতন, তারা হয়ে যায় ডাকাত ও দস্যুদের সহযোগী। শত্রুর ওপর প্রতিশোধ না তুলে পরস্পরের সম্পদ লুণ্ঠন করে ওরা। প্রতারিত করে অন্যকে।

ওদের শাসকরা গরীবের সম্পদ লুটে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়। শত্রুরা আক্রমণ করলে অমূলক হম্বিতম্বি করে জনগণকে ধোঁকা দেয়। শত্রুর সঙ্গে গোপন আঁতাত করে। দেশের কোন অংশ ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে রক্ষা করে গদী। ভোগ বিলাসের জন্যই ওরা শুষে নেয় জনগণের শেষ রক্তবিন্দু।

অনেক জাতির শাসকরা কেবল রাজ্য বিস্তারের মোহে যুদ্ধ করেছে। বিলাসিতার সময়টা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বইয়ে দিয়েছে রক্তের বন্যা। আজ পৃথিবী থেকে ওদের নামও মুছে গেছে।

খৃষ্টানদের মতো আমরাও লড়াইকারী। কিন্তু দু'জনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ওরা অনেক দূর থেকে এসেছে আমাদের ধর্মের অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্য। এসেছে আমাদের নারীদের অধিকার করে ওদের গর্ভ থেকে খৃষ্টান জন্ম দেয়ার জন্য। আমরা আত্মরক্ষার জন্য এবং আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্য লড়াই করছি।

খৃষ্টানদের এ ঝড়কে প্রতিরোধ করতে না পারলে আমরা বিবেকহীন, আত্মমর্যাদাশূন্য বলে পরিচিত হবো। আর যদি আমরা বাড়ীতে বসে ওদের আক্রমণের অপেক্ষা করি তবে নিশ্চয়ই আমরা ভীত ও কাপুরুষ বলে চিহ্নিত হবো।

প্রতিরোধের নিয়ম হলো, যখনি দুশমন তোমাকে হত্যা করার জন্য তরবারী কোষমুক্ত করবে, আঘাত করার পূর্বেই তোমার তলোয়ার তার শিরোচ্ছেদ করবে। সে আগামী কাল আক্রমণ করতে আসবে জানলে আজই তার মোকাবেলায় নেমে যাও, যাতে সে আর আঘাত করার সুযোগ না পায়।'

'নূরুদ্দিন জঙ্গীর কাছে কি সাহায্য চাওয়া যায় না?' আলী বললেন, 'সাহায্য পেলে সাথে সাথেই আমরা ক্রাক আক্রমণ করতে পারতাম।'

"না, তাঁর কাছে সবসময় এমন সৈন্য থাকা দরকার, আমরা পেছন থেকে আক্রান্ত হলে তিনি যেন ওদেরকে পাল্টা আক্রমণ করতে পারেন।' আইয়ুবী বললেন, 'আমি কারো কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার পক্ষপাতি নই, বরং গেরিলাদের পাঠিয়ে আমরা ওদের ঘুম হারাম করে দিতে পারি। আমার বিশ্বাস, আমাদের গুপ্তচর এবং কমাণ্ডোরা মিলে শত্রুর মূল উপড়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু ওখানকার নিরপরাধ মুসলমানদেরকে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ, কমাণ্ডো বাহিনী কাজ শেষে এদিক ওদিক পালিয়ে যাবে। কিন্তু ওখানকার নিষ্পাপ মুসলমান ভাই-বোনগুলো পালাতে পারবে না, তারা শত্রুর হাতে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বিকল্প হিসাবে ওদেরকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসা যায় কিনা দেখো। আক্রমণ করার জন্য আরো কিছু সময় প্রয়োজন। এর মধ্য আমরা অনেক নতুন রিক্রুটও পেয়ে যাবো।'

'আমার মনে হয় এখানকার মুসলমানদের ব্যাপারে আমাদের পলিসি পরিবর্তন করা প্রয়োজন।' বললো খৃস্টানদের গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

ক্রাকের এক দুর্গে ক'জন খৃস্টান সম্রাট, উচ্চপদস্থ সেনা অফিসার এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মিটিং চলছে। পরাজিত সেনাবাহিনীর দিকে তাকালেই ওদের ক্রোধ বেড়ে যাচ্ছে। এ পরাজয়কে ওরা বদলে দিতে চাচ্ছিল ক্ষোভ আর রাগ দিয়ে। এদের মধ্যে কেবল হরমুনই ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করছিলেন।

ক্রাকের মুসলমানদের ওপর চলছিল অবর্ণনীয় নির্যাতন। তিনি বললেন, 'আপনারা এখানকার মুসলমানদের সাথে যেমন ব্যবহার করছেন আমরাও সুবাকে তেমন করেছিলাম। ফলশ্রুতিতে আমাদেরই এক গুপ্তচর মেয়ে বিপজ্জনক এক বন্দীকে পালাতে সাহায্য করেছিল। সে সুবাক দুর্গের সব কিছু দেখে গেছে। তাছাড়া সালাহউদ্দিন দুর্গপ্রাচীর যেভাবে ভেঙেছে এতে ভেতরের মুসলমানদেরও হাত ছিল। আমাদের ব্যবহারে ওরা এতটা বিরক্ত ছিল যে, জীবনবাজি রেখে ওরা সালাহউদ্দিনের সাহায্য করেছে। ওরাই ছিল আইয়ুবীর সেনাবাহিনীর পথ প্রদর্শক।'

'এ জন্যই আমরা এখানকার মুসলমানদের সাহস এবং জযবা নিঃশেষ করার জন্য নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছি।' বললো এক সেনা কমাণ্ডার।

'তার পরিবর্তে ওদেরকে আপনাদের বন্ধুতে রূপান্তরিত করুন, ওরা আপনাদের সাহায্য করবে।' বললো হরমুন। 'আমাকে অনুমতি দিলে ধর্মান্তরিত না করেই ওদেরকে খৃস্টানদের বন্ধুতে রূপান্তরিত করতে পারবো। তখন দেখবেন, ওরা মুসলমানদের

বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে।'

'ভুলে যাচ্ছো হরমুন!' মুখ খোললেন সম্রাট রিমাণ্ড, 'দু'একজন মুসলমানকে নারী দেহ আর টাকার লোভ দেখিয়ে গাদ্দারে পরিণত করা যায় কিন্তু গোটা সেনাবাহিনী বা একটা সমগ্র জাতিকে গাদ্দার বানানো যায় না। হরমুন, ওদের ওপর নির্ভর করো না। ওদের আমরা বন্ধু বানাতে চাই না, আমরা মুসলমানদেরকে নির্বংশ করতে চাই।

কোন অমুসলিম কোন মুসলমানকে ভালবাসলে এর অর্থ হচ্ছে সে ইসলামকেই ভালবাসে। অথচ আমরা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চাই। ক্রাক, জেরুজালেম, ওফা এবং আন্দালুসিয়া যেখানেই খৃষ্টানদের শাসন রয়েছে ওখানকার মুসলমানদের ওপর এতোটা নির্যাতন করো যেন ওরা মরে যায়। না মরলেও খৃষ্টানদের সামনে মাথা নত করে রাখে।'

'মুসলমানদের সাথে এখানে যা করা হচ্ছে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিয়মিত তার খবর পাচ্ছেন।' হরমুন বললো, 'আপনারা তাকে ক্রাকে তাড়াতাড়ি আক্রমণ করতে বাধ্য করছেন। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের সেনাবাহিনী এ মুহূর্তে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উপযুক্ত নেই।'

'তবে কি এখানকার মুসলমানদেরকে মাথায় তুলে নাচবো! বুঝতে পারছি না মুসলমান বন্দীদেরকে হত্যা না করে কেন আমরা লালন পালন করছি।' ক্ষোভের সাথে বলে উঠলেন গে অব লুজিনাম।

'কারণ মুসলমান বন্দীদের হত্যা করলে আইয়ুবী আমাদের বন্দীদের হত্যা করবে। আমাদের কাছে রয়েছে ওদের তিনশ' লোক, ওদের কাছে রয়েছে আমাদের তেরশ' বন্দী। একজন মুসলমান সৈন্য হত্যার বিনিময়ে আমরা চারজন খৃষ্টান সৈন্য হারাতে পারি না।' বললেন সম্রাট অগাস্টাস।

'আইয়ুবী আমাদের যে সব সৈন্যদের বন্দী করেছে ওরা ভীরু, কাপুরুষ। যুদ্ধ করার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব গ্রহণ করেছে ওরা। ওদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। আমাদের হাতে মরার চাইতে বরং মুসলমানের হাতে মরাই ভাল। নিশ্চিন্তে মুসলিম বন্দীদের হত্যা করার পক্ষপাতি আমি।' একজন সেনা কমাণ্ডার দাঁড়িয়ে বললো।

'স্থানীয় মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করে, বন্দীদের হত্যা করে আমরা কি আইয়ুবীকে পরাজিত করতে পারবো? এখন আমাদের সামনে সমস্যা হলো আইয়ুবী আক্রমণ করলে কিভাবে বাঁধা দেবো, কিভাবে সুবাক দুর্গ পুনরুদ্ধার করবো। সেই সমস্যার কথা ভুলে আপনার কথা মতো ক্রাকের সব মুসলমানদের মেরে ফেললাম। তারপর কি হবে? শত্রু কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? তারচে আইয়ুবীর মতো আমরাও আমাদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করছি না কেন?' বললো একজন।

'মিশরে আমাদের গোয়েন্দারা কি কাজ করছে অনুগ্রহ করে হরমুন কি বলবেন?' বললো আরেক সেনা কমাণ্ডার।

'হ্যাঁ, আমাদের গোয়েন্দারা আশানুরূপ কাজ করছে। সালাহউদ্দিন সুবাক কেল্লায়। তার অনুপস্থিতিতে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। কায়রোর উপ-রাষ্ট্রপতি মুসলেহ উদ্দিন আমাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন।

মুসলেহ উদ্দিন আইয়ুবীর বিশ্বস্ত। এখন ফাতেমীদের সহযোগিতায় ওখানে গোপনে একজনকে খলিফা নির্বাচন করে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলছে। আমাদের সেনা অফিসাররা সুদানী বাহিনীকে তৈরী করছে ওদের বিরুদ্ধে। কায়রোতে আইয়ুবীর ফৌজের দু'জন উপ-সেনাপ্রধান আমাদের লোক। সুদানীরা আক্রমণ করলেই ফাতেমীরা বিদ্রোহ করবে।'

'ভুলে যাচ্ছো কেন, মিশরের সংবাদ পেলে আইয়ুবী ক্রাক দুর্গ আক্রমণ মুলতবী রেখে ছুটে যাবে।' বললেন রিমাণ্ড, 'এখানেই রাখতে হবে তাকে। এমনভাবে বিরক্ত করতে হবে যেন তার সৈন্যরা মিশর যাবার পথ না পায়।'

হরমুন বললেন, 'আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, মিশরে তার যে ক'জন সৈন্য রয়েছে ওরা কিছু করতে পারবে না। ওদের বুঝানো হয়েছে, সুলতান তোমাদেরকে গনিমতের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছেন। হাজার হাজার সুন্দরী যুবতী ধরা পড়েছে, ওদেরকে সৈন্যদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়েছে।

এসব গুজব ছড়ানোর দায়িত্ব পালন করছে প্রশাসনের লোকেরা। আমি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলতে পারি, গোটা সেনাবাহিনী সুদানীদের পক্ষ অবলম্বন করবে। এ বিদ্রোহ দমন করার জন্য আইয়ুবীকে এখানকার ফৌজ নিয়ে যেতে হবে ওখানে। ততোক্ষণে কায়রো হবে ফাতেমী খেলাফতের পদানত। আমরা আইয়ুবীকে আক্রমণ করবো না। কায়রোতে স্থান না পেয়ে বিশাল মরুতে ঘুরে ঘুরে একদিন মুসলমানদের হাতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে সে।'

হরমুন আরো বললেন, 'মুসলমানদের মানসিকতা আপনারা এখনো বুঝেননি, এ জন্যেই আমার কিছু কিছু পদক্ষেপ ও পরামর্শকে আপনারা ভাল চোখে দেখেন না। প্রশিক্ষণের সময় যদি ওদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া যায় যে, তোমরা দেশ ও জাতির অতন্দ্র প্রহরী, সিংহাসন উপহার দিলেও ওরা সৈন্য হয়ে থাকতেই পছন্দ করবে। কিন্তু যদি ওদের ভেতর আত্মপূজা ও নারী লিপ্সা জাগিয়ে দেয়া যায়, যদি ওদের মদে অভ্যস্ত করে তোলা যায় তবে আপন ধর্ম ছেড়ে দিতেও ওরা কুণ্ঠিত হবে না। আমাদের পক্ষাবলম্বনকারী প্রশাসনের লোকেরা দ্বিতীয় দায়িত্বটিই পালন করছে।'

'তবে প্রশাসনের লোকদের মতো সেনা ফৌজকে অতো সহজে গাদ্দার বানানো যায় না। প্রশাসনের লোকেরা সহজেই ভোগবিলাসী হয়ে ওঠে, কিন্তু সৈন্যদের শৃংখলা তাদেরকে সহজে ভোগবাদী হতে দেয় না।' হরমুনের কথার মাঝখানে বললেন অগাস্টাস।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে এটাও ঠিক, খেলাফতের লোভ সব সময়ই কাজ করে। নইলে নবীর মৃত্যুর পর তাঁর শোকের কাল পার হওয়ার আগেই খেলাফতের জন্য মুসলমানরা পরস্পর যুদ্ধ করতে পারতো না।'

'কিন্তু সেই মুসলমানরাই ঈমানদারীর সাথে দায়িত্ব পালন করে দেশের পর দেশ দখল করে ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেছিল।'

'হ্যাঁ, মজাটা এখানেই। মুজাহিদরা ঈমানদারীর প্রমাণ দিলেও খলিফারা তার কোন মূল্য দেয়নি। এমনকি খলিফারা তাদের সাথে ভাল ব্যবহার পর্যন্ত করেনি। ফলে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের মধ্যে বিস্তর ফারাক সৃষ্টি হয়েছে।'

'কিন্তু তার ফলও পেয়েছে খলিফারা। সাধারণ মুসলমানতো অবশ্যই, এমনকি জানবাজ মুজাহিদ ও সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন খলিফারা শেষ পর্যন্ত তাদের গদি আর টিকিয়ে রাখতে পারেনি।'

হরমুন বললেন, 'তার কারণ, ইসলামী সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করার পরিবর্তে ব্যক্তি স্বার্থের দিকে নিবদ্ধ হয়েছিল সকলের দৃষ্টি। ফলে, একে একে তাদের হাত থেকে ছুটে যেতে থাকলো বিজিত এলাকাগুলো। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা এখন আরবে অবস্থান করতে পারছি।

প্রথম দিকের সেনাপতিরা ইসলামী রাজ্যের সীমানা যদ্দুর বিস্তৃত করেছিল, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সে পর্যন্ত যেতে চাচ্ছেন। তার সবচে বড় গুণ হচ্ছে, তিনি সঠিক ইসলামকে চিনতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন, খলিফারা ব্যক্তি স্বার্থে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন। মানব কল্যাণের চিন্তা বাদ দিয়ে ভোগের রাজ্যে হারিয়ে গেছে তাদের চেতনা। এটা বুঝতে পেরে খেলাফত বা প্রশাসনের তোয়াক্কা না করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন তিনি। ইসলামের আসল চেহারা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বেছে নিতে পেরেছেন সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথ।

তার চলার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মিশরের খেলাফত। তিনি তাকে পদচ্যুত করেছেন সাহস, দূরদর্শিতা এবং সামরিক শক্তি দিয়ে। ফলে তার সাথে মোকাবেলা করতে হলে তেমনি সাহস ও দূরদর্শিতা অর্জন করতে হবে আমাদেরও। কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে তার মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।'

পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল বৈঠকে। হরমুনই নীরবতা ভাঙলেন আবার, 'বেসমারিক নেতৃত্বের লক্ষ্য ক্ষমতার মসনদ। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা অর্থ, নারী এবং মদে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সুলতান তাদের এ দুর্বলতা বুঝতে পেরেছেন। আমরা কেবল উচ্চাভিলাষী সেনা কর্মকর্তাদেরকেই হাত করছি। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আমাদের দ্বিতীয় টার্গেট।

সেনাবাহিনীকে দুর্বল করতে হলে তাদেরকে জনগণের কাছে হেয় করতে হবে। আমি এ কাজটিই করছি। এ ব্যাপারে আপনারা হয়তো আমার সাথে একমত হবেন না, তবুও আমি বলবো, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে যুদ্ধের ময়দানে হারানো সম্ভব নয়। কারণ, তার প্রতিটি সৈন্য তার মতোই জানবাজ। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা এতটাই অবগত যে, মৃত্যু তাদের মধ্যে কোন ভীতির সৃষ্টি করে না।

আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, তিনি শুধু যুদ্ধ পরিচালনা করেন না, নিজেও লড়াই করেন। তাকে কোন খলিফা বা বেসামরিক নেতৃত্ব থেকে নির্দেশ নিতে হয় না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন পাকা মুসলমান। তার কথা হচ্ছে, আমি সরাসরি খোদা এবং কোরআনের হুকুম পালন করি।

আমাদের বাগদাদের গোয়েন্দারা বলেছে, নূরুদ্দিন জঙ্গী যেসব পরামর্শ পাঠিয়েছেন আইয়ুবী তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। প্রথমতঃ একজন বড় মুফতি ফতোয়া দিয়েছেন, খেলাফতের কেন্দ্র থাকবে বাগদাদ। বিভিন্ন দেশের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে খলিফা সেনা প্রধানের সাথে পরামর্শ করবেন। দ্বিতীয়তঃ সামরিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে

খলিফা কোন হস্তক্ষেপ করবেন না। তৃতীয়তঃ খোৎবায় খলিফার নাম উচ্চারণ করা হবে না।

আইয়ুবী আরো নির্দেশ দিয়েছেন, খলিফা বা তার মনোনীত কোন ব্যক্তি বা কোন কেল্লাদার বাইরে বের হলে জনগণ ফুলের তোড়া নিয়ে আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। খলিফার সম্মানে কোন শ্লোগান দেয়া যাবে না। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বড় সাফল্য, তিনি শিয়া-সুন্নীর মতভেদ দূর করে দিয়েছেন। এখন শিয়াদের অনেকেই সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে আসীন। শিয়া আলেমদের তিনি বুঝিয়েছেন, ইসলামে নেই এমন কোন কাজ যেন তারা না করেন।

এতে আমাদের বেশ ক্ষতি হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদল থাকলে আমাদের সুবিধা হতো। এখন আমরা প্রশাসনের মধ্যে সালাহউদ্দিন এবং সেনাবাহিনী বিরোধী মনোভাব তৈরীর চেষ্টা করছি।'

'এ মনোভাব স্থায়ী করতে হবে।' মুখ খোললেন ফিলিপ অগাস্টাস। 'শুধু সালাহউদ্দিনই আমাদের শত্রু নয়, আমাদের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে। আমাদের চেষ্টা হবে আইয়ুবীর মৃত্যু হলে এ জাতি যেন অন্য কোন আইয়ুবীর জন্ম দিতে না পারে।

এ জন্য ওদের আকিদা বিশ্বাসে কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি লোকের চিন্তায় থাকবে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন। ওদেরকে বিলাসিতার গহীনে ডুবিয়ে দাও, দেখবে একজন অন্য জনের মাথা কাটছে। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, তখন ওরা ক্রুশের গোলাম হতে দ্বিধা করবে না। সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম খৃস্টবাদের রঙে রঙীন করতে আপত্তি করবে না। ক্ষমতার লোভে তখন একজন অন্যজনকে হত্যা করবে। এ কাজে সাহায্য চাইবে আমাদের কাছে। তখন হয়তো আমরা কেউ বেঁচে থাকবো না, কিন্তু আমাদের আত্মা ওদের এ পরিণতি দেখে খুশী হবে।

ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইহুদীরা নিজের যুবতী মেয়েদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করো। ইহুদীরা জেরুজালেম এবং ফিলিস্তিনকে নিজের মনে করে, এ জন্য ওরা আমাদের দুশমন। কিন্তু এ কথা বলার সময় এটা নয়। ওদের বলো, জেরুজালেম তোমাদের। শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিন তোমাদেরই থাকবে। আর এ ফিলিস্তিন পেতে চাইলে তোমরা এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা করো।

তবে ইহুদীরা অত্যন্ত সতর্ক। আমাদের মানসিকতা বুঝতে পারলে ওরা হাত গুটিয়ে নেবে। তাই সতর্কতার সাথে ফিলিস্তিনের লোভ দেখিয়ে ওদের সম্পদ এবং যুবতীদের ব্যবহার করতে হবে। সংখ্যায় নগন্য বলে আমাদের আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে সাহস পাবে না ওরা। আমরা ওদের এই দুর্বলতা কাজে লাগাবো। বিজয়ের পর আমাদের স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সুবিধা দিয়ে ওদের আমরা টিকিয়ে রাখবো।'

সুবাক এবং ক্রাক দুর্গ থেকে অনেক দূরে এক বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল। চারপাশে উঁচু নীচু পাথুরে পাহাড়। কাঁকর আর বালুকাময় ভূমিতে মাঝে মাঝে খানাখন্দ। একদিকে খৃস্টান শাসকরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিপজ্জনক পরিকল্পনা তৈরী করছিল,

অন্যদিকে দেড় মাইল দীর্ঘ এবং দেড় মাইল প্রশস্ত এ পাহাড় ঘেরা স্থানে চলছিল আইয়ুবীর যুদ্ধের মহড়া, নতুন রিক্রুট করা মুসলিম সৈন্যদের প্রশিক্ষণ।

পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সুলতান মহড়া দেখছিলেন। সাথে দু'জন সহকারী। প্রশিক্ষণরত সৈনিকরা ঘোড়াসহ লাফিয়ে খানাখন্দ পার হচ্ছিল। প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণ ঠেকিয়ে করছিল পাল্টা আক্রমণ।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সুলতান।' বললেন একজন সহকারী, 'কিছুদিনের মধ্যেই এরা অভিজ্ঞ সৈনিকে পরিণত হবে। তীর-তরবারী, নেজা-বল্লম, সবকিছুতেই হয়ে উঠবে পারদর্শী।'

নতুন রিক্রুটদের মধ্যে সুবাকের লোক যেমন ছিল, গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় ক্রাক থেকেও যুবকরা এসে শামিল হয়েছিল এতে। ক্রাকে এদের ওপর চলছিল অবর্ণনীয় নির্যাতন। নতুনদের আগ্রহ উদ্দীপনায় সুলতান প্রীত হলেন। সহকারীদের বললেন, 'সুবাক এবং ক্রাক থেকে আরো নতুন নতুন যুবকদের ভর্তি করে ওদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করো।'

তিনি আরো বললেন, 'অস্ত্রের ব্যবহার জানলেই অভিজ্ঞ সৈনিক হওয়া যায় না। একজন অভিজ্ঞ সৈনিকের গুণ হচ্ছে বুদ্ধি এবং দূরদর্শিতা। যারা এলোপাথাড়ি দুশমনকে আক্রমণ করে, এমন সৈনিক আমার প্রয়োজন নেই। আমার সৈন্যরা জানবে কে তার শত্রু, যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে থাকবে পরিচ্ছন্ন ধারণা। বিশ্বাস থাকবে তারা আল্লাহর সৈনিক, আল্লাহর পথে লড়াই করছে। এদের মধ্যে প্রচণ্ড আবেগ রয়েছে, কিন্তু যদি উদ্দেশ্য এবং নিজের অবস্থান জানা না থাকে অল্প ক'দিনের মধ্যেই এ আবেগ নিঃশেষ হয়ে যাবে। ওদের বুঝিয়ে বলো, আমরা কেন ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার করতে চাই। গাদ্দারীর পরিণাম কি হয় তা ওদের জানিয়ে দাও। ওদের বলো, কেবলমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে নয় বরং দ্বীন এবং ঈমানের জন্য তোমরা যুদ্ধ করছো। তোমরা লড়ছো আগামী প্রজন্মের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য। সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ হলে ওদের জন্য আত্মিক এবং মানসিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করো।'

'মহামান্য সুলতান', এক সহকারী সালার বললেন, 'প্রতি সন্ধ্যায় ওদের জন্য দ্বীনী আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা একদল পশু সৈনিক তৈরী করতে চাই না।'

'আমাদের যে সব মেয়েদেরকে ওরা অপহরণ করছে, যেসব যুবতীদের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে, তাদের কথা এদের খুলে বলো। খৃস্টানরা কিভাবে পবিত্র কোরআন পদদলিত করছে, কিভাবে মসজিদকে ওদের ঘোড়ার আস্তাবল বানাচ্ছে জানাও তাদের। ওদের বলো, নারীর সম্ভ্রম, পবিত্র কোরআন এবং মসজিদের সম্মান রক্ষা করা মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। যেদিন তোমরা এ দায়িত্ব ভুলে যাবে, সেদিন এ পৃথিবীই তোমাদের জন্য হয়ে যাবে জাহান্নাম। পরকালের শাস্তি তো মৃত্যুর পরের কথা।'

ট্রেনিং চলছিল পর্বত বেষ্টিত বিশাল এলাকা জুড়ে। এরপরও সুলতান পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে কোন সময় খৃস্টান ফৌজ বা তাদের কোন কমাণ্ডো বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এ ফৌজ। চলে আসতে পারে তাদের কোন গোয়েন্দা, যে এখানকার গোপন তৎপরতার খবর তুলে দেবে ওদের হাতে। এ জন্য সুলতানের চার পাঁচজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

দল পাহারায় নিয়োজিত ছিল ক্যাম্পের বাইরে। কিন্তু তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সুলতানকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি গুপ্তঘাতক দল পৌঁছে গেলো সুলতানের কাছাকাছি।

সুলতান যে পাহাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার বিপরীত দিকের টিলায় উঠে এলো কমান্ডো দলটি। তাদের দিকে সুলতানের পিঠ। দলের একজন বললো, 'মাত্র আড়াইশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে আইয়ুবী। তাকে মারার জন্য এখন একটা তীরই যথেষ্ট, কি বলো?'

'হ্যাঁ।' বললো দ্বিতীয়জন, 'কিন্তু এরপর পালিয়ে যাবো কোথায়?'

'তাও ঠিক। ওরা আমাদের মেরে ফেললে তো কোন কথা ছিল না, কিন্তু তা করবে না। এমন শাস্তি দেবে, আমরা আমাদের সঙ্গীদের নাম বলতে বাধ্য হবো।'

তৃতীয়জন বললো, 'সালাহউদ্দিনকে হত্যা করা এতো সহজ হলে এতদিন তার বেঁচে থাকার কথা ছিল না।'

'কিন্তু কঠিন হলেও এখন যে কঠিন নয় তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছো। ফাতেমীরা বলছে আমরা শুধু ওদের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছি, কাজের কাজ কিছুই করছি না।'

'ভেবো না, খুব শীঘ্রই ওর মৃত্যু হবে। শুনেছি ঘাতক দলের সদস্যরা খুব সাহসী। সুলতানের দেহরক্ষীদের মধ্যে ওদের তিনজন সদস্য রয়েছে। সম্ভবত ওরা ভয় পাচ্ছে, নয়তো একটা লোককে মারতে এতদিন লাগবে কেন?'

কথা বলতে বলতে ওরা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। এরা ছিল খৃষ্টানদের নিয়োজিত ভাড়াটে খুনী।

ক্রাকে খৃষ্টান সম্রাটদের মিটিং শেষ হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, আর অপেক্ষা নয়– আইয়ুবী আক্রমণ করার পূর্বেই তাকে আক্রমণ করতে হবে। শুরু হলো সৈন্য সমাবেশের পালা।

ফ্রান্সের বাহিনী আইয়ুবীকে পথেই বাঁধা দেবে। রিমাণ্ডের ফৌজ আক্রমণ করবে মুসলিম বাহিনীর পেছন থেকে। ক্রাকের দুর্গ রক্ষা করবে জার্মান বাহিনী। তাদের সাথে থাকবে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের কয়েক প্লাটুন সৈন্য।

আইয়ুবীর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে আক্রমণ করে পালিয়ে আসার পরিকল্পনার বিরোধিতা করলো খৃষ্টান গোয়েন্দা বিভাগ। তাদের যুক্তি হলো, সুলতান আইয়ুবী তার বাহিনী তিন ভাগে ভাগ করে রেখেছেন। একভাগ যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে আছে। দ্বিতীয় ভাগের সৈন্যরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে সমগ্র মরুভূমিতে ছড়িয়ে আছে। গাছের একটা পাতা নড়লেও আইয়ুবীর কানে সে সংবাদ পৌঁছে যায়। তৃতীয় ভাগ ব্যস্ত থাকে ট্রেনিং ও মহড়ায়। সুলতানের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা শুনে এ পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়া হলো।

খৃষ্টানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল আইয়ুবীর চেয়ে চারগুণ বেশী। এর বেশীর ভাগ বর্মধারী এবং অশ্বারোহী। ওদের স্বাভাবিক আক্রমণ ঠেকানো মুসলিম বাহিনীর পক্ষে ছিল অসম্ভব। কিন্তু সুবাকের যুদ্ধ ওদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। আতংক ছড়াচ্ছিল পরাজিত সৈন্যরা। সুবাক ছিল ওদের কাছে লৌহ দুর্গ।

সুলতানের বাহিনীকে পথে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য ওরা বিশাল এক বাহিনী

পাঠিয়েছিল। দুর্গে বসে তাদের সাফল্যের খবর শোনার অপেক্ষা করছিল নেতৃবৃন্দ।

সুলতান মুখোমুখি সংঘর্ষে না গিয়ে ওদেরকে মরুর বালুর সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন গেরিলা লড়াইয়ের মাধ্যমে। মুসলিম বাহিনীর নিক্ষিপ্ত গোলার আগুন দেখে আতংকিত ঘোড়া এবং উটগুলো দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটু আগুন দেখলেই ভড়কে যেতো। সুলতান ওদের পরাজিত করেই ছুটে এসে হামলা চালালেন। প্রচণ্ড আক্রমণে লৌহ দুর্গের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙে পড়লো। কাঁপন ধরলো খৃষ্টানদের বুকে।

বিভিন্ন সম্রাটদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল সম্মিলিত বাহিনী। নিজেদের ভেতর ছিল চরম বিরোধ। সবাই চাচ্ছিল নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে। সম্প্রসারিত করতে চাচ্ছিল স্বীয় রাজ্যের সীমানা। শুধু মুসলমানদের নিঃশেষ করার জন্যই ওরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু হৃদয়ে লালিত বিরোধের কারণে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না ওরা।

খৃষ্টানরা ছিল ষড়যন্ত্রে পারদর্শী। কোন মুসলিম এলাকা দখল করলে ওখানে চালাতো হত্যাযজ্ঞ। লুণ্ঠন করতো মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম। অপরদিকে মুসলমানরা কোন এলাকা দখল করলে দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা এবং ভালবাসা দিয়ে শত্রুকে আপন করে নিতেন আইয়ুবী।

মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে ছিল আত্মত্যাগের সুষমা। দশজন সৈনিকের কমাণ্ডো বাহিনী একশ' খৃষ্টান সৈন্যকে পর্যুদস্ত করে দিত। জীবন বিলিয়ে দেয়াকে এরা সাধারণ ব্যাপার মনে করতো। সুলতানের নিপুণ পরিচালনায় অল্প সংখ্যক সৈন্য বিশাল বাহিনীর ব্যূহ ভেঙে দিতো।

ক্রাকের অভিযানের ব্যাপারেও তিনি এ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। এতে খৃষ্টান বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়লো। সৈন্যদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা দেখে যুদ্ধের পরিকল্পনা আপাততঃ স্থগিত করলেন খৃষ্টান সম্রাটরা। তারা বের করতে চেষ্টা করলেন আইয়ুবীকে ঠেকানোর বিকল্প পন্থা।

'মিশরে অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে। মিশর আক্রমণ করার জন্য সুদানীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।' বললেন সম্রাট রিমাণ্ড। তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, যুদ্ধাস্ত্রসহ এর সমস্ত ব্যয় খৃষ্টান শাসকরা বহন করবেন। মিশরে অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করার দায়িত্ব পড়লো হরমুনের ওপর। তিনি বেছে বেছে মিশরের কয়েকটি জায়গায় টোপ ফেললেন। এ টোপ যারা গিললো তাদের মধ্যে ছিলেন মিশরের উপ-রাষ্ট্রপ্রধান মুসলেহ উদ্দিন। তিনি খৃষ্টানদের টোপ গিলে খৃষ্টান শিবিরে নিয়মিত সংবাদ পাঠাতে লাগলেন তার তৎপরতার। আশাব্যঞ্জক সে সব সংবাদে উল্লসিত হলো খৃষ্টান সম্রাটগণ।

মিশরের অর্থ সচিব নিহত হয়েছেন এবং মুসলেহ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এ খবর এখনো পৌছেনি খৃষ্টানদের কাছে। দ্রুত এ সংবাদ ক্রাকে পৌছানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো খৃষ্টান গোয়েন্দারা। কিন্তু চারদিকে সুলতানের ফৌজ যেভাবে ছড়িয়ে আছে তাতে

অনেকটা পথ ঘুরে ক্রাকে যেতে হবে তাদের। এতে কম করেও দিন পনেরো সময় লেগে যাবে। বিষয়টি খৃষ্টান গুপ্তচরদের চিন্তিত করে তুললো।

যেদিন সাবেরা অপহৃত হয় সেদিন ক্রাকে পৌঁছলো এক খবর বহনকারী। দূত বললো, 'মিশরে বিদ্রোহের জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু সুদানীরা এখনো আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়নি। তাদের ঘোড়ার অভাব রয়েছে, তবে উট আছে অনেক। এ মুহূর্তে শ'পাঁচেক ঘোড়া পাঠানো দরকার।'

'এখনি পাঁচশ' ঘোড়া নিয়ে আটজন খৃষ্টান অফিসার রওনা হয়ে যাও।' নির্দেশ দিলেন ক্রাকের সেনাপতি। 'সময় সুযোগ বুঝে তোমরা সুদানীদের দিয়ে মিশর আক্রমণ করাবে।'

খৃষ্টানদের অসংখ্য ঘোড়া থেকে বাছাই করা পাঁচশ' ঘোড়া নিয়ে রওনা হলো ঘোড়ার বহর। পথ দেখাচ্ছিল সেই গোয়েন্দা। সুদানী এ গোয়েন্দাটি তিন বছর থেকে এ কাজে রয়েছে। আটজন খৃষ্টান সেনা অফিসার ও পাঁচশ' ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে চললো কাফেলা। অফিসাররা বললো, 'আইয়ুবীকে এখান থেকে আর মিশর যেতে দেয়া হবে না।'

সুলতান শুনেছেন মিশরের পরিস্থিতি ভাল নয়। কিন্তু কতটা খারাপ তা তিনি বুঝতে পারেননি। মিশর যে এখন জীবন্ত আগ্নেয়গিরি তা তিনি জানতেন না।

আলী তাকে বলেছিলেন, 'মিশরে গোয়েন্দাদের যে নেটওয়ার্ক রয়েছে তাতে যে কোন সংবাদ আমরা সময় মতোই পেয়ে যাবো। কিন্তু অর্থসচিব এবং উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের পরিণতির কথা তারা যথাসময়ে জানতে পারেননি।

সুলতানের কাছে সংবাদ পাঠানোর জন্য কেউ কেউ পুলিশ প্রধানকে পরামর্শ দিলে তিনি বলেছিলেন, 'আগে সাক্ষী প্রমাণ যোগাড় করি, তারপর সুলতানকে জানাবো।'

রাতে সাবেরাকে ভিন্ন একটা তাঁবুতে রাখা হলো। খুব সকালে সূর্য উঠার আগেই তিনজন অপহরণকারী এবং সাবেরাকে আটজন সশস্ত্র সৈন্যের পাহারায় কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হলো।

দলটি যখন কায়রো পৌঁছলো, সূর্য ডুবে গেছে। ওরা সরাসরি পুলিশ প্রধানের অফিসে গেলো। গিয়াস বিলকিস সারাদিন মামলার তদন্ত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সন্ধ্যার পর এসে ঢুকলেন শান্তি সেলে।

মুসলেহ উদ্দিনের বাড়ীতে তল্লাশী নেয়া হয়েছে। ফিরিঙ্গী মেয়েটাকে পাওয়া গেছে। উজবেক মুসলমান বলে নিজের পরিচয় দিল মেয়েটি। পুলিশ প্রধানকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলো নানা উল্টাপাল্টা কথা বলে। চেষ্টা করলো তাকে যৌবনের মায়াজালে আটকে দিতে। গিয়াস বিলকিস যুবতীকে শাস্তি সেলের কয়েকটা কক্ষ দেখালেন। বিবর্ণ হয়ে গেলো মেয়েটার মুখ।

পুলিশ প্রধানের উদ্দেশ্য সফল হলো, অবশেষে সব স্বীকার করলো মেয়েটি। বললো, 'আমার নাম মার্থা। জাতিতে খৃষ্টান। এসেছি জেরুজালেম থেকে।'

মেয়েটা পুলিশ প্রধানকে অর্থ এবং যৌবনের লোভ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে বললো, 'মানুষ তো সুখের জন্যই এতো কষ্ট করে। আপনি আমাকে মুক্তি দিলে সুখ ও

সম্পদে আপনাকে ভরে দেবো।'

মুসলেহ উদ্দিনের বাড়ী থেকে যেসব সম্পদ আটক করা হয়েছে এতেই তিনি হতবাক হয়ে গেছেন। তিনি অনুমান করতে পেরেছেন উপ-রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও মুসলেহ উদ্দিন কেন খৃষ্টানদের ফাঁদে পা দিয়েছেন। অর্থ ছাড়াও যুবতীর মাতাল করা রূপ আর ভাষার যাদু থেকে বেঁচে থাকার জন্য পাথর হৃদয় মানুষের প্রয়োজন।

পুলিশ প্রধান ভাবনার অতলে ডুবে গেলেন। উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে রূপের জ্বলন্ত আগুন আর সম্পদের পাহাড় নিয়ে মেয়েটা এসেছে জেরুজালেম থেকে। এসেছে একজন মুসলিমের কাছে খৃষ্টানের উপঢৌকন হিসাবে। ফলে তিনি বুঝলেন, ষড়যন্ত্রের মূল অনেক গভীরে।

মেয়েটার দিকে তাকালেন পুলিশ প্রধান। 'বলো মেয়ে, এ দেশে কি জন্য এসেছো? কে তোমাকে পাঠিয়েছে?'

যুবতীর ঠোঁটে মৃদু হাসির ঝিলিক। বললো, 'যা বলেছি তার বেশী আর কিছু বলার নেই। আর কিছু বললে ক্রুশের সাথে প্রতারণা করা হবে। ক্রুশ হাতে নিয়ে শপথ করেছি, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রয়োজনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো, তবুও গোপন তথ্য ফাঁস করবো না। এখন আমাকে যা ইচ্ছে করতে পারেন। একটা কথাও আর বলবো না। আর যদি আপনি আমাকে জেরুজালেম বা ক্রাকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেন, এ দেহ ছাড়াও পাবেন অঢেল সম্পদ। মুসলেহ উদ্দিন তো আপনার হাতে বন্দী, ওকে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার স্বজাতি, কিছু বললে বলতেও পারে।'

গিয়াস বিলকিস মার্থাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, মুসলেহ উদ্দিনের কক্ষে চলে এলেন। তার শারীরিক অবস্থা ভাল না। হাতের কব্জিতে রশি বেঁধে ছাদের আংটার সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে উপ-রাষ্ট্রপতিকে।

'মুসলেহ, বন্ধু! যা জিজ্ঞেস করি জবাব দাও। তোমার স্ত্রী কোথায়? কারা তাকে অপহরণ করেছে?

তোমার বান্ধবী মার্থা সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। এবার তোমাকেও বলতে হবে। আমি দেখতে চাই দু'জনেই এক কথা বলছো কিনা। তুমি কতটুকু মিথ্যে বলতে পারো সেটাও বুঝা যাবে তোমার কথা থেকে।'

'আমার হাত খুলে দে বদমাশ।' ক্রোধে দাঁত পিষে বললেন মুসলেহ উদ্দিন। 'সুলতান আসুক, তোকেও এভাবে ঝুলাবো।'

প্রহরী এসে পুলিশ প্রধানের কানে কানে কি যেন বললো। বিস্ফারিত চোখে সেন্ট্রির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ছুটে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মুসলেহ উদ্দিনের স্ত্রী এবং তিনজন অপহরণকারী বসে আছে। অপহরণ থেকে শুরু করে এদের গ্রেপ্তার হওয়ার সমস্ত ঘটনা খুলে বললো সাবেরা। পুলিশ প্রধান চারজনকে নিয়ে চললেন আণ্ডারগ্রাউণ্ড শাস্তি সেলে। মুসলেহ উদ্দিনের কক্ষের তালা খুলে চারজনকে তার সামনে দাঁড় করানো হলে তাদের দেখেই চোখ বন্ধ করে ফেললেন তিনি।

'এই তিন জনের মধ্যে হত্যাকারী কে?' প্রশ্ন করলেন পুলিশ প্রধান।

মুসলেহ উদ্দিন নীরব। আবার প্রশ্ন করলেন। কিন্তু কথা বললেন না উপ-রাষ্ট্রপ্রধান। গিয়াস বিলকিস একজন লোককে চোখের ইশারায় ডাকলেন। লোকটি ভেতরে এসে মুসলেহ উদ্দিনের কোমর জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়লো। ছিঁড়ে যাচ্ছে মুসলেহ উদ্দিনের হাতের কব্জি। চিৎকার দিয়ে বললো, 'মাঝেরটা।'

তিনজনকে সরিয়ে নেয়া হলো। গিয়াস বিলকিস ওদের বললেন, 'সমস্ত ঘটনা খুলে বলো। তা নয়তো এখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।'

নিজেদের মধ্যে কি কথা হলো ওদের। বললো, 'আমরা রাজি।'

ওদেরকে আলাদা আলাদা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সাবেরাকে নেয়া হলো উপরে।

পূর্বের বলা কথাই আবার বললো সাবেরা। বললো, 'আমার মা সুদানী, পিতা মিশরী। থাকতাম সুদানে। বছর তিনেক আগে আব্বার সাথে মিশর এলাম। এক অনুষ্ঠানে মুসলেহ উদ্দিন আমায় দেখলেন। আব্বার কাছে লোক পাঠালেন। আব্বার সাথে তার কত টাকার চুক্তি হয়েছিল জানি না। আমাকে মুসলেহ উদ্দিনের বাড়ী রেখে আব্বা চলে গেলেন। যাওয়ার সময় হাতে ছিল এক থলি আশরাফি।

পরদিন মুসলেহ উদ্দিন একজন আলেম এবং ক'জন লোক ডেকে আমাকে বিয়ে করলেন। এখন আমি তার স্ত্রী। ও আমায় ভীষণ ভালবাসতো। আব্বার স্নেহ আমি পাইনি বলে আমি ছিলাম ভালবাসার কাঙ্গাল। মনে হয় বিক্রি করার জন্যই আব্বা আমাকে মিশর নিয়ে এসেছিলেন। মুসলেহ উদ্দিন এতটা নীচ কখনো ভাবিনি। ও কখনো মদ পান করেনি। বাইরে কি করতো আমি জানতাম না, জানার চেষ্টাও করিনি।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সুবাক চলে যাবার পর মুসলেহ উদ্দিন কেমন যেন হয়ে গেলেন। অনেক রাত করে বাসায় ফিরতেন।

আমার আব্বা মদ্যপ ছিলেন। আমি মদের গন্ধের সাথে পরিচিত। দেখতাম মুসলেহ উদ্দিনের মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে। ভালবাসার খাতিরে আমি চোখ বুঁজে এ সব সহ্য করতাম। তাকে কিছুই বলতাম না। ক'দিন পর বাসায় অপরিচিত লোকের আনাগোনা শুরু হলো। এক রাতে আমাকে দুই থলি আশরাফি এবং দুটি স্বর্ণের টুকরো দেখালো। অন্য এক রাতে মদে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরলো।

আমার কাছে এসে বললো, 'তুমি কি মিশরের উত্তরে রোম উপসাগরের এলাকা, নাকি সুদান সীমান্তের এলাকা পছন্দ করবে? তুমি যে এলাকা চাইবে, সেখানকার রাণী হবে তুমি, আমি হবো সম্রাট।' আমি অতশত বুঝি না, চুপ করে রইলাম। ভাবলাম অত্যধিক মদ পান করে আমার স্বামীর মাথা বিগড়ে গেছে।

একরাতে তিনি একজন সুন্দরী ফিরিঙ্গী যুবতীকে বাড়ী নিয়ে এলেন। সাথে আরো অপরিচিত দু'জন লোক। মেয়েটাকে থাকতে দেয়া হলো তার শোবার ঘরে। আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়নি ওদের।

মেয়েটা আমার সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওকে আমি ঘৃণা করতাম। এ মেয়েটা আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে। এটা হলো খিজরুল হায়াতের হত্যার আগের ঘটনা।

অপহরণকারীরা পুলিশ প্রধানকে প্রথমে ভুল তথ্য দেয়ার চেষ্টা করলেও সত্য বলতে ওদের বাধ্য করা হলো। ওদের বর্ণনা অনুযায়ী ওরা তিনজনই ঘাতক দলের সদস্য। খৃষ্টানরা মুসলেহ উদ্দিনের সাথে এদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তাদেরকে দিয়েছিল প্রচুর অর্থ এবং সুন্দরী তরুণী। ওরা কথা দিয়েছে, আইয়ুবীকে পরাজিত করতে পারলে মিশর সীমান্তে তাকে একটা পরগণার স্বাধীন শাসক করে দেয়া হবে।

মুসলেহ উদ্দিন প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের হাত করতে লাগলেন। খিজরুল হায়াত তার ফাঁদে পা দেননি। অর্থ বিভাগ কব্জা করতে হলে হয় তাকে বশ করতে হবে, নয়তো সরিয়ে দিতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীরা ছিল সুলতানের প্রতি অনুগত। তাদের বদলি করে নিজের লোক বসাতে হলেও খিজরুল হায়াতকে সরিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

মুসলেহ উদ্দিন তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন। দায়িত্ব দিলেন ঘাতক দলের সদস্যদের। খৃষ্টানদের কাছ থেকে ওরা নিয়মিত বখরা পেতো। কাজ শেষে কিছু উপরি পাওয়ারও চেষ্টা করতো। মুসলেহ উদ্দিন পঞ্চাশ আশরাফির বিনিময়ে ওদের নিয়োগ করেছিলেন। কাজ শেষ হওয়ার পর দেননি বলে ওরা ক্ষ্যাপে গেলো। গোপন তথ্য জানিয়ে দিল তার স্ত্রীকে।

মুসলেহ উদ্দিন এখনো ঝুলন্ত অবস্থায় দুলছেন। জবানবন্দী নেয়ার জন্য তার হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। ততোক্ষণে জ্ঞান হারিয়েছেন মুসলেহ উদ্দিন। তাকে মাটিতে নামিয়ে বিছানায় শোয়ানো হলো। অনেক পরে তার জ্ঞান ফিরলো। অর্ধচেতন অবস্থায় তিনি আবোল তাবোল বকতে লাগলেন। একটু পর চোখ বড় বড় করে তাকাতে লাগলেন সবার দিকে।

ডাক্তার এসে ওষুধ দিলেন। কোন ফল হলো না। মেয়েটার কক্ষে গিয়ে দেখা গেলো সে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ডাক্তার এসে নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন, 'বিষ খেয়ে মারা গেছে, তবে বেশীক্ষণ হয়নি।' লাশের পাশে একটা প্যাকেটে বিষের চিহ্ন পাওয়া গেলো।

রাতে গিয়াস বিলকিসের কাছে এলেন জয়নুদ্দিন আলী বিন নাজা আল ওয়ায়েজ। জয়নুদ্দিন মিশরের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সর্ব বিষয়ে তার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। পীর না হলেও প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তারা তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

তিনি পুলিশ প্রধানকে বললেন, 'শুনেছি দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের দুএকজন ধরা পড়েছে। আপনাকে আরো কিছু তথ্য দিতে চাই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ক'জন লোক আমাকে বলেছে সুলতানের অনুপস্থিতিতে শত্রুরা ফায়দা লুটছে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ করছে যেন ধরা না পড়ে। গোয়েন্দা উপ-প্রধান হামাসকে কিছু না বলেই আমি গোপনে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছিলাম।

আমার জলসায় ফৌজি অফিসার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছাড়াও বিভিন্ন পেশার লোকজন এসে থাকেন। আমার নিজস্ব এবং বিশ্বস্ত লোকদেরকেও তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগিয়েছি। যদ্দুর বুঝতে পেরেছি, মিশরের বিরুদ্ধে বিরাট এক

ষড়যন্ত্র চলছে। আপনি ক'জনকে গ্রেপ্তার করার পর গা ঢাকা দিয়েছে বাকীরা।'

জয়নুদ্দিন পুলিশ প্রধানের কাছে সমস্ত গোপন তথ্য প্রমাণাদি পেশ করলেন। গিয়াস বিলকিস ডেকে পাঠালেন হামাস বিন আবদুল্লাকে। এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, এখনি সুলতানকে সংবাদ দেয়া উচিত। দূত হিসেবে জয়নুদ্দিনকে নির্বাচিত করা হলো। পরের দিন বারোজন রক্ষী সেনা নিয়ে সুবাকের পথ ধরলেন জয়নুদ্দিন।

তৃতীয় সন্ধ্যায় জয়নুদ্দিন সুবাক পৌঁছলেন। সুলতান হতবাক হয়ে গেলেন তাঁকে দেখে। খুশীও হলেন। জড়িয়ে ধরলেন পরস্পরকে।

জয়নুদ্দিন বললেন, 'আমি কোন ভাল সংবাদ আনিনি। আপনার অর্থ সচিব নিহত হয়েছেন। হত্যাকারী ভারপ্রাপ্ত উপ-রাষ্ট্রপতি মুসলেহ উদ্দিন এখন জেলে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার।'

বিবর্ণ হয়ে গেলো সুলতানের চেহারা। জয়নুদ্দিন তাঁকে সব ঘটনা খুলে বললেন। বললেন, 'মিশরের সেনাবাহিনীতে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, সুবাকের মুসলিম ফৌজকে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং প্রচুর গনিমতের মাল দেয়া হচ্ছে। আপনি খৃষ্টান এবং ইহুদী যুবতীদেরকে ফৌজের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন।

ওদেরকে আতংকিত করার জন্য আরো বলা হচ্ছে, বিশাল এক সুদানী বাহিনী খুব শীঘ্রই মিশর আক্রমণ করবে। মিশরের স্বল্প সংখ্যক সৈন্য ওদের বাঁধা দিতে পারবে না। নিহত হবে প্রতিটি সৈন্য। সুলতান আইয়ুবীও তাই চাইছেন। আরো গুজব ছড়ানো হয়েছে, সুলতান গুরুতর আহত হয়ে পড়ে আছেন। বাঁচার কোন আশা নেই। সুবাকের সেনা অফিসাররা ইচ্ছে মতো উপভোগ করছে। আপনি গুরুতর আহত একথা এখন সবাই বিশ্বাস করছে। এমনকি মুসলেহ উদ্দিনও। এ জন্যই মুসলেহ উদ্দিন দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে খৃষ্টানদের সহযোগিতা করে যাচ্ছিল।'

সাথে সাথে নূরুদ্দিন জঙ্গীকে সব জানিয়ে চিঠি লিখলেন সুলতান। তার কাছে সামরিক সাহায্য চাইলেন। লিখলেন, 'এখানে থাকলে মিশর হাতছাড়া হয়ে যায়। চলে গেলে পরাজয়ে বদলে যায় সুবাকের বিজয়। কোন কিছুর বিনিময়ে এ এলাকা ফিরিয়ে দিতে রাজি নই আমি। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, আমি কি এখানেই থাকবো নাকি মিশর ফিরে যাবো।'

একজন দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ারকে ডেকে বললেন, 'রাতদিন ঘোড়া ছুটাবে। থামবে না কোথাও। ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে সামনে যাকে পাবে তার অশ্ব বদলে নেবে। দিতে না চাইলে তাকে হত্যা করবে। শত্রুর হাতে পড়লে পালানোর চেষ্টা করবে, না পারলে চিঠি মুখে পুরে গিলে ফেলবে। কোন অবস্থাতেই যেন চিঠি দুশমনের হাতে পড়তে না পারে।'

দূত রওনা হয়ে গেলো। তিনি দ্বিতীয় চিঠি লিখলেন ভাই তকিউদ্দিনের কাছে। লিখলেন, 'তোমার কাছে যা আছে এবং যে ক'জন যুদ্ধ করতে পারে তাদের নিয়ে চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে কায়রোর দিকে ঘোড়া ছুটাও। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কোথাও থেমো না। তোমার সাথে কোথায় দেখা হবে অথবা আলো দেখা হবে কিনা জানি না। যদি

তোমার আমার সাক্ষাৎ না হয়, যদি আমি মারা যাই, তুমি অনতিবিলম্বে মিশরের দায়িত্বভার গ্রহণ করো।

যাত্রার পূর্বে আব্বাজানকে কদমবুসি করে বলবে, তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে। এরপর আম্মাজানের কবরে গিয়ে ফাতেহা পড়ো। আল্লাহ তোমার সঙ্গী। আমি যেখানে থাকবো সেখানে ইসলামের পতাকা নত হতে দেবো না। তুমিও মিশরে ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন রেখো।'

আরেক জন দূত ডেকে তাকেও পূর্বের মতো নির্দেশ দিলেন। রওনা হয়ে গেলো দ্বিতীয় দূতও।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর পায়ের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লো দূত। তার বা হাত তরবারীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন। পিঠে বিধে আছে তীর।

'পথে দুশমনের হাতে পড়েছিলাম। কিন্তু চিঠি নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি।' যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বললো দূত। আরো কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু কিছুই আর বলতে পারলো না, তার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেলো চির দিনের জন্য।

চিঠি তুলে নিলেন জঙ্গী। চিঠি পড়ে অনতিবিলম্বে সুবাকের কাছে পৌঁছলো নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিশাল বাহিনী। সুবাকবাসীরা দেখলো, এক ধূলিঝড় এগিয়ে আসছে। সকলের মনে শংকিত প্রশ্ন, 'কারা এরা?'

খৃষ্টানদের আক্রমণ ভেবে তৈরী হয়ে গেলো মুসলিম ফৌজ। হঠাৎ ধূলিঝড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিল কালিমা খচিত পতাকা। ভেসে এলো সৈনিকদের তাকবীর ধ্বনি। তাই শুনে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানালো সুবাকের সৈন্যরা। মুসলিম ফৌজকে অভ্যর্থনা জানাতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন সেনা কর্মকর্তাবৃন্দ।

একদিন সকালে মিশরের সেনাবাহিনীকে ময়দানে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। কেন্দ্রীয় সেনা কমাণ্ডের এ আকস্মিক নির্দেশে হতবাক হয়ে গেলো সৈন্যরা। কেউ বললো, 'সম্ভবতঃ দেশে বিদ্রোহ হয়েছে।' আবার কেউ বললো, 'সুদানীরা মিশর আক্রমণ করেছে।' কিন্তু কেন জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কমাণ্ডাররাও তা জানতো না।

নির্দেশ পেয়ে ফৌজ ময়দানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। একদিক থেকে ছুটে এলো সাতজন ঘোড়সওয়ার। সওয়ারদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সৈন্যদের প্রশ্নমাখা চোখ।

অশ্বারোহীদের প্রথমে রয়েছেন সুলতান আইয়ুবী। খালি গা। পাজামা ছাড়া পরণে কিছুই নেই।

সবাই জানে সুলতান সুবাকের রণাঙ্গনে। সারিগুলোর সামনে দিয়ে দুলকি চালে এগিয়ে গেলো আইয়ুবীর ঘোড়া। মাঝ বরাবর এসে ঘোড়া থামালেন তিনি। উচ্চস্বরে বললেন, 'আমার দেহে কি কোন আঘাতের চিহ্ন দেখছো? আমি কি বেঁচে আছি?'

সমস্বরে ধ্বনিত হলো, 'আমাদের সেনা প্রধান, জিন্দাবাদ। আমাদের বলা হয়েছিল আপনি গুরুতর আহত। বাঁচার সম্ভাবনা নেই।'

'এ খবর যদি মিথ্যে হয় তবে তোমাদের যা বলা হয়েছে তার সবই গুজব। যে সব মুজাহিদদের ব্যাপারে তোমাদের বলা হয়েছে– তাদের স্বর্ণ-রৌপ্য দেয়া হচ্ছে, খৃষ্টান

মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করছে ওরা, তার সবই গুজব। অথচ ওরা ঘুরে মরছে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে। ক্রাক দুর্গ, তার পরের এবং তার পরের দুর্গ পদানত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। ওরা কেন অনাহারে-অর্ধাহারে পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে মরছে? ওরা ঘুরে মরছে শুধুমাত্র খৃষ্টান পশুদের হাত থেকে তোমাদের মা, বোন এবং মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য।

সুবাকে দেখেছি যুবতী মেয়েরা খৃষ্টানদের হারেমে, পুরুষ আর বৃদ্ধরা ওদের বেগার ক্যাম্পে। জেরুজালেম, ফিলিস্তিন এবং ক্রাকের প্রতিটি গ্রামে মুসলমানদেরকে একই অবস্থায়ই আমি দেখেছি। আমাদের অনেক মসজিদ এখন ওদের ঘোড়ার আস্তাবল। পবিত্র কোরআনের পাতাসমূহ শহরের অলিগলিতে পদদলিত হচ্ছে।'

একজন কমাণ্ডার চিৎকার দিয়ে বললেন, 'তাহলে এখানে আমরা কি করছি? আমাদেরকে কেন ময়দানে নেয়া হচ্ছে না?'

'আমিই সে প্রশ্ন করছি তোমাদের। তোমাদেরকে এখানে রাখা হয়েছে কি এ জন্য যে, শত্রুরা গুজব ছড়াবে আর তোমরা তা বিশ্বাস করবে? তাদের ছড়ানো গুজবে বিশ্বাস করে তোমরা দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং খৃষ্টানদের হাতে তুলে দেবে মিশরের পবিত্র ভূমি? লুণ্ঠিত হবে তোমাদের মেয়েদের সম্ভ্রম? কোরআনের পাতা ছিঁড়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হবে আর তোমরা তাকিয়ে তাকিয়ে তা দেখবে, এ জন্য? তোমরা কি খৃষ্টানদের হাতে কোরআনের অপমান দেখতে চাও? তোমরা নিজের ঈমানেরই হেফাজত করতে পারছো না, স্বাধীনতার হেফাজত কিভাবে করবে?'

একটু থামলেন তিনি। পিনপতন নীরবতা নিয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সৈনিকরা। তিনি সবার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, 'তোমাদের মধ্যে দু'একজন কমাণ্ডার দেখা যাচ্ছে না। ওরা কোথায় তোমরা কি জানো? জানো না। ঠিক আছে, ওদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমি।'

সুলতানের ইশারায় একদিক থেকে দশজন লোককে সামনে নিয়ে আসা হলো। ওদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ঘাড়ে রশি। অবনত মস্তক।

সম্মুখ সারির সামনে দিয়ে ওদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

সুলতান বললেন, 'এরা ছিল তোমাদের কমাণ্ডার। জাতির দুশমনের সাথে এদের বন্ধুত্ব। তোমাদের নবী এবং কোরআনের শত্রুর সাথে মিশে গেছে এরা। কিন্তু ধরা পড়েছে।'

সুলতান খিজরুল হায়াতের হত্যা এবং মুসলেহ উদ্দিনের গ্রেপ্তারের কথা শোনালেন। তাকে সামনে নিয়ে আসা হলো। মুসলেহ উদ্দিন এখনো স্বাভাবিক হননি। গত রাতে সুলতান তাকে গারদে দেখে এসেছিলেন। মুসলেহ উদ্দিন সুলতানকে চিনতে পারেননি।

এখনো দেশ ভাগ করে নিজে স্বাধীন সম্রাট হবার কথা বলে যাচ্ছিলেন। সুলতান তাকে সেনাবাহিনীর সামনে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিলেন।

সৈন্যদের দেখে মুসলেহ উদ্দিন চিৎকার দিয়ে বললেন, 'এই হলো আমার বাহিনী। মিশর সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো। আমি তোমাদের সম্রাট। সালাহউদ্দিন তোমাদের শত্রু। হত্যা করো তাকে।' পাগলের মতো প্রলাপ বকে যাচ্ছিল মুসলেহ

উদ্দিন।

সৈন্যদের মাঝখান থেকে শন শন শব্দে ছুটে এলো একটি তীর। বিঁধল তার বুকে। পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি, ততোক্ষণে আরো কটা তীর বিদ্ধ করেছে তার দেহ। হুংকার দিয়ে তীরন্দাজকে থামিয়ে দিলেন সুলতান। কমাণ্ডারের নির্দেশে তীর নিক্ষেপকারী এগিয়ে এলো। দাঁড়াল সুলতানের সামনে।

'সম্মানিত সুলতান।' বললো সে, 'আমি এক গাদ্দারকে হত্যা করেছি। এর জন্য মৃত্যুদণ্ড দিতে চাইলে আমি প্রস্তুত।' মাথা এগিয়ে দিল তীরন্দাজ।

সুলতান তাকে ক্ষমা করে দিলেন। ডাকলেন জল্লাদকে। অন্য গাদ্দারদেরও হত্যা করা হলো। এরপর এক অবিশ্বাস্য নির্দেশ দিলেন সুলতান, 'তোমরা এখান থেকেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে মার্চ করবে। তোমাদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র এবং রসদ যাবে পেছনে।'

সঙ্গে সঙ্গেই মার্চ করে রওনা হলো বাহিনী। সুলতান চাইলেন কাটা মাথাগুলোর দিকে। তাঁর চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো অশ্রুর বন্যা।

কাপড় পরে একদিকে হাঁটা দিলেন সুলতান। সঙ্গীদের বললেন, 'শত্রুরা মুসলমানদের মধ্যে এভাবেই গাদ্দার সৃষ্টি করতে থাকবে। এমন একদিন আসবে, যখন সবাই গাদ্দারদের যারা বিরোধিতাকারীদেরকেই শত্রু ভাবতে শুরু করবে। ইসলামের পতাকা উড্ডীন দেখতে চাইলে বন্ধু এবং শত্রু চিনে নাও।'

আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবার এ নির্দেশে অনেকে হতবাক হয়েছিল। সুলতান বললেন, 'আমার এ আকস্মিক নির্দেশে আপনারা আশ্চর্য হয়েছেন। এখানকার ফৌজ অনর্থক বসেছিল। ওদের কোন কাজ ছিল না। প্রতিদিন মিশরের বাইরে নিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ এবং মহড়া দেয়ার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার নির্দেশ পালিত হয়নি।

আমি দু'জন পদস্থ সামরিক অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। ওরাই শত্রুর যোগসাজসে মিশরের সেনাবাহিনীকে বেকার বসিয়ে রেখেছিল। সৈন্যরা মদ এবং জুয়ায় অভ্যস্ত হতে লাগলো। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। ওদের মস্তিষ্ক নানান গুজব গ্রহণ করতে লাগলো।

আপনারা ভাবছেন সেনাবাহিনী ছাড়া মিশর চলবে কি করে? চিন্তার কারণ নেই। সুবাক বিজয়ী যোদ্ধারা আমার পেছনেই যাত্রা করেছে। শত্রুর পশুত্ব খুব নিকট থেকে দেখেছে ওরা। দেখেছে যুদ্ধের বিভীষিকা। ওদেরকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। ওরা সঙ্গী সিপাইদের রক্তের সাথে বেঈমানী করবে না।

এখন যারা যাচ্ছে ওরা ক্রাক দুর্গ আক্রমণ করবে। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবে। তখন শত্রুমিত্র চিনতে পারবে। যে সৈনিক একবার শত্রুর চোখে চোখ রেখে যুদ্ধ করে কোন লোভ-লালসা ওদের বিচ্যুত করতে পারে না।'

নুরুদ্দিন জঙ্গী এবং ছোট ভাইকে চিঠি লিখে সুলতান গোপনে কায়রো রওনা হয়েছিলেন। রণক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতির কথা গোপন রাখার জন্য পদস্থ কর্মকর্তাদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'জঙ্গী অবশ্যই সাহায্য পাঠাবেন। ওদের এখানে রেখে সমপরিমাণ মিশরী ফৌজ কায়রো পাঠিয়ে দেবে। মিশরগামী সৈন্যরা

পথে বিশ্রাম করবে কম।'

এতে সুলতানের ছিল দুটো উদ্দেশ্য। মিশরে বিদ্রোহ হয়ে থাকলে এরা তা দমন করবে, তা না হলে মিশরের ফৌজ আসবে রণক্ষেত্রে আর এরা থাকবে মিশরে।

সুলতান মিশর পৌঁছলে তার আগমন সংবাদ গোপন রাখা হলো। জয়নুদ্দিনের দেখানো বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করা হলো রাতের মধ্যে। ঘাতক দলের সদস্যরাও কয়েকজনের নাম বলেছিল, ধরা হলো তাদেরও।

সুলতানের নির্দেশে জয়নুদ্দিনের হাতে তুলে দেয়া হলো সাবেরাকে। সুলতান বললেন, 'একজন ভাল লোক দেখে তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন।'

ছোট ভাইয়ের আসার অপেক্ষা করছিলেন সুলতান। তকিউদ্দিন এলেন তিনদিন পর। সাথে দু'জন অশ্বারোহী। তাকে মিশরের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন সুলতান। তকিউদ্দিনের হাতে অর্পন করা হলো মিশরের ভারপ্রাপ্ত গভর্ণরের দায়িত্ব।

সুলতান বললেন, 'সুদানের ওপর দৃষ্টি রেখো। যে কোন পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার জিম্মা তোমায় দেয়া হলো। সুদান আক্রমণ করার প্রয়োজন হলে তাও করবে।'

'এবার ফিরতে হবে রণক্ষেত্রে।' সঙ্গীদের বললেন সুলতান।

তিনি গোয়েন্দা প্রধান আলীকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন, তাকালেন তার দিকে। 'একটু অপেক্ষা করুন সুলতান।' আলী বললেন, 'আপনাকে চমৎকার একটা উপহার দেবো।'

সুলতান প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন তার দিকে। আলী বললেন, 'আসুন আমার সাথে।'

আলীর সাথে হাঁটা দিলেন সুলতান, তাদের সঙ্গে পা মিলালেন উপস্থিত সবাই।

বিরাট এক মাঠে পাঁচশ' অশ্ব। পিঠে জীন চাপানো। খানিক দূরে আটজন খৃষ্টান সেনা অফিসার দাঁড়িয়ে আছে। হাত-পা বাঁধা। প্রত্যেক বন্দীর পাশে আছে একজন করে মিশরী সৈন্য।

'এ সব ঘোড়া কোত্থেকে এসেছে আলী?' সুলতান প্রশ্ন করলেন।

'ক্রাক থেকে আপনার জন্য উপহার এসেছে।'

আলী একজন লোককে ইশারায় ডাকলেন। লোকটি এসে সুলতানের সামনে দাঁড়ালো।

'সুলতান!' আলী বললেন, 'এ লোকটি আমার গোয়েন্দা দলের সদস্য। গত তিন বছর থেকে খৃষ্টান গোয়েন্দা দলে কাজ করছে। ওরা ওকে নিজস্ব গুপ্তচর মনে করে। ও খৃষ্টান এবং সুদানীদের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করে।

কয়েকদিন পূর্বে ও ক্রাক গিয়েছিল। সুদানীদের পক্ষ থেকে খৃষ্টান সম্রাটদের বলেছে, মিশর আক্রমণ করার জন্য ওদের পাঁচশ' যুদ্ধের ঘোড়া প্রয়োজন। ওরা পাঁচশ' ঘোড়া পাঠিয়ে দিয়েছে। সাথে আটজন সেনা অফিসার। এরা মিশর আক্রমণে পেছনে থেকে সুদানীদের নেতৃত্ব দেবে।

আমাদের এ গোয়েন্দা ওদেরকে উত্তর দিকে ঘুরিয়ে সীমান্তের সেনা চৌকিতে

সংবাদ দিয়েছে। নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছে অফিসারদের বন্দী করতে। সীমান্তের সৈন্যরা এদের কায়রো নিয়ে এসেছে।'

'এদের মেহমানদারীর দায়িত্ব হাসানের হাতে দিয়ে এবার চলো। ময়দান আমাকে ডাকছে। এখানে দেয়ার মতো সময় আমার হাতে নেই।'

খৃষ্টান সেনা অফিসারদেরকে হাসান বিন আবদুল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে আলী সুলতানের সাথে সুবাকের পথ ধরলেন।

কায়রোর বালুকারাশি গাদ্দারদের রক্ত শুষে নিচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবে মনে হচ্ছিল দ্বীন এবং স্বাধীনতার পতাকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের রক্ত গ্রহণ করতে কায়রোর মাটিও দ্বিধা করছে।

সুলতান যখন লাশগুলো দেখলেন, বললেন, 'ওদের ছিন্ন মস্তক লাশের বুকের ওপর রেখে দাও।'

এ ঘটনায় তিনি সবচে' বেশী ব্যথা পেয়েছিলেন মুসলেহ উদ্দিনের মৃত্যুতে। কারণ তাকে তিনি অসম্ভব বিশ্বাস করতেন। নিজের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে গিয়ে তাকে তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এ বিশ্বস্ত লোকটিই যে একদিন শত্রুর সাথে হাত মেলাবে কে জানতো?

সেনাবাহিনীর শৃংখলা ভেঙে যে সিপাইটি তীর ছুঁড়েছিল সুলতান তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ সৈনিক ঈমান এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বেঈমানী সহ্য করতে না পেরেই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। লাশগুলো দেখে সুলতানের চেহারায় আনন্দের দ্যুতির পরিবর্তে খেলা করছিল কষ্টের কালিমা। এতগুলো গাদ্দার ধরতে পেরে যেখানে খুশী হওয়ার কথা, সুলতান সেখানে ছিলেন বেদনা ভারাক্রান্ত। তার চোখ ফেটে গড়িয়ে পড়েছিল বিন্দু বিন্দু অশ্রু কিন্তু ভেতরে ছিল ক্ষোভের বহ্নিশিখা।

ক্রোধের সাথেই তিনি বললেন, 'এদের কারো জানাজা পড়া হবে না। লাশ ফেরত দেয়া হবে না আত্মীয়-স্বজনের কাছে। রাতের অন্ধকারে একই গর্তে কাফন ছাড়া সবাইকে পুঁতে রাখো। এমনভাবে মাটি সমান করবে, পৃথিবীতে যেন কবরের কোন চিহ্ন না থাকে।'

'সম্মানিত সুলতান।' মুখ খুললেন সুলতানের বন্ধু বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ, 'আপনি যা করেছেন, ঠিক করেছেন। তবুও পুলিশ সুপার এবং সাক্ষীদের জবানবন্দীসহ কাজীর লিখিত রায় সংরক্ষণ করা উচিত। নয়তো কোন এক সময় কেউ বলতে পারে, আপনি ওদের সুবিচার নিশ্চিত করেননি। ওদের মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত ছিল আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।'

'না। এমন অভিযোগ উত্থাপনের কোন সুযোগ নেই। ওদের গাদ্দারীর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। ওরা নিজেরাও তা স্বীকার করেছে। যারা বেঈমানদের সাথে মিশে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের শাস্তি বিলম্বিত করার কোন অধিকার আমার নেই। সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও আমি ওদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিনের পর দিন বিচারের মহড়া দেবো এতো সময় আমার নেই। আর ওরা সেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও তার অনুসারীদের মিথ্যেবাদী প্রমাণ করার জন্য কুটতর্কে মেতে

উঠবে এমন সুযোগ দেয়ার নির্দেশ কোরআন আমাকে দেয়নি।

এতগুলো লোককে অন্যায়ভাবে হত্যার অপরাধে যদি আমি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে থাকি তবে হত্যা করো আমাকে। তারপর আমার লাশ ফেলে দিও শহরের বাইরে কোন বিজন এলাকায়। যেন সেই লাশের গোশত খুবলে খায় পাহাড়ী শিয়াল আর কুকুরের দল। তবে বন্ধুরা, আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পূর্বে পবিত্র কোরআনের আলিফ লাম থেকে ওয়াননাছ পর্যন্ত পড়ে নিও। কোরআন যদি আমাকে মৃত্যুদণ্ডের ফয়সালা দেয়, আমার মস্তক হাজির রয়েছে।'

'মাননীয় সুলতান, আমার উদ্দেশ্য ছিল, কেউ যেন বলতে না পারে আপনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।'

'আমি বুঝেছি।' সুলতান বললেন, 'তোমার উদ্দেশ্য আমার কাছে দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। শুধু বলতে চাই, গাদ্দারীর অপরাধে কোন আসামীকে যদি রাষ্ট্র প্রধানের সামনে উপস্থিত করা হয়, রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব হলো বিলম্ব না করে তাকে শাস্তি দেয়া।

যদি রাষ্ট্রপ্রধান তাকে শাস্তি দিতে গড়িমসি করেন তবে বুঝতে হবে তিনি গাদ্দারের সঙ্গী, অথবা অযোগ্য বা বেঈমান। তার ভয়, বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে আসামী তাঁকেও অপরাধীর দলে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলতে পারে। কিন্তু আমি পরিচ্ছন্ন। আমাকে গাদ্দারদের সারিতে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও, আল্লাহর কুদরতী হাত আমাকে আলাদা করে দেবে।

তোমাদের বুক যদি কাবার প্রভুর নূরে আলোময় থাকে, তবে অপরাধীর মুখোমুখি হতে ভয় পেয়ো না। বন্ধু বাহাউদ্দিন যে পরামর্শ দিয়েছেন সে অনুযায়ী কাগজপত্র তৈরী করো। কাজীর দ্বারা রায় লিখিয়ে নাও। তবে এ রায় কাজীর হবে না, কাজী লিখবেন, মিশরের গভর্ণর এবং সেনাপ্রধান নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতাবলে আসামীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। সাক্ষী প্রমাণে আসামীদের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।'

তকিউদ্দিনের দিকে তাকালেন সুলতান। তার চেহারায় দীর্ঘ ভ্রমণের ছাপ। সুলতান বললেন, 'তোমার চেহারায় আমি দুশ্চিন্তা এবং ক্লান্তি দেখছি। কিন্তু তুমি বিশ্রাম করতে পারবে না। তোমার সফর শেষ হয়নি, সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমাকে সুবাক যেতে হচ্ছে, যাওয়ার আগে তোমার সাথে জরুরী কিছু কথা আছে।'

'মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের স্ত্রী এবং সন্তানদের ব্যাপারে কি নির্দেশ মাননীয় সুলতান?' জানতে চাইলেন পুলিশ প্রধান।

'অতীতে গাদ্দারদের পরিবারের ব্যাপারে যে নির্দেশ ছিল এখানেও তা কার্যকর হবে। ওদের বিধবা স্ত্রীদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নাও। দেখবে খৃস্টানদের সাথে কারো সম্পর্ক রয়েছে কিনা। নারী পূজা আমাদের মধ্যে গাদ্দার সৃষ্টি করছে। তোমরা দেখেছো খৃস্টানরা সুন্দরী যুবতীদের বিনিময়ে ওদের ঈমান কিনে নিচ্ছে।

নিরপরাধ বিধবাদেরকে তাদের পছন্দের পাত্রের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করো। জোর করে কাউকে বিয়ে দেবে না। লক্ষ্য রাখবে, কোন নারী যেন আশ্রয়হীন না হয়, আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার বঞ্চিত না হয়। রুটি রুজির জন্য ওদেরকে যেন কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

বিধবাদেরকে কেউ যেন বলতে না পারে, তাদের স্বামীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা

হয়েছে। বরং ওদের বুঝিয়ে বলো, বেঈমান স্বামীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ায় ওরা ভাগ্যবতী। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ওদের সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করো। এই এতীম ও বিধবাদের সমস্ত খরচ বহন করবে রাষ্ট্র। মনে রেখো, ওরা পিতৃহীন এ অনুভূতি কখনো যেন ওদের ব্যথিত না করে। সন্তানকে যেন পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে না হয়।

সুলতান যতশীঘ্র সম্ভব রণক্ষেত্রে ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন। তাঁর আশংকা ছিল, তাঁর অনুপস্থিতিতে খৃস্টান বাহিনী কোন পদক্ষেপ নিলে মুসলিম বাহিনীর জন্য তা যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হতে পারে।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর পাঠানো সেনা সাহায্য এরই মধ্যে পেয়ে গেছেন তিনি। কায়রো থেকে পাঠানো ফৌজও যাচ্ছে ময়দানের দিকে। এ দু'দলকেই রণক্ষেত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

নিজের অফিসে গিয়ে ছোট ভাই, আলী, হাসান, পুলিশ প্রধান এবং আরো ক'জন পদস্থ কর্মকর্তাকে নিয়ে মিটিংয়ে বসলেন সুলতান। তকিউদ্দিনকে মিশরের ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর এবং এখানকার সেনাপ্রধান ঘোষণা করে বললেন, 'আমার মতোই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার সমস্ত ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হলো।'

এরপর তকিউদ্দিনের দিকে ফিরে বললেন, 'তকিউদ্দিন, 'তুমি আমার ভাই, এ কথা আজ থেকে মন থেকে মুছে ফেলো। অযোগ্যতা, বিশ্বাস ভঙ্গ, গাদ্দারী, ষড়যন্ত্র, দুর্বলতা, দায়িত্বে অবহেলা এবং অন্যায়ের শাস্তি ইসলামের বিধান অনুযায়ীই তুমি পাবে।'

'দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল সম্মানিত সুলতান।' তকিউদ্দিন বললেন, 'মিশরের আকাশে বিপদের যে কাল মেঘ ঘনিয়ে আসছে তা আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'শুধু মিশর নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিপদের সম্মুখীন। এ ঝড় ইসলাম এবং মুসলিম সালতানাত বিস্তারের ক্ষেত্রে সবচে বড় বাঁধা। একটা কথা সব সময় মনে রেখো, মুসলিম বিশ্ব কোন একক জায়গীর নয়, কারো বাপ-দাদার সম্পত্তি নয়। এ জমিন আল্লাহর, আমরা সবাই এর রক্ষক। এ ভূমির প্রতিটি ধূলিকণা আমাদের কাছে আমানত। এ মাটি ব্যবহার করার পূর্বে ভাবতে হবে তুমি কি কারো অধিকার খর্ব করছো? আল্লাহর দেয়া আমানতের খেয়ানত করছো?

আমার কথা মন দিয়ে শোন তকি, বড় দুর্ভাগ্য হলো, ইসলামের অনুসারীদের মধ্যেই গাদ্দার আর ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যা বেশী। মুসলিম জাতি যত বিশ্বাসঘাতকের জন্ম দিয়েছে, অন্য কোন জাতি তা দেয়নি। এমনকি আমাদের গৌরবোজ্জল জিহাদের ইতিহাসও বিশ্বাসঘাতকতার কালিতে কলংকিত।

আলীকে জিজ্ঞেস করে দেখো, ওর গোয়েন্দারা খৃস্টান এলাকায় গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত। তাদের রিপোর্ট হলো– খৃস্টান শাসক, ধর্মীয় গুরু এবং সমাজের নেতারা জানেন মুসলমানরা নারী পাগল এবং ক্ষমতালিপ্সু। নারী, ক্ষমতা এবং অর্থের জন্য এরা ধর্ম, দেশ এবং আপন জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে পিছপা হয় না।'

সুলতান উপস্থিত সকলের প্রতি দৃষ্টি বুলিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের গোয়েন্দারা বলেছে, খৃস্টান গুপ্তচরদের ট্রেনিং দেয়ার সময় বলা হয়, 'মুসলিম ইতিহাসে

যত বিজয় রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতাও সে পরিমাণ। ওরা ততোগুলি বিজয় লাভ করেনি আমাদের গোয়েন্দারা যতো গাদ্দার তৈরী করতে পেরেছে। আল্লার রাসূলের ওফাতের পর ওরা নিজেদের মধ্যে নিজেরাই খেলাফতের জন্য যুদ্ধ করেছে। খলিফার বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামের শত্রুর সাথে হাত মিলিয়েছে। গদীকে নিষ্কন্টক করার জন্য নেতাদের হত্যা করেছে।'

এভাবেই নিঃশেষ হয়ে গেলো আমাদের জাতীয় চেতনা। দেশ জুড়ে চললো ব্যক্তি পূজার জয় জয়কার। সংকীর্ণ হয়ে এলো বিশাল মুসলিম সালতানাত। শেষ হয়ে গেলো মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তি।

খৃষ্টান জাতি আমাদের এ দুর্বলতার কথা জানে। মুসলমান ক্ষমতার জন্য দেশের বিশাল এলাকা ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত। যুগে যুগে সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

আমার বন্ধুরা। অতীত ইতিহাস আর বর্তমানকে যখন দেখি– আমার ভয় হয়, এমন এক সময় আসবে যখন এরা নিজের ইতিহাসের সাথেও বেঈমানী করবে। ঐতিহাসিকরা লিখবেন, মুজাহিদরা যখন দেশ এবং জাতির জন্য বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে শত্রুর সব পরিকল্পনা, তখন গোপনে ওদের কিছু সংখ্যক সঙ্গী শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করেছে। বিজয়কে ঢেকে দিয়েছে পরাজয়ের বোরকা দিয়ে। সংকীর্ণ করেছে মুসলিম রাষ্ট্রের সীমানা।

বন্ধুরা, রাষ্ট্র প্রধান এর দায়দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা করবেন। একদল মুসলমান থাকবে যারা হবে শ্লোগান সর্বস্ব। কেউবা গর্বের সাথে দুশমনের শ্লোগান অনুকরণ করবে। এরা হবে আপন ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞ।

তখন তাদের একথা বলার মতোও কেউ থাকবে না, ইসলামের পতাকাবাহী মর্দে মুজাহিদরা যুগে যুগে দ্বীন ও ঈমান রক্ষার জন্য বিশাল মরু, পাহাড় ও উপত্যকা মাড়িয়ে দূর দেশে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তোমাদের পূর্ব পুরুষরাই একদিন ঝড়-ঝঞ্জার মধ্যে উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন শংকাহীন চিত্তে। সমুদ্রের ভয়ংকর ঝড় তাদের গতি রোধ করতে পারেনি। ওরা এমন স্থানে গিয়ে যুদ্ধ করেছেন যেখানে পাথরও ছিল ওদের শত্রু।

ওরা যখন ক্ষুৎপিপাসায় অধীর এবং অস্ত্র ও ঘোড়া শূন্য তখনো যুদ্ধ করেছেন। আহত হয়ে সহযোদ্ধাকে ব্যান্ডেজ করার সুযোগ দেননি। তারা অবলীলায় পান করেছেন শাহাদাতের অমীয় সুধা, কিন্তু কবর খুঁড়ে সময় নষ্ট করার সুযোগ দেননি সঙ্গীদের। মরুর বালি সিক্ত হয়েছে নিজের এবং শত্রুর রক্তে।

অন্যদিকে ওদের শাসকরা রাজপ্রাসাদের মধ্যে অকুণ্ঠ ডুবেছিল ভোগ বিলাসে। উপভোগ করছিল উলঙ্গ নৃত্য। ইহুদী যুবতীর রূপ ও সোনার মোহর ঠুলি এঁটে দিয়েছিল ওদের চোখে।

শাসকরা যখন দেখলেন জনগণ যোদ্ধাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, ওদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া শুরু করলেন। যে বীরেরা ইউরোপ থেকে ভারত পর্যন্ত উড্ডীন করলেন ইসলামের বিজয় পতাকা তাদের জন্য রসদের যোগান বন্ধ করে দেয়া হলো।

যুবক মুহাম্মদ বিন কাশিমের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। ভারতের অত্যাচারী এক শক্তিধর শাসককে পরাজিত করে তিনি দখল করে নিয়েছিলেন তার

রাজ্য। মুক্তি দিয়েছিলেন মজলুম মানুষদের।

তার সুন্দর ব্যবস্থাপনায় সেখানকার জনগণ প্রীত হলো। তার ভালবাসায় মুগ্ধ হলো ভারতবাসী। তারা সেই ভালবাসার প্রতিদান দিল দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু খলিফা তার সাথে কি ব্যবহার করেছিলেন! ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে তাকে দেশে ডেকে পাঠালেন খলিফা। তারপর তাকে হত্যা করলেন এক বর্বর পন্থায়।'

কান্নার গমকে হারিয়ে গেলো সুলতানের ভাষা। নীরব হলেন তিনি। হাজার হাজার শহীদের লাশ দেখলে সুলতানের চোখে ফুটে উঠতো অপার্থিব আলো। কিন্তু একজন গাদ্দারের মৃতদেহ দেখলে কেঁদে ফেলতেন তিনি।

নীরবতা ভেঙে সুলতান আবার বললেন, 'মুহম্মদ বিন কাশিমকে নিজের জাতি হত্যা করলেও শত্রুরা তাকে বিজয়ী হিসেবে বরণ করে নিয়েছে।'

বলতে বলতে আবারো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন সুলতান। অথচ তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি অতীতকে ভুলতেন না, তবে তার দূরদৃষ্টি আটকে থাকতো সোনালী ভবিষ্যতের প্রচ্ছদপটে।

'খৃষ্টানদের দৃষ্টি আমাদের ভবিষ্যতের ওপর নিবদ্ধ। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প নিয়ে মাঠে নেমেছে খৃষ্টান শাসক এবং সেনাপতিরা। ওরা আমাদের দেশ নয়, দখল করতে চায় আমাদের ঈমান।

আমাদের গোয়েন্দারা বলেছে, ইসলামের সবচে বড় দুশমন সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস। তার কথা হচ্ছে, 'আমার জাতির একটা বড় উদ্দেশ্য রয়েছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম এ উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর থাকবে। এ বিজয় তরবারীর জোরে হবে এমন কোন কথা নেই। ওদের চিন্তা চেতনা এবং সংস্কৃতি বদলে দিতে পারলেই আমরা বিজয়ী।'

'তকিউদ্দিন, খৃষ্টানদের মতো আমাদের দৃষ্টিও ভবিষ্যতের ওপর নিবদ্ধ থাকবে। ওরা আমাদের মধ্যে গাদ্দার তৈরী করছে। আমরা গাদ্দারীর জীবাণু চিরদিনের জন্য নিঃশেষ করে দেবো। গাদ্দার হত্যা করলেই এ পথ রুদ্ধ হবে না বরং বন্ধ করতে হবে গাদ্দার তৈরীর সকল কারখানা।

মানুষের মধ্যে শুধু আল্লাহ এবং নবীর ভালবাসা সৃষ্টি করলেই এ পথ বন্ধ হবে। মানুষকে বুঝাতে হবে খৃষ্টানদের সভ্যতা সংস্কৃতি আর আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি এক নয়। বেলেল্লাপনা এবং উলঙ্গ নৃত্য ওদের সংস্কৃতি। মদ এবং ব্যভিচার ওদের কৃষ্টি। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ওদের সৌন্দর্য।

ওদের আর আমাদের মাঝে বড় পার্থক্য হলো, আমরা ইজ্জত-আব্রুর রক্ষক আর ওরা তা দিয়ে ব্যবসা করে। আফসোস! আমাদের মুসলমান ভায়েরা এ পার্থক্য আজ এমনভাবে মুছে দিচ্ছে যে, আচরণ দেখে বুঝার উপায় থাকে না, কে মুসলমান আর কে খৃষ্টান।

তকিউদ্দিন! তোমাকে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দুটো ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে হবে। সামনাসামনি যুদ্ধ করবে শত্রুর সাথে, আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ হবে নিজেদের প্রতিকূলে। আমাদের মধ্যে গাদ্দার তৈরী না হলে এতদিনে আমরা থাকতাম মধ্য ইউরোপে। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে সুন্দরী যুবতীদের পরিবর্তে ব্যবহার করতো অন্য অস্ত্র। ঈমান দৃঢ় হলে

তার আগুনে পুড়ে মরতো সমগ্র খৃষ্টান জগত।'

'আপনি কি সমস্যায় রয়েছেন এখানে এসে আমি বুঝতে পেরেছি।' তকিউদ্দিন বললেন, 'আপনি যে গাদ্দারদের বেষ্টনীর মধ্যে আছেন হয়তো নুরুদ্দিন জঙ্গীও তা জানেন না। তার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালে ভাল হয় না?'

'তকিউদ্দিন, ভাই আমার! সাহায্য শুধু আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাইতে গেলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। খৃষ্টান বাহিনী বর্মাচ্ছাদিত। আমার সৈন্যরা সাধারণ কাপড় পরে মাঠে নেমেও ওদের পরাজিত করে। লোহার মতো মজবুত ঈমান হলে বর্মের প্রয়োজন নেই। বর্ম এবং পরিখা নিরাপত্তার অনুভূতি সৃষ্টি করে, ফলে সৈন্যরা নিজেই নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে। মনে রেখো! ময়দানে পরিখার বাইরে থেকে এদিক ওদিক ঘুরে যুদ্ধ করতে হয়।

কখনো শত্রুকে পিঠ দেখাবে না, সতর্ক থাকবে যেন শত্রু পেছন থেকে হামলা করতে না পারে। সেনাবাহিনীর কেন্দ্র অক্ষত রেখো। দুপাশে ছড়িয়ে শত্রুকে ঘেরাও করো।

গোয়েন্দা বাহিনীর পরামর্শ ছাড়া যুদ্ধ করো না। কমাণ্ডো হামলা করে শত্রুর রসদ ধ্বংস করে দিও। শত্রুর রসদ আসার পথ বন্ধ করে দেয়া, শত্রুর বাহন হত্যা করে ওদের ভয় পাইয়ে দেয়া এসবই কমাণ্ডো বাহিনীর কাজ।

কখনো শক্তি সঞ্চয় না করে নিয়মিত লড়াইয়ে যাবে না। আত্মরক্ষামূলক লড়াই না করে উল্টো সব সময় শত্রুকে ব্যস্ত রাখবে যেন ওরা সুস্থির হতে না পারে।

এখানে যে সব সৈন্য রেখে যাচ্ছি ওরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এসেছে। এরাই পদানত করেছে সুবাক দুর্গ। শত্রুর চোখে চোখ রেখে যুদ্ধ করেছে এরা। ভাইকে শহীদ হতে দেখেছে চোখের সামনে। এদের সাথে রয়েছে সে কমাণ্ডো বাহিনী, সামান্য ইশারা পেলে যারা নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে পারে। আমি যাদের রেখে যাচ্ছি ওদের ভেতর রয়েছে ঈমানের অনির্বাণ দীপশিখা। নিজে সম্রাট সেজে ওদের ঈমানের উষ্ণতা নষ্ট করো না।

খৃষ্টানরা আমাদের ঈমানের ওপর আঘাত করছে। তীব্র গতিতে মিশরের দিকে ধেয়ে আসছে ওদের অপসংস্কৃতির ঝড়। অপসংস্কৃতির এ ঝড় রোধ করতে না পারলে ঈমান টিকিয়ে রাখা যাবে না। ফলে সাংস্কৃতিক লড়াই অস্ত্রের লড়াইয়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। একে অবহেলা করে যতোই অস্ত্রের লড়াই জারী রাখো বিজয়ের নাগাল পাবে না কখনো। মনে রেখো, সাংস্কৃতিক সীমানা টিকিয়ে রাখতে না পারলে কোন রাজনৈতিক বিজয়ই টিকে থাকে না।'

সুলতান ছোট ভাইকে বুঝিয়ে বললেন, 'সুদানে মিশর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। মিশরের পালিয়ে যাওয়া বিদ্রোহী সৈন্যও রয়েছে ওদের সাথে। কিন্তু ঘরে বসে শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষা করো না। গোয়েন্দারা সব সময় তোমাকে সংবাদ দিতে থাকবে। ওদের নেতা হাসান থাকবে তোমার সাথে।

শত্রুর প্রতিটি চাল সম্পর্কে সচেতন থাকবে। প্রতিপক্ষের তৎপরতা ও গতিবিধি সম্পর্কে সব সময় সুস্পষ্ট ধারনা যে কোন বিজয়ের পূর্বশর্ত। যদি মনে করো শত্রু আক্রমণের জন্য প্রস্তুত, সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করবে। তবে পেছনের ব্যবস্থাপনা অবশ্যই

মজবুত রাখতে হবে। যুদ্ধ ক্ষেত্র সম্পর্কে জাতিকে অন্ধকারে রেখো না। খোদা না করুন পরাজিত হলে নিজের ভুল স্বীকার করবে। জনগণের সামনে এর কারণ ব্যাখ্যা করবে।

সাধারণ মানুষের রক্ত এবং অর্থ দিয়ে যুদ্ধ করা হয়। নিহত বা আহত হয় জাতির সন্তানেরা। এ জন্য জাতির আস্থা অর্জন করতে হবে। যুদ্ধকে রাজা-বাদশার খেলা মনে করো না। এটা একটা জাতীয় সমস্যা। এ জন্য সবসময় জনসমর্থন প্রয়োজন।

মনে রেখো, জনগণকে ভালবেসেই জনগণের আস্থা অর্জন করতে হয়। তোমার ভালবাসা নিখাদ হলে জনগণ তোমাকে ভাল না বেসে পারবে না। জনগণের ভালবাসা অর্জন করার এটাই একমাত্র পথ।

আমি ফাতেমী খেলাফতকে পদচ্যুত করেছি। তার অনুসারীরা আমার বিরুদ্ধে তৎপর। শুনেছি তারা গোপনে একজন খলিফা নিয়োগ করেছে। আল আয়েদ মরে গেলেও ক্ষমতালোভীরা বেঁচে আছে। সুদানীদের দিয়ে ওরা গদি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। ফাতেমীরা ঘাতক দলের সমর্থন পাচ্ছে। আমি আলীকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি, হাসান এবং পুলিশ প্রধান তোমার সাথে থাকবে। ফৌজে নতুন ভর্তি আরো জোরদার করো। ওদের প্রশিক্ষণ দাও।'

'মহামান্য সুলতান, ইদানিং মিশরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীতে নতুন ভর্তি হচ্ছে না।' হাসান বললেন, 'এলাকার লোকজনও সেনাবাহিনীর ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছে।'

'এর কারণ অনুসন্ধান করেছো?' আলীর প্রশ্ন।

'আমার দু'জন গুপ্তচর ওখানে নিহত হয়েছে। আমি নতুন গোয়েন্দা পাঠিয়েছি।'

'আমি আমার মতো চেষ্টা করছি।' বললেন পুলিশ প্রধান। 'সম্ভবত সে অঞ্চলের লোকজন নতুন কোন কুসংস্কারের পাল্লায় পড়েছে। ওখানে যাতায়াত খুব কষ্টসাধ্য। এলাকার লোকজন কষ্ট সহিষ্ণু হলেও কুসংস্কারে বিশ্বাসী।'

'কুসংস্কার এক গজব।' সুলতান বললেন, 'সে অঞ্চলের ওপর কঠোর দৃষ্টি রেখো। ওদেরকে কুসংস্কার থেকে রক্ষা করা তোমাদের দায়িত্ব।'

ক্রাক দুর্গে জরুরী মিটিং চলছে। এতে উপস্থিত রয়েছেন কয়েকজন খৃষ্টান সম্রাট এবং পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা। সুবাক হাতছাড়া হয়ে গেছে, ক্রাকও মুসলমানদের দখলে চলে গেলে জেরুজালেম রক্ষা করা যাবে না।

ওরা বুঝতে পেরেছে, পূর্ণ প্রস্তুতির জন্য আইয়ুবী কিছুটা সময় নিচ্ছে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেই আইয়ুবী চূড়ান্ত আক্রমণ করবে। তার আগ পর্যন্ত থেমে থেমে আক্রমণ চালাতে থাকবে সে। এ জন্য ক্রাকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হচ্ছে। দুর্গের বাইরে এসে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু সে পরিকল্পনায় কিছুটা রদবদল আনতে হচ্ছে।

গোয়েন্দারা বলেছে, 'এখানকার ফৌজ মিশরে নিয়ে মিশরের বাহিনীকে সুলতান রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে নূরুদ্দিন জঙ্গীর সেনা সাহায্যও পৌঁছে গেছে তার কাছে। মিশরের ভারাপ্রাপ্ত গভর্ণর হয়েছেন আইয়ুবীর ভাই তকিউদ্দিন। আইয়ুবী নিজে

মিশর গিয়ে বিদ্রোহ দমন করেছেন। বিদ্রোহীদের দেয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড।'

গোয়েন্দাদের দেয়া এ সংবাদে খৃস্টান সম্রাটরা বিচলিত হলেন। আহত হলেন বিশ্বস্ত এজেন্ট মুসলেহ উদ্দিনের মৃত্যুতে। মিশরের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোয়েন্দা প্রধান হরমুন বললেন, 'মুসলেহ উদ্দিনের মৃত্যু ক্ষতিকর হলেও তকিউদ্দিনের ক্ষমতা গ্রহণ আমাদের জন্য আশাব্যাঞ্জক। সে আইয়ুবীর ভাই হলেও আইয়ুবী নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে আমার গোয়েন্দাদের জালে ধরা দেবে। সালাহউদ্দিন এবং আলী দু'জনের কেউ মিশর নেই।'

'আমি আশ্চর্য হচ্ছি, ঘাতক দল কি করছে?' বললেন রিমাণ্ড। 'ওরা আবার দু'পক্ষেরই কাজ করছে নাতো? হারামীরা এখনো আইয়ুবীকে হত্যা করতে পারলো না। অথচ ওদের পেছনে এ পর্যন্ত আমাদের অনেক টাকা নষ্ট হয়েছে।'

'টাকা নষ্ট হয়নি।' হরমুন বললেন, 'দেখবেন সালাহউদ্দিন যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কায়রো যাবার সময় তার সাথে ছিল কুড়িজন দেহরক্ষী। এদের চারজন ঘাতক দলের সদস্য। আইয়ুবীকে যেন পথেই শেষ করে দিতে পারে আমি সে ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

'মিথ্যে আশায় বসে থাকা উচিত নয়।' বললেন ফিলিপ অগাস্টাস। 'আইয়ুবী নিরাপদে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছবে এ ধারণা করেই এখন পরিকল্পনা করতে হবে। তার সাথে রয়েছে নতুন সৈন্য। আনকোরা সৈনিকদেরও ট্রেনিং দেয়া শেষ। নূরুদ্দিন জঙ্গীর পাঠানো সৈন্যও পৌঁছে গেছে। সুবাকের মতো শক্তিশালী দুর্গ তার হাতে। এখন রসদপত্র কায়রো থেকে আনতে হবে না, সুবাকে প্রচুর রসদ জমা করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কি? সে ক্রাক অবরোধ করুক, আর আমরা অবরুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করি, এ সুযোগ তাকে আমি দিতে চাই না।'

'অবরোধ করার সুযোগই সে পাবে না।' বললেন একজন সেনা কমাণ্ডার, 'আমরা দুর্গের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করবো এবং সুবাক অবরোধ করবো।'

'সালাহউদ্দিন মরুর শিয়াল।' বললেন ফিলিপ, 'তাকে মরুভূমিতে পরাজিত করা সহজ নয়। সে আমাদেরকে সুবাক অবরোধ করার সুযোগ দিয়ে আমাদেরকেই অবরোধ করবে। আপনারা তার যুদ্ধ পলিসি এখনো বুঝতে পারেননি। যদি তাকে মুখোমুখি এনে লড়াই করা যায় তবে আমি বিজয়ের নিশ্চয়তা দিতে পারি। কিন্তু আপনারা তা পারবেন না। আইয়ুবী কখনোই সামনাসামনি যুদ্ধ করবে না।'

এ বিষয়ের ওপর কথা হলো দীর্ঘক্ষণ। সিদ্ধান্ত হলো অর্ধেক ফৌজ দুর্গের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ওরা মুসলিম বাহিনীর একটু দূরে তাঁবু ফেলে তাদের গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখবে। এদের সংখ্যা হবে মুসলিম ফৌজের দ্বিগুণ।

আইয়ুবীকে পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্য একদল সৈন্যকে নির্ধারণ করা হলো। সুবাক থেকে মুসলিম ফৌজের কাছে রসদ আসার পথে পাঠিয়ে দেয়া হলো কয়েক প্লাটুন সৈন্য। কমাণ্ডারদের অভিমত হলো, প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে নিরুপায় হয়ে আইয়ুবী মুখোমুখি লড়াইয়ে বাধ্য হবে।

খৃস্টান সেনানায়করা লৌহ বর্ম পরিহিত সৈন্যদের ওপর নির্ভর করছিলেন। তাদের

বেশীর ভাগ ফৌজই ছিল বর্ম পরিহিত। এমনকি উটগুলোকেও বর্ম পরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

যুদ্ধের জন্য ওরা ঘোড়া সংগ্রহ করেছিল ইউরোপ থেকে। কিছু ছিল আরবী ঘোড়া। আরবী ঘোড়াগুলো ওরা সংগ্রহ করেছিল মুসলিম সৈন্য ও কাফেলা থেকে চুরি করে। সুলতান আইয়ুবীর সব কটা ঘোড়াই ছিল আরবী। সামরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রও অব্যাহত রইলো।

'সুলতান আইয়ুবী মিশরের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত এলাকাতে নতুন ভর্তির কোন লোক পাবে না।' বললেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন। 'ওরা প্রকৃতিগতভাবেই যুদ্ধবাজ এবং পরিশ্রমী। আমরা ওখানে নীরবে কাজ করেছি। সে এলাকার লোকজন এখন যুদ্ধের বিরোধিতা করছে।

আমাদের গোয়েন্দাদের জন্য এলাকাটি মজবুত দুর্গের কাজ করছে। মুসলমানদের দু'জন গোয়েন্দাকে ওখানে গায়েব করে ফেলা হয়েছে। আমরা এখন সীমান্তের এলাকাগুলোতে কাজ করবো। ধীরে ধীরে এর প্রভাব পড়বে মিশরের কেন্দ্রে।

আমি এসব অঞ্চলে মুসলমানদের একটা দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছি। ওরা পীর, ফকির এবং দরবেশদের ভীষণ শ্রদ্ধা করে। কাউকে তসবিহ নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করতে দেখলে তার ভক্ত হয়ে যায়। তলিয়ে দেখে না ওরা খাঁটি কি অখাঁটি। এ সব পীর, ফকীর এবং দরবেশরা ইসলামী আন্দোলন এবং জেহাদের বিরোধী।

যদি কোনক্রমে বিশ্বাস করানো যায় এসব ফকীরদের সাথে খোদার সম্পর্ক রয়েছে, ব্যস, দলে দলে লোক পানি পড়া, তেল পড়া এবং তাবিজ কবজের জন্য ওদের পিছু নেবে। মুসলিম বাহিনী ঘাম এবং রক্ত দিয়ে যে সুনাম অর্জন করছে এসব পীর-ফকীর তা বরদাশত করতে পারে না।

ওরা আন্দোলনের নাম শুনলে ভড়কে যায়, সন্ত্রস্ত হয় জিহাদের নামে। সুলতান এবং নূরুদ্দিন জঙ্গী মুসলিম সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র। অন্যদিকে খলিফাদের কার্যকলাপে সচেতন মানুষ বীতশ্রদ্ধ।

আমরা আমাদের পোষা আলেমদের মাধ্যমে কৌশলে তাদের মধ্যে একদল আলেম গড়ে তুলেছি, যারা ময়দানকে ভয় পায়। এরা খলিফার অনুগত। খলিফার সহযোগিতায় এরা জিহাদের অর্থ বদলে দিচ্ছে। রাজনীতিকে হারাম বলে ফতোয়া দিচ্ছে। মানুষকে ইসলামের জিহাদী জযবা থেকে বিমুখ করে নিজের স্বার্থ হাসিল করছে।

এরা কথা বলে বিশেষ পদ্ধতিতে। সাধারণ মানুষ মনে করে আল্লাহ যে সব গোপন রহস্য অন্যকে জানাননি এরা তা জানেন। সাধারণ মুসলমান সহজেই এসব পীর ফকির এবং দরবেশের ফাঁদে আটকা পড়ছে।

আপনারা জানেন, দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হলে তা মরা লাশে পরিণত হয়। ইসলামের আত্মা হলো জিহাদ। আমি ইসলামের দেহ থেকে আত্মাটা বিচ্ছিন্ন করে লাশটা তুলে দিয়েছি এসব আলেমদের হাতে।

এসব আলেম এবং পীর ফকিররা ইসলামের নামে মুসলমানদেরকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ইহুদীরা

মুসলমানদের ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে, আমিও একটু ভিন্ন কায়দায় তাদের পথেই এগিয়ে যাচ্ছি।'

খৃষ্টানদের এ তৎপরতা নিয়ে সুলতান উদ্বিগ্ন ছিলেন। স্বজাতির লোকেরা অদৃশ্যে থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এ রণক্ষেত্রের দুশমন সুলতানের চোখের সামনে নেই। সরাসরি ওদের সাথে কোন যুদ্ধ হচ্ছে না, কিন্তু দৃশ্যমান শত্রু একজনকে শহীদ করার সুযোগ পাওয়ার আগেই এরা একশ' জনকে বিভ্রান্ত করে ফেলতে পারছে।

ছোট ভাই এবং কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সুলতান রণক্ষেত্রে রওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে চব্বিশজন দেহরক্ষী। খৃষ্টান গোয়েন্দারা যথা সময়ে এ খবর জানতে পারলো।

চাতুর্যের সাথে ঘাতক দলের চারজন সদস্য দেহরক্ষী পদে চাকুরী নিয়েছিল। সুলতানকে হত্যা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সুযোগ হচ্ছে না। কারণ, চারজনের ডিউটি একত্রে পড়ে না। তাছাড়া সব সময় কমপক্ষে দশজন পাহারায় থাকে।

রক্ষীদের কমাণ্ডার ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক এবং বুদ্ধিমান। রক্ষী দলে ঘাপটি মেরে আছে ঘাতকদের চারজন সদস্য, জানতেন না তিনি। সুলতান সফরে, সুতরাং তিনি আরো বেশী সতর্ক। সঙ্গে আরো বেশী রক্ষী নিতে চেয়েছিলেন কমাণ্ডার। সুলতানের আপত্তির জন্য রক্ষীদের সংখ্যা বাড়ানো যায়নি।

কায়রো থেকে সুলতানের যাত্রা শুরু হয়েছিল বিকেলে। সফর চললো মাঝ রাত পর্যন্ত। এরপর বিশ্রাম। ভোর রাতে আবার যাত্রা শুরু হলো। দুপুরের মরু রোদে ক্লান্ত হয়ে পড়লো ঘোড়াগুলো। পানি, ছায়াদার বৃক্ষ এবং টিলা দেখে থামলো কাফেলা। তাঁবু টানানো হলো সুলতানের জন্য।

রক্ষীদের দু'জন তাঁবুর সামনে, দু'জন পেছনে। অন্যরা ধারে কাছে ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। কয়েকজন ঘোড়াকে পানি খাওয়াতে ব্যস্ত। আলী বিন সুফিয়ান এবং সুলতানের অন্য সঙ্গীরা তাঁবু টানাননি। একটা টিলার পাশে গাছের ছায়ায় সবাই শুয়ে পড়েছেন। ঝোপ ঝাড়ের কারণে সুলতানের তাঁবু ছিল দৃষ্টির আড়ালে। উত্তাপ ছড়াচ্ছে মরু সূর্য। যে যেখানে পারছে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে।

এই প্রথম এক সঙ্গে সুলতানের তাঁবুর প্রহরায় এসেছে ঘাতক দলের দু'জন সদস্য। বাকী রক্ষীরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। সহিসরাও উট এবং ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছে। ঘাতক দলের অন্য দুই সদস্য বাকী রক্ষীদের সাথে।

পাহারারত দু' সৈনিকের একজন তাঁবুর পর্দা ঈষৎ ফাঁক করলো। চকিতে ফিরে তাকালো দ্বিতীয় প্রহরীর দিকে। সুলতান ঘুমিয়ে আছেন। পিঠ তাঁবুর দরজার দিকে।

প্রহরী হাতের বর্শা তাঁবুর বাইরে রেখে আলতো পায়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। খাপে ভরা তরবারী, খঞ্জরও হাতে নেয়নি। এ প্রহরী অন্যদের চাইতে শক্তিমান, বয়সে যুবক। শরীরে অসুরের শক্তি। সতর্ক পায়ে সে এগিয়ে গেলো ঘুমন্ত সুলতানের কাছে।

আচমকা সে দু'হাতে চেপে ধরলো সুলতানের গলা। সুলতান ঘুমাননি, জেগেই ছিলেন তিনি। পাশ ফেরার সময় টের পেলেন দুটো লৌহ কঠিন হাত গলায় চেপে

বসছে।

আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র। এরপর চিরদিনের জন্য নিভে যাবে তাঁর জীবনের আলো। উপুড় হয়ে পড়ে আছেন তিনি। ঘাতক সুলতানের পিঠ হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে ঘাড় থেকে একটা হাত সরিয়ে নিল। আরেক হাত তখনো চেপে ধরে আছে সুলতানের ঘাড়। লোকটি কোমরের বেল্ট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বের করলো। প্যাকেটের মুখ খুলে ভেতরের পাউডার ঢেলে দিতে চাইলো সুলতানের মুখে।

লোকটার গায়ে অসুরের শক্তি। অসহায়ের মতো পড়ে আছেন সুলতান। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঘাতকের হাতে প্যাকেট দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন লোকটা তাকে বিষ খাওয়াতে চাচ্ছে। মুখ বন্ধ করে ফেললেন তিনি।

বিষ খাওয়ানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো প্রহরী। এ ফাঁকে কোমর থেকে খঞ্জর খুলে নিলেন সুলতান। ঢুকিয়ে দিলেন লোকটার পাঁজরে। বের করে আবার আঘাত করলেন। ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী প্রহরী এতেও কাবু হলো না।

সুলতান খঞ্জর বের না করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লোকটার অন্ত্রনালী কেটে ফেললেন। ঢিলে হয়ে গেলো আক্রমণকারীর হাত। পড়ে গেলো হাত থেকে কাগজের প্যাকেট। ধাক্কা দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ালেন সুলতান। লোকটা পড়ে গেলো নিচে। ক্ষতস্থানে হাত চেপে পড়ে আছে, উঠার সাধ্য নেই।

পতনের শব্দে দ্বিতীয় প্রহরী তাঁবুর ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলো। সঙ্গীর অবস্থা দেখে তরবারী নিয়ে ছুটে এলো। আঘাত করলো সুলতানকে লক্ষ্য করে। চকিতে জায়গা বদল করে আঘাত ঠেকালেন সুলতান। সুলতান যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার পাশের খুঁটিতে আটকে গেল তরবারী। এ সুযোগে সুলতান প্রহরীকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করলেন। দেহ বাঁকিয়ে আঘাত এড়ালো প্রহরী। সুলতান উচ্চস্বরে কমাণ্ডারকে ডাকলেন। এ সময় দ্বিতীয় আঘাত করলো প্রহরী।

দ্রুত সরে আক্রমণকারীর পাশে চলে এলেন সুলতান। আঘাত করলেন পাঁজরে। আমূল ঢুকে গেলো খঞ্জর। দলের বাকী দু'জন তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সুলতানের ডাক শুনে তারা ছুটে ভেতরে এলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো সুলতানের ওপর। সুলতান সাহস হারালেন না। তিনজনের বিরুদ্ধে একা লড়ে যেতে লাগলেন।

কয়েকজন প্রহরী নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন কমাণ্ডার। ঢুকেই আক্রমণকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একপাশে সরে দাঁড়ালেন সুলতান। মনে পড়লো, এর আগেও তিনি এমনি এক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন।

দাঁড়িয়ে দু'দল প্রহরীর যুদ্ধ দেখতে লাগলেন সুলতান। শোরগোল শুনে আলী এবং তার সঙ্গীরাও ছুটে এলেন। পরিস্থিতি দেখে বিবর্ণ হয়ে গেলো আলীর চেহারা।

রক্তাক্ত চার প্রহরী মাটিতে পড়ে আছে। মারা গেছে দু'জন। তৃতীয় জন জ্ঞান হারিয়েছে। পাঁজর থেকে পেট পর্যন্ত ফাঁড়া। বুকে গভীর ক্ষত। চতুর্থ জনের আঘাত লেগেছে পেটে এবং উরুতে। হাত জোড় করে সে জীবন ভিক্ষা চাইতে লাগলো। 'আমি বেঁচে থাকতে চাই। আমার বোনের জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে দিন। ক্ষমা করুন আমায়।'

সুলতান ইঙ্গিতে প্রহরীদের থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওকে মেরো না। চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।'

একটু পর তৃতীয় প্রহরীরও জ্ঞান ফিরে এলো। এক দেহরক্ষী এগিয়ে ওর বসিয়ে দিল। ব্যক্তিগত চিকিৎসককে ডাকলেন সুলতান। বললেন, 'যে কোন বাঁচাও। চিকিৎসার কোন ত্রুটি যেন না হয়।'

সুলতান সম্পূর্ণ সুস্থ। একটা আঁচড়ও লাগেনি তাঁর গায়ে। তাকে দেখে যেন কিছুই হয়নি। মৃদু হেসে বললেন, 'আমি আশ্চর্য হইনি। এমনটি হওয়ারই

আলীর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কপালে চিন্তার বলিরেখা। চেহারা সুলতানের দেহরক্ষী নির্বাচন করার দায়িত্ব তার। দলের অন্যান্য সদস্যরা বি এখনই দেখা উচিত।

সুলতানের বিছানা থেকে ঘাতকের হাত থেকে পড়ে যাওয়া কাগজের প্যা নিলেন ডাক্তার। পরীক্ষা করে বললেন, 'ভয়ংকর বিষ। এর সামান্য পাউডার খাওয়াতে পারলে মৃত্যু অনিবার্য।'

ডাক্তারের নির্দেশে বিছানা বাইরে নিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে আনা হলো। প্রহরীকে তুলে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন সুলতান। পেটের চাইতে তার উরুর বেশী মারাত্মক। প্রহরী হাত জোড় করে সুলতানের কাছে জীবন ভিক্ষা চাইতে লাগ

সুলতানের সাথে তার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই। সে একজন ভাড়াটিয়া ক্ষতস্থানের ব্যথার চাইতে সে বেশী কাঁদছিল অবিবাহিত বোনের জন্য। বোনে নিচ্ছিল বারবার।

'মহামান্য সুলতান।' বললো সে, 'আমি একজন মুসলমান। ক্ষমা করুন আ আমার জন্য না হলেও আপনার একজন মুসলিম বোনের জন্য আমাকে মার্জনা করুন

'জীবন এবং মৃত্যু আল্লাহর হাতে।' দৃঢ় অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান। মারে কে বাঁচায় দেখলে তো? কিন্তু আমার বন্ধু! এ মুহূর্তে আমার হাতে তোমার তুমি দেখতে পাচ্ছো। কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে নিজের পাপের দিকে তাকাও। কত অসহায় তুমি।

তোমার মৃত সঙ্গীদের সাথে মরুভূমিতে ফেলে যাবো তোমাকে, মারবো শিয়াল-শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে তোমার মাংস। তোমার জ্ঞান থাকবে, কিন্তু পা পারবে না, এক সময় মরে যাবে। এভাবেই পাবে তোমার পাপের শাস্তি।'

হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো প্রহরী। আঁকড়ে ধরতে চাইলো সুলতানের হাত।

'কে তুমি?' প্রশ্ন করলেন সুলতান, 'কোত্থেকে এসেছো? আমার সাথে তোমা কিসের শত্রুতা?'

'আমি ফাতেমীদের লোক। আমরা চারজনই ঘাতক দলের সদস্য। তিন বছর প আপনার সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিলাম। কিভাবে আপনার দেহরক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত হও যায় আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল।'

প্রহরীর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো অনেক মূল্যবান তথ্য।

একদিকে ডাক্তার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করছেন, অন্যদিকে লোকটি বলে যাচ্ছে

ফাতেমী খেলাফতের পতনের পর থেকে এ পর্যন্ত আইয়ুবীর বিরুদ্ধে কি কি ষড়যন্ত্র করেছে, কি চুক্তি হয়েছে খৃষ্টান এবং ঘাতক দলের সাথে সব কথাই সে বললো।

ডাক্তার ব্যান্ডেজ শেষ করেছেন।

লাশগুলো বাইরে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন সুলতান। আলীকে বললেন, আহত প্রহরীকে এখান থেকেই কায়রো নিয়ে যেতে। বললেন, 'প্রহরী ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত যে সব লোকের নাম করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও।'

সাথে সাথে আহত প্রহরীকে নিয়ে উটে চাপলেন আলী। ছুটলেন কায়রোর দিকে।

মিশরের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত এলাকা। এরপরই সুদানের বর্ডার। এখানে রয়েছে পুরনো পোড়োবাড়ী। শত শত বছরের অব্যবহৃত বাড়ীগুলো ভয়ংকর এবং দুর্গম।

হয়তো ফেরাউনদের সময় এ এলাকা ছিল সবুজ শ্যামল। এখানে ছিল পানির ঝর্ণা। শুকনো ঝিল আর পানি শূন্য নদী তার সাক্ষ্য বহন করছে। এখানে ছিল পাথুরে পর্বত আর বালিয়াড়ি। পর্বতগুলো দেখতে ছিল বিশাল অট্টালিকার মতো। থামের মতো পর্বতশৃঙ্গ। কোথাও দেয়ালের মতো খাঁড়া হয়ে আছে শৃঙ্গগুলো। সমতল ভূমিতে বালি আর বালি।

চল্লিশ মাইল লম্বা এবং বার মাইল চওড়া এ অঞ্চল জুড়ে জনবসতিও রয়েছে। জনসংখ্যার বেশীর ভাগ মুসলমান। অন্য ধর্মেরও কিছু লোক আছে। সবাই কুসংস্কারে বিশ্বাসী। এলাকার যেখানে পানি আছে সেখানেই আছে গাছ-গাছালি ও বৃক্ষলতা। অধিবাসীদের পেশা কৃষি।

ফারাওদের এসব অট্টালিকাকে মানুষ ভয় পেতো। লোকজন ভুলেও মাড়াতো না তার আশপাশ। তাদের বিশ্বাস, এখানে থাকে ফেরাউনদের অতৃপ্ত আত্মা। দিনের বেলা পশুর রূপ ধরে ওরা ঘুরে বেড়ায়। ওদের কখনো দেখা যায় উষ্ট্রারোহী সৈনিকের বেশে, আবার কখনো সুন্দরী যুবতীর রূপে। কখনো শোনা যায় ভয়ংকর শব্দ।

বছর খানেক থেকে এসব পোড়োবাড়ী মানুষকে আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। মুসলিম সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তির জন্য আইয়ুবীর লোকজন যখন ওখানে গেলো, এলাকার লোকজন তাদেরকে পোড়োবাড়ী সম্পর্কে ভয়ংকর সব গল্প শোনালো। ওরা ওখানে যেতে নিষেধ করলো তাদের।

প্রথমবার সেনাবাহিনীতে ভর্তির পরিমাণ আশানুরূপ হলেও পরের বার চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো। ঘোষণা শুনেও কেউ সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতে এলো না। যারা সৈন্য ভর্তি করতে গিয়েছিল তারা জানতে পারলো, ইদানিং সীমান্ত প্রহরীরাও ভয়ে পোড়োবাড়ীর পথ মাড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে। ওরা কোন মানুষকে পোড়োবাড়ীর দিকে যেতে দেখেনি। সৈন্য ভর্তি না হওয়ায় দলটি ক'দিন পরই ফিরে যায়।

নির্বিঘ্নেই সময় কেটে যাচ্ছিল। কয়েক সপ্তাহ পর আরো একটি দলকে পাঠালেন আলী বিন সুফিয়ান। বললেন, 'সৈন্য ভর্তির জন্যই তোমরা ওখানে যাচ্ছো। কিন্তু লোকজন সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে না চাইলে জবরদস্তির কিছু নেই। সে ক্ষেত্রে তোমাদের কাজ হবে এর রহস্য খুঁজে বের করা। রহস্য উদ্ধার না করে তোমাদের কেউ যেন ফিরে না আসে।'

ওরা সেই অঞ্চলে গিয়েই টের পেলো, ইদানীং ওই পোড়োবাড়ীতে অত্যন্ত সন্তর্পনে লোকজনের যাতায়াত শুরু হয়েছে। ওরা ওখান থেকে যখন ফিরে আসে, ওদের চোখে মুখে থাকে তৃপ্তি। দেখতে দেখতে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ওখানে মেলা বসতে শুরু করেছে। ঘটছে আশ্চর্য সব ঘটনা। সেদিন পাঁচজন সীমান্ত রক্ষী টহল দিতে দিতে পোড়োবাড়ীর কাছে গেলো, কিন্তু তারপর কি যে হলো, ওদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সমগ্র মিশরে ছড়িয়ে ছিল সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বাহিনী। রহস্যঘেরা পোড়োবাড়ী সম্পর্কে ওরা কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠালো। রিপোর্টে বলা হলো, 'এ অঞ্চলের মানুষের চিন্তাধারা বদলে যাচ্ছে। মুসলিম সেনাবাহিনীকে ওরা ঘৃণার চোখে দেখে। সুলতান আইয়ুবীর নামও ওরা শুনতে চায় না।'

এ রিপোর্ট পাঠানোর পর দু'জন গোয়েন্দা কর্মী নিহত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, গোপনে হত্যা করা হয়েছে ওদের।

ধীরে ধীরে এ অঞ্চলের লোকজন ভয়ংকর পোড়োবাড়ীতে যাওয়া আসা শুরু করলো। অথচ ক'দিন আগেও ওই স্থানের নাম শুনলে ভয়ে আঁতকে উঠতো সবাই।

শুরুটা ছিল এভাবে, একদিন গাঁয়ে এলো একজন অপরিচিত উষ্ট্রারোহী। লোকটি মিশরীয় মুসলমান। উটের মতো তার চেহারাও নাদুশ নুদুশ। গাঁয়ের লোকদের একত্রিত করে সে বললো, 'আমি অর্থ কষ্টে ছিলাম। দিনে একবেলার আহার জোটাতে পারতাম না। সিদ্ধান্ত নিলাম ডাকাতি করবো। বাড়ী থেকে বের হলাম। বাহন নেই, পায়দল হাঁটতে লাগলাম।

এ এলাকায় জনবসতি কম। ভাবলাম ডাকাতি করে এখানে নিরাপদে লুকিয়ে থাকতে পারবো, ধরা পড়ার ভয় থাকবে না। অনেকদিন ঘোরাঘুরি করলাম। কিন্তু কোন শিকার পেলাম না।

হাঁটতে হাঁটতে পোড়োবাড়ী এলাকায় একটা পাহাড়ের কাছে পড়ে গেলাম। দেহে শক্তি নেই। অনেক কষ্টে দু'হাত ওপরে তুলে আল্লাহর সাহায্য চাইলাম। কানে ভেসে এলো এক গুরুগম্ভীর শব্দ, 'তুমি ভাগ্যবান, এখনো কোন পাপ করোনি, পাপের ইচ্ছে করেছো মাত্র। ডাকাতি করে এখানে এলে এতক্ষণে দেহের পরিবর্তে কঙ্কালের খাঁচা পড়ে থাকতো। পাহাড়ী জন্তু জানোয়ার তোমার গোশত ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতো।'

সে বললো, 'শব্দ শুনে আমি আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। মনে হলো কে যেন আমাকে টেনে তুলছে। চোখ খুলে দেখলাম এক আজব দৃশ্য। সেখানে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। দেখলাম দুধ সাদা শুভ্র শুশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধকে। বৃদ্ধের দু'চোখ থেকে আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। তাহলে এ বৃদ্ধের কণ্ঠই শুনেছি আমি?

ভয়ে কাঁপতে লাগলাম আমি। বৃদ্ধ দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'কোন ভয় নেই পথিক। যারা এখানে আসতে ভয় পায় ওরা হতভাগা। শয়তান ওদেরকে এখানে আসতে দেয় না। যাও, গাঁয়ের লোকদের গিয়ে বলো, ফারাওদের খোদা এখন আর নেই। এ এলাকা এখন মুসার খোদার রাজত্বের অধীন। হযরত ঈসা (আ.) আকাশ

থেকে এখানেই অবতরণ করবেন। এ বিরাণ ভূমি থেকেই প্রজ্জ্বলিত হবে ইসলামের আলো। জ্যোতিতে জ্যোর্তিমান হবে সমগ্র পৃথিবী। যাও বৎস, গাঁয়ের লোকদের আমার কথা বলবে। এখানে নিয়ে এসো ওদের।'

আমি হাঁটতে পারছিলাম না। দেহ শক্তিহীন, দুর্বল। বৃদ্ধ আবার বললেন, 'যাও, গুণে গুণে পঞ্চাশ পা উত্তর দিকে এগোবে। খবরদার, একবারও পেছনে তাকাবে না। লোকদের কাছে আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দাও। নয়তো তোমার ভীষণ ক্ষতি হবে। সামনে দেখতে পাবে একটা উট। তার সাথে রয়েছে ঘাস-পাতা, তোমার খাবার এবং পানি। উটের সাথে আর যা পাবে সব তোমার।'

এ কথা শুনে আমি হাঁটতে লাগলাম। কোন দুর্বলতা নেই। বৃদ্ধকে ফেরাউনের আত্মা ভেবে প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম, এ জন্য পিছনে তাকাইনি, যেন পালাতে পারলে বাঁচি।

গুণে গুণে পঞ্চাশ পা এগোলাম। এখানে এসে পথ খানিকটা বেঁকে গেছে। সামনে দেখলাম একটা উট। এগিয়ে গিয়ে উটের সাথে বাঁধা পুটুলী থেকে খাবার বের করে নিলাম। তৃপ্তির সাথে খেয়ে পানি পান করলাম। দেহে এলো অবর্ণনীয় শক্তি।'

একটি থলির মুখ খুললো অপরিচিত লোকটি। লোকদের দেখিয়ে বললো, 'এই দেখুন স্বর্ণ মুদ্রা, এটিও উটের সাথে বাঁধা ছিল। তাই উটে চেপে আপনাদের কাছে এলাম বৃদ্ধের বাণী শোনানোর জন্য।'

কথা শেষ করে অপরিচিত লোকটি ফিরে গেলো। লোকটির বাচনভঙ্গী গাঁয়ের মানুষকে ভয়ংকর স্থানে যেতে উদ্বুদ্ধ করলো। মুরুব্বীরা বললেন, 'লোকটি অপরিচিত। আমরা কখনো তাকে দেখিনি। লোকটি নিজেই ফারাওদের আত্মা কিনা কে জানে!'

নিষিদ্ধ জিনিষের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণের ফলে যুবকরা সে ভয়ংকর স্থানে যেতে তৈরী হলো। ওরা দেখতে চায় পোড়োবাড়ীর গোপন রহস্য। স্বর্ণ মুদ্রার হাতছানি এড়াতে পারলো না গাঁয়ের লোকজনও।

চল্লিশ মাইল দীর্ঘ এলাকায় এ অপরিচিত লোকটির সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। কেউ কেউ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। কেউবা সিদ্ধান্ত নিল যাবার জন্য, কিন্তু মন থেকে ভয় দূর করতে পারছিল না। কিছু লোক পার্বত্য এলাকার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এলো।

ক'দিন পর দু'জন যুবক উষ্ট্রারোহী সমগ্র এলাকা ঘোরাঘুরি করলো। আগের লোকটির মতো গল্প বললেও এদের বলার ধরন ছিল ভিন্ন। ওরা ঘোড়ায় চেপে অনেক দূরে যাচ্ছিল। সাথে ছিল অতিরিক্ত দুটো ঘোড়া। ওতে মূল্যবান মালপত্র বোঝাই। ওরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য সুদান যাচ্ছিল।

পথে ডাকাত দল ওদের সব কিছু কেড়ে নিয়ে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। যুবক দু'জন হাঁটতে হাঁটতে পার্বত্য এলাকায় এসে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো। চলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলো ওদের। ক্লান্ত দেহ নিয়ে মাটিতে বসে পড়লো ওরা।

তখন ওরা দেখতে পেলো শুভ্র পোষাক পরা এক বৃদ্ধ ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন। বৃদ্ধ ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, 'শয়তান তোমাদের সম্পদ লুট করেছে। তোমরা খুব ভাল। পঞ্চাশ কদম এগিয়ে দুটি উট দেখতে পাবে। উটের

সাথে যা থাকবে সব তোমাদের। সোনা গয়না দেখে পরস্পর মারামারি করো না। তাহলে দু'জনই চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যাবে। গ্রামে গিয়ে লোকদের বলো, পার্বত্য এলাকাকে যেন ভয় না পায়। এখানে ভয়ের কিছু নেই।'

এভাবে অনেক কথা বলে ওরা ফিরতি পথ ধরলো। চেহারায় ভয়ের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই।

সাহস করে লোকজন পার্বত্য এলাকায় যাতায়াত শুরু করলো। দেখা গেলো অনেকেই ভয়ংকর পোড়োবাড়ীতে আসা যাওয়া করছে। ওরা বললো, 'ভেতরে একজন দরবেশ রয়েছেন। তিনি গায়েব জানেন। আকাশের খবর বলতে পারেন।'

কেউ কেউ বললো, 'তিনি ইমাম মেহদী।' কেউ বললো, 'তিনি মুসা (আ.)।' আবার অনেকের ধারণা তিনিই হযরত ঈসা (আ.)। তিনি যেই হোন একজন দরবেশ। পাপীদের সাথে দেখা দেন না, কেবলমাত্র মন পবিত্র করে গেলেই তাকে দেখা যায়। কেউ তো বলেই ফেললো, 'তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন।'

এসব রহস্যময় গল্প মানুষকে পোড়োবাড়ীর ভেতরে টানতে লাগলো। ভয়ংকর স্থানে শুরু হলো মানুষের আনাগোনা।

ভেতরে গুহার মতো কক্ষে ঢোকার আঁকাবাঁকা পথ। একটা বিশাল কক্ষের ছাদ অনেক উঁচু। ছাদে মাকড়সার জাল। কিন্তু ফুলের সুবাসে ম, ম করছে কামরাটি। কামরার এক পাশ থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে সিঁড়ি। পাতালপুরীতে গিয়ে শেষ হয়েছে শেষ ধাপ।

এসব প্রাসাদ ছিল ফারাওদের। ওরা নিজেরা খোদার আসনে বসেছিল। ওদেরকে সবাই দেখতে পেতো না। মানুষকে এ প্রাসাদে একত্রিত করে শুধু কণ্ঠ শোনানো হতো। বড় কক্ষে মিশে ছিল এক সুড়ং মুখ। সুড়ংয়ের অপর প্রান্ত থেকে কথা বলা হতো। কে কথা বলছে লোকেরা দেখতো না, শুধু কণ্ঠ শুনতে পেতো।

এ শব্দকে খোদার কণ্ঠ ভেবে তৃপ্তি পেতো মানুষ। বড় কক্ষে ছিল পর্যাপ্ত আলো। কোন প্রদীপ ছিল না। এ জন্য আয়না ব্যবহার করা হতো। সে আয়নার সাহায্যে আলোর প্রতিবিম্ব কক্ষে এসে পড়তো। সে কালে এ আয়নার বহুল প্রচলন ছিল না। ফলে মানুষ এটাকে ভাবতো খোদায়ী নূরের কারিশমা। এ অলৌকিক কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে যেতো মানুষ।

শত শত বছরের সেই পুরনো পদ্ধতি ফিরে এলো আবার। মানুষ সুড়ংয়ের শব্দকে খোদার শব্দ মনে করে মোহিত হলো। দূর হয়ে গেলো পোড়োবাড়ীর ভয়। অনেক পথ ঘুরে বিভিন্ন কক্ষ পেরিয়ে যেতে হতো বড় কক্ষে। সবগুলো কক্ষে ছিল কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা।

ইথারে ভেসে বেড়াতো একটি কণ্ঠ, 'আমি তোমাদেরকে আঁধার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছি। মরে গেছে ফেরাউনের আত্মা। খোদার নূর দেখো। এ হলো কোহে তুরের জ্যোতি। মুসা (আ.) এ জ্যোতিই দেখেছিলেন। ঈসা (আ.)কে এ নূর জ্যোতিষ্মান করবে। আল্লাহকে ভয় করো। মুখে কালেমা পড়ো।'

হতবাক হয়ে লোকজন পরস্পরের দিকে চাইতো। গুণ গুণ করে কালেমা পড়তো

সবাই।

ইথারের শব্দে মুসা, ঈসা এবং কালেমার কথা না থাকলে মানুষ হয়তো বিশ্বাস করতো না। এরা সবাই মুসলমান। ধর্মের নামে ওরা সব কথাই বিশ্বাস করছে। ইথারে গুঞ্জরিত হলো দ্বিতীয় কণ্ঠ, 'আমাদের নবী (সা.) অন্ধকার হেরা গুহায় আল্লাহকে দেখেছিলেন। তোমরাও এ অন্ধকার কক্ষে আল্লাহকে দেখতে পাবে।'

ভক্তির আবেশে মাথা নোয়ালো সবাই। যিনি পথিকদের উট, খাবার এবং স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছেন এরা তার কাছে যেতে চাইছে। যিনি মৃতকে জীবন দিতে পারেন, এরা তাকে দেখতে চায়।

মানুষের আগ্রহ এবং সেই সাথে উৎকণ্ঠা বেড়ে যাচ্ছিল। ওরা যখন বাড়ী ফিরলো, মহিলারা বললো, 'একজন অপরিচিত লোক এসে দরবেশের অলৌকিক কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। উনি নাকি দরবেশকে দেখেছেন।'

বড় মসজিদের ইমামের কাছে গিয়ে লোকজন দরবেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। ইমাম সাহেব বললেন, 'তিনি একজন পবিত্র মানুষ। হযরত ঈসার বাণী নিয়ে এসেছেন। ঈসার বাণী হলো ভালবাসা আর সম্প্রীতির শিক্ষা। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, কাউকে আহত করো না বরং আহত ব্যক্তির চিকিৎসা করো। তোমরা এ নিয়ম মেনে চললে দরবেশ বাবা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেখা দেবেন।'

ইমাম সাহেবের মুখে শোনার পর দরবেশ সম্পর্কে মানুষের মনে আর কোন সন্দেহ রইলো না। দলে দলে লোক পোড়োবাড়ীতে যেতে লাগলো। দরবেশ ঘোষণা করলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে লোকজন এখানে এসে কিছু চাইলে তার মনের আশা পূরণ করা হবে।'

সে অনুযায়ী প্রতি বৃহস্পতিবার বাবার সাথে দেখা করার দিন ধার্য করা হলো। পুরুষের সাথে মেয়েরাও ওখানে যেতে লাগলো। বাবাকে যেনো কেউ বিরক্ত করতে না পারে সে জন্য স্বেচ্ছায় একদল লোক স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করা শুরু করলো। এখন আর কেউ ইচ্ছে মতো পোড়োবাড়ীতে যেতে পারে না।

দূর-দূরান্ত থেকে উট, ঘোড়া আর খচ্চরে চেপে লোকজন আসতে লাগলো। রহস্য ঘেরা পোড়োবাড়ীর বাইরে বৃহস্পতিবার আসার অপেক্ষায় বসে থাকতে শুরু করলো দর্শনার্থীরা।

এর মধ্যে ভেতরের চিত্রও বদলে গেলো। আলো আঁধারীতে পাপী আর পূণ্যবানের ছবি দেখানো হতে লাগলো। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখতো পাপীর ছবি শূন্যে ভাসছে, শাস্তি পাচ্ছে।

সূর্য ডোবার সাথে সাথেই খুলে যেত রহস্য ভরা সুড়ং মুখ। সুড়ংটি মূলতঃ প্রাসাদের ভেতরকার প্যাসেজ। দু'পাশের দেয়ালে ছোট ছোট খুপড়ি। সুড়ং পথ দশগজ পরে পরে ডানে বায়ে মোড় নিয়েছে। সুড়ং মুখে দাঁড়িয়ে থাকে দু'জন লোক। পাশে খেজুরের স্তূপ। দর্শকদের দেয়া খেজুরের তোহফা এখানে জমা করা হতো। খেজুরের পাশে পানির মশক। সুড়ং পথে যেতে চাইলে দর্শনার্থীদেরকে দুটো খেজুর এবং কয়েক ঢোক পানি দেয়া হতো।

অন্ধকার সুড়ং পেরিয়ে লোকেরা পৌঁছতো আলো ঝলমলে বিশাল কক্ষে। ওখানে ভেসে আসতো গায়েবী আওয়াজ, 'কালেমা পড়ো, আল্লাহকে স্মরণ করো। হযরত মুসা (আ.) এসেছেন। ঈসা (আ.) আসবেন। মন থেকে পাপ এবং শত্রুতা মুছে ফেলো। যুদ্ধ বিগ্রহের কথা ভুলে যাও। বেহেস্তের লোভ দেখিয়ে যাদের দিয়ে যুদ্ধ করানো হয়েছিল তাদের পরিণতি দেখে নাও।'

দর্শনার্থীদেরকে একদিকে মুখ করে দাঁড় করানো হতো। শব্দ শেষ হলেই ছুটে আসত চোখ ধাঁধানো তীব্র আলো। একটু পর সে আলো কমে আসতো ধীরে ধীরে। তারপর আবার তীব্র আলোতে ভরে যেতো ঘর।

এভাবে কয়েকবার আলোর খেলা চলার পর সামনের দেয়ালে ভেসে উঠতো অসংখ্য ছবি। ধ্বনিত হতো গায়েবী আওয়াজ, 'এরাও তোমাদের মতোই যুবক এবং সুন্দর ছিল। খোদার বিধান মানেনি। কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চেপে খোদার সৃষ্ট মানুষ হত্যা করেছে। ওদের ধোঁকা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছিল, তোমরা যুদ্ধ করে শহীদ হলে স্বর্গ পাবে। ওদের পরিণতি দেখো। খোদা ওদেরকে শয়তানের রূপ দিয়েছেন।'

এর সাথে শোনা যেতো মেঘের গর্জন আর বজ্রের চমক। শোনা যেতো বিভিন্ন পশুর শব্দ। চোখ ধাঁধানো আলোয় দর্শকরা চোখ পিটপিট করে তাকাতো দেয়ালের দিকে। ভয়ংকর দাঁতালো পশুর দল একদিক থেকে অন্য দিকে যাচ্ছে। শুধু মুখটা মানুষের মতো, বাকী সব ভয়ংকর হায়নার মতো।

একটু পর দেখা গেলো, ওরা দু'বাহুতে জড়িয়ে রেখেছে দুই উলঙ্গ সুন্দরী যুবতী। ছাড়া পাওয়ার জন্য তড়পাচ্ছে যুবতীরা। বজ্রের শব্দ ছাপিয়ে গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, 'এদের ছিল রূপের অহংকার। খোদার দেয়া সৌন্দর্য সুষমাকে এরা অপবিত্র করেছে।'

এরপর দেয়ালে ভেসে বেড়াতো সুন্দর যুবক আর রূপসী রমণীর দল। প্রাণোচ্ছল, হাসিখুশী। গায়েবী শব্দ তুলে ধরতো এদের পরিচয়। 'এসব যুবক যুবতী যুদ্ধ বিগ্রহে যায়নি। মানুষকে শুনিয়েছে প্রেম ও ভালবাসার বাণী। কেউ কারো মনে আঘাত দেয়নি। ওরা সন্তুষ্ট করেছে মানুষকে, আল্লাহও ওদের প্রতি সন্তুষ্ট তাই।'

এরপর ওদের নিয়ে যাওয়া হতো অন্য একটি কক্ষে। ওখানে ছিল মৃত মানুষের হাড়গোড়। সুন্দরী যুবতীরা এদিক ওদিক হাঁটছে। ঠোঁটে মিষ্টি হাসির ঝিলিক।

একটু পর ভেসে আসতো গায়েবী শব্দ, 'হযরত ঈসা (আ.) আসছেন। যুদ্ধ বিগ্রহ এবং ঘৃণা বিদ্বেষ মন থেকে মুছে ফেলো। খলিফা আল আয়েদ আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।

দৃষ্টিকাড়া রূপসীদের দিকে তাকিয়ে থাকতো দর্শকরা। কিন্তু ওদের বের করে দেয়া হতো অন্য পথে। দর্শকদের মনে হতো এইমাত্র ওরা স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। হৃদয়ে স্বপ্নের মোহ, ভয় আর ভাল লাগার মিশেল অনভূতি নিয়ে বেরিয়ে যেতো ওরা। আবার সেই স্বপ্নের ভুবনে ফিরে যাওয়ার জন্য মন আকুপাকু করতো। কিন্তু ওদের আর সেই সুড়ং মুখে যেতে দেয়া হতো না।

লোকজন ওখান থেকে বেরিয়ে বাড়ী ফিরে যেতো না কেউ। রাত কাটাতো প্রাসাদের বাইরে, পর্বতে, উপত্যকায়। দু'তিন জন করে জটলা করে বসে ফিসফিস কথা বলতো।

আল্লাহর বাণী নিয়ে যিনি এসেছেন গায়েবী শব্দ তার। তিনি বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) আসছেন। খলিফা আল আযেদ আবার পৃথিবীতে এসেছেন।

আল আযেদের মৃত্যুর পর ফাতেমীরা খৃষ্টান এবং ঘাতক দলের সাথে মিশে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। মিশর আক্রমণ করার জন্য সুদানে তৈরী হচ্ছিল শক্তিশালী বাহিনী।

দিন দিন পোড়োবাড়ীর অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে রটে গেলো ঈসা (আ.) আসছেন। তিনি আল আযেদকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রহস্যময় দরবেশের বাণী এখন লোকজনের মুখে মুখে, 'আইয়ুবীর সেনাবাহিনীতে কেউ ভর্তি হবে না। যুদ্ধ বিগ্রহ করা মহাপাপ। সালাহউদ্দিন একজন পাপী। সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির জন্য তিনি যুবকদেরকে বেহেশতের লোভ দেখিয়ে ফৌজে ভর্তি করেন। অথচ কে না জানে খুন-খারাবী জঘন্য কাজ?'

পোড়োবাড়ী এখন এ অঞ্চলের লোকদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। অনেকে পার্বত্য এলাকায় স্থায়ীভাবে থাকা শুরু করেছে। দরবেশকে একনজর দেখার জন্য এরা বাড়ীঘর ছেড়ে অপেক্ষার প্রহর গোণে দিনের পর দিন। কখন আসবে সেই শুভ লগ্ন, কখন বাবা দেখা দেবেন। জীবন থেকে মুছে যাবে অভাব, অশান্তি আর মলিনতা।

আহত বন্দীকে নিয়ে কায়রো পৌঁছলেন আলী বিন সুফিয়ান। বন্দীর নাম আকিল। আলাদা বাড়ীতে রেখে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। বাড়ীর সামনে সেন্ট্রি দাঁড় করিয়ে দিলেন আলী।

আকিল এখনো সুস্থ হয়নি, সে এই পোড়োবাড়ীর ঠিকানা দিল আলীকে। খুলে বললো ওখানে কি হচ্ছে। আলী সিদ্ধান্ত নিলেন, আকিল সুস্থ হলে তাকে নিয়ে গোয়েন্দা দল পার্বত্য এলাকায় যাবে। উদ্ধার করবে পোড়োবাড়ীর রহস্য।

সহকারী গোয়েন্দা প্রধান হাসান এবং পুলিশ প্রধানকে আলী জানালেন তার সিদ্ধান্ত। বললেন, 'ওই এলাকায় এখন কাউকে পাঠানোর দরকার নেই। ওখানকার লোকজনের ভেতর সেনাবাহিনী বিরোধী ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। আমার ধারণা, ওখান থেকে রহস্যময় ষড়যন্ত্র উদ্ধার করা যাবে।'

আকিলের ধারণা ছিল সে মরে যাবে। বিলাপ করছিল সে। নিজের গ্রামের নাম নিয়ে বলছিল, 'আমার বোনকে এনে দাও। আমি এ জীবনে ওকে আর কোনদিন দেখতে পাবো না।'

তার এ দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছিলেন আলী বিন সুফিয়ান। তিনি বন্দীর কাছ থেকে সব গোপন কথা বের করার চেষ্টা করছিলেন। লোকটি বোনের জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। একে একে সবকিছুই বলে দিল আলীর কাছে। গোয়েন্দা প্রধান বুঝলেন ওর কাছে আর কোন তথ্য নেই। দু'জন কমাণ্ডোকে ডাকলেন আলী। আকিলের গায়ের ঠিকানা, বোনের নাম ধাম দিয়ে বললেন, 'ওর বোনকে সাথে করে নিয়ে আসবে। মিশরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ওর বাড়ী।'

কমাণ্ডো দু'জন সাথে সাথে ঘোড়ায় চেপে বসলো।

সুবাক দুর্গে পৌঁছে গেছেন সুলতান আইয়ুবী। তাকে হত্যা করার জন্য এত বড় একটা আক্রমণ হলো অথচ চেহারায় উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নেই।

রক্ষী কমাণ্ডার এবং কর্মকর্তাদের নির্ঘুম রাত কাটে। ভয়ে তটস্ত সবাই। এই বুঝি সুলতান তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'কেন এমনটি হলো? যখন আক্রমণ হলো তখন তোমরা কি করছিলে?' এ জন্য চরম শাস্তি না দিলেও তাদের যে অন্যত্র বদলী করে দিবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু সুলতান নির্বিকার। এ প্রসঙ্গের ধারে কাছেও তিনি গেলেন না। কেন্দ্রীয় সেনা নেতৃবৃন্দকে ডেকে বললেন, 'আপনারা দেখেছেন আমার জীবনের কোন ভরসা নেই। আমার যুদ্ধের চাল আপনাদেরকে গভীরভাবে বুঝে নিতে হবে। শত্রুরা আরেকটা রণক্ষেত্র তৈরী করেছে। ওদের গুপ্তচরদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। আমাদের গোয়েন্দাদের কেউ কি ফিরে এসেছে?'

'মহামান্য সুলতান। দু'জন গোয়েন্দা কর্মী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে এসেছে।' এক সেনা অফিসার বললেন।

সুলতান তাদের ডেকে পাঠালেন। খৃষ্টানদের সমস্ত পরিকল্পনা সুলতানকে অবহিত করা হলো। তিনি নূরুদ্দিন জঙ্গীর পাঠানো ফৌজের সালার এবং মিশর থেকে আসা ফৌজের সালারকে আসতে বলে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

চারদিন পর আকিলের বোনকে নিয়ে দূত কায়রো ফিরে এলো। সাথে চারজন লোক। ওরা বন্দীর চাচা এবং চাচাত ভাই। বোনটি মনকাড়া সুন্দরী। তার চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। সেই আকিলের একমাত্র বোন। বাবা-মা নেই ওদের।

বন্দীর সাথে দেখা করতে চাইলো ওরা। আলীর অনুমতি প্রয়োজন। বোনকে অনুমতি দিলেন গোয়েন্দা প্রধান। সঙ্গীরা অনেক অনুরোধ করলো। বললো, 'আমরা তার সাথে কথা বলবো না। শুধু এক নজর দেখেই চলে আসবো।'

অনুমতি মিলল। কিন্তু সঙ্গে রইলেন আলী। পাঁচজনকেই বন্দীর কাছে নেয়া হলো। আকিলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটা। ভাইয়ের চোখে মুখে চুমো খেয়ে কাঁদতে লাগলো।

'এদের সাথে হাত মেলাও।' চাচা এবং চাচাত ভাইকে দেখিয়ে বললেন আলী।

করমর্দনের পর ওদের বের করে দেয়া হলো। আলী বললেন, 'এর সাথে আর কখনো দেখা করতে পারবে না, এবার তোমরা বাড়ী যেতে পারো।'

গাঁয়ের পথ ধরলো ওরা। মেয়েটা আলীর পায়ের কাছে বসে পড়ে বললো, 'আমাকে ভাইয়ের সেবা-শুশ্রূষা করার সুযোগ দিন।'

বোনের এ আবেগ ফেলতে পারলেন না আলী। একজন মহিলাকে ডেকে বললেন, 'ওর দেহ তল্লাশী করো।'

দেহ তল্লাশী করা হলো। এরপর মেয়েটাকে বন্দীর কাছে রেখে সবাই ফিরে গেলেন। কক্ষে ভাই-বোন ছাড়া কেউ নেই। কি হয়েছে জানতে চাইলে ভাই সব ঘটনা খুলে বললো বোনকে।

'এখন ওরা আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করবে?'

'সুলতানকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেছি, এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। অনুগ্রহ করে মৃত্যুদণ্ড না দিলেও আজীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।'

'তবে কি আপনাকে আর কোন দিন দেখতে পাবো না?'

'না শারজা।' বেদনামাখা কণ্ঠে বললো আকিল, 'কারাগারে আমি মরবোও না আবার বাঁচবোও না। ওটা অত্যন্ত ভয়ংকর স্থান।'

শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো শারজা, 'আমি তখনই আপনাকে বাঁধা দিয়েছিলাম। নিষেধ করেছিলাম এসব লোকের পাল্লায় পড়তে। কিন্তু আপনি বললেন আইয়ুবীকে হত্যা করা বৈধ। আপনি ওদের লোভের ফাঁদে পা দিলেন। আমার কথা একবারও ভাবলেন না। এখন আমার কি হবে? আপনি ছাড়া কে আশ্রয় দেবে আমাকে?'

আকিলের ভেতর চলছিল মানসিক দ্বন্দ্ব। কখনো ওর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো অনুশোচনা, 'ওদের ফাঁদে পা দিয়ে ভুল করেছি। শারজা! সালাহউদ্দিন মানুষ নয়, ফেরেশতা। আমরা চারজন তাগড়া যুবক তার কিছুই করতে পারিনি। একটু আঁচড়ও লাগেনি তার দেহে। অথচ শূন্য হাতে তিনি একা আমাদের তিনজনকে মেরে ফেললেন। আর আমি মৃত্যুর দুয়ারে।'

'লোকে যে বলে, সালাহউদ্দিনের ঈমান অত্যন্ত মজবুত, কোন পাপী তাকে হত্যা করতে পারবে না, এ কথা তাহলে মিথ্যে নয়। আপনারা চারজনই মুসলমান। তাকে মারতে যাওয়ার আগে একবারও ভাবলেন না, আইয়ুবীও একজন মুসলিম?'

'আইয়ুবী খলিফাকে অপমান করেছে।' আকিলের কণ্ঠে উত্তেজনা, 'তুমি জানো না আল আযেদ আল্লাহর খলিফা।'

'খলিফা যেই হোন আর আইয়ুবী তার সাথে যে ব্যবহারই করুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু এখন আপনি যে একমাত্র বোনকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য আলাদা হয়ে যাচ্ছেন, এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় বের করা যায় না?'

'হয়তো যায়। আমার শাস্তি মওকুফ করার আশ্বাস পেয়েই সব গোপন তথ্য প্রকাশ করেছি। কিন্তু আমার পাপ এত মারাত্মক যে ক্ষমা না-ও করতে পারে।'

এতক্ষণে আকিলের ঘুমিয়ে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু বোনকে কাছে পেয়ে আবেগ ও উত্তেজনায় অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল সে। এতে পেটের ক্ষতস্থানের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কথা বন্ধ করলো না বন্দী।

হঠাৎ ক্ষতস্থানে ব্যথা হতে লাগলো। পেট চেপে ধরে বোনকে বললো, 'শারজা! সম্ভবত আমি মরে যাবো। বাইরে লোক আছে, ওকে বলো ডাক্তার ডেকে দিতে।'

ছুটে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো শারজা। বেরোতেই সামনে পড়লো এক সেন্ট্রির, বাইরে দাঁড়িয়ে ও পাহারা দিচ্ছিল। শারজা বললো, 'রোগীর অবস্থা খারাপ। প্লিজ, একটু এদিকে দেখুন।'

সেন্ট্রি শারজাকে ডাক্তারের বাসা দেখিয়ে বললো, 'আমি যেতে পারছি না, ডাক্তারকে বললেই তিনি চলে আসবেন।'

কাছেই ডাক্তারের বাসা। শারজা তাকে ভাইয়ের কথা জানালো। বন্দীকে বাঁচিয়ে

রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করার নির্দেশ দেয়া ছিল ডাক্তারকে। দৌড়ে বন্দীর কাছে পৌঁছলেন তিনি। পেটের ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বন্দীকে দ্রুত রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার ঔষধ খাওয়ানো হলো। তারপর ডাক্তার অনেক সময় নিয়ে পুরনো ব্যাণ্ডেজ খুলে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

ওষুধের প্রভাবে আকিল ঘুমিয়ে পড়লো। অবাক চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইলো শারজা। সুদর্শন ডাক্তারের জন্য তার হৃদয়ে সৃষ্টি হতে লাগলো শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অচেনা অনুভূতি। এত রাতে একজন অপরাধীকে চিকিৎসা করার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে ডাক্তার ছুটে আসবেন, শারজা এতোটা আশা করেনি। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় ডাক্তারের আন্তরিকতা ও লক্ষ্য করেছে।

ব্যাণ্ডেজ শেষে দু'হাত ওপরে তুলে ডাক্তার অনুচ্চকণ্ঠে রোগীর জন্য প্রার্থনা করলেন, 'জীবন এবং মৃত্যুতো তোমারই হাতে প্রভু! এ হতভাগাকে রহম করো। মালিক আমার, ওর জীবন ফিরিয়ে দাও। সুস্থ করে দাও ওকে।'

শারজার চোখ ভিজে উঠলো। ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেলো ওর মন। হাটু গেড়ে ডাক্তারের হাতে চুমো খেল শারজা।

'বন্দীর সাথে তোমার সম্পর্ক কি?' ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

'আমি ওর বোন। ডাক্তার সাহেব! আমার ভাইয়ের জন্য আপনার এ দরদ ও ভালবাসা কেন? তিনি আপনাদেরকে সব গোপন কথা বলে দিয়েছেন বলেই কি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছেন?'

'ও কাকে কি গোপন তথ্য দিয়েছে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি ডাক্তার। ওকে সুস্থ করে তোলা আমার কর্তব্য। আমার কাছে মুমিন আর কমিনে কোন পার্থক্য নেই।'

'ও কি অপরাধ করেছে হয়তো আপনি জানেন না। জানলে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ না করে ওখানে লবণ ছিটিয়ে দিতেন।'

'আমি সব জানি। তবুও আমি ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো।'

শারজা ডাক্তারের কথায় প্রভাবিত হয়ে নিজের সব কথা ওকে খুলে বললো।

'বাবা-মা মারা গেছেন, আমি তখন খুব ছোট। ভাইয়ার বয়স দশ কি এগারো। তিনিই আমাকে লালন-পালন করেছেন। আমি যুবতী হয়েছি। ভাইজান না থাকলে কেউ আমাকে হয়তো অপহরণ করে নিয়ে যেতো। তিনি তার জীবন আমার জন্য উৎসর্গ করেছেন।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছেন ডাক্তার। ওদের কথার শব্দে আহত লোকটা জেগে উঠতে পারে ভেবে দু'জন বারান্দায় চলে এলেন। অনেকক্ষণ পর যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। হাত ধরলো শারজা, 'আপনি চলে গেলে আমার ভয় করবে।'

'কিন্তু তোমাকে আমি সাথে নিতে পারছি না, কারণ আমি একা থাকি। আবার এখানে তোমার সাথে রাতও কাটাতে পারছি না। ঠিক আছে, আরো কিছুক্ষণ থাকি।'

আবার বসে পড়লেন ডাক্তার। কথায় কথায় রাতের দুই প্রহর কেটে গেলো। ডাক্তার শেষ রাতে বাসায় ফিরলেন। পরদিন সূর্য উঠার আগেই আহত বন্দীকে দেখার জন্য আবার

ফিরে এলেন। নতুন করে ওষুধ দিয়ে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

বন্দীকে দুধ এবং খাবার দেয়া হলো। হতবাক চোখে তাকিয়ে রইলো শারজা। এমন খাবার কেউ কোন বন্দীকে দিতে পারে ও জীবনে কখনো কল্পনাও করেনি।

নাস্তা খাওয়ার কিছুক্ষণ পর এলেন আলী বিন সুফিয়ান। বন্দীকে দেখে ফিরে গেলেন তিনি, থেকে গেলেন ডাক্তার।

শারজা আবার কথার ঝাঁপি খুলে দিল। তার জীবন-পাতা মেলে ধরলো ডাক্তারের সামনে। অনেক বেলা করে ঘরে ফিরলেন ডাক্তার।

আকিল লক্ষ্য করলো, সন্ধ্যা পর্যন্ত ডাক্তার তিন বার বন্দীকে দেখতে এসেছেন, অথচ আগে দিনে একবারের বেশী আসতেন না। ডাক্তার ফিরে গেলে আকিল বোনকে বললো, 'শারজা! এই ডাক্তারের হাতে আমার জীবন। বুঝতে পারছি তোমাকে দেখার পর সে আমার চিকিৎসার ব্যাপারে বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমি মরতে রাজি, কিন্তু ও তোমার কাছে যা চায় তা হতে দেবো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার জীবনের বিনিময়ে ও তোমার ইজ্জত নষ্ট করতে চাইছে।'

'আপনি কি বলছেন ভাইয়া! আমি তো তাকে ফেরেশতার মতো পবিত্র মনে করি। আমি বড় হয়েছি। সবকিছু বুঝার বয়স হয়েছে। এ পর্যন্ত তিনি খারাপ কোন কথা তো দূরের কথা, খারাপ কোন ইশারাও করেননি। তার সাথে অনেক কথা বলেছি। তাকে আমার খারাপ মনে হয়নি।'

শারজার কথায় দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলো আকিল। ডাক্তারের প্রতি তারও আগ্রহ বেড়ে গেলো।

রাতে ডাক্তার আবার এলেন। আকিল ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে শারজা। বারান্দায় চলে এলো দু'জন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বললেন, 'তোমার ভাইকে যে ওষুধ দিয়েছি সকালের আগে জাগবে না। আমার সাথে বাসায় চলো।'

খানিকটা সংকোচ করলেও শারজা ডাক্তারের প্রস্তাব অস্বীকার করতে পারলো না। ডাক্তার সুদর্শন যুবক, এখনো বিয়ে করেননি। বাসায় একা থাকেন। শারজা যুবতী এবং সুন্দরী। মনে মনে ভাবলো, আজ রাতেই হয়তো ডাক্তার নিজের মুখোশ খুলে দেবে।

বাসায় ফিরে দু'জন দুটো চেয়ার টেনে বসলো। ডাক্তারের আচরণে প্রকাশ পাচ্ছিল নিরেট আন্তরিকতা এবং স্নেহ। আশ্চর্য হলো শারজা। ডাক্তার এখনো তাকে খারাপ কোন প্রস্তাব দিচ্ছে না কেন?

নিজের অজ্ঞাতেই প্রশ্ন করলো, 'আমি একজন মরুচারী বেদুইন। গরীব যুবতী। এমন এক অপরাধীর বোন, যে সুলতানকে হত্যা করতে চেয়েছিল। আপনি কেন আমার সাথে এত সুন্দর ব্যবহার করছেন? একজন বন্দীর বোন এ স্নেহ পাওয়ার উপযুক্ত নয়।'

মৃদু হাসলেন ডাক্তার। কোন জবাব দিলেন না।

'আমি একজন তরুণী এবং রূপসী, এ জন্যই কি আমার জন্য এ আন্তরিকতা।'

'তুমি রূপসী এবং যুবতী। তোমার তৃতীয় সৌন্দর্যের কথা তুমি জানো না। তোমার বয়সী আমার একটা বোন ছিল। দেখতে অবিকল তোমার মতো। তোমার মতোই

আমাদের পিতা-মাতা শৈশবে মারা গেছেন। সংসারে দু'জন ছাড়া কেউ ছিল না।

বোনটাকে আমিই লালন-পালন করেছিলাম। আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলাম তার জন্য। বেঁচে ছিলাম ওর ভালবাসা নিয়ে। একবার ওর অসুখ হলো। অনেক চিকিৎসা করলাম, কিন্তু ধরে রাখতে পারিনি। নিজের হাতেই ওকে কবর দিতে হয়েছে। আমি হয়ে গেলাম নিঃসঙ্গ, একা।

যেদিন তোমাকে প্রথম দেখলাম, চমকে উঠেছিলাম। মনে হলো, আমার বোনটা আবার ফিরে এসেছে। তুমি দেখতে অবিকল আমার বোনের মতো।

যদি তুমি তোমার রূপ-যৌবনকে ভয় পাও, আমাকে সন্দেহ করো, তবে আর কখনো তোমার কাছে আমার স্নেহময় আবেগ প্রকাশ করবো না। কথাও বলবো না তোমার সাথে। ভয় নেই, পূর্বের আন্তরিকতা নিয়েই তোমার ভাইয়ের চিকিৎসা করবো। তাকে সুস্থ করে তোলা আমার দায়িত্ব। চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

শারজাকে বন্দীর কাছে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলেন ডাক্তার। শারজার মনে এখন কোন সন্দেহ নেই। ডাক্তার তার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না নিশ্চিত সে।

পরদিন নিয়ম মতো ডাক্তার এলেন। বন্দীকে ওষুধ দিয়ে ফিরে গেলেন। শারজার সাথে একটি কথাও বললেন না। শারজা বারান্দায় এসে ডাক্তারের সামনে দাঁড়ালো।

'আপনি কি আমার সাথে রাগ করে চলে যাচ্ছেন? আমার সাথে একটি কথাও বললেন না কেন?'

'তোমার সাথে রাগ করিনি শারজা। তবে আমি তোমাকে কোন সন্দেহে ফেলতে চাই না।'

রাতে আকিল ঘুমিয়ে পড়লো। আলতো পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো শারজা। কি এক আকর্ষণে ছুটে গেলো ডাক্তারের কাছে। তার মনে অনেক প্রশ্ন জমা হয়ে আছে। হয়তো ডাক্তারই এর সঠিক জবাব দিতে পারবেন।

'খলিফা কি আল্লাহর প্রেরিত দূত।' প্রশ্ন করলো ও।

'খলিফাও একজন মানুষ। আল্লাহর প্রেরিত দূত হলেন নবী এবং রাসূলগণ। আমাদের নবী (সা.) পর্যন্ত এসে আল্লাহর প্রেরিত নবীর আগমন ধারা শেষ হয়ে গেছে।'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীও কি আল্লাহর দূত।'

'না, তিনিও আমাদের মতো মানুষ। তবে তিনি উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ। আল্লাহ এবং নবীর (সা.) বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন।'

'সুলতান যে যুদ্ধ করছেন, মানুষ মারছেন, এটা কি বৈধ?'

'মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। এ প্রচেষ্টায় কেউ যদি বাঁধা দেয়, তা দূর করা ফরজ। সুলতান শুধু এ ফরজ আদায় করছেন। তিনি কারো ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেননি, বরং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বেঈমানদের তৎপরতাকে তিনি ঠেকাতে চাইছেন।'

এভাবে অনেক প্রশ্ন করলো শারজা। এখন সে সন্দেহ মুক্ত। সুলতান আইয়ুবী সম্পর্কে তার এতদিনের ধারণা বদলে গেছে।

'তা হলে আমার ভাই তো মহা অন্যায় করেছে। আপনি আমাকে যেভাবে বললেন,

এভাবে তাকে বললে তিনিও এ পাপের পথে পা দিতেন না। এখন তো তাকে ক্ষমা করা হবে না।'

'হবে। সুলতান তাকে বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। তার উচিত পাপের প্রায়শ্চিত্য করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুলতান তাকে কোন শাস্তি দিবেন না।'

'আমি জীবনভর আইয়ুবী এবং আপনার খেদমত করবো।' কেঁদে বললো শারজা, 'আমার ভাই আপনাদের গোলাম হয়ে থাকবে।'

ডাক্তারের একটা হাত দু'হাতে তুলে নিয়ে ও বললো, 'আপনি আমার কাছে যে মূল্য চাইবেন, আমি দেবো। আপনার বাদী হয়ে থাকবো সারা জীবন। বিনিময়ে আমার ভাইকে সুস্থ করে দিন। ওকে বাঁচিয়ে তুলুন।'

'বিনিময় নেয়া হয় আল্লাহর কাছ থেকে।'

শারজার মাথায় হাত বুলিয়ে ডাক্তার বললেন, 'বোনকে ভাইয়ের পাপের শাস্তি দেয়া হয় না। ভাইয়ের স্বাস্থ্যের মূল্য বোন থেকে উসুল করা হয় না। পাপের প্রায়শ্চিত্য পাপ দিয়ে নয়। আমাদের সবার রক্ষক আল্লাহ। প্রতিটি মুসলমান সকল নারীর ইজ্জতের রক্ষক। তোমরা আমাদের কাছে আমানত।

তোমার ভাইয়ের সুচিকিৎসা করার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করো আমি যেন আমানতের খেয়ানত না করি। অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারি। তোমার ভাইয়ের সুস্থতার জন্য দোয়া করো। একজন অসুস্থ ভাইয়ের জন্য বোনের দোয়া আল্লাহ নিশ্চয়ই কবুল করবেন।'

ডাক্তার মেয়েটাকে যেন যাদু করেছেন। তার মিষ্টি ব্যবহারের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। শারজা যা ভেবেছিল ডাক্তার তা নন। ডাক্তারের নৈতিকতাই ওকে বেশী প্রভাবিত করেছে। নিঃসঙ্গ রাতে এমন এক সুন্দরী তরুণীকে একা পেয়েও ডাক্তার অশালীন কোন ইঙ্গিত করেননি। ডাক্তার চাইলে তাকে বাঁধা দেয়া সম্ভব ছিল না। ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য হলেও তাকে ডাক্তারের প্রস্তাবে রাজি হতে হতো।

কিন্তু ডাক্তারের চোখে কামনার আগুন নেই। স্নেহ ভালবাসার এক অব্যক্ত অনুভূতি তার চেহারায় আলো হয়ে জ্বলছে। মোহিত হলো শারজা। কখন যে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে টের পেলো না। ও হারিয়ে গেল ভাবনার অতল তলে। সম্বিত ফিরলো ডাক্তারের ডাকে।

'চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে তোমার ভাইকে দেখে আসবো।'

দু'জন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আকাশে চাঁদ উঠেনি। আবছা অন্ধকার। ওরা হাঁটছে ধীরে ধীরে। দু'বাড়ীর মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলছে ওরা। সামনের ছোট্ট গলিটা পেরোলেই আকিলকে যেখানে রাখা হয়েছে সে বাড়ী। বাড়ীটাতে সব সময় সশস্ত্র সেন্ট্রির পাহারা থাকে। দু'জনের কারো মুখে কোন কথা নেই। হাঁটছে নিঃশব্দে।

গলির মুখে এসে পড়েছে ওরা। অকস্মাৎ ওদেরকে পেছন থেকে জাপটে ধরলো কেউ। কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো চোখ-মুখ। ওরা এখন শব্দও করতে পারছে না।

ডাক্তার একজন শক্তিশালী যুবক। আচমকা আটকে পড়ায় কিছুই করতে পারছেন

না। আক্রমণকারীরা চারজন। ওরা এই দু'জনের হাত-পা বেঁধে ফেললো। এরপর দুটো দেহ কাঁধে তুলে হারিয়ে গেলো অন্ধকারে।

খানিক দূরে ছ'টা ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল। ডাক্তারকে একটা ঘোড়ায় চাপিয়ে ওদের একজন পেছনে উঠে বসলো। শারজাকে উদ্দেশ্য করে একজন বললো, 'শব্দ করো না শারজা। তোমার কাজ হয়ে গেছে। পঞ্চম ঘোড়াটায় উঠে বসো।'

ওর মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে বাঁধন খুলে দেয়া হলো।

'ওকে ছেড়ে দাও।' আক্রমণকারীদের বললো শারজা, 'ওর কোন দোষ নেই, ও খুব ভাল মানুষ।'

'ওকে আমাদের প্রয়োজন।' বললো ওদের একজন।

'ওকে তোমাদের কি দরকার?'

'শারজা!' ভেসে এলো অন্য কণ্ঠ, 'চুপচাপ ঘোড়ায় উঠে বসো।' চকিতে ওদিকে ফিরে শারজা বললো, 'আপনি!'

'উঠে বসো। সময় নষ্ট করো না।'

ঘোড়ায় চেপে বসলো শারজা। ও খুব ভাল সওয়ারী। কায়রো পেছনে ফেলে ঘোড়াগুলো এগিয়ে চললো মরুভূমির বালি মাড়িয়ে।

প্রভাত সূর্য উঁকি মারছে আকাশে। এখন সেন্ট্রি পরিবর্তনের সময়। নতুন প্রহরী ডিউটিতে এসে দেখলো রাতের প্রহরী নেই। জানালা দিয়ে উঁকি দিল কক্ষের ভেতর। আহত বন্দী কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

গেটে গিয়ে দাঁড়ালো নতুন সেন্ট্রি। সে জানতো, বন্দীকে দেখার জন্য সকালেই ডাক্তার আসবেন। তার পরে গোয়েন্দা প্রধান। বন্দীর সাথে আছে তার বোন। তার অনুমতি ছাড়া ভেতরে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু বোনকে কোথাও দেখা গেলো না।

কিছুক্ষণ পর আলী এসে সেন্ট্রিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার কি রোগী দেখে চলে গেছে?'

'ডাক্তার এখনো আসেননি। আমি এসে রাতের প্রহরীকে পাইনি। বন্দীর বোনকেও কোথাও দেখছি না।'

আলী ভাবলেন, বন্দীর অবস্থা খারাপ বলে মেয়েটা হয়তো ডাক্তারের জন্য গিয়েছে। শুধু মিশর নয়, মুসলিম বিশ্বের জন্য বন্দী অত্যন্ত মূল্যবান। তাকে দিয়ে ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্রের রহস্য উদঘাটন করতে হবে।

কক্ষের ভেজানো দরজা ঠেলে দ্রুত ভেতরে ঢুকলেন আলী। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে বন্দী। এক ঝটকায় বন্দীর মুখের কম্বল সরিয়ে ভয়ে দু' কদম পিছিয়ে এলেন। যেন মানুষ নয়, কম্বলের নীচে শুয়ে আছে এক বিষধর সাপ।

সেন্ট্রিকে ডাকলেন আলী। দৌড়ে ভেতরে ঢুকল প্রহরী।

'ওকে চিনতে পারছো? রাতের সেন্ট্রি নয়তো!'

আতংকে বিবর্ণ হয়ে গেলো সেন্ট্রির চেহারা। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, 'রাতে ও-ই ডিউটি করেছে। ও এখানে ঘুমিয়ে আছে কেন? বন্দী কোথায়?'

'ও ঘুমায়নি, মারা গেছে।'

কম্বল তুলে একদিকে ফেলে দিলেন আলী। বিছানা রক্তে লাল হয়ে গেছে। প্রহরীর বুকের মাঝ বরাবর খঞ্জরের দুটো আঘাত। বারান্দা এবং বাইরের অবস্থা গভীর মনযোগ দিয়ে দেখলেন আলী। এক ফোটা রক্ত নেই কোথাও। তার অর্থ সেন্ট্রিকে জীবিত কক্ষে ঢোকানো হয়েছিল। খঞ্জর মারা হয়েছে বিছানায় শুইয়ে। চেপে ধরার কারণে দাপাদাপি করতে পারেনি, তা নয়তো এদিক ওদিক রক্তের ছিটে ফোঁটা দেখা যেতো।

মৃত্যুর পর গায়ের ওপর কম্বল চাপিয়ে বন্দীকে তুলে নেয়া হয়েছে। এ অপহরণে বোনটা সাহায্য করে থাকতে পারে। রূপের লোভ দেখিয়ে হয়তো সেন্ট্রিকে ভেতরে নিয়ে এসেছিল। মেয়েটার সঙ্গীরা ওকে হত্যা করে ভাই-বোন দু'জনকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বন্দীর গ্রাম থেকে আসা চারজন লোককে দেখা করার অনুমতি দিয়ে ভুল করেছেন বলে আফসোস হলো আলীর। নইলে ওরা এখানকার অবস্থা, পাহারা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারতো না। মেয়েটাকে তার সাথে থাকার অনুমতি দেয়াও ঠিক হয়নি। ও আসলেই বন্দীর বোন কিনা কে জানে? এখন মনে হচ্ছে, মেয়েটাও ওদের দলেরই সদস্য।

নিজের ওপর ক্রোধ হচ্ছিল তার। অনুতাপ করছিলেন ভুলের জন্য। দক্ষ একজন গোয়েন্দা হিসাবে আলীকে ধোঁকা দেয়া সহজ নয়, অথচ এরা তাকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে গেলো!

এক প্রশ্নের জবাবে সেন্ট্রি বললো, 'আগের রাতে আমার ডিউটি পড়েছিল। দেখেছি মেয়েটা ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে অনেক রাতে ফিরে এসেছে।'

আলীর মনে সন্দেহ জাগলো। মেয়েটা রূপ যৌবন দিয়ে ডাক্তারকে হয়তো হাত করে নিয়েছিল। সেন্ট্রিকে বললেন, 'ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো। দ্রুত যাবে।'

চলে গেলো সেন্ট্রি। আলী বাইরে পায়ের চিহ্ন পরীক্ষা করতে লাগলেন। বন্দী আহত। নিশ্চয়ই একা পালায়নি। অস্পষ্ট পায়ের ছাপ থেকে আলী কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। বন্দীর গ্রামে কমাণ্ডো অভিযান চালানো যায়। কিন্তু কায়রো থেকে সে গ্রাম অনেক দূরে। কি করণীয় কোন কুল কিনারা পেলেন না আলী।

ফিরে এলো প্রহরী। বললো, 'ডাক্তার বাসায় নেই। তার বাসার চাকর বলেছে, মেয়েটা প্রতি রাতেই ডাক্তারের কাছে আসতো। অনেক রাত পর্যন্ত কথা বলতো। গত রাতেও মেয়েটা এসেছিল। অনেক রাতে দু'জনই বাসা থেকে বেরিয়েছেন। আর ফিরে আসেননি ডাক্তার।'

আলীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, ডাক্তারও বন্দীকে পালাতে সাহায্য করেছে। মেয়েটার রূপই এর জন্য দায়ী। গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের ডাকলেন আলী। বন্দীর পালিয়ে যাওয়ার কথা বললেন ওদের।

গোয়েন্দা কর্মীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। একস্থানে পাওয়া গেলো অনেকগুলো ঘোড়ার পদচিহ্ন। আশপাশের লোকজন বললো, 'গতরাতে অনেকগুলো ঘোড়ার পদশব্দ শোনা গেছে।'

ঘোড়ার পদচিহ্ন অনুসরণ করে শহরের শেষ সীমা পর্যন্ত গেলো গোয়েন্দা দল।

সামনে যাওয়া অর্থহীন। রাতের ঘোড়ার পদচিহ্ন এখন অনেকটা মুছে গেছে। তবে ওরা কোন্ দিকে গেছে বুঝা যাচ্ছে।

সংবাদটা মিশরের ভারপ্রাপ্ত গভর্ণরের কানে তোলা দরকার। আলী ভাবলেন, বন্দীর দেয়া তথ্য নিশ্চয়ই ভুয়া। পালানোর পথ বের করার জন্যই বন্দী অভিনয় করেছে। শুধু তাকে নয়, সুলতানকেও লোকটা বোকা বানিয়ে গেলো! দুপুরের দিকে গভর্ণরকে সংবাদ দেয়ার জন্য বেরিয়ে গেলেন আলী।

কায়রো থেকে অনেক দূরে ছ'টি ঘোড়া তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। একটার পিঠে আকিল, অন্যটায় ডাক্তার। ডাক্তারের হাত-পা বাঁধা।

আড়াআড়িভাবে উপুড় করে তাকে শোয়ানো হয়েছে। একদিকে মাথা এবং হাত, অন্যদিকে পা ঝুলছে। নিঃসাড় পড়ে আছেন তিনি। চোখ বাঁধা বলে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। ঘোড়া যখন মোড় ঘুরছে, উঁচু নীচু টিলা অতিক্রম করছে, অমনি শুধু অনুভব করছেন। ডাক্তারের সাথে রয়েছে অপহরণকারীদের একজন। খুরের শব্দে মনে হচ্ছে পেছনে আরো ঘোড়া আসছে। একই গতিতে ঘোড়া ছুটেছে রাতভর। পথে কোথাও বিশ্রাম নেয়নি অপহরণকারীরা।

আকাশে উঠে এসেছে মরু সূর্য। কিন্তু থামার কোন লক্ষণ নেই। রোদের তেজ বাড়ছে। সূর্য এখন মাথার উপরে। পেছন থেকে ভেসে এলো কানফাটা চিৎকার। কেউ পড়ে গেছে ঘোড়ার পিঠ থেকে। তার ঘোড়াটিও থামলো। পেছনে গেল খানিক। কেউ একজন বললো, 'তুলে ছায়ায় নিয়ে চলো। অজ্ঞান হয়ে গেছে। হায়, হায়! রক্তক্ষরণ হচ্ছে।'

'ডাক্তারের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দাও।' মেয়েলী কণ্ঠ। 'রক্তক্ষরণ বন্ধ না হলে আমার ভাই মরে যাবে।'

রাতভর তীব্র গতিতে ঘোরা ছুটেছে। ঝাঁকুনিতে ফেটে গেছে আকিলের ক্ষতের সেলাই। লোকটা দাঁত কামড়ে ব্যথা সহ্য করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অত্যধিক রক্তক্ষরণে অজ্ঞান হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে।

একটা গাছের ছায়ায় চলে এলো ওরা। পানি দেয়া হলো আকিলের মুখে। ভেতরে না গিয়ে গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো। রক্তে লাল হয়ে গেছে তার কাপড়। ডাক্তারের হাত-পা এবং চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। চোখ রগড়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন তিনি।

'এদিক-ওদিক তাকিয়ো না। সোজা সামনে চলো।' পিঠে খঞ্জর ঠেকিয়ে বললো এক অপহরণকারী।

হাঁটা দিলেন ডাক্তার। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আকিলকে ছায়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। পাশে বসে আছে শারজা। কাঁদছে। ডাক্তারকে দেখেই ও বললো, 'দোহাই ডাক্তার, আমার ভাইকে বাঁচান।'

বসে রোগীর শিরা দেখলেন ডাক্তার। এদিক-ওদিক তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে তাকে। এখনো পিঠে খঞ্জর ঠেকিয়ে রেখেছে লোকটা। আকিলের শিরা থেকে হাত

সরিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চকিতে পেছনে ফিরলেন। মুখোশ পরা চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। একজনের হাতে খঞ্জর।

ক্রুদ্ধ স্বরে ডাক্তার বললেন, 'গযব পড়ুক তোমাদের ওপর। বাঁচানোর পরিবর্তে লোকটাকে তোমরা মেরে ফেলেছো। তোমরা সবাই এর হত্যাকারী। আমি ওকে বিছানা থেকে নড়তে দেইনি। তোমরা সারা রাত ঘোড়ার পিঠে রেখেছো ওকে। ক্ষতস্থান ফেটে দেহের সব রক্ত ঝরে ও মারা গেছে।'

লাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো শারজা। অনেক কাঁদলো মেয়েটা।

ওকে সরিয়ে লাশ ঘোড়ার পিঠে চাপানো হলো। পাহাড়ের ঢাল থেকে সরে এসে পথে নামল কাফেলা। ডাক্তারের চোখ এবং হাত-পা বেঁধে দেয়া হলো। এখনো শারজার বিলাপ শোনা যাচ্ছে।

ডাক্তার তার পেছনে বসা আরোহীকে বললো, 'লোকটা সুস্থ হয়ে যেতো। ওকে তোমরা মেরে ফেললে। সুলতান ওকে কোন শাস্তিই দিতেন না।'

'আমরা ওকে বাঁচানোর জন্য আনিনি। ওকে নয়, ওর ভেতরের গোপন তথ্য অপহরণ করেছি। সে মরে গেছে এ জন্য আমাদের কোন দুঃখ নেই। আমরা খুশী। কারণ, তোমরা এবং তোমাদের সুলতান কোন গোপন তথ্য জানতে পারলো না ওর কাছ থেকে।'

'তোমরা আমাকে কোন অপরাধের শাস্তি দিচ্ছো?'

'আমরা তোমাকে নবীদের মতো সম্মানে রাখবো। মরুর সামান্য গরম বাতাসও তোমাকে স্পর্শ করবে না। পথে রোগীর কোন সমস্যা হলে তুমি চিকিৎসা করবে, এ জন্যই তোমায় এনেছি। তখন ভাবিনি, তোমার কাছে ওষুধ বা যন্ত্রপাতি কিছুই নেই, কি দিয়ে চিকিৎসা করবে?

মেয়েটাকে আনার প্রয়োজন ছিলো, তোমাকে ছেড়ে ওকে নিয়ে এলে তোমাদের গোটা সেনাবাহিনী আমাদের ধাওয়া করতো। আমাদের যাত্রা নিরাপদ করার জন্যই তোমাকে আনতে হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের একজন ভাল ডাক্তারও দরকার। এখন থেকে তুমি আমাদের সাথে থাকবে।'

'দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এমন কোন লোকের চিকিৎসা আমি করবো না। তোমরা খৃষ্টান এবং সুদানীদের বন্ধু। ফাতেমীদের সাহায্যকারী। তোমরা ওদের হাতের পুতুল। ওদের নির্দেশে তোমরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছো।'

'তবে তো তোমাকে মরতে হবে।'

'তাই আমার জন্য ভাল।'

'তোমার সাথে এমন ব্যবহার করবো যা ভাল না। তখন আমাদের প্রতিটি নির্দেশ পালন করতে তুমি বাধ্য হবে। তবে আমার মনে হয়, তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করার কোন প্রয়োজনই পড়বে না। তুমি সুলতান আইয়ুবীর রাজত্ব দেখেছো, আমাদেরটা দেখলে বলবে, এখান থেকে যাবো না। এ তো এক স্বর্গ। আমাদের প্রস্তাব না মানলে নরকের ছবিটাও এক নজর দেখিয়ে দেবো।'

ঘোড়া ছুটছে। চোখ বাঁধা থাকায় ডাক্তার কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কল্পনায় নিজের

ভবিষ্যত দেখার চেষ্টা করছেন শুধু। শারজার কথা বার বার মনে পড়ছে। কিন্তু হতাশ হচ্ছেন এই ভেবে, মেয়েটা হয়তো ওদের দলেরই সদস্য। ও তাকে কোন সাহায্য করবে না।

সীমান্ত প্রহরারত মুসলিম সৈনিকদের ভয়ে অপহরণকারীদেরকে অনেক পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে। দিনভর একটানা চলেছে। সন্ধ্যার পরও থামেনি। মাঝ রাতে কাফেলা একটা উপত্যকায় এসে থামলো।

অন্ধকার রাত। ডাক্তারকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে চোখ এবং হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিল। সামনে দিল খাবার এবং পানীয়।

পথশ্রমে ক্লান্ত সবাই। ঘোড়াগুলোর জিন খুলে পানি খাওয়ানো হলো। ঘাস পাতা দিয়ে বেঁধে রাখা হলো একটু দূরে। খাওয়ার পর হাত-পা বেঁধে ডাক্তারকে ওরা শুয়ে পড়তে বললো। ওরাও শুয়ে পড়লো। গত রাতে কেউ ঘুমুতে পারেনি, শোয়ার সাথে সাথে ঘুম নেমে এলো সবার চোখে।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তারের চোখ খুলে গেলো। ভাবলেন হত্যা করার জন্য সম্ভবত তাকে জাগানো হচ্ছে। মরার জন্য ডাক্তার তৈরী। কে যেন পায়ের বাঁধন খুলছে।

পায়ের কাছ থেকে ছায়ামূর্তি হাতের কাছে চলে এসেছে। ধীরে ধীরে হাতের বাঁধনও খুলে ফেললো। এরপর ডাক্তারের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'দুটো ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়েছি।' শারজার কণ্ঠ, 'নীরবে আমার সাথে আসুন। ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে। এখুনি পালাতে হবে। ওরা বেহুশের মতো ঘুমুচ্ছে। সহজে জাগবে না।'

নিঃশব্দে শারজাকে অনুসরণ করলেন ডাক্তার। নরম বালিতে হাঁটার শব্দ হচ্ছে না। সামনে দুটো ঘোড়া প্রস্তুত। দু'জন দুটোর পিঠে উঠে বসলো।

'ঘোড়া ভাল চালাতে না পারলেও ভয় নেই।' শারজা বললো, 'পড়বেন না। লাগাম ঢিলা করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিন। ডানে বাঁয়ে ঘুরাতে পারবেন তো?'

কোন কথা না বলে ঘোড়া ছুটালেন ডাক্তার। শারজা বললো, 'আমার পেছনে আসুন, আমি পথ চিনি। সাবধান, অন্ধকারে যেন বিচ্ছিন্ন হবেন না।'

অশ্বের ক্ষুরের শব্দে জেগে উঠলো অপহরণকারী দল। কারা যাচ্ছে প্রথম দিকে বুঝতে পারলো না ওরা। শারজার পালানোর প্রশ্নই ওঠে না। ডাক্তারের হাত পা বাঁধা। তাহলে কে যাচ্ছে?

চিন্তা-ভাবনা করতে কিছু সময় নষ্ট হলো ওদের। ঘোড়ার কাছে ছুটে গেলো ওরা। দুটো ঘোড়া নেই। খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেলো, ডাক্তার নেই, শারজাও নেই।

কি ঘটেছে বুঝতে বাকী রইলো না কারো। দ্রুত ঘোড়ার পিঠে জিন চাপালো ওরা। ধাওয়া করে ছুটলো ওদের পেছনে। দুই ঘোড়সওয়ারই তখন অনেকে দূরে। তবুও বার বার ওদের দৃষ্টি ছুটে যাচ্ছে পেছন দিকে, যদি ধাওয়া করে ওদের ধরে ফেলে অপহরণকারীরা!

অনেকক্ষণ চলার পর ঘোড়ার গতি কিছুটা কমিয়ে আনলো ওরা। ডাক্তার শারজাকে বললো, 'এখানে কোথাও সীমান্ত ফাঁড়ি রয়েছে। কোথায় জানি না।'

জানে না শারজাও। ফাঁড়ির রক্ষীদের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য অনেক পথ ঘুরে ওরা এগিয়েছে। শারজা বললো, 'সোজা পথে আমাদের গ্রাম এত দূরে নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা কায়রোর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি।'

দুপুরে ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর তকিউদ্দিনের কাছে পৌছলেন আলী বিন সুফিয়ান। তাকে সব কথা খুলে বললেন। গভর্ণর বললেন, 'চারজন অপরিচিত লোককে বন্দীর সাথে দেখা করতে দেয়া এবং সন্দেহভাজন মেয়েটাকে তার কাছে থাকতে দেয়াটা ছিল মারাত্মক ভুল। আপনার মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ ভুল করার পরও আমি ততোটা আশ্চর্য হইনি, যতোটা আশ্চর্য হয়েছি ওদের দুঃসাহস এবং দক্ষতা দেখে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন।' আলী বললেন, 'এ রকম সুরক্ষিত সেনানিবাসে ঢুকে সেন্ট্রিকে হত্যা করে বন্দীকে অপহরণ করা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক কাজ।'

'আমার ধারণা, ডাক্তার এবং যুবতী মেয়েটা এ অপহরণকে সহজ করে দিয়েছে। সুলতান আমাদের এ দুর্বলতা নিয়েই উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, নারী এবং ক্ষমতার লোভ এ জাতিকে ধ্বংস করবে। আমি ডাক্তারকে একজন ভাল মানুষ মনে করতাম। অথচ অবাক লাগছে, একটা সাধারণ মেয়ে তাকে অন্ধ করে ফেললো!'

'বন্দীর গ্রামের ঠিকানা সংগ্রহ করে আমি এক প্লাটুন সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের যে পর্বত ঘেরা পোড়োবাড়ীর কথা বন্দী বলেছে সে ব্যাপারে কি চিন্তা করেছেন?'

'মনে হয় বন্দী মিথ্যে বলেছে। জীবন বাঁচানোর জন্যই একটা মিথ্যে গল্প ফেঁদেছিল ও। এরপরও খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য ওখানে গোয়েন্দা দল পাঠাবো।'

প্রহরী ভেতরে এসে বললো, 'ডাক্তার একজন তরুণীকে নিয়ে এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছেন। উনি আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন।'

এ সংবাদ শুনে থ' হয়ে গেলেন দু'জনই। একজন আরেকজনের দিকে চাইতে লাগলেন। কারো মুখে কথা সরছে না।

'অন্য কেউ হবে হয়তো' বলে বেরিয়ে গেলেন আলী। পেছনে গেলেন গভর্ণর।

ডাক্তার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। সাথে বন্দীর বোন শারজা। ধুলোমলিন বিধ্বস্ত চেহারা ওদের, ঘোড়াগুলো হাঁপাচ্ছে।

'বন্দীকে কোথায় রেখে এসেছো?' আলীর কন্ঠে ঝাঁঝ।

হাত দিয়ে ইশারা করে ডাক্তার বুঝালেন, তারা ভীষণ ক্লান্ত, পিপাসার্ত এবং ক্ষুধার্ত। ভেতরে নিয়ে তাদেরকে পানি এবং খাবার দেয়া হলো। খাওয়া শেষে ডাক্তার সব ঘটনা খুলে বললেন।

'আহত বন্দী আমাদের সাথে রয়েছে জানতাম না। পরদিন ঘোড়া থেকে পড়ে লোকটা যখন মারা গেলো তখনই শুধু জেনেছি বন্দীকেও অপহরণ করা হয়েছে।'

শারজা কিভাবে তাকে মুক্ত করেছে এবং এরপর দু'জন পালিয়ে এসেছে ডাক্তার তাও বললেন। শারজারও জবানবন্দী নেয়া হলো। তার কথা শুনে আলী বুঝলেন, গ্রামের একজন সাধারণ মেয়ে হলেও সাহস আছে মেয়েটার।

শারজা বললো, 'ভাইয়ের আশ্রয়ে এতদিন আমি বেঁচে ছিলাম। তার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হতাম না। ডাক্তার নিষ্পাপ, আন্তরিকতা ও দরদ নিয়েই তিনি ভাইয়ের চিকিৎসা করেছেন। তার পবিত্র ব্যবহারে আমি মোহিত হয়েছি। ভেবেছি লোকটা মানুষ নয়, ফেরেশতা। আমার সাথে যে চারজন লোক এসেছিল ওদের সাথে আমার আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। যারা সুলতানকে হত্যা করতে চায় এরা তাদের দলের লোক।

আপনার লোকেরা যখন আমাদের গ্রামে গিয়েছিল তখন এ চারজন গ্রামে ছিল। ভাইয়ের বন্দী হওয়ার কথা শুনে ওরা সাথে এসেছে। ভাইয়া ওদের অনেক গোপন কথা জানতেন। ওদের আশংকা ছিল ভাইয়া না আবার সব প্রকাশ করে দেয়! ভাইয়া কোথায় এবং কি কাজে গিয়ে আহত হয়েছেন তাও তারা জানতো। তাই সুযোগ পেলে ভাইয়াকে অপহরণ করার টার্গেট ছিল তাদের।

আমারও ইচ্ছা ছিল ভাইয়াকে ওরা অপহরণ করুক। দুটো কারণে আমি ভাইয়ার কাছে থাকতে চেয়েছি। প্রথমতঃ তার সেবা করা। দ্বিতীয়তঃ সুযোগ পেলে তাকে অপহরণ করতে সাহায্য করা।

আমার সাথে আসা সে চারজন লোক গ্রামে ফিরে যায়নি। কায়রোতে আত্মগোপন করেছিল ওরা। আমার ইঙ্গিত পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ডাক্তার আমার চিন্তা বদলে দিলেন। তিনি বললেন, ভাইয়াকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না।

সুলতান আইয়ুবী সম্পর্কে আমাদের এতদিন যা বলা হয়েছিল, ডাক্তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বললেন। আমরা সুলতানকে হত্যা করা বৈধ মনে করতাম, কিন্তু ডাক্তার বললেন, তিনি ইসলামের জন্য যুদ্ধ করছেন। ডাক্তারের উন্নত নৈতিক চরিত্র সুলতান এবং ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে দিল। অধিকাংশ সময় তার কাছে গিয়ে এসব কথা শোনার জন্য বসে থাকতাম।

একদিন ডাক্তারের বাসায় যাচ্ছি, পথে সেই চারজনের সাথে দেখা হলো। ওরা ভাইয়াকে অপহরণ করার কথা বললো। আমি বললাম, 'আমার ইচ্ছে পরিবর্তন করেছি। ভাইয়া এখানেই থাকবেন।'

ওরা বললো, 'শহরে এসে তোমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে।'

ওদের সহযোগিতা না করলে ওরা আমাকে হত্যা করে ভাইয়াকে নিয়ে যাবে বলে হুমকি দিল। আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। বললাম, 'অপহরণের ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবো না।'

ওদের একজন বললো, 'ডাক্তারের বাসায় তোমার আসা-যাওয়া দেখে ভেবেছিলাম তুমি তাকে ফাঁসিয়েছ। এখন দেখছি নিজেই তার জালে ফেঁসে গেছো।'

আমি ওদের ধমক দিয়ে বললাম, 'এসব কথা আবার বললে পরিণতি ভাল হবে না। ডাক্তারের সাথে আমার খারাপ কোন সম্পর্ক নেই।' ওরা এতটা দুঃসাহসী হয়ে এ কাজ করবে ভাবিনি, এ জন্য ডাক্তারকেও বলিনি কিছু।

রাতে ডাক্তারের বাসা থেকে ফেরার সময় ওদের হাতে ধরা পড়লাম। একটা ঘোড়ার পিঠে আমার ভাইকেও দেখলাম। ভাইয়া মুক্ত হয়েছেন দেখে খুশীও হলাম। পালানোর জন্য প্রস্তুত হলাম। ডাক্তারকে অপহরণ করুক আমি তা চাইনি। আমার বাঁধা উপেক্ষা

স্বরে ওরা তার হাত-পা বেঁধে ঘোড়ায় তুলে নিল।

ভাইয়াকে কিভাবে অপহরণ করেছে জানতে চাইলাম। ওরা বললো, 'আমাদের দু'জন গিয়ে সেন্ট্রির কাছে একটা ঠিকানা জিজ্ঞেস করলো। সেন্ট্রি তাদেরকে ঠিকানা বুঝাতে লাগলো। এ সুযোগে দু'জন ঢুকে গেলো ভেতরে। বাইরের দু'জনও সেন্ট্রিকে নিয়ে ভেতরে গেলো। ভাইয়া তাদেরকে দেখে উঠে বসলেন।

ভাইয়ার বিছানায় সেন্ট্রিকে শুইয়ে দেয়া হলো। খঞ্জর দিয়ে বুকে দুটো আঘাত করে বেরিয়ে এলো ওরা।

ওরা ধারণা করেছিল, আমি ডাক্তারের বাসায় রয়েছি। ওদের ভয় ছিল, আমি অপহরণে বাঁধা দেবো। এ জন্য দু'জন লুকিয়ে রইলো ডাক্তারের বাসার পথে। ডাক্তার যখন আমাকে এগিয়ে দিতে এলেন তখনই ওরা আমাদেরকে ধরে ফেললো। আর সাথে সাথেই সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলো।'

দু'জনের জবানবন্দীর ওপর নির্ভর করলেন না গোয়েন্দা প্রধান। এদের ফিরে আসাও ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে। দু'জনকে আলাদা কক্ষে নিয়ে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। আলী বাধ্য হলেন ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করতে।

মেয়েটার প্রসঙ্গে ডাক্তার বললেন, 'ওর সাথে আমার স্নেহমাখা আবেগ জড়িত। ও দেখতে অবিকল আমার মৃতা বোনের মতো। এ জন্য ওকে আন্তরিকতা দেখিয়েছি, নিয়ে গেছি আমার বাসায়। বন্দীর ঘরেও ওর কাছে বেশী সময় কাটাতাম। আমার ভেতর কোন পাপ বোধ ছিল না, এ কারণে ও বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়ে আমার ওপর। আমার ওপর গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের কারণে ও আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। মুসলমান হওয়ার পরও গ্রামের এক সহজ সরল মেয়ে হওয়ার কারণে ইসলাম সম্পর্কে ওর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

সুলতান আইয়ুবী সম্পর্কে ওর মনে কাজ করছিল বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। গ্রামে যা শুনেছে তাই বিশ্বাস করেছে ও। আমি ইসলাম, সুলতান এবং মিশর সম্পর্কে ওর খারাপ ধারণা দূর করে দিয়েছি। তার কথা শুনে বুঝতে পেরেছি, তাদের এলাকায় ইসলাম এবং সুলতানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্র চলছে।'

শারজার গতানুগতিক জবানবন্দী গ্রহণ না করে আলী বিন সুফিয়ান তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন। জবাবে মেয়েটি পোড়োবাড়ীর প্রসঙ্গ তুলে বললো, সে নিজেও পোড়োবাড়ীর রহস্যময় পীরের ভক্ত। আলীর প্রশ্নের জবাবে শারজা বললো, 'ভাইয়া সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। বাড়ীতে আমি থাকতাম একা। গ্রামের লোকেরা আমাকে পোড়োবাড়ীতে চলে যাওয়ার জন্য উস্কানী দিতে লাগলো। পবিত্র বাবা নাকি সুন্দরী যুবতী ও কুমারী কন্যাদের পছন্দ করেন। আমাদের গ্রামের ক'জন সুন্দরী যুবতী রহস্য ঘেরা বাড়ীতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।'

শারজা বললো, 'এক ছুটিতে ভাইয়া বাড়ী এলে আমি তার কাছে পোড়োবাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি নিষেধ করলেন। তাই আর আমার সেখানে যাওয়া হয়ে উঠেনি।'

পোড়োবাড়ী সম্পর্কে শারজা পরিষ্কার করে কিছুই বলতে না পারলেও ওখানে যে

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে তা সহজেই বুঝা গেলো তার বক্তব্যে।

ডাক্তারের প্রসঙ্গ তোলা হলে ও বললো, 'অপহরণকারীরা তাকে বন্দী করে রাখলেও আমি তাকে মুক্ত করে দিতাম। আমি বাঁচবো কি মরবো এ তোয়াক্কা করতাম না।'

শারজা বললো, 'ভাইয়ার মৃত্যুর পর গ্রামে যাবার আর কোন আকর্ষণ আমার নেই। তাই ভাইয়ার মৃত্যুর পর সিদ্ধান্ত নিলাম, পথেই ডাক্তারকে মুক্ত করে এই দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবো। আগে ভাবতাম, অপহরণকারীরা আমাদের আপন। কিন্তু ডাক্তার আমার চোখ খুলে দিলেন। তার কাছ থেকেই জানতে পারি, ওরা ভয়ানক পাপী ও অপরাধী। নিজের দেশের এবং ধর্মের বিরুদ্ধে ওরা ষড়যন্ত্র করছে। ওদের সাথে পালাতে গিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ভাইয়ার জন্য ওদের কোন আন্তরিকতা ও দরদ নেই। ভাইয়া তাদের গোপন তথ্য জানতেন বলেই তাকে ওরা অপহরণ করে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলেছে।'

'এখন কি করবে?' প্রশ্ন করলেন আলী। 'নিজের ব্যাপারে কি ভাবছো?'

'আমি সারা জীবন ডাক্তারের পায়ের ওপর পড়ে থাকবো। তিনি আগুনে ঝাঁপ দিতে বললে তাও দেবো। আমার চোখে ছিল পাপের পর্দা। ডাক্তার তা সরিয়ে দিয়েছেন। আমি সারা জীবন তার দাসীগিরী করেও এ ঋণ শোধ করতে পারবো না।'

'আচ্ছা, আমরা যদি রহস্যময় পোড়োবাড়ীতে অভিযান চালাই, তুমি কি আমাদের সহযোগিতা করবে?'

মেয়েটি বললো, 'আপনারা যদি রহস্যঘেরা বাড়ীতে যেতে চান, আমি নিয়ে যাবো। আমাদের এলাকায় যারা সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে আমি সবাইকে চিনি। ওদের গ্রেফতার করতে চাইলেও আমি সহযোগিতা করবো। এ জন্য মরতে হলেও পিছপা হবো না। ওরা যে আপন ধর্ম, দেশ এবং জাতির শত্রু এ কথা ডাক্তার আমাকে ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

আলীর পরামর্শে পদস্থ সেনা অফিসার এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মিটিং ডাকা হলো। আলোচনা হলো উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে। তাদের অধিকাংশই বললেন, 'নতুন গভর্ণর তকিউদ্দিন মিশরের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। তাই কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আমাদের গভীর চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এক বিশাল এলাকা জুড়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে দুশমনরা। এতো লোকের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হবে না। মনে হচ্ছে, রহস্যময় বাড়ী ঘিরে নতুন মতাদর্শ জন্ম নিয়েছে। মতাদর্শের অনুসারীরা এর বিরুদ্ধে কোন সেনা অভিযান সহ্য করবে না। ওখানে আলেম এবং ধর্মপ্রচারক পাঠানো যেতে পারে। ওরা দ্বীনের সত্যিকার কথা তুলে ধরে মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসবেন। তাদের ভক্তিমাখা আবেগকে আহত করা যাবে না।'

কেউ পরামর্শ দিলেন, 'ঘটনা সুলতানকে অবহিত করে তার নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া উচিত।'

'এর অর্থ হচ্ছে আপনারা মানুষকে ভয় পাচ্ছেন।' মুখ খুললেন ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর তকিউদ্দিন, 'এদিকে আল্লাহ ও রাসুলের দ্বীনকে বিকৃত করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে আপনাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। আপনারা বিভ্রান্ত মানুষদের আবেগ নিয়ে চিন্তিত।

কেউ আবার সুলতানকে সব জানাবার পরামর্শ দিয়েছেন। সুলতান এক শক্তিমান শত্রুর মোকাবিলা করছেন, তা কি আপনাদের জানা নেই? এ অবস্থায় মিশরে কি হচ্ছে সব সুলতানকে জানিয়ে তাকে বিব্রত করা কি ঠিক হবে? তাকে কি আপনারা বুঝাতে চাচ্ছেন, আমরা দু'চার হাজার শত্রুর ভয়ে আতংকিত! তাই আমি এ ব্যাপারে সরাসরি এবং কঠোর পদক্ষেপ নিতে চাই।'

'অপরাধ নেবেন না মাননীয় সুলতান!' বললেন এক সেনাপতি, 'আমাদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের অভিযোগ হচ্ছে, আমরা তরবারীর জোরে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করছি। আমরা এ অপবাদ মুছে ফেলতে চাই। আমরা ওখানে যাবো প্রেম এবং ভালবাসার বাণী নিয়ে।'

'তাহলে কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন?' গভর্ণরের কণ্ঠে তিরস্কার। 'এত টাকা খরচ করে কেন সেনাবাহিনী লালন পালন করা হচ্ছে? সেনাবাহিনীকে ছুটি দিয়ে একদল ধর্মপ্রচারক তৈরী করি। ওরা গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে ঘুরে ধর্ম প্রচার করবে। অস্ত্রভাণ্ডার নীল দরিয়ায় ফেলে দিয়ে বলুন সবাই দরবেশ হয়ে যাই!'

গভর্ণরের কণ্ঠে উথলে উঠলো এক রাশ আবেগ, 'বন্ধুগণ! রাসুল (সা.)-এর বিরুদ্ধে কাফেরদের তরবারী উন্মুক্ত হলে ইসলামের তরবারী কোষবদ্ধ থাকতে পারে না। সূর্য উঠলে যেমন অন্ধকার পালিয়ে যেতে বাধ্য তেমনি ইসলামের তলোয়ার কোষমুক্ত হলে আল্লাহ ও আল্লাহর নবীকে অস্বীকারকারী প্রতিটি বেঈমানের শির অবনত হতে বাধ্য। কালেমার বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রতিটি কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়াকে একজন মুসলমান তার নৈতিক দায়িত্ব মনে করে।

ইসলাম তরবারীর জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ অভিযোগকারীদের কাছে আমি ক্ষমা চাইতে যাবো না। ডাকাত ও দুর্বৃত্তদের হাত থেকে জনগণকে নিরাপত্তা দিতে গেলে যেমন নিরাপত্তা কর্মীদের অস্ত্র তুলে নিতে হয় হাতে তেমনি পশুশক্তির হাত থেকে মানবতাকে রক্ষা করতে হলেও হাতে অস্ত্র নিতে হয় মানবতা কর্মীদের। তাই মানবতার স্বপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য যদি কেউ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে কিছুই করার নেই আমার।

বন্ধুরা! আপনারাই বলুন, আজ কেন সংকীর্ণ হয়ে এসেছে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা? স্বয়ং মুসলমানই কেন ইসলামের শত্রুতে পরিণত হচ্ছে? কারণ, খ্রীষ্টান যুবতীদের রূপ, মদ, সম্পদ, আর ক্ষমতার মোহ মুসলমানদের তরবারী ভোতা করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের ইতিহাস– সত্যের পথে অনড়, অটল থাকার ইতিহাস। যত অভিযোগই উত্থাপন করা হোক না কেন, আমরা সত্যের পথে অটল ও আপোষহীন ছিলাম, আছি, থাকবো।'

সুলতান তকিউদ্দিন বললেন, 'যেহেতু যুদ্ধের ময়দানে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না, তাই বিভিন্ন অভিযোগ দিয়ে ওরা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করতে চাচ্ছে। কৌশলে কেড়ে নিতে চাচ্ছে আমাদের হাতের অস্ত্র। ওদের পদাতিক এবং নৌ-অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর ওরা আমাদেরকে নিঃশেষ করার জন্য বেছে নিয়েছে ষড়যন্ত্রের পথ। নারী, মদ আর সম্পদের মাধ্যমে দ্বীনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বাঁধার প্রাচীর।

আমাদের চরিত্র, আমাদের নৈতিকতা আর আমাদের ঈমানী চেতনা ধ্বংস করার জন্য সামনে এগিয়ে দিচ্ছে রূপসীদের রাঙা ঠোঁটের মৃদু হাসি আর ভণ্ড পীরদের তেলেসমাতি কারবার। আপনারা এদের বিরুদ্ধে তরবারী কোষমুক্ত করতে নিষেধ করছেন!

শুনুন আমার বন্ধুরা! ভালবাসার অভিনয় করে শত্রু আপনাদের হাত থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিতে চাইছে। আঘাত করতে চাইছে আপনাদের পিঠে। 'কেউ তোমার এক গালে চড় মারলে অন্য গাল পেতে দাও', ওদের এ শ্লোগান একটা প্রতারণা। কেউ ওদের গালে চড় মারার আগেই ওরা তাকে গোপনে হত্যা করে, এটাই ওদের ইতিহাস।

ক্রাকের মুসলমানরা কি অবস্থায় আছে আপনাদের জানা নেই? সুবাকে ওদের তৈরী বেগার ক্যাম্পের নির্যাতন কি আপনারা দেখেননি? ওখানে লুণ্ঠিত হয়েছে মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম। আজো অধিকৃত ফিলিস্তিনের নির্যাতীতা মুসলমান নারীরা হারাচ্ছে ইজ্জত। প্রচণ্ড আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে আপনার ভাই ও বোনেরা।

আপনারা কি জানেন না, খৃষ্টানরা মুসলমানদের কাফেলা থেকে যুবতী এবং সুন্দরী মেয়ে ও শিশুদের অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়ে ও শিশু হত্যাকারী জানোয়ারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে আপনারা নিষেধ করছেন? বলছেন এ অন্যায়! এ অন্যায় করতে আমি লজ্জিত হবো না।

নিরস্ত্র মুসলিম রক্তে রঙ্গীন হচ্ছে খৃষ্টানদের তরবারী। ওদের অপরাধ, ওরা আল্লাহ এবং রাসূলকে বিশ্বাস করে, ভালবাসে। ওরা ক্রুশ পুজা এবং শিরক করে না। যেখানে আল্লাহর বাণী কায়েম হবে শুধু সেখানেই তোমাদের তরবারী কোষবদ্ধ হবে।'

'ওদের আবেগকে আহত করা যাবে না' আমি এ কথায় বিশ্বাসী নই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসক আর অযোগ্য আমীর ওমরাহর দল আকর্ষণীয় কথা বলে মানুষকে প্রলুব্ধ করে। মানুষের মিথ্যে আকীদা বিশ্বাস ওদের পুঁজি। জনগণকে কুসংস্কারের সাগরে ডুবিয়ে নিজেরা লালসা এবং ভোগ বিলাসে মত্ত থাকলে চলবে না। সত্যের পথে চলতে গিয়ে কারো কারো কষ্ট হবে। এ ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

কয়েকজনের সন্তুষ্টির জন্য জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে পারি না। কিছু মানুষের আবেগ আহত হবে বলে দেশের এক বিশাল এলাকা ষড়যন্ত্রকারী গাদ্দারদের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না। আপনারা দেখেছেন ওখানকার মানুষ সহজ-সরল এবং অশিক্ষিত। গোত্রপতিরা ধর্মের ইজারাদার হয়ে বসে আছে। শত্রুর পক্ষ হয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।'

সভার সদস্যগণ কল্পনাও করতে পারেনি গভর্ণর এমন কঠিন পদক্ষেপ নেবেন। তিনি যে সব যুক্তি পেশ করেছেন তা খণ্ডন করার ক্ষমতা কারো ছিল না। অন্য কোন পরিকল্পনা পেশ করার সাহস পায়নি কেউ।

গভর্ণর বললেন, 'বর্তমানে মিশরে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর ময়দানের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। এদের মধ্য থেকে পাঁচশ' ঘোড়সওয়ার, দু'শ উষ্ট্রারোহী এবং পাঁচশ' পদাতিক সৈন্য আজ সন্ধ্যার মধ্যে রওনা করবে। এরা রহস্য ঘেরা বাড়ী থেকে এদ্দুর দূরে থাকবে, যেন প্রয়োজনে আক্রমণ করতে পারে।

দামেশক থেকে যে দু'শ সওয়ার এসেছে তারা পার্বত্য এলাকায় গিয়ে পোড়োবাড়ী অবরোধ করবে। বাড়ীর ভেতরে চলবে কমাণ্ডো অভিযান।' গভর্ণর আরো বললেন, 'ওরা তৈরী করে একদল চাটুকার। চাটুকারের দল ঘুরে ঘুরে প্রচার করে, ওনি যা বলেছেন তা আল্লাহর কথা। ভণ্ড শাসকদের ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য ওরা বলে বেড়ায়, শাসকদের কথা না মানলে পাপ হবে।

এ ভাবেই মানুষ লম্পট পাপীদের গোলামীর শৃংখলে বাঁধা পড়ে। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে দুটো শ্রেণীতে। এক দল শাসক, আরেক দল শাসিত। এক দল অত্যাচারী, অন্য দল অত্যাচারিত। তখন জনগণ হয় ক্ষমতাসীনদের বলির পাঁঠা।

আমরা দেখছি, শত্রু আমাদের মূলে আক্রমণ করছে। আমাদের ভাইদেরকে নিয়ে যাচ্ছে কুফরীর গহীন অন্ধকারে। এখনই কঠোর পদক্ষেপ না নিলে এর অর্থ হবে আমরা বেঈমানদের সহযোগিতা করছি। আমার ভাই সুলতান আইয়ুবী বলেছেন, গাদ্দারীতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি।

আমি দেখতে পাচ্ছি, সমাজে শাসক এবং শাসিত এ দুটো শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। শাসক মদের পিয়ালায় ডুবিয়ে দেবে দেশের সম্পদ। অনাহারে অর্ধাহারে মারা পড়বে জনগণ। ভাইজানের কথাই ঠিক। তিনি বলেছেন, নিজ জাতি এবং ধর্মের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত আমাদের। জাতির চিন্তা চেতনা এবং কর্মধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। মনে রাখবেন, আগামী প্রজন্ম আমাদের কবরের কাছে জবাব চাইবে। জাতি এবং ধর্মের জন্য কল্যাণকর কোন কাজ থেকে আমাদেরকে দূরে থাকলে চলবে না।'

সভা শেষ হলো। সবাই যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করে সুলতান সেনাবাহিনীকে সমগ্র মরু এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারা দখল করে নিল পানি এবং মরুদ্যানগুলো। শত্রু যেন এসব এলাকায় আসতে না পারে এ জন্য পাহারার ব্যবস্থা করা হলো। জায়গায় জায়গায় স্থাপন করা হলো মেনজানিক কামান। সতর্ক প্রহরায় থাকলো তীরন্দাজ বাহিনী। পর্বত চূড়ায় বাংকার তৈরী করা হলো।

সুলতান মুসলিম ফৌজকে নির্দেশ দিলেন, 'শত্রু মুখোমুখি আক্রমণ করলে চারদিকে ছড়িয়ে যাবে। ওরাও তখন ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে।'

এভাবে সুলতান এমনভাবে সৈন্যদের সংগঠিত করলেন, কোনটা সামনের দিক আর কোনটা পেছনের বুঝার কোন উপায় রইল না। সেনাবাহিনীর এক অংশ রিজার্ভ রাখা হলো জরুরী প্রয়োজনে কাজে লাগানোর জন্য। প্রস্তুত রইলো কমাণ্ডো বাহিনী।

সুলতান খৃস্টানদের তৎপরতার বিস্তারিত খবর পাচ্ছিলেন। ওদের প্রথম পরিকল্পনা ছিল সুবাক দুর্গ পুনরুদ্ধার করা। তাদের ধারনা, সুবাক অবরুদ্ধ হলে সুলতানের ক্ষুদ্র বাহিনীকে মরুভূমিতেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাবে। ভেতরের সাহায্য সুলতান পাবেন না। কায়রো থেকেও কোন সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এভাবেই সুলতানকে উচিত শিক্ষা দেয়ার কথা ভাবলো তারা।

যেদিক থেকে সুবাক দুর্গে আক্রমণ করার সম্ভাবনা ছিল, সুলতান সেদিক থেকে তাঁর

সৈন্যবাহিনী সরিয়ে আনলেন। বাহ্যত সুবাক এখন অরক্ষিত।

খৃষ্টান গুপ্তচর ছুটলো ক্রাকে। বললো, 'সুবাক এখন অরক্ষিত। নির্দ্বিধায় আক্রমণ করা যায়। বিনা বাঁধায় সুবাক দুর্গ দখল করা যাবে।'

সাথে সাথে মুখোমুখি আক্রমণকারী বাহিনীকে দিক পরিবর্তনের নির্দেশ দিল খৃষ্টান সেনাপতি। নতুন নির্দেশ পেয়ে খৃষ্টানদের বিশাল বাহিনী এগিয়ে চললো সুবাকের দিকে। পেছনে রসদের বহর। সুবাক থেকে চার মাইল দূরে ছাউনি ফেললো খৃষ্টান বাহিনী।

রসদ বোঝাই হাজার হাজার গাড়ী পেছনে আসছে। বিস্তীর্ণ এলাকার কোথাও একজন মুসলিম সৈন্যও দেখা যায়নি। নির্ভয়ে এগিয়ে চললো রসদবাহী কাফেলা। খৃষ্টান সম্রাটদের খুশীর অন্ত নেই। সুবাক দুর্গ তাদের হাতের মুঠোয়।

রাত নেমেছে। নিরুদ্বিগ্ন সেনাবাহিনীর কেউ ঘুমিয়ে আছে, কেউ আবার আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। অকস্মাৎ তাদের দৃষ্টি ছুটে গেলো ফেলে আসা পথের দিকে। মাইল পাঁচেক দূরের আকাশ রঙ্গীন হয়ে উঠছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে।

একদল দ্রুতগামী সওয়ারকে পাঠিয়ে দেয়া হলো কি ঘটেছে দেখার জন্য। ওরা যখন সেখানে পৌঁছলো তখন সব শেষ। অবাক হয়ে ওরা তাকিয়ে রইলো সে আগুনের দিকে। ওদের চোখের সামনে পুড়ছে ওদের রসদ সামান। লাগামহীন ঘোড়াগুলো দিক-বিদিক ছুটাছুটি করছে। আগুনে পুড়ে গেছে পশুর খাবার, শুকনো ঘাস আর খড়ের স্তূপ।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সেনাপতিরা ছুটে গেলেন সেখানে। তাদের বিষণ্ন চোখে অবাক করা দৃষ্টি। কিছু নেই। এক মাসের রসদ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ওরা বুঝতে পারলো, এবারও ওরা সুলতান আইয়ুবীর ফাঁদে পা দিয়েছে।

'রসদ ছাড়া দুর্গ অবরোধ করা যাবে না। এখন সুবাক যাওয়ার পথও নিরাপদ নয়।' সেনাপতি সিদ্ধান্ত দিলেন, 'অভিযান মুলতবী করা হলো।'

গুপ্তচরের দ্বিতীয় সংবাদে আরো হতাশ হয়ে পড়লো খৃষ্টান বাহিনী, 'গত রাতে খৃষ্টানদের দ্বিতীয় বাহিনীর রসদও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

খৃষ্টান সম্রাট এবং সেনাপতিরা বৈঠকে মিলিত হলেন। পরিকল্পনা রদবদল করতে হবে। কি আশ্চর্য! মুসলিম বাহিনীর 'টিকি'টি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গোয়েন্দারাও বলতে পারলো না কোথায় জমায়েত হয়ে আছে মুসলিম বাহিনী। দৃশ্যত বিশাল মরুভূমির কোথাও নেই ওরা, অথচ কার্যত সর্বত্র আছে।

খৃষ্টানদের দুই বিশাল বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করে দিলেন সুলতান। কমাণ্ডারদের ডেকে বললেন, 'খৃষ্টান ফৌজ যুদ্ধ মুলতবী করলেও আমাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। ওরা দুই বাহিনীর মুখোমুখি লড়াইকে যুদ্ধ বলে। আমি তা করবো না। ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে। ওদের নিশ্চিন্তে পিছাতে দেবো না। কমাণ্ডো আক্রমণে ওদের ব্যস্ত রাখবো এবং একটু একটু করে নিঃশেষ করবো ওদের।'

সুলতান কমাণ্ডোদের বললেন, 'পেছনে বা ডানে বাঁয়ে ঝটিকা আক্রমণ করে পালিয়ে যাবে তোমরা। এভাবে ওদের নিয়ে আসবে আমাদের পছন্দের রণক্ষেত্রে। তখন দেখবে,

ওখানকার প্রতিটি ধূলিকণাও আমাদের সহযোগিতা করছে।'

সুলতান এক জায়গায় বসে থাকেন না। আজ এখানে তো কাল ওখানে। ঘুরে বেড়াচ্ছেন সমগ্র মরু এলাকা। খৃষ্টান গোয়েন্দারাও জানে না সুলতান কখন কোথায় থাকেন। পরবর্তী বিপর্যয়ের ভয়ে তটস্ত রইল খৃষ্টান ফৌজ।

মিশরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের পার্বত্য এলাকা। এখানকার রহস্যময় বাড়ীতে আকাশ থেকে নেমে এলো হযরত ঈসা (আ.)। ফেরাউনদের ভাঙ্গা বাড়ী থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন এক ধর্ম বিশ্বাস। এ অঞ্চলের অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ নতুন এ ধর্মমত গ্রহণ করছে।

বৃহস্পতিবারের এক মনোরম সন্ধ্যায় বাড়ীর প্রবেশ পথে দর্শনার্থীর প্রচণ্ড ভীড়। সারিবদ্ধভাবে ভেতরে ঢুকছে সবাই। ভেতরের প্রশস্ত কক্ষে গুঞ্জরিত হচ্ছে অদৃশ্য কণ্ঠ। পাশের দেয়ালে ভাসছে পাপীদের শাস্তির দৃশ্য। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মতো আজও মানুষ আগ্রহ নিয়ে সে দৃশ্য দেখছে।

হঠাৎ কণ্ঠ থেমে গেলো। যে পবিত্র বাবাকে পাপী চক্ষু দেখতে পায় না তার কণ্ঠের পরিবর্তে ভেসে এলো নতুন কণ্ঠ, 'পথভ্রষ্ট মানুষ! আজ রাতে বাড়ী ফিরে যেও না। যে রহস্য উন্মোচনের জন্য তোমরা উদ্বিগ্ন, কাল সকালে তা দেখতে পাবে। যে বাবার দর্শন লাভের জন্য তোমরা ব্যাকুল, ভোরেই তার দেখা পাবে। এখনই এ পোড়োবাড়ীর বাইরে চলে যাও। হযরত ঈসা (আ.) আসছেন। বাইরে গিয়ে সবাই শুয়ে পড়ো।'

কক্ষের দেয়ালে ভেসে উঠা তারকারাজি ম্লান হয়ে এসেছে। যুবতীরা হেঁটে বেড়াচ্ছে। সৈন্যদের পোশাক পরা কিছু লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওদের। চিৎকার ভেসে আসছে। থেমে গেছে মেঘের গর্জন। পবিত্র স্থানে এসব কি ঘটছে! ভয়ার্ত মানুষ কক্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

কি ঘটছে দর্শনার্থীদের কেউ বুঝতে পারলো না। তখনো দলে দলে লোক ভেতরে যাচ্ছে। সঙ্গী হচ্ছে কমাণ্ডো সদস্যরা। কেউ কেউ ঢুকছে মশাল নিয়ে। ভেতরে মশাল নেয়ার নিয়ম নেই। আশ্চর্য হলো দর্শনার্থীরা, তারা বুঝতে পারছে না কেন মশাল নেয়া হচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশটি মশাল এবং একশজন সৈন্য পোড়োবাড়ীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে।

বড় কক্ষে না গিয়ে অন্ধকার গলি পথে এগিয়ে গেলো ওরা। এ পথে বাইরের কারো চলাচল নিষিদ্ধ। এরা সবাই সশস্ত্র। কারো কাছে খঞ্জর বা তরবারী আবার কারো হাতে রয়েছে তীর ধনুক। লোকজনের বেরোবার পথেও ঢুকে পড়েছে কমাণ্ডো সৈন্য। ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি অন্ধকার গলিতে।

দামেশকের দু'শ অশ্বারোহী ঘিরে ফেললো বাড়ীর চারদিক। ওরা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দর্শনার্থীদের একদিকে একত্রিত করছিল। বাড়ীর ভেতরটা অন্ত্রনালীর মতো পেঁচানো। আঁকা-বাঁকা পথ পেরিয়ে কমাণ্ডো দল পৌঁছলো এক প্রশস্ত কক্ষে। এ কক্ষের ছাদ অনেক উঁচু। কক্ষে অনেক নারী-পুরুষ। কারো কারো চেহারা নেকড়ের মতো।

মিশরের ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর তকিউদ্দিন এবং আলী বিন সুফিয়ানের পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধ্যার পর সেনা সদস্যের একটি দল পার্বত্য এলাকায় পৌঁছলো। পথ দেখাচ্ছিল শারজা।

পাঁচশ ঘোড়সওয়ার, দু'শ উষ্ট্রারোহী এবং পাঁচশ পদাতিক সৈন্যের বহর লুকিয়ে রইলো খানিক দূরে। পোড়োবাড়ী আক্রান্ত হলে সুদানীরা আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি এদের লুকিয়ে রাখলেন।

সেনাবাহিনীর এক অংশের ওপর দায়িত্ব ছিল সুদান সীমান্তের দিকে দৃষ্টি রাখা। সীমান্ত রক্ষীদেরকেও এ দলের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এ সেনাদলের প্রতিটি সদস্য ছিল নির্বাচিত। দামেশক থেকে আসা দু'শ অশ্বারোহী এ অভিযানে অংশ নিয়েছিল। অন্যরা ছিল সুলতান আইয়ুবীর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক। এদের অনেকেই ছিল কমান্ডো আক্রমণে পারদর্শী।

সন্ধ্যায় কমান্ডো বাহিনী পোড়োবাড়ীর গেটে পৌছলো। সারি বেঁধে লোকজন ভেতরে ঢুকছে। দু'জন লোক দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছে তিনটে করে খেজুর এবং পানি।

দর্শনার্থীদের সাথে মিশে ছয় কমান্ডো এগিয়ে গেলো সামনে। দাঁড়ালো গিয়ে গেটে দাঁড়ানো লোক দু'জনের সামনে। গেটে একটি মশাল জ্বলছে। সামনেটা আলোকিত, কিন্তু দরজার ভেতরে অন্ধকার। কিছু দূরে গিয়ে আলোকিত বড় কক্ষ।

ছ'জনের হাতে বেরিয়ে এলো চকচকে খঞ্জর। দরজার অন্ধকারের আড়াল নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনের পেছনে। খঞ্জর ঠেকাল দু'জনের পিঠে। অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, 'বাঁচতে চাইলে এখান থেকে সরে যাও। সেনাবাহিনী তোমাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে।'

প্রতিবাদ না করে দু'জন সরে গেলো। দু'জন কমান্ডো দখল করলো ওদের জায়গা। চার কমান্ডো সরে আসা দু'জনকে বললো, 'ভেতরে চলো।'

কমান্ডোদের ভয়ংকর চেহারার দিকে একপলক তাকিয়েই ভেতরের দিকে পা বাড়ালো ওরা। দেখা গেলো ভেতরের কক্ষে অনেক সুন্দরী তরুণী ঝলমলে কাপড় পরে ঘুরাফেরা করছে। একদিকে যুবক-যুবতী হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, অন্যদিকে ছাদ থেকে মাটি পর্যন্ত পর্দা ঝুলানো। পর্দা একবার ডানে আবার বাঁয়ে ঘুরছে। অন্যদিক থেকে ছুটে আসছে চোখ ধাঁধানো তীব্র আলো।

ভেতরে কোন ভূতপ্রেত বা দৈত্য দানো নেই, পূর্বে কমান্ডো সদস্যদের এসব কথা বলা না হলে ওরা ভয়ে ছুটে পালাতো। কমান্ডো দু'জন গেটের দায়িত্ব নেয়ার পর একদল কমান্ডো সৈন্য ভেতরে ঢুকল। সৈন্যদের দেখে ভয়ংকর প্রাণীগুলো বিকট শব্দ করতে লাগলো। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সৈন্যদের ভয় দেখাতে চাইলো।

ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে কয়েকজন তেড়ে এলো সৈন্যদের দিকে। সৈন্যরা ওদের ঘিরে ফেললো। ধস্তাধস্তির সময় কয়েক জনের মুখোশ খুলে পড়লো। সৈন্যরা সবার মুখ থেকে নেকড়ে বা বিভিন্ন পশুর মুখোশ খুলে নিল। বেরিয়ে এলো মানুষের চেহারা। একপাশে পড়ে আছে মদের পাত্র।

সশস্ত্র পাহারায় সৈনারা ওদের বাড়ীর বাইরে নিয়ে গেলো। বাড়ীর অন্যপ্রান্তে তল্লাশী নেয়া হলো। এক ব্যক্তি একটি সুড়ঙ্গের মুখে মুখ লাগিয়ে বলছে, "পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো। হযরত ঈসা (আ.) আসছেন ....."

সুড়ংয়ের অপর প্রান্ত শেষ হয়েছে আলোকিত প্রশস্ত কক্ষে। ওখানে দর্শনার্থীরা গায়েবী শব্দ শুনে আর পাপীদের শাস্তির ছবি দেখে আতংকিত হয়। লোকটাকে বেঁধে ফেললো সৈন্যরা। একজন সৈন্য সুড়ঙ্গ মুখে মুখ লাগিয়ে বললো, 'পথভ্রষ্ট মানুষ, আজ রাতে কেউ বাড়ী যাবে না। এতদিন যে রহস্যময় বাবাকে দেখার অপেক্ষা করছিলে, কাল ভোরেই তাকে দেখতে পাবে।'

বন্দীদের জিজ্ঞেস করে সৈন্যরা আলোর উৎসের কাছে পৌছলো। এখানে জ্বলছে অনেকগুলো মশাল। পেছনে কাঠের পাটাতন। পাটাতনের ওপর স্থাপন করা হয়েছে বিশাল আয়না। মশালের আলো আয়নায় পড়ে তার প্রতিবিম্ব সামনে ছড়িয়ে পড়ে। কাঠের পাটাতন ঘুরিয়ে আয়নার প্রতিসরণ এদিকে ওদিকে ঘোরানো যায়। কক্ষের দেয়ালে ঝুলানো পর্দার মাঝে মাঝে কাঁচ সেটে দেয়া হয়েছে। আয়নার প্রতিবিম্ব কাঁচে পড়লে মনে হয় আকাশে তারা জ্বলছে।

দেয়ালের রংয়ের সাথে মিলিয়ে পর্দায় রং করা হয়েছে। একজন সচেতন ব্যক্তি দেখা মাত্রই বুঝতে পারতো, এ হলো আলোর কারসাজি। কিন্তু নেশাযুক্ত খেজুর আর পানি পান করিয়ে দর্শনার্থীদের মোহগ্রস্থ করা হয় বলে তারা তা বুঝতে পারে না। আলোর কারসাজিকেই ওরা এতদিন মনে করেছে সত্য।

সুড়ং পথে আসা শব্দে দর্শনার্থীরা আরো হতবাক হয়। এ জন্যই একবার বেরিয়ে এলে প্রতিটি লোক আবার ভেতরে যেতে চাইতো। এ ছিল নেশার প্রভাব। এভাবেই এতদিন মানুষকে নেশাগ্রস্থ করে ধর্মীয় অনুভূতির নামে প্রতারিত করা হয়েছে সবাইকে।

খেজুর এবং পানির মশক আটক করা হলো। বন্দী করা হলো ভেতরের সবাইকে। দুটো দলকেই জনগণের সামনে একটু উঁচুতে দাঁড় করানো হলো। সেনা কমাণ্ডারের নির্দেশে মুখ থেকে মুখোশ খুলে ফেললো ওরা। বেরিয়ে এলো মানুষের চেহারা।

লোকজনকে বলা হলো, সারি বেঁধে ওদের অতিক্রম করতে। আশ্চর্য হলো গ্রামবাসীরা, এরা আকাশের অধিবাসী নয়, ওদেরই গাঁয়ের লোক। মেয়েগুলোও চেনা জানা। মেয়েদের মধ্যে চারজন ইহুদী, সাতজন খৃষ্টান আর অন্যরা মুসলমান।

এরপর মূল অপরাধীদেরকে সামনে আনা হলো। এদের ছ'জনই খৃষ্টান। আরবদের মতোই মিশরের ভাষায় পারদর্শী ওরা। এরা অর্থের লোভ দেখিয়ে এলাকার লোকদের হাত করেছে।

চারটি মসজিদের ইমামও ওদের নিজস্ব লোক। ধর্মের নামে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য এরা এসব ইমামদের নিয়োগ করেছিল।

এ অঞ্চলের মানুষ যাতে সেনাবাহিনীতে ভর্তি না হয় এ জন্য খৃষ্টান নেতৃবৃন্দের নির্দেশে ওরা এ নাটকের অভিনয় করেছে। সফল হয়েছে ওরা। এলাকার মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে সুদানীদের প্রতি ভালবাসা। আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে মানুষের হৃদয়ে। এমনকি ওদের ফাঁদে জড়িয়ে মানুষ নিজের ধর্মকেও বিসর্জন দিয়েছে।

কেউ পালিয়ে আছে কিনা দেখার জন্য খোঁজ করা হলো প্রতিটি কক্ষ। বাইরে দু'শ ঘোড়সওয়ার বাড়ী ঘিরে রেখেছে। জ্বলছে শত শত মশাল। সেনাবাহিনীর এক অংশ সুদান সীমান্তে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

রাত গিয়ে ভোর হলো। সুদানের দিক থেকে কোন আক্রমণ এলো না। কোন বাঁধা এলো না পোড়োবাড়ীর ভেতর থেকেও। গ্রামের যারা এসেছিল পোড়োবাড়ীতে ওরা কেউ বাড়ী ফিরে যায়নি, ওরা প্রতারক সেই অদৃশ্য বাবাকে দেখতে চায়।

সকালে গ্রামে খবর পাঠানো হলো, অদৃশ্য বাবা একটু পর দর্শন দেবেন। দলে দলে অন্যান্য গ্রামবাসীরাও ছুটলো পাহাড়ের দিকে। দেখতে দেখতে পাহাড়ের পাদদেশে জমায়েত হলো প্রায় চার হাজার গ্রামবাসী। ওরা সবাই নতুন ধর্ম মতের অনুসারী। সবাই বাবাকে এক নজর দেখার জন্য ব্যাকুল। তাদের বিশ্বাস, বাবা তাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেবেন।

সৈন্যরা লোকজনকে বসিয়ে দিল। সবাই তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে আছে পোড়োবাড়ীর দিকে। স্বর্গীয় জ্যোতিতে স্নাত দরবেশ এখনই বেরিয়ে আসবেন। অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হয় না।

হঠাৎ দেখা গেলো পোড়োবাড়ীর দিক থেকে সেনাবাহিনীর পাহারায় একটা মিছিল এগিয়ে আসছে। কারো চেহারা নেকড়ের মতো, কারো বানর বা ভাল্লুকের মতো। দর্শনার্থীরা বড় কক্ষের দেয়ালে এদের ছবি দেখেছিল। গায়েবী আওয়াজ বলেছিল, পরকালে এদেরকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কারণ এরা যুদ্ধ করেছিল। ভর্তি হয়েছিল সেনা ফৌজে।

লোকজনকে পোড়োবাড়ীর ভেতরে নিয়ে ওদের প্রতারণার পদ্ধতি দেখান হলো। এতদিন কিভাবে ধোঁকা দেয়া হয়েছে নিজের চোখে দেখল মানুষ। ভেতরটা দেখা শেষ হলে আবার তাদেরকে পাহাড়ের পাদদেশে একত্রিত করা হলো।

ঈষৎ উঁচু জায়গায় দাঁড়ালেন মিশরের ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর তকিউদ্দিন। বললেন, 'খেজুরের সাথে হাশিশ মিশিয়ে তোমাদেরকে নেশাগ্রস্ত করা হতো। দেখানো হতো স্বর্গ নরক। বলা হতো মুসা, ঈসা আর আল আয়েদের কথা। এর সবই ছিল প্রতারণা। হাশিশের প্রভাবে তোমরা সবকিছুই বিশ্বাস করেছিলে। এরা ধোঁকার জাল বিছিয়ে সমগ্র অঞ্চলকে বিভ্রান্ত করেছে।

তোমাদের শোনানো হয়েছে এক দরবেশের কাহিনী। দরবেশ মানুষকে উট, ঘোড়া এবং টাকা দেন। আসলে মিথ্যে বলে এরা তোমাদের লোভ দেখিয়েছে। মিথ্যা বলার বিনিময়ে পেয়েছে অঢেল সম্পত্তি। এরা এসেছে তোমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে। এসেছে তোমাদের ঈমান নষ্ট করতে।'

জনতার মাঝে দেখা দিল মৃদু গুঞ্জন। উত্তেজিত মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর। সেনাবাহিনী চেষ্টা করেও ওদের ঠেকাতে পারলো না। জনতার সম্মিলিত ক্রোধ অপরাধীদেরকে পিটিয়ে মেরে ফেললো। যুবক-যুবতী আর পুরুষদের কেউ রক্ষা পেল না।

সেনাবাহিনী ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র এলাকায়। বন্দী করা হলো খৃষ্টান গোয়েন্দা এবং চরদের। চারজন ইমামকেও গ্রেপ্তার করা হলো। উত্তেজিত জনতা ভেঙে গুড়িয়ে দিল সে রহস্যময় বাড়ী। কায়রো ফিরে গেলেন তকিউদ্দিন। শারজা এবং ভাজারকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দিলেন। সুদান আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে

নির্দেশ দিলেন তকিউদ্দিন।

এ অভিযানে গিয়ে তিনি দেখেছেন মিশরের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবেশী দেশটি কি ষড়যন্ত্র করছে। ওদের আক্রমণ না করলে এ ষড়যন্ত্র বন্ধ করা যাবে না। তিনি বুঝতে পেরেছেন, সুদানীরা এখন খৃষ্টানদের সহযোগী। সুদানের কিছু এলাকা দখল করতে না পারলেও আক্রমণের ফলে ওদের ষড়যন্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে। কায়রোতে শুরু হলো যুদ্ধের প্রস্তুতি।

চুরমার করে দেয়া হয়েছে ষড়যন্ত্রের একটি কেন্দ্র। কিন্তু গভর্ণর তকিউদ্দিন এতেও সন্তুষ্ট নন। খৃষ্টানদের প্রত্যক্ষ মদদে সুদানীরা এ ষড়যন্ত্র বিস্তৃত করেছে। ওদের প্রতিহত না করলে নতুন ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করবে। এ জন্যই তিনি সুদান আক্রমণ করতে চাইছিলেন।

ওখানেও ছিল সুলতান আইয়ুবীর গুপ্তচর। নিয়মিত ওরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠাচ্ছিল। এসব তথ্য দিয়ে সুলতান যেভাবে উপকৃত হতে পারতেন তকিউদ্দিনের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। দু'ভাইয়ের আবেগ এক হলেও বুদ্ধিমত্তা এবং দীশক্তিতে ছিল বিস্তর ফারাক। দু'জনই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেন। কিন্তু একজনের সিদ্ধান্তে থাকতো দূরদর্শীতা এবং ধৈর্য, অন্যজনের থাকতো আবেগ এবং তাড়াহুড়ো।

সামরিক উপদেষ্টাগণ গভর্ণরকে বললেন, 'সুদান আক্রমণ করার পূর্বে সুলতানের সাথে পরামর্শ করা উচিত।'

এ প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন গভর্ণর। বললেন, 'আপনারা কি সুলতানকে বুঝাতে চাইছেন, তাকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না? কি ঝড়ের মোকাবিলা করছেন সুলতান তা আপনাদের অজানা নয়। আমরা তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকলে সুদানীরাই মিশর আক্রমণ করে বসবে। এখনই ফৌজকে মার্চ করতে বলুন। রসদ সামান ছাড়াই সেনাবাহিনী রওনা করবে।'

'এতবড় এক অভিযানে যাওয়ার পূর্বে একটু চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।' বললেন এক সেনাপতি, 'সুলতানকে এ ব্যাপারে জানানো উচিত, যাতে তিনি সম্মানিত জঙ্গীকে অবহিত করতে পারেন।'

'আপনারা মিশরে একজন একজন করে গাদ্দার গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন, আমি গাদ্দারী এবং ষড়যন্ত্রের উৎসের উৎপাটন করতে চাই। এ জন্য আর কারো সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই। আমার নির্দেশই যথেষ্ট।' বললেন ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর।

তকিউদ্দিন এমন কতগুলো বিষয়ে মনযোগ দেননি যা তার জন্য পরাজয় বয়ে আনতে পারে। কায়রোতে ছিল খৃষ্টান এবং সুদানের গুপ্তচর। সেনাবাহিনীর প্রতিটি নড়াচড়া ওরা লক্ষ্য করছিল। তকিউদ্দিনের দুর্ভাগ্য, এসব গুপ্তচরদের মধ্যে ছিল প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তা এবং সুদানী অফিসার।

কয়েক বছর পূর্বে মিশরের সুদানী বাহিনী ভেঙে এসব মেধাবী অফিসারদের রেখে দিয়েছিলেন সুলতান। সুলতানের যুদ্ধ পলিসি সম্পর্কে এরা ছিল অভিজ্ঞ। অন্যদিকে মুসলিম গোয়েন্দারা সুদানী ফৌজের যুদ্ধ পলিসি পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। খৃষ্টান সম্রাটরা সুদানী বাহিনীকে উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত করে রেখেছিল।

সুদান আক্রমণ করতে হবে বিশাল মরু পেরিয়ে। জঙ্গল এবং পর্বত ঘেরা অঞ্চলে রসদ পৌঁছানো সহজ নয়, ভাবেননি তকিউদ্দিন। দেশের স্বাধীনতা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যাপারে তার প্রচণ্ড ক্ষোভ এসব দিকগুলো দৃষ্টির আড়ালে রেখেছিল।

তকিউদ্দিনের সদিচ্ছার কোন অভাব ছিল না, কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর মতো দূরদর্শী হতে পারেননি তিনি। শুরু হলো যুদ্ধের প্রস্তুতি। এ ব্যাপারে সুলতানকে কিছুই জানানো হলো না। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর অনুমতি নিয়েই তিনি একক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুলতান প্রচণ্ড ঝড়ের মোকাবিলা করছেন তার এ ধারণা অমূলক ছিল না। তার চিন্তাধারা ছিল সঠিক।

তখন সুলতান ছিলেন ক্রাকের আট মাইল দূরে, অস্থায়ী ক্যাম্পে। তার হেড কোয়ার্টার ছিল বেদুইনদের মতো। আজ এখানে তো কাল ওখানে। যে এলাকায় কমাণ্ডো আক্রমণ হবে তার আশাপাশেই থাকতেন তিনি। কোন্ সময় কোথায় থাকবেন কমাণ্ডাররা শুধু জানতেন।

কমাণ্ডো বাহিনী খৃস্টানদের সকল রসদ ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ অদৃশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ওদের জন্য ছিল আতংক। যদিও খৃস্টানদের ক্ষতি হচ্ছিল, পাশাপাশি মুসলিম শহীদদের সংখ্যাও কম ছিল না। কখনো দশজনের কমাণ্ডো দল থেকে ফিরে আসতো তিন কি চারজন। খৃস্টানদের বাড়তি সতর্কতার ফলে জানের ক্ষতি হচ্ছিল বেশী। নতুন করে যুদ্ধ পলিসি পরিবর্তন করার চিন্তা-ভাবনা করলেন সুলতান।

'মনে হয় মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য খৃস্টান আমাদের বাধ্য করছে।' সেনা অফিসারদের বললেন সুলতান, 'ওদের এ ইচ্ছে পূরণ হবে না, মরতে দেবো না এত বেশী কমাণ্ডো জওয়ান।'

'এ জন্য কমাণ্ডো সৈনিকের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।' এক অফিসার বললো।

অন্য একজন বললো, 'শুধু আবেগের বশে দুশমনের শক্তিকে খাটো করে দেখা ঠিক নয়। আবেগের বশে একজন সৈনিক যুদ্ধ করে জীবন দিতে পারে কিন্তু বিজয়ের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। খৃস্টানদের তুলনায় আমরা অনেক কম। এ ছাড়া ওদের বেশীর ভাগ সৈন্যই বর্মাচ্ছাদিত।'

মৃদু হেসে সুলতান বললেন, 'যে লৌহবর্ম ওরা পরে থাকে তা তাদের নয়, আমাদের সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই দেখেছো, ওরা রাতে বা ভোরে মার্চ করে। কারণ, সূর্যের উত্তাপে ওদের লৌহবর্ম আগুনের মতো উত্তপ্ত হয়ে যায়। সৈন্যরা তখন ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় পরিধেয় বর্ম। বর্মের অত্যধিক ওজন কমিয়ে দেয় ওদের চলার গতি। আমি ঠিক দুপুরে ওদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করবো। ঘাম ঝরে ঝাপসা হয়ে যাবে ওদের দৃষ্টি। আমরা সংখ্যায় কম, কৌশল ও ঈমানী জযবা দিয়ে সে ঘাটতি পূরণ করবো আমরা।'

আলীর সহকারী জাহেদীন এসে সালাম করলো। সাথে দু'জন লোক। সুলতানের চোখে ফুটে উঠলো আলোর দ্যুতি। দু'জনকেই পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদিককার কি খবর?'

জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দু'জনেই বের করে আনলো গলায় ঝুলানো কাঠের তৈরী

ক্রুশ। একটানে ঝুলানো রশি ছিঁড়ে ক্রুশ ছুঁড়ে ফেললো দূরে। দু'জনই মুসলিম গোয়েন্দা। ওরা বিস্তারিত রিপোর্ট দিল সুলতানের কাছে।

গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সুলতান যুদ্ধের নতুন পরিকল্পনা তৈরী করলেন। আক্রমণের স্থান নির্দেশ করলেন মানচিত্রে। এরপর গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে বললেন, 'ওখানকার মুসলমানদের অবস্থা বলো।'

গোয়েন্দারা যখন ওখানে মুসলমানদের ওপর খৃষ্টানদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলো, সুলতানের চেহারার রঙ বদলে গেলো। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, কপাল কুঞ্চিত। তাঁবুর ভেতর পায়চারী করতে করতে বললেন, 'তারপর?'

'সুবাক থেকে পালিয়ে যাওয়া খৃষ্টানরা ক্রাকের মুসলমানদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। ওখানকার মুসলিম ব্যবসায়ীরা দুশ্চিন্তায় আছে। কোন অমুসলিম তাদের দোকানে যায় না। মুসলমানরা গেলেও তাদের ওপর খবরদারী করা হয়। মসজিদের বারান্দাকে ওরা উট, ঘোড়ার বাথান বানিয়েছে। আজান শুরু হলে হুল্লোড় করে গান গায় রেলিংয়ে বসে।

মুসলমানদের মানসিক অবস্থা দুর্বল করার জন্য নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, 'আইয়ুবী গুরুতর যখম হয়ে দামেশকে গিয়ে মারা গেছেন। তার নেতৃত্বহীন সেনাবাহিনী যার যেদিকে ইচ্ছে পালাচ্ছে। বলা হচ্ছে, সমগ্র মরুভূমির কোথাও মুসলিম সেনাবাহিনীর ছাউনি নেই। কিছুদিনের মধ্যেই সুবাক দুর্গ আমাদের হাতে আসছে। এদিকে সুদানীরা মিশর আক্রমণ করেছে। মিশরের সেনাবাহিনী ওদের সাথে হাত মিলিয়েছে।

প্রতিদিন সকালে পাদ্রীরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে এসব গুজব ছড়িয়ে মুসলমানদের জন্য দোয়া করে। ভালবাসার কথা বলে।

এতে একদিকে মুসলমানদের মানসিক শক্তি দুর্বল হচ্ছে, অন্যদিকে খৃষ্টানদের মনের জোর বেড়ে যাচ্ছে।

যুবতী মেয়েরা মুসলিম মেয়েদের বলে বেড়াচ্ছে, 'আইয়ুবীর সৈন্যরা অধিকৃত এলাকায় যুবতীদের নষ্ট করছে। তোমাদেরকেও ছাড়বে না। দেশ শত্রুমুক্ত হলে আমরা এবং তোমরা সবাই নিরাপদে থাকতে পারবো।'

এর আগেও ক্রাকের মুসলমানদের দুর্দশা সম্পর্কে সুলতানকে বলা হয়েছে। ওরা সুলতানের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতে প্রস্তুত নয়, তবুও শুনতে হচ্ছে। দেয়ালেরও কান আছে, এ জন্য ওরা থাকে নির্বাক। দু'জন একস্থানে বসে কথা বলতেও ভয় পায়। মসজিদে, এমনকি শব যাত্রীদের সাথেও থাকে খৃষ্টানদের গুপ্তচর।

ওদের দুর্ভাগ্য, মুসলিম ভাইয়েরাই খৃষ্টানদের চর হিসেবে কাজ করে। নিজের বাড়ীতে কথা বললেও ফিসফিসিয়ে বলতে হয়। 'এরা খৃষ্টান শাসনের বিরোধী' বেগার ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য এ কথাটুকুই যথেষ্ট।

'মাননীয় সেনাপতি।' অপর গোয়েন্দা বললো, 'সম্প্রতি ক্রাকে খৃষ্টানদের নতুন চাল শুরু হয়েছে। মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার করছে ওরা। ক'দিন পূর্বে সরকারী খরচে একটা ভাঙ্গা মসজিদ মেরামত করা হয়েছে। বেগার ক্যাম্প থেকে মুসলমানদের মুক্ত না

করলেও শ্রমের সময় কমিয়ে দিয়েছে। ওদের বলা হচ্ছে, 'তোমরা সরকারের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছো এরপরও তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে।'

এ প্রেম এবং ভালবাসার অস্ত্র অত্যন্ত মারাত্মক। অমুসলিম যুবকরা মুসলিম যুবকদের চরিত্র নষ্ট করার কাজে লিপ্ত। ক্রাক আক্রমণে দেরী করলে ওরা নামমাত্র মুসলমানে রূপান্তরিত হবে। কোরআন বাদ দিয়ে গলায় ঝুলাবে ক্রুশ। তখন ওরা আমাদের কোন সাহায্য করবে না।

প্রেমের কথা বললেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি আরো জোরদার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হচ্ছে প্রতিদিন। এখন পর্যন্ত মুসলমানদের আবেগ টিকে আছে। দু'একজন ছাড়া ওদের ভালবাসার ফাঁদে এখনো পা দেয়নি। কিন্তু কতদিন পর্যন্ত এ আবেগ নিয়ে টিকে থাকতে পারবে ওরা তাই ভাববার বিষয়।'

সুলতানকে উদ্বিগ্ন দেখালো। তিনি জাহেদীনকে বললেন, 'তোমরা কি মুসলমানদের সাথে কথা বলেছো? প্রেমের টোপ যেমন ভয়াবহ, চরিত্র হনন তারচে বেশী মারাত্মক। আলীকে কি কায়রো থেকে ডেকে আনবো না তুমিই তার স্থান পূরণ করতে পারবে? মুসলমানদেরকে গুজব এবং মিথ্যা ভালবাসার বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা করতে হবে।'

'কায়রোর অবস্থা ভাল নয়। আলীকে ডাকার দরকার নেই, তিনি ওখানেই থাকুন। তার পরিবর্তে হাসান বিন আব্দুল্লাহ আমাদের সাথে থাকলেই চলবে। ক্রাকের ব্যাপার আমিই সামাল দেবো।'

'এ ব্যাপারে কি ভেবেছো তুমি?'

জাহেদীন আলীর স্থান পূরণ করতে পারবে কি না সুলতান তা বুঝতে চাচ্ছিলেন। জবাবের প্রতীক্ষা না করে তিনি আবার বললেন, 'জাহেদীন! আমি কখনো যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হইনি। এ ক্ষেত্রেও পরাজয় চাই না। খৃষ্টান শক্তি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আক্রমণ করেছে। আমি খৃষ্টানদের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক আগ্রাসন থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে চাই।'

'আপনি জানেন ক্রাকে আমাদেরও গোয়েন্দা কর্মী রয়েছে। ওরা ওখানকার অধিবাসীকে আপনার ব্যাপারে, আমাদের ফৌজ এবং মিশরের ব্যাপারে সঠিক তথ্য দেবে, আপনার বাণী পৌঁছাবে প্রতিটি মুসলমানের কানে।'

'ওখানকার নারীদের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধের অভাব রয়েছে।' বললো অপর গোয়েন্দা।

'আমরা যুবতী মেয়েদের বলবো, প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে যেন মুসলিম নারীদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। আমি দেখেছি, ওখানকার মেয়েরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।'

'মেয়েরা যদি সন্তানের শিক্ষা দীক্ষার দিকটা ঠিক মতো দেখে তাহলে মুসলিম জাতি আরো উন্নত হবে।' বললেন সুলতান। 'প্রতিটি শিশু ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হলে অমুসলিমরা তাদের অপচেষ্টায় ব্যর্থ হবে।

শিশুদের কচি মনে ইসলাম এবং নবীর ভালবাসা সৃষ্টি হলে বড় হয়ে ওরা অন্য কোন

মতবাদ গ্রহণ করবে না। এ জন্য ওদের সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করো। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্রাক আক্রমণ করবো। সুবাকের মুসলমানদের মতো ক্রাকের মুসলমানদেরকেও মুক্ত করবো ইনশাআল্লাহ। জাহেদীন, এ জন্য কাকে ক্রাক পাঠাতে চাও?'

'এ দু'জনকে। এরা ক্রাকের নিয়ম নীতি যেমন জানে, পথ-ঘাটও চেনে। এরা মেধাবী এবং বুদ্ধিমান।'

ক্রাকের মুসলমানদের উপর মিথ্যা ভালবাসার বিষাক্ত অস্ত্র চালানো হচ্ছিল গোয়েন্দা প্রধান হরমুনের পরামর্শে। সুবাক হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর হরমুন খৃস্টান সম্রাটদের বলেছিল, প্রেমের অভিনয় করে ক্রাকের মুসলমানদেরকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব। পক্ষে না এলেও আইয়ুবীর ওপর ওদের মন বিষিয়ে তোলা যাবে। কিন্তু খৃস্টান সম্রাটরা মুসলমানদের ঘৃণা করতেন। ভালবাসার অভিনয় করতেও তারা রাজী ছিলেন না। তাদের ধারণা, শক্তি প্রয়োগ করেই এদের জাতীয় চেতনা নিঃশেষ করা যাবে।

হরমুন ছিলেন একজন মনোবিজ্ঞানী। তার মতে মন জয় করতে পারলে গোটা জাতি হাতের মুঠোয় এসে যাবে। শেষ পর্যন্ত তিনি সম্রাটদেরকে তার স্বমতে আনতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গোপনে গ্রেপ্তার করে গায়েব করে দিন, কিন্তু অন্যান্য মুসলমানদের আতংকিত করা যাবে না। মেয়েদের দিয়ে মেয়েদের বেপর্দা করতে হবে। যুবকদের করতে হবে মাদকাসক্ত। মানসিক গোলামীর মাধ্যমে ওদের বিলাসপ্রিয় করে তুলতে হবে।

সংস্কৃতির নামে যুবক-যুবতীদেরকে ঘর থেকে বের করে বেহায়াপনার তামিল দিতে হবে। ওদের বোঝাতে হবে, প্রগতির জন্য এসব নাচগান প্রয়োজন। ধর্মান্ধরা তোমাদের নিষেধ করবে, কিন্তু সংস্কৃতিবান না হলে উন্নতির শিখরে উঠা যাবে না।'

হরমুন বললেন, 'একদিন দেখা যাবে, এরা নামে মুসলমান থাকলেও কথা-বার্তা, আচার-আচরণ এমনকি চিন্তা-ধারায়ও থাকবে খৃস্টান। ওরা ওদের সমাজে আমাদের হয়ে কাজ করবে।'

সেদিন থেকেই হরমুনের এ প্রস্তাবের বাস্তবায়ন শুরু হলো। প্রস্তাব মতে, নির্বাচিত করা হবে একজন সুদর্শন মুসলিম যুবক। তাকে দেয়া হবে শক্ত সামর্থ ঘোড়াগাড়ী, মূল্যবান পোষাক এবং সম্পদ। তাকে এবং তার পরিবারকে রাজ দরবারে নিমন্ত্রণ করে সম্মান দেয়া হবে। এভাবে তাদের মন থেকে উপরে ফেলতে হবে ইসলামী আবেগ এবং ভালবাসা।

হরমুন খৃস্টান সম্রাটদের বললেন, 'মুসলমানদেরকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করতে চাইলে ওদের মাথায় রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পোকা ঢুকিয়ে দিন, অমনি আপনাদের চোখের ইশারায় সে নাচবে। মদপান করবে, নিজ জাতির যুবতীদেরকে নিজের হাতে উলঙ্গ করে আপনাদের হাতে তুলে দেবে। মুসলমানদের ভবিষ্যত অন্ধকার করতে চাইলে আমার এ ফর্মূলা পরীক্ষা করে দেখুন।

মুসলমানরা ইহুদীদের সবচেয়ে পুরনো শত্রু তা আপনাদের অজানা নয়। তারপরও ইহুদীরা নিজের যুবতী মেয়েদেরকে মুসলমানদের হাতে কেন তুলে দিচ্ছে? দিচ্ছে

নিজেদের স্বার্থে, দিচ্ছে মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য। ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই ইহুদীরা মেয়েদের আব্রু এবং শেষ সম্বলটুকুও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাহলে আমরা বসে আছি কেন? আমি সশস্ত্র লড়াইয়ের বিপক্ষে নই। সশস্ত্র লড়াই জারী রাখতে হবে, তবে লড়াই দিয়ে ইসলামকে শেষ করা যাবে না।

ইহুদী জাতি মুসলিম নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ। ওদের মেয়েদের গড়ন প্রায় মুসলমানদের মতো। কোন ইহুদী নারী বোরকা পরে ওদের বাড়ীতে প্রবেশ করলে কেউ সন্দেহ করে না। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে ইহুদীরা। মুসলিম সমাজ এবং সংস্কৃতিতে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। আমরাও এখন থেকে এ পথেই এগুবো।'

জাহেদীনকে বিদায় করার বিশ দিন পর। ক্রাকের রাস্তায় একজন নতুন পাগলের আবির্ভাব ঘটলো। মুখে দাড়ি, গায়ে লম্বা জুব্বা, মাথায় পাগড়ী, কাঁধে ঝুলানো রুমাল। চেহারা এবং পোষাক ময়লা। দেখলে মনে হয় দূর থেকে এসেছে। হাতে কাঠের তৈরী ক্রুশ।

ক্রুশ উপরে তুলে পাগল চিৎকার করে বলছে, 'মুসলমান ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে গেছে। সুবাকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মুসলিম যুবতীদের ইজ্জত আব্রু নিধনের পালা। মিশরের সব মুসলমান মদে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। প্রভু যিশু বলেছেন, এ জাতি পৃথিবীতে আর বেশীদিন থাকবে না। নূহের দ্বিতীয় প্লাবন থেকে বাঁচতে চাইলে ক্রুশের ছায়ায় আশ্রয় নাও। যিশুকে পছন্দ না হলে ইহুদীদের খোদাকে সিজদা করো। মসজিদের সিজদা তোমাদের কোন কাজে আসবে না।'

পোষাকে এবং কথাবার্তায় লোকটাকে পাগল মনে হচ্ছিল। কেউ ডাকলে থেমে যেতো, কিন্তু কোন প্রশ্নের জবাব দিত না। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে আগের কথাগুলোই বলে যেতো। লোকটা কে, কোত্থেকে এসেছে, জানতে চাইল না কেউ।

তার হাতে ক্রুশ এ জন্য খৃষ্টানরা খুশী। ইহুদীদের কথা বলছে বলে তারাও সন্তুষ্ট। মুসলমানদের ধ্বংসের সংবাদ দিচ্ছে বলে দু'দলই আনন্দিত। ক'জন টহল সৈনিক তার ধমক শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। পাগল ভেবে এড়িয়ে গেলো পুলিশের লোকেরা। কোন মুসলমান সাহস পেল না পাগলটার মুখ বন্ধ করে দিতে। ক্রোধে ফেটে যাচ্ছিল মুসলিম হৃদয়গুলো, কিন্তু ওরা অসহায়।

লোকটি শহরের অলিগলিতে ঘুরে একই কথা বলে যাচ্ছিল। কখনো আগের কথার সাথে নতুন কথা যোগ করতো, 'মুসলিম বাহিনী আর ক্রাকে আসবে না। তাদের সালাহউদ্দিন মরে গেছে।' আবার কখনো এমন অর্থহীন কথা বলত যাতে মনে হতো, লোকটা আসলেই পাগল।

তার পেছনে হাঁটছিল একদল শিশু-কিশোর। বয়স্করা খানিক গিয়ে ফিরে আসতো। অনেকক্ষণ থেকে এক যুবক পাগলটাকে অনুসরণ করছিল। দু'জন খৃষ্টান যুবক তাকে

বললো 'ওসমান, ক্রুশের আশ্রয়ে চলে এসো।' ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকলো ওসমান। ওসমানের কাপড়ের নিচে লুকানো খঞ্জরের কথা ওরা জানে না। পাগলটাকে হত্যা করার জন্যই সে তার পিছু নিয়েছে।

ওসমান সালেমের পিতামাতা বেঁচে আছেন। ছোট বোন আল নূরের বয়স কুড়ি। ওসমানই সংসারে বড়। দারুণ আবেগপ্রবণ ছেলে। ইসলামের নামে জীবন দিতে প্রস্তুত। খৃষ্টান গোয়েন্দাদের সন্দেহভাজন তালিকায় তারও নাম আছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, মুসলিম যুবকদেরকে খৃষ্টান সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এ যুবক। তবে গোয়েন্দারা এখনো তাকে হাতেনাতে ধরতে পারেনি।

পাগলের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। পাগলটা ক্রুশ হাতে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলছে দেখে রক্ত গরম হয়ে গেলো ওসমানের। লোকটা আসলেই পাগল কিনা তা ভেবে দেখলো না। বাড়ী ফিরে খঞ্জর তুলে নিল। জামার নিচে কোমরে গুঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পিছু নিল পাগলটার।

পথে দু'জন খৃষ্টান যুবকের কথায় রক্ত চড়ে গেলো মাথায়। কিন্তু নীরব রইলো সে। পাগলটাকে হত্যা করার ইচ্ছে আরো জোরালো হলো। পাগলটার পেছনে অনেক শিশু-কিশোর। বড়োরাও রয়েছে। এখানে কিছু করা যাবে না।

বিকেল হয়ে এসেছে, কমে এসেছে পাগলের গলার জোর। তার পেছনের জটলাও হালকা হয়ে এসেছে। সূর্য ডোবার আর একটু বাকী। গলির মোড়ে মসজিদের কাছে গিয়ে পাগলটা বসে পড়লো। এখনো ক্রুশ উঁচিয়ে রেখেছে। বললো, 'এটা এখন থেকে গীর্জা, মসজিদ নয়।'

পাশে এসে দাঁড়ালো ওসমান। সে জানতো, পাগলটাকে হত্যা করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কারণ তার হাতে রয়েছে ক্রুশ, কথা বলছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ওসমান পাগলের আরো কাছে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, 'ক্রুশসহ এখনি এখান থেকে পালিয়ে যাও। নয়তো খৃষ্টানরা তোমার লাশ তুলে নেবে।'

পাগল অনেকক্ষণ ওসমানের দিকে তাকিয়ে রইলো। সামনে এখনো কয়েকজন ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওসমানের কথার কোন জবাব না দিয়ে কিশোরদের ধমক দিল। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলো ওরা। পাগল মসজিদের ভেতর ঢুকে পড়লো। হত্যা করার সুবর্ণ সুযোগ। কিছু না ভেবেই ওসমান ভেতরে ঢুকে গেট বন্ধ করে দিয়ে দ্রুত খঞ্জর বের করলো। পেছনে ফিরে চাইল পাগল লোকটি। ওসমান খঞ্জর দিয়ে আক্রমণ করেছে। কাঠের ক্রুশ দিয়ে আঘাত ঠেকালো পাগলটা।

'থাম যুবক। ভেতরে চলো। আমি মুসলমান। এটা আমার অভিনয়। আমি এসেছি আইয়ুবীর কাছ থেকে। কেন এ অভিনয় করছি, আমাকে মারার পূর্বে সে কাহিনী তোমার শোনা দরকার।' ওসমান অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সে পাগলা বুড়োর দিকে।

৫

পাগলটাকে আর আঘাত করলো না ওসমান। জুতা খুলে মসজিদের ভেতরে ঢুকলো দু'জন। ক্রুশটা এখনো তার হাতে। ভেতরে গিয়ে পাগলবেশী লোকটা বললো, 'তোমার নাম কি যুবক?'

'ওসমান।'

'আমি মুসলমান। তুমি কখন থেকে আমার পিছু নিয়েছো?'

'সারা দিন তোমার পেছনে হেঁটেছি, কিন্তু সুযোগ হয়নি।'

'আমাকে কেন মারতে চাচ্ছো?'

'কারণ আমি ইসলাম এবং সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে কোন কথা সহ্য করি না। তুমি পাগল হও আর যেই হও আমি তোমাকে হত্যা করবো।'

'কিন্তু আমাকে হত্যা করলে ইসলাম ও সালাহউদ্দিনের কি উপকার হবে?'

'জানি না। তবে ইসলাম ও সালাহউদ্দিনের একজন দুশমন কমবে।'

'যে ইসলাম ও সালাহউদ্দিনের বিরোধিতা করবে তুমি কি তাকেই হত্যা করবে?'

'অবশ্যই। সুযোগ পেলে আমি কাউকে ছাড়বো না।'

'তুমি কাকে ইসলামের বড় দুশমন মনে করো?'

'অবশ্যই খৃষ্টানদের। তবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো শক্তি এখনো আমার হয়নি। হলে তাদেরও আমি ছাড়বো না।'

'ইসলাম ও সালাহউদ্দিনের বিরোধিতা করলে তাদেরকে হত্যা করতে হবে এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে?'

'কেউ এ কাজ করতে আমাকে বলেনি। আমি নিজে থেকেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'তুমি কি একাই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছো, না তোমার সাথে আরো কেউ আছে?'

'আমি একাই।'

আরো কয়েকটা প্রশ্ন করে পাগল লোকটা বললো, 'তোমার মতো একজন যুবকই আমার প্রয়োজন। তুমি নিজ থেকে এসেছো ভালই হয়েছে। ভেবেছিলাম এমন লোক পেতে আমার বেশ কষ্ট হবে। শোন, আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর একজন গোয়েন্দা। খৃষ্টানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য পাগলের অভিনয় করছি। সফর করেছি এ পোষাকেই। তোমার সাথে কিছু কথা বলবো, মন দিয়ে শোন।

মনে রেখো, মসজিদে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে আমি আগের মতো আজেবাজে কথা শুরু করবো। পাগলরা যেমন করে আর কি! তুমি এমন ভাব করবে, যেন আমার কথা মন দিয়ে শুনছো। যা বলার আমি দ্রুত বলছি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মুসল্লীদের ভেতরও

ওদের গুপ্তচর থাকতে পারে, এ জন্য নামাজের আগেই কথা শেষ করতে হবে।'

ওসমান কখনো গোয়েন্দা দেখেনি। ও জানতো না গোয়েন্দারা অসাধারণ মেধাবী হয়ে থাকে। ও অবাক হয়ে গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সামান্য কয়েকটা প্রশ্ন করেই গোয়েন্দা লোকটি যুবককে চিনে নিয়েছে। বুঝেছে, এ যুবক যথেষ্ট হুশিয়ার, বিশ্বস্ত এবং আবেগপ্রবণ।

'শোন ওসমান, তোমার মতো আরো কয়েকজন যুবক এবং যুবতী জোগাড় করো। তাদের মনমানসিকতাও তোমার মতো হতে হবে। তাদেরকে তোমার মতোই হতে হবে সাবধান ও বিশ্বস্ত। তাদের মনমানসিকতা তৈরী হয়ে গেলে শুরু হবে তোমাদের আসল কাজ। তোমাদেরকে প্রতিটি মুসলমানের বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রচার করতে হবে, সুলতান আইয়ুবী বেঁচে আছেন এবং সুস্থ আছেন।

তোমরা আরো প্রচার করবে, ক্রাক থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার দূরত্বে অবস্থান করছেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে ক্রাক আক্রমণের জন্য মুসলিম বাহিনী শুধু প্রস্তুতই নয়, ওরা খৃষ্টান বাহিনীর আহার নিদ্রা হারাম করে রেখেছে। কায়রোর পরিস্থিতিও এখন পুরো শান্ত। ওখান থেকে সকল ষড়যন্ত্রের মূল উপড়ে ফেলা হয়েছে।'

ওসমানের বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেলো। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে সাহস সঞ্চয় করে বললো, 'আপনি ঠিক বলছেন?'

'ওসমান, তোমার ও আমার স্বপ্ন এক। আমি সে স্বপ্নের বাস্তবায়নে পরিকল্পিতভাবে কাজ করছি আর তুমি আবেগে ভেসে বেড়াচ্ছো। এখন আর এভাবে ভেসে বেড়ালে চলবে না। আজ থেকে তুমি ভাববে, তুমিও আইয়ুবীর একজন সৈনিক। শোন, আমি যা বলছি সব ঠিকই বলছি।'

'আপনি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ যুবক, উনিই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমার দায়িত্ব হচ্ছে, উনি আসছেন এ খবর এখানকার জনগণকে জানিয়ে দেয়া। তোমাকে দিয়েই সে কাজ শুরু হলো।'

'সুলতান কখন আক্রমণ করবেন? আমরা তার পথ চেয়ে বসে আছি। আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তিনি বাইরে থেকে আক্রমণ করলে আমরা ভেতর থেকে খৃষ্টানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। আল্লাহর দোহাই লাগে, তাঁকে তাড়াতাড়ি আক্রমণ করতে বলুন।'

'বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হবে যুবক। প্রথমে শোন সুলতান আইয়ুবী কি বলেছেন। এরপর প্রতিটি যুবকের হৃদয়ে তা গেঁথে দাও।

সুলতান বলেছেন, 'ক্রাকের মুসলিম যুবকদের বলবে, তোমরাই ইসলামের রক্ষক। আল্লাহর দ্বীনকে বাঁচাতে হলে আজ তোমাদের জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তুমি তাদেরকে আমার জীবনের কাহিনী শোনাবে।'

তিনি তাঁর জীবন কাহিনী বলতে গিয়ে আরো বলেছেন, 'আমি প্রথম যুদ্ধ করেছি শৈশবে। একটা দুর্গে অবরুদ্ধ হয়েছিলাম আমরা। নেতৃত্বে ছিলেন আমার চাচা। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'ভয় পেয়ো না। এখন ভয় পেলে ভয়ে ভয়ে কেটে যাবে সারাটা জীবন। ইসলামের পতাকাবাহী হতে চাইলে এখনই পতাকা তুলে নাও। বেরিয়ে যাও দুশমনের বুহ্য ভেদ করে। আবার ফিরে এসো। ঝাঁপিয়ে পড়ো শত্রুর ওপর।'

সেদিন আমি ভয় পাইনি। তিন মাস অবরুদ্ধ ছিলাম। না খেয়ে থেকেছি। শেষ পর্যন্ত শত্রুর অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলাম। অবরুদ্ধ অবস্থায় আমরা প্রথম খেয়েছি শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া খাবার। দানা পানির অভাবে আমাদের যে সব ঘোড়া মরে গিয়েছিল, তা পূরণ করেছি শত্রুর ঘোড়া দিয়ে।'

সুলতান আরো বলেছেন, 'আমার জাতির সন্তানদের বলবে, শত্রু আমাদের ভালবাসার অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করেছে। যদিও এটা মোটেই ভালবাসা নয় বরং ভালবাসার নামে প্রতারণার ভয়াল ফাঁদ মাত্র। ওরা জানে না ভালবাসা কি, শুধু জানে ভালবাসার মিথ্যা অভিনয় করতে। মনে রেখো, কোন অমুসলিম মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না।

খৃষ্টান শক্তি যুদ্ধের ময়দানে টিকতে পারেনি। ওদের সব পরিকল্পনা আমরা ধুলার সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। ওরা এখন মুসলিম জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মের হৃদয় থেকে বের করে দিতে চাচ্ছে ইসলামী জাতীয়তাবোধ।

সারা দুনিয়ার মুসলমান এক জাতি। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। শত্রুরা এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করার উষ্কানী দিচ্ছে।

ওরা ধর্মের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার পরিবর্তে আমাদের কিশোর ও যুবকদের হৃদয়ে সৃষ্টি করতে চাচ্ছে পুঞ্জীভূত ঘৃণার পাহাড়। এ জন্য ওরা ব্যবহার করছে নানা রকম বিপজ্জনক অস্ত্র। ইসলামের কথা যারা বলে, ইসলামের পথে যারা চলে, তাদের নামে নানা অপবাদ দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে গালি দেয়া হচ্ছে মোল্লা, গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এসব বলে। এভাবে আগামী প্রজন্মের মন বিষিয়ে দেয়া হচ্ছে তাদের ওপর।

মুসলিম যুবকদের বলবে, দুশমন আমাদের ওপর সর্বপ্লাবী হামলা শুরু করে দিয়েছে। সম্মুখ সমরের পাশাপাশি মানসিক চোরাগুপ্তা হামলা করছে। এর জন্য ব্যবহার করছে ভয়ংকর সব অস্ত্র। এ সব অস্ত্রের নাম হলো সম্পদের প্রতি মোহ, বিলাসিতা, আলস্য এবং দায়িত্বহীনতা।

এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খৃষ্টান এবং ইহুদী শক্তি সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। ইহুদীরা নিজেদের যুবতী মেয়েদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে তোমাদের পেছনে। তারা তোমাদের পাশবিক শক্তিকে উসকে দিচ্ছে। ওরা আমাদের যুবকদের হাতে তুলে দিচ্ছে নানা রকম নেশার দ্রব্য। সৃষ্টি করছে মাদকাশক্তি। কোন জাতি ধ্বংস হওয়ার জন্য এ দুটো অভ্যাসই যথেষ্ট।

তুমি যুবকদের বলবে, পাপী মানুষের পরকালের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের কঠিন যন্ত্রণা। কিন্তু এ দুটো অভ্যাস পৃথিবীতেই তোমাদের জন্য জাহান্নামের যন্ত্রণা নিয়ে আসবে। তোমরা যাকে আজ বেহেশতের আনন্দ ভাবছো, দু'দিন বাদে দেখবে তা আসলে জাহান্নামের শাস্তি।

এখনি সচেতন না হলে একদিন তোমরা হবে খৃষ্টানদের গোলাম। ওরা তোমাদের বোনদের অক্র নষ্ট করবে। শহরের অলিগলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকবে কোরানের ছেঁড়া পাতা, মসজিদ হবে ঘোড়ার আস্তাবল। চোখের সামনে তোমাদের বাড়ীঘর জ্বলবে দাউ দাউ করে।'

সুলতান আরো বলেছেন, 'মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে চাইলে নিজের

ঐতিহ্য কখনো ভুলে যেয়ো না। দুশমন একদিকে তোমাদেরকে উত্যক্ত করছে, অন্যদিকে সম্পদ আর নারীর লোভ দেখাচ্ছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, মুসলমান কোন বিলাসপ্রিয় জাতি নয়। মুসলমান সম্পদের দাস হয় না, বরং সম্পদকেই তারা দাসে পরিণত করে। প্রয়োজন হলে খেজুর পাতার চাটাইতে বসে আমরা পৃথিবী শাসন করতে পারি।

রোম ও পারস্যের সম্রাটদের সুবিশাল প্রাসাদ আর অতুলনীয় শানশওকত ও তৈজসপত্রের চেয়ে আমাদের কাছে বেশী প্রিয় তেজী ঘোড়া আর জং হীন তলোয়ার। আমাদের মূলধন কোরআন আর হাদীস, আমাদের আসল সম্পদ ঈমান আর আমল। সহায় আমাদের আল্লাহ। বিশ্বাস ও কর্মের দৃঢ়তাই আমাদের রক্ষাকবচ।

তুমি ওদেরকে বলবে, বিলাসদ্রব্য, সম্পদ আর নারী দেহের লোভ দেখিয়ে ওরা তোমাদেরকে গোলামীর শিকলে বাঁধতে চাইছে। তলোয়ারকে ভয় পেয়েই এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে ওরা।

হে আমার জাতির সন্তানেরা, নিজের হাতে নিজের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলিয়ো না। আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাও। মনে রেখো, অত্যাচারী শাসক সব সময় ভয়ের মধ্যে থাকে। প্রতিপক্ষকে জুলুম অথবা অর্থ দিয়ে পরাভূত করতে চায়। অত্যাচারকে ভয় পেয়ো না। পা দিও না লোভের ফাঁদে।

তোমরাই জাতির ভবিষ্যত। আমরা অতীত হয়ে গেছি। জাতির অস্তিত্ব এখন নির্ভর করছে তোমাদের হাতে। তোমরা সচেতন হলে জাতি বাঁচবে, তোমরা ঘুমিয়ে থাকলে জাতি মারা যাবে। শত্রু তোমাদের মন-মানসিকতার সোনালী ঐতিহ্য অপবিত্র চিন্তা ধারার কালো নেকাবে ঢেকে দিতে চায়। ওরা চায় পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। এর মোকাবেলায় চাই অফুরন্ত সাহস আর হিম্মত।

তোমরা যদি সাহসের সাথে সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকতে পারো বুকের ভেতর, আর প্রতিটি মুহূর্ত সে স্বপ্নকে বুকে নিয়ে নির্ভয়ে পথ চলতে পারো– দেখবে, প্রতিটি সূর্যোদয় তোমাদের জন্য সাফল্য ও বিজয়ের বার্তা বয়ে আনবে।

তোমাদেরকে ভয় পায় বলেই এ কুটিল পথ বেছে নিয়েছে ওরা। শুরু করেছে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। মুমীন ঈমান বিকিয়ে দেয় না বলেই তো অস্ত্রের লড়াইতে নামতে হয় ওদের। কিন্তু যদি তোমাদের ঈমানী চেতনা নষ্ট করা যায় তবে আর অস্ত্রের লড়াইয়ের প্রয়োজন কি?

মনে রেখো, যে হৃদয়ে ঈমানের আগুন নেই সে দেহে ওদের আঘাত করারও প্রয়োজন নেই। কারণ, কোন দেহ কাঠামোর সাথে ওদের কোন বিরোধ নেই, ওদের বিরোধ তো বিশ্বাসের সাথে, ঈমানের সাথে, তাওহীদের সাথে।

তোমাদের হিরন্ময় বিশ্বাস ও চেতনার বিনাশ সাধনই ওদের একমাত্র টার্গেট। সে টার্গেটে পৌঁছার জন্যই ওদের এতসব সাংস্কৃতিক হামলা।

দুঃখের বিষয়, প্রাণে না মেরেও যে আমাদের হত্যা করা যায় এ কথা ওরা বুঝলেও আমরা সহজে বুঝতে চাই না। তাই মুসলমানের মতো জীবন যাপন না করেও আমরা মুসলমান বলে দাবী করতে পারি নিজেদেরকে।

হে যুবক বন্ধুরা, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, ভবিষ্যতে ওদের প্রতিটি কাজের ওপর নিবদ্ধ রেখো তোমাদের সজাগ দৃষ্টি। তাহলেই দেখতে পাবে ওদের প্রতিটি কাজের পেছনে এক অন্তর্গূঢ় লক্ষ্য রয়েছে। আর সে লক্ষ্যটি হচ্ছে তোমাদের ইসলামী চেতনার বিনাশ সাধন করা, ধর্মীয় ভাবধারার প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। তোমরা যে মিশনারী জাতি, তোমাদের ওপর যে খেলাফতের কঠিন দায়িত্ব রয়েছে সে কথা তোমাদের ভুলিয়ে দেয়া।

বেঈমানরা তোমাদেরকে কি অবস্থায় নিয়ে এসেছে তা তো আজ নিজেরাই দেখতে পাচ্ছো। হে আমার যুবক বন্ধুরা, তোমরা মানসিকভাবে ওদের গোলামীর নিগড়ে একবার বন্দী হলে সমগ্র মুসলিম জাতিরও একই পরিণতি হবে। কারণ, মুসলিম উম্মাহ আর কিছুই নয়, সে তো তোমাদেরই সম্মিলিত সমষ্টি মাত্র।

সময়ের এক চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে আজ তাই তোমাদের কাছেই আমি আকুল আহবান জানাচ্ছি, এসো, নিজে বাঁচো, জাতিকে বাঁচাও। দৃষ্টিকে প্রসারিত করো, সংকীর্ণতা পরিহার করো। ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে বাঁচানোর কোন চিন্তা মনেও এনো না, সেটা হবে আত্মহত্যার শামিল। জোট বাঁধো, ঐক্যবদ্ধ হও, এক হয়ে রুখে দাঁড়াও শত্রুর বিরুদ্ধে।'

সুলতানের বাণী শোনানোর পর মুসলিম গোয়েন্দাটি এবার ওসমান সালেমকে তার কাজ ও কর্মপদ্ধতি কি হবে সে বিষয়ে বলতে লাগলো।

'আমাদের প্রধান সেনাপতি বলেছেন, আবেগ তাড়িত হয়ে কোন কাজ করো না। কেবল আবেগ দিয়ে সময়ের গতিকে রোধ করা যায় না। সব সময় খেয়াল রাখবে, আবেগ যেন দূরদর্শীতার উপর বিজয়ী না হয়। কখনো উত্তেজিত হবে না। সংযম এবং সতর্কতার সাথে কাজ করবে। এই সংযম ও সতর্কতাই বিজয়ের চাবিকাঠি।'

পাগল লোকটি ওসমানকে বললো, 'আমার আরো দু'জন সঙ্গী বিভিন্ন রূপ নিয়ে তোমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

এবার শোন তোমার কাজ কি হবেঃ এ মুহূর্ত থেকে বিশ্বস্ত মুসলমানদের বাড়ীতে গোপনে তীর, ধনুক এবং বর্শা তৈরী করে লুকিয়ে রাখবে। যুবক, বৃদ্ধ, কিশোর সবাইকে অস্ত্রের ট্রেনিং নিতে হবে। তবে সাবধান, এ কাজ করতে হবে গোপনে। শত্রুরা যেন কোন মতেই তোমাদের প্রস্তুতি টের না পায়। ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে নারীদেরকেও অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেবে। জেহাদ কেবল পুরুষের জন্যই নয়, নারী পুরুষ সবার জন্য ফরজ।

ইহুদী মেয়েদের কথা যেন কেউ কানে না তোলে। তাদের কোন কথা বিশ্বাস করবে না। ওরা মুসলমানদের মনোবল নষ্ট করার জন্য এবং জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য নানা কৌশলে নানা কথা প্রচার করবে।

সন্দেহ করতে পারে এমন কোন কথা ওদের সাথে বলবে না। কারও সাথে ঝগড়াঝাটি করবে না। ফালতু ঝগড়ায় জড়িয়ে নিজেদের শক্তি ও সময় অপচয় করবে না।

প্রথমে সংগঠিত হয়ে একজনকে নেতা নির্বাচন করে নিও। প্রত্যেকের তৎপরতা

নেতার নজরে থাকবে। তার অনুমতি ছাড়া কেউ কোন পদক্ষেপ নেবে না। নেতা বানাবে এমন একজনকে, যে পরহেজগার, যে তোমাদের মধ্যে সবচে ত্যাগী, নির্লোভ আর বিচক্ষণ।

শত্রুর গতিবিধির ওপর ভালভাবে লক্ষ্য রাখবে। তুমি কি করছো সেটা বড় কথা নয়, শত্রু কি করছে সেটাই বড় কথা। কারণ শত্রুর ক্ষমতা ও শক্তি খর্ব করার ওপর নির্ভর করছে তোমাদের বিজয়।

প্রতিপক্ষ আগামীকাল কি পদক্ষেপ নেবে তা যদি তুমি আজ জানতে না পারো তবে তার আগামীকালের অগ্রযাত্রাকে কিছুতেই তুমি প্রতিহত করতে পারবে না। ফলে নিজে কি করছো তা যেমন তোমাদের নখদর্পনে থাকবে ঠিক একইভাবে শত্রুর প্রতিটি পদক্ষেপও তোমাদের নখদর্পনে থাকতে হবে।'

সূর্য ডুবো ডুবো। মসজিদের পেশ ইমাম এলেন। তাকে দেখে ক্রুশ হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল পাগলা। মসজিদের ভেতর তার কণ্ঠ ভেসে এলো, 'মুসলমান! ক্রুশের আশ্রয়ে এসো। তোমাদের ইসলাম মরে গেছে।'

ওসমানের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধ ইমাম।

'এখানে কি করছিলে?' ঝাঁঝের সাথে ওসমানকে প্রশ্ন করলেন ইমাম।

'ওকে ভেতরে বসিয়ে রেখেছিলে কেন? কেন তাকে শেষ করে দাওনি? তোমার দেহে কি মুসলিম পিতার রক্ত নেই? আমি বৃদ্ধ না হলে ওকে জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে দিতাম না।'

'ওকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই আমি ওর পিছু নিয়েছিলাম।'

ইমামকে খঞ্জর দেখিয়ে বললো ওসমান। 'আল্লাহর শোকর ও আমার আঘাত ক্রুশ দিয়ে ঠেকিয়ে দিয়েছে। লোকটা পাগল নয়। ইহুদী বা খৃষ্টানও নয়। ও মুসলমান। সুলতান আইয়ুবীর বাণী নিয়ে এসেছে।'

ইমামকে সুলতানের পয়গাম শুনিয়ে ওসমান বললো, 'আমি এর বাস্তবায়ন করবো। আজ সন্ধ্যা থেকেই নেমে পড়বো কাজে।'

একটু ভেবে নিয়ে ওসমান আবার বললো, 'কিন্তু আমাদের একজন নেতা প্রয়োজন। আপনি কি আমাদের নেতৃত্ব দেবেন? ভেবে দেখুন! সরকার জানতে পারলে প্রথমেই নেতার মস্তক উড়িয়ে দেবে।'

'আমি এ জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবো, মসজিদে দাঁড়িয়ে এমন কথা কি বলতে পারি? তবে আমি নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য কি না সে ফয়সালা করবে জাতি। আমি মসজিদের এ পবিত্র অঙ্গনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার জীবন, সন্তান-সন্তুতি এবং ধন-সম্পদ ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দেবো।'

সামান্য বিরতি নিয়ে তিনি আবেগের সাথে বললেন, 'প্রিয় সন্তান, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি কথা গভীরভাবে মনে গেঁথে নাও। তিনি ঠিকই বলেছেন, যুবকরাই হচ্ছে দ্বীন এবং জাতির ভবিষ্যত রক্ষক। ইচ্ছে করলে এরা আশার আলো জ্বালতে পারে আবার ইচ্ছে করলে সমাজকে আঁধারেও ঢেকে দিতে পারে।'

তিনি আরো বললেন, 'কোন মুসলমান যুবক যখন কোন ইহুদী বা খৃষ্টান যুবতীর দিকে তাকিয়ে থাকে তখন সে এ কথা ভাবে না যে, তার বোনও অন্যের কু দৃষ্টির শিকার হতে পারে। প্রিয় যুবক! খোদার এই ঘরে দাঁড়িয়ে আজ এই মুহূর্ত থেকে প্রতিজ্ঞা করো, সালাহউদ্দিনের পয়গাম কার্যকরী করার জন্য জীবনপণ চেষ্টা করবে।'

নামাজ শেষে বাড়ী ফিরে গেল ওসমান। বাড়ী গিয়েই ছোট বোন আল নূরকে নিরালায় ডেকে নিল। তাকে শোনালো সুলতান আইয়ুবীর বাণী।

বললো, 'বোন! আমাদের দ্বীন এবং জাতি তোমার কাছে অনেক বড় ত্যাগের প্রত্যাশী। তুমি অন্তপুরবাসী নারী– আজ থেকে এ চিন্তা ছেড়ে দাও। মুসলিম নারীদেরকে জেহাদের জন্য প্রস্তুত করো।'

ওসমান তাকে আরো বললো, 'আমি তোমাকে খঞ্জর এবং তীর, ধনুক ও তলোয়ারের ব্যবহার শিখাবো। তবে কাজ করতে হবে খুব সাবধানে, কেউ যেন সন্দেহ করতে না পারে আমরা কি করছি।'

আল নূর আবেগে ওসমানের হাত চেপে ধরলো।

'আমি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ভাইয়া। আমার বান্ধবীরাও দেশ এবং জাতির জন্য কি করা যায় সে ভাবনায় বেশ কিছুদিন যাবত অস্থির। আমরা তো এতকাল পুরুষের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, এবার ভাবছিলাম আমরাও কিছু করতে পারি কি না।'

ওসমান বললো, 'সুলতান এবং মুসলিম বাহিনীর ব্যাপারে এতদিন আমরা যা শুনেছি সব মিথ্যা, সব গুজব। প্রতিটি মুসলমানের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের কানে সঠিক খবর পৌছে দিতে হবে। তবে মনে রেখো, মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট গাদ্দার এবং খৃষ্টানদের গোয়েন্দাও রয়েছে।'

কয়েকটা বাড়ীর উল্লেখ করে ওসমান বললো, 'আগে এসব বাড়ীর মেয়েদের হাত করে নাও। এরপর সতর্কতার সাথে তাদেরকে বলো, তোমাদের পুরুষগুলো জাতির সাথে গাদ্দারী করছে। ওদের বলো, খৃষ্টান এবং ইহুদী মেয়েদের ভালবাসার অভিনয় নিরেট প্রতারণা মাত্র। এ হচ্ছে আমাদের জাতির বিরুদ্ধে এক ধরনের ফাঁদ।'

'রিনিকে এখানে আসতে বারণ করবো? তোমার সাথেও তো ওর সম্পর্ক রয়েছে।' বললো আল নূর।

'ওকে যা বলার আমিই বলবো। তুমি কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলবে, শেষে আবার না ঝামেলায় পড়ে যাই।'

'ঠিকই বলেছেন, ও ভীষণ বুদ্ধিমতি এবং সতর্ক।'

'ওকে তোমার কিছু বলার দরকার নেই, যা বলার আমি নিজেই বলবো।'

ওসমান নিজের ঘর থেকে কাজ শুরু করে দিল।

রিনি একজন খৃষ্টান যুবতী। সুন্দরী। ওসমানদের বাড়ীর অল্প দূরে ওদের বাড়ী। রিনির পিতা বর্তমানে এখানকার পুলিশ প্রধান। ওর পুরো নাম রিনি আলেকজান্ডার।

রিনি আল নূরের বান্ধবী। কিন্তু ওসমানকে দেখলে ওর চোখে মুখে আনন্দের দ্যুতি হেসে উঠতো।

ওসমান এড়িয়ে চলতো তাকে। তার ধারণা, খৃষ্টান মেয়েটা এখানে গোয়েন্দাগিরী করতে আসে। তবে ও যেন ওসমানকে সন্দেহ না করে এ জন্য কখনো কখনো তার সাথে হাসি ঠাট্টাও করতো।

ওসমান ভাবলো, এখন রিনিকে এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ করা উচিত। ছোট বোনকে সামরিক ট্রেনিং দিতে হবে, রিনিকে তা জানানো যাবে না।

রিনিকে কিভাবে এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ করবে এ নিয়ে ওসমান সারাদিন ভাবলো। গভীর ভাবনা চিন্তার পর একটা বুদ্ধি এলো তার মাথায়।

পরদিন ওসমান আল নূরকে ডেকে বললো, 'রিনি যখন আমাদের বাড়ীতে আসে তখন তুমি কোন ছুতা দেখিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেও। এভাবে কয়েকদিন এড়িয়ে চললে দেখবে, একদিন ও নিজে থেকেই এখানে আসা বন্ধ করে দেবে।'

পাগলের কথা শহরের লোকের মুখে মুখে। পাগলের মুখে মুসলমানদের ধ্বংসের ভবিষ্যত বাণী শুনে সবাই খুশী। দু'দিন বাদেই বন্ধ হয়ে গেল পাগলের উৎপাত। মনে মনে সবাই তাকে খুঁজছে। দেখা গেল, সরকারীভাবেও তাকে খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু কোথাও নেই সে।

সরকার মুসলমানদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য পাগলটাকে ব্যবহার করতে চাচ্ছিল। তাই সরকার তাকে ধরার জন্য গোয়েন্দা লাগালো। শহরের কোথাও তাকে না পেয়ে তাকে ধরে আনার জন্য শেষ পর্যন্ত শহরের বাইরেও ঘোড়সওয়ার পাঠানো হলো। দশ-বারো দিন খোঁজাখুজির পরও লোকটাকে কোথাও পাওয়া গেল না। যেন বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেছে।

আজ পনেরো দিন ধরে ওসমান আল নূর এবং নূরের বান্ধবীদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আল নূর সুলতান আইয়ুবীর বাণী শুনিয়ে তার বান্ধবীদের অনেককেই ইতিমধ্যে দলে টেনে এনেছে। তাদেরকে তীর ও তরবারী চালনা শিখাতে ওসমানের যথেষ্ট কষ্ট হলো।

মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই অস্ত্রের কারিগর ছিল। ওসমান এবং তার বন্ধুরা অস্ত্র তৈরীর এ সব কারিগরদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করলো। এসব কারিগররা সব খৃষ্টানদের চাকরী করতো। তবে এ সব কারিগরদের নিজেদের জন্য কোন অস্ত্র তৈ করার অনুমতি ছিল না। প্রচলিত আইনে মুসলমানদের জন্য অস্ত্র বহন এবং বাড়ীতে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ ছিল। ওসমান ও তার বন্ধুরা এসব কারিগরদের গোপনে তীর, ধনুক এবং বর্শা তৈরী করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলো।

ওসমান কারিগরদের বললো, 'এ সব অস্ত্র ছাড়া নিজেদের জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোন পথ নেই। জাতির এ দুর্দিনে আমরা আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা চাই। অবশ্যই এর বিনিময়ে আমরা আপনাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়ার চেষ্টা করবো।'

কারিগরদের মনে নতুন করে আশার সঞ্চার হলো। তাদের অনেকে বিনা পারিশ্রমিকেই সানন্দে তাদেরকে অস্ত্র বানিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেল। যদিও তারা জানতো, এ কাজ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ধরা পড়লে নিজের জীবন বাঁচানোই দায় হয়ে পড়বে। যুবকদের কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে এসব কারিগররা নিজেদের বাড়ীতে গোপনে অস্ত্র তৈরী করতে লেগে গেলো।

সময়টা ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই খারাপ। কারো ওপর সরকারের সন্দেহ হলে তার বিপদের অন্ত থাকতো না। সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করে তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। প্রশ্ন করা হতো মুসলমানদের ঘরে কি হচ্ছে। কোথায় কোথায় গোয়েন্দা রয়েছে ইত্যাদি। এরপর শুরু হতো দৈহিক নির্যাতন।

কারিগররা এ জন্য সীমাতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করছিল। এসব কারিগররা ছিল বলতে গেলে গরীব। কিন্তু শুধুমাত্র অর্থের জন্য তারা এমন বিপজ্জনক কাজ করতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু যখন তাদের সামনে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলে ধরা হলো তখন তারা একে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করলো। ধরা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু জেনেও তাই তারা নানা বিপদ মাথায় নিয়ে গোপনে মুসলমানদের জন্য অস্ত্র বানানোর কাজ কোন রকমে চালিয়ে যাচ্ছিল।

মুসলিম কারিগরদের বানানো এ সব অস্ত্র রাতের মধ্যেই ওসমানরা বিভিন্ন বাড়ীতে নিয়ে লুকিয়ে ফেলতো। দিনের বেলা মেয়েরা বোরকার নীচে খঞ্জর বহন করে পৌঁছে দিত নিজস্ব গন্তব্যে। কিন্তু অস্ত্র তৈরী এবং লুকানোর এ কাজ চলছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। এভাবে ওসমানদের তৎপরতা এবং গোয়েন্দাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেল সুলতানের বাণী। ওখানেও প্রস্তুতি শুরু হলো।

সুলতানকে জানানো হলো, মুসলিম গোয়েন্দা পাগলের ছদ্মবেশে ক্রাকের যুবকদের কাছে সুলতানের বাণী পৌঁছে দিয়েছে।

সুলতান খুশী হলেন। বললেন, 'যে জাতির যুবকরা জেগে ওঠে, তাদের কেউ পরাজিত করতে পারে না।'

'এ সাফল্য আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে মাননীয় সুলতান।' বললেন, সহকারী গোয়েন্দা প্রধান জাহেদীন। 'আপনার অনুমতি পেলে অধিকৃত অঞ্চলের যুবকদের উত্তেজিত করে ক্রাকে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারি।'

'না।' সুলতান বললেন, 'দেখা যাবে এ আগুনে ওরা নিজেরাই পুড়ে মরছে। আমি চাই না যুব সমাজ আগুনে পুড়ে মরুক। তার পরিবর্তে ওদের হৃদয়ে আমি ঈমানের আগুন জ্বালাতে চাই।'

তিনি বললেন, 'যুবকদেরকে উত্তেজিত করা সহজ। আবেগপূর্ণ কথায় ওরা সহজেই উত্তেজিত হয়ে উঠে। এটা তাদের বয়সের ধর্ম। আবার কেউ ওদের হাতে কয়েকটা টাকা তুলে দিলে দেখবে ওরা তার হাতের পুতুল হয়ে নাচবে। চেষ্টা করলে ওদের নিজেদের ভেতর দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করতে পারবে শত্রুরা। তবে ভেবো না এ সব যুবক মূর্খ বা বুদ্ধিহীন। বরং ওদের বয়সটাই এমন যে সামান্যতেই ওদের রক্ত গরম হয়ে উঠে।

এরা সাধারণতঃ চঞ্চল, উৎসাহী, কর্মতৎপর। শত্রুরা জানে, যুবকদের অস্থির মনকে

যেদিকে ঘোরানো যায় ওরা সেদিকেই ছুটে চলে। এরা যেমন ভাল কাজ করতে পারে, তেমনি খারাপ কাজও করতে পারে। শত্রুরা এ সুযোগটাই গ্রহণ করছে।

ওরা যুবকদের ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে তুলছে। বিলাসিতা এবং পাশবিক সত্তাকে উসকে দিচ্ছে ওরা। ওরা জানে, কাউকে একবার মানসিক লালসার গহীনে ডুবিয়ে দিতে পারলে তাকে আমরা আর শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদে ব্যবহার করতে পারবো না।

তুমি ওদেরকে উত্তেজিত নয় বরং শান্ত রাখার চেষ্টা করবে। আগে তাদের সামনে তুলে ধরো তাদের আত্ম পরিচয়। মহানবীর (সা.) কথা কি মনে নেই? তিনি বলেছেন, নিজেকে জানো এবং শত্রুকে চিনে নাও। আর আল্লাহ বলেছেন যে জাতি নিজেকে সাহায্য করে না আল্লাহও তাদের সাহায্য করেন না। অতএব আগে তাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান দাও।

তুমি ওদের বর্তমান চিন্তাধারা বদলে দাও। তাদের মধ্যে জাতীয় অনুভূতি জাগিয়ে তোল। জাতির প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করো। যুব সমাজ জাতির সবচে মূল্যবান সম্পদ। উত্তেজিত করে এ সম্পদকে নিঃশেষ করো না। ওদের দ্বারা অবশ্যই শত্রু নিধন করবে– তবে তার আগে ওদের মধ্যে শত্রু-মিত্র পার্থক্য করার যোগ্যতা সৃষ্টি করো।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী জাহেদীনকে আরো বললেন, 'শোন জাহেদীন, তোমাকে একটা কথা বলা জরুরী মনে করছি। কোন মুসলমান আমাকে গালি দিলেই সে ইসলামের শত্রু হয়ে যায় না, গাদ্দারও হয়ে যায় না। বড়জোর সে আমার ব্যক্তিগত দুশমন হতে পারে। তাকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব তোমার নয়। তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য দেশে আইন রয়েছে, আদালত রয়েছে। কিন্তু আইনের আশ্রয় নিয়েও আমি তাকে শাস্তি দেয়ার বিরোধী। কারণ, আইন– দেশ, জাতি এবং ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তৈরী করা হয়েছে, নেতার ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার জন্য নয়।

যে দেশ এবং জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, যে শত্রুর হাত শক্তিশালী করে, গাদ্দার তো সে। নেতার আসনে বসে কেউ এ অপরাধ করলে সেও গাদ্দারীর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তুমি সহকারী গোয়েন্দা প্রধান। কেবল জনগণ নয়, নেতাদের ব্যাপারেও তোমাকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে। এমন কি আমার গতিবিধিও তোমার দায়িত্বের বাইরে নয়।

শয়তানের সাথে আমার এমন কোন আপোষ-রফা হয়নি যে, সে আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে না। আর আমি ফেরেশতাও নই যে, মানবিক দুর্বলতা থেকে আমি মুক্ত। তুমি আমার ব্যক্তিগত কর্মচারীও নও, তোমার দায়িত্ব জাতির স্বার্থ রক্ষা করা। এ স্বার্থ যার দ্বারাই বিঘ্নিত হবে তাকেই পাকড়াও করার দায়িত্ব তোমার।'

জাহেদীন বললো, 'আপনার কথা আমার মনে থাকবে সুলতান। এবার বলুন, ওখানে যে একদল যুবক তৈরী হয়েছে, ওদের আমরা কিভাবে ব্যবহার করবো?'

'ওদের উত্তেজিত করো না। ওদের ভেতর সঠিক চিন্তা করার যোগ্যতা সৃষ্টি করো। কি করতে হবে অবস্থার প্রেক্ষিতে ওরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে। আবেগ দিয়ে কোন কিছু চিন্তা করা যাবে না।

ওখানে আরো বেশী করে মেধাবী গোয়েন্দা পাঠাও। মনে রেখো, দুশমন আমাদের

নয়, আমাদের যুবকদের কর্মধারা নষ্ট করে দিতে চাইছে। ওরা জানে, কোন জাতিকে পরাভূত করতে চাইলে সে জাতির যুব সমাজের মন-মানসিকতায় বিলাসিতা ঢুকিয়ে দিলে ওরা তখন যুদ্ধ আর কর্মের ময়দান থেকে নিজেরাই সরে দাঁড়াবে।

আরাম আয়েশ আর বিলাসদ্রব্য তাদেরকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। স্বার্থ চিন্তা তাদেরকে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তারা তখন শুধু নিজেরা নয়, নিজেদের মেয়েগুলোকেও অন্যের হাতে তুলে দেবে প্রগতি ও সভ্যতার দোহাই দিয়ে।

তারা তখন কতটা খারাপ হতে পারে সে তুমি ভাবতেও পারবে না। তুমি যাকে ভাল মানুষ ও সম্মানিত ব্যক্তি বলে সমীহ করবে, সে ততটুকুই ভাল যে, সে মানুষকে ভাল ভাল উপদেশ দিবে। তার নিজের স্বার্থ ও আনন্দের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হলে, সে মনে মনে পৃথিবীর সব মানুষ ভাল হয়ে যাক এটাও চাইতে পারে। কিন্তু নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে তাও করবে কি না সন্দেহ। নিজের চোখের সামনে ওরা তখন নিজের যুবতী বোনদের উলঙ্গ নাচিয়ে গর্ববোধ করবে।'

বলতে বলতে হঠাৎ সুলতান বলে উঠলেন, 'ক্রাকের যেসব যুবক অস্ত্র তৈরী করছে তাদের কাছে কোমায় ব্যবহৃত তরল জ্বালানি পৌঁছে দিয়ে তার ব্যবহার শিখাতে বলেছিলাম, তা কি করা হয়েছে?'

'জ্বী সুলতান! এ তরল জ্বালানি তৈরীর পদ্ধতি ওদের শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। খবর পেয়েছি, ওখানকার মুসলমানরা এরই মধ্যে তা তৈরী করা শুরুও করে দিয়েছেন।'

ক্রাকে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটলো যাতে সেখানকার যুবকরা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। অবস্থা এমন নাজুক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে, যুব সমাজকে বাধ্য হয়ে এক কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলো।

খৃষ্টানরা তাদের অধিকৃত এলাকায় যে সব মুসলিম কাফেলা যাতায়াত করতো সে সব কাফেলা লুট করা শুরু করে দিয়েছিল। মুসলিম ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ভ্রমণকারীদের নিয়ে তৈরী হতো এ সব কাফেলা। সংখ্যায় দেড় থেকে দু'শ হলেই কাফেলা যাত্রা শুরু করে দিত। কাফেলায় থাকতো উট, ঘোড়া এবং ব্যবসায়ীদের মালপত্র। কখনো দু'চারটে পরিবারও থাকতো কাফেলার সঙ্গে। খৃষ্টান নির্যাতনের ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে মুসলিম প্রধান এলাকায় হিজরত করার জন্যই এসব পরিবারগুলো শামিল হতো কাফেলায়।

প্রতিটি কাফেলাতেই সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা থাকতো। ফলে, সাধারণ ডাকাত দল এসে কোন কাফেলা লুট করার সাহস পেতো না।

খৃষ্টানরা সেনাবাহিনীকে এসব কাফেলা লুণ্ঠন করার দায়িত্ব দিল। ফলে মুসলমানদের কোন কাফেলার সন্ধান পেলেই খৃষ্টান সৈন্যরা বেদুইনের ছদ্মবেশে কাফেলায় লুটতরাজ করার জন্য ছুটে যেতো।

যেসব খৃষ্টান সম্রাটরা ইতিহাসের পাতায় আজো হিরো সেজে বসে আছেন, এসব লুণ্ঠন ছিল তাদেরই পরিকল্পনার ফসল। লুটের মাল থেকে তারাও নিয়মিত ভাগ পেতো।

কিছু কিছু মুসলমান আমীর ওমরাও এসব অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। এরা ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম প্রদেশের শাসক। ওদের ছিল নিজস্ব সেনাবাহিনী।

লুণ্ঠিত কাফেলার কেউ এসে এ সব মুসলিম শাসকের কাছে অভিযোগ করলে তারা তা শুনেও না শোনার ভান করতো। কারণ লুণ্ঠনকারী খৃস্টানদের পক্ষ থেকে ওদেরকে দেয়া হতো মদ, নারী ও স্বর্ণমুদ্রা। ইচ্ছে করলে এসব শাসকরা খৃস্টানদের লুটতরাজ বন্ধ করতে পারতো। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করতো না।

শাসকদের মনোভাব জানতো বলেই কখনো কখনো এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যের ভেতরে এসেও খৃস্টান সৈন্যরা মুসলিম কাফেলার ওপর হামলা করতে দ্বিধাবোধ করতো না।

মুসলিম শাসকদের এ দুর্বলতার সুযোগে খৃস্টান সম্রাটরা এবার মুসলিম রাজ্য সমূহের সীমান্ত হজম করতে শুরু করলো। কোন কোন মুসলিম শাসক এ অবস্থায় খৃস্টানদের আনুগত্য স্বীকার করে তাদেরকে কর দেয়া শুরু করলো। এভাবেই ক্রমে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে আসতে লাগলো মুসলিম রাজ্যের সীমানা।

নূরুদ্দিন জঙ্গী এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো খৃস্টানদের হাতে তুলে দেয়ার পরিবর্তে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন। তাদের কাছে এসব মুসলিম শাসকরা ছিল খৃস্টানদের চাইতেও বিপজ্জনক।

সুলতান আইয়ুবীর কাছে লেখা এক চিঠিতে নূরুদ্দিন জঙ্গী লিখলেন, 'বিলাসিতা এবং ভোগের জন্য এসব মুসলিম শাসকবর্গ ইসলামী রাজ্যগুলো খৃস্টানদের কাছে বন্ধক দিয়ে রেখেছে। খৃস্টানরা ওদেরকে ধন-সম্পদ এবং অপহৃত মুসলিম যুবতী উপহার দিয়ে অন্ধ করে ফেলেছে। এদের হাতেই এখন বেশী করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পবিত্র ইসলাম। এরা কাফের বেঈমানদের চাইতেও ইসলামের জন্য বেশী বিপজ্জনক এবং অপবিত্র।

ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে এরা। এ সুযোগে খৃস্টান শক্তি ইসলামের মূল উৎপাটনের তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। খৃস্টানদেরকে পরাজিত করার পূর্বে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো মুসলিম বিশ্বের সাথে একীভূত করা প্রয়োজন। কারণ, এদের হাতে মুসলমানদের জীবন ও সহায় সম্পদ খৃস্টানদের মতোই সমান নিরাপত্তাহীন। এ ছাড়া দ্বীন ও ঈমানকে টিকিয়ে রাখার অন্য কোন পথ নেই।'

এ কারণেই খৃস্টানদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার পরও দেখা যেতো, খৃস্টান অধ্যুষিত এবং খৃস্টান প্রভাবিত এসব মুসলিম এলাকাগুলো থেকে বিরাট বিরাট মুসলিম কাফেলা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে নিয়মিতই মরুভূমির বিশাল পথ অতিক্রম করে চলেছে।

এমনি এক কাফেলা ক্রাকের কয়েক মাইল দূর দিয়ে যাচ্ছিল। যাত্রীদের সাথে ছিল অনেক ঘোড়া এবং ব্যবসায়িক মালপত্র। ছিল কয়েকটি পরিবার। শিশু-কিশোর ছাড়াও কাফেলায় ছিল দু'জন যুবতী। যুবতীরা দুই আপন বোন।

পথ চলছে কাফেলা। খৃস্টানরা খবর পেয়ে সৈন্যদের একটা দল পাঠিয়ে দিল। দলটি দিনে দুপুরেই কাফেলায় আক্রমণ করে বসলো।

কাফেলার যাত্রীরা প্রবল বিক্রমে প্রতিরোধ করলো এ হামলা। আক্রমণের প্রথম ধাক্কা কেটে গেল দেখা গেল উভয় পক্ষেই বেশ হতাহত হয়েছে। সৈন্যরা এবার কাফেলাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলো। কাফেলাও সংহত হয়ে আস্তে আস্তে পেছনে সরে যেতে লাগলো।

নারী ও শিশুদের নিয়ে কয়েকজন পেছনের পাহাড়ের দিকে সরে গেল। বাকীরা লড়ে যেতে লাগলো প্রাণপণে। কিন্তু সৈন্যরা ছিল সংখ্যায় বেশী এবং নিয়মিত যোদ্ধা। ফলে এসব সৈন্যদের সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না ওরা। মরুর বালুকারাশি লাল হয়ে গেলো যাত্রীদের তাজা রক্তে।

নারী ও শিশুদের নিয়ে যারা পাহাড়ের পাদদেশে জমা হয়েছিল ওদের দিকে এগিয়ে গেল সৈন্যরা। ওরা ততোক্ষণে পাহাড়ের উপর গিয়ে বিভিন্ন পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। ঘাতকরা তীরের আওতায় আসতেই ওরা তীর ছুঁড়তে শুরু করলো। সামনের সারির বেশ কয়েকজন তীরের আঘাতে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল সৈন্যরা। সামান্য পেছনে সরে চলে এলো নিরাপদ দূরত্বে। সৈন্যদের একদল চলে গেল পাহাড়ের উল্টো দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পিছন থেকে হামলা করে বসলো লুকিয়ে পড়া যাত্রীদের ওপর।

সাথে সাথেই সামনে থেকে ছুটে এলো সৈন্যদের মূল বাহিনী। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইতি ঘটলো লড়াইয়ের। ঘাতকদের তরবারী থেকে নারী ও শিশুরা পর্যন্ত রক্ষা পেলো না। কাফেলার দুশ জন যাত্রীর অধিকাংশই নিহত হলো।

লড়াই শেষে দেখা গেল পনেরোজন আহত যুবক এবং দু'জন যুবতী ছাড়া কেউ বেঁচে নেই। এদের বন্দী করে মাল সামান নিয়ে ডাকাত দল ক্রাকের পথ ধরলো। ডাকাত দল যখন ক্রাকে প্রবেশ করছিল সামনে ছিল বন্দীরা। দুটো ঘোড়ার পিঠে বসে ছিল যুবতী দু'জন।

ক্রাকের জনসাধারণ তাকিয়ে দেখলো কাফেলাকে। যুবতী দু'জনের পোষাক-আশাক মুসলমানদের মতো। মেয়ে দুটোর পেছনে মুখোশপরা খৃষ্টান সৈন্যদের সশস্ত্র পাহারা। তাদের পেছনে লুষ্ঠিত মাল সামানসহ উট এবং ঘোড়ার বিশাল সারি।

মেয়ে দু'জন কাঁদছিল। ক্রাকের লোকজন বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো তামাশা দেখার জন্য। মুসলিম কাফেলা লুণ্ঠিত হয়েছে এ জন্য ওরা খুশী। হাততালি দিয়ে সবাই আনন্দ প্রকাশ করছে।

বন্দীদের মধ্যে এক যুবকের নাম ছিল আশফাক। মেয়ে দু'জন ওরই বোন। কপালে এবং কাঁধে আঘাতের চিহ্ন যুবকের। এখনো রক্ত ঝরছে আহত স্থান থেকে।

রাস্তার দুপাশে দর্শকদের দেখে আশফাক চিৎকার দিয়ে বললো, 'ডুবে মরো তোমরা। এই অসহায় মেয়ে দু'জনকে দেখো। এরাও মানুষ। তোমরা মানুষ হলে ওরা একা আমার নয় তোমাদেরও বোন। যদিও ওরা মুসলমান।'

একজন খৃষ্টান সৈন্য পেছন থেকে তার ঘাড়ে ঘুসি মারলো। উপুড় হয়ে পড়ে গেল আশফাক।

অন্য একজন বন্দী তাকে আবার তুলে নিল। আবার চিৎকার দিয়ে বললো ছেলেটা,

ক্রাকের মুসলমানেরা, এ দু'জন তোমাদের মেয়ে। ওরা এখন খৃষ্টান ডাকাতদের হাতে বন্দী। একটু পর হয়তো তাদের সতীত্ব লুন্ঠন করা হবে। তাদের আর্ত চিৎকারে বিষাক্ত হয়ে যাবে ক্রাকের বাতাস। সে বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে তোমরা কতোক্ষণ বাঁচতে পারবে আমার জানা নেই।'

দু'জন মুখোশধারী ডাকাত এগিয়ে এসে তাকে পিটাতে লাগলো। তাই দেখে মেয়েরা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠে বলতে লাগলো, 'আল্লাহর দোহাই লাগে, আমাদের ভাইকে মেরো না। আমাদের সাথে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করো, দয়া করে ওকে ছেড়ে দাও।'

এক বোন চিৎকার দিয়ে বললো, 'আশফাক, চুপ করো। তুমি এদের কিছুই করতে পারবে না।'

মুসলিম দর্শকরা অনেক কষ্টে এ দৃশ্য হজম করছিল। ওদের বিবেক, ওদের আত্মমর্যাদা দৃষ্টির সামনে ধূলায় গড়াচ্ছে, কিন্তু ওরা কিছুই করতে পারছে না।

দর্শকদের মধ্যে ওসমানও ছিল। সঙ্গীদের দিকে তাকাল ও। সবার চোখে মুখে ক্রোধের আগুন। দ্রুত লাফাচ্ছে হৃদপিণ্ড। যেন খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। ওদের পেছনে পেছনে কিছু দূর এগিয়ে গেল ওসমানরা। সামনে রাস্তার পাশে একজন মুচি জুতো সেলাই করছে।

ওসমান মুচির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জুতা খুলে বসে পড়লো তার সামনে। মুচিও আশফাকের কথা শুনেছে এবং মেয়েদের দুর্দশা দেখেছে। কিন্তু বেচারা গরীব মুচির কিইবা করার আছে! একজন মুসলমান অনুগ্রহ করে তাকে বারান্দায় থাকতে দিয়েছেন, এই তার চরম সৌভাগ্য।

তাকে কেউ কোনদিন মসজিদ, গীর্জা বা ইহুদীদের উপাসনালয়ে যেতে দেখেনি। জুতা মেরামতের দরকার হলেই লোকেরা তার দিকে তাকায়। তাকে কেউ কোনদিন কথা বলতে দেখেনি। মনে হয় সংসার বিবাগী একজন লোক। খৃষ্টানদের সাথেও কোন সম্পর্ক নেই, মুসলমানদের ব্যাপারেও কোন আগ্রহ নেই।

বন্দীর দল চলে গেছে। মুচি জুতা সেলাই করছে। মাথা তুলে একবারও ওসমানের দিকে তাকাচ্ছে না। ওসমান এদিক ওদিক তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, 'এ দু'জন মেয়েকে আজ রাতে মুক্ত করতে হবে।'

'জানো এরা আজ রাতে কোথায় থাকবে?' মাথা না তুলেই ফিসফিসিয়ে বললো মুচি।

'জানি। ওরা আজ রাতে খৃষ্টান সম্রাটের কাছে থাকবে। কিন্তু আমি কখনো ভেতরে যাইনি। ভেতরটা দেখিওনি।'

'আমি দেখেছি। ওখান থেকে মেয়েদের বের করে আনা সম্ভব নয়।'

'তাহলে তুমি কোন্ কাজের কাজী?'

ওসমানের কণ্ঠ ঝলকে উঠলো আবেগ এবং ক্ষোভে। 'আমাদের পথ দেখাও। মেয়েদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই হলো। মুক্ত করার সুযোগ না পেলে ওদেরও হত্যা করবো। তবুও বদমায়েশ সম্রাটদের ভোগের সামগ্রী হতে দেবো না আমাদের দুই অসহায় বোনকে।'

'এ জন্য ক'জন যুবকের জীবন উৎসর্গ করতে পারবে?'
'আপনি যা চাইবেন।'
'ঠিক আছে, কাল রাতে দেখা যাবে।'
'না, আজ রাতে।' ওসমানের দৃঢ় কণ্ঠ। 'যা করার আজ রাতেই করতে হবে।'
'ইমামের কাছে যাও।'
'ক'জন যাবো?'
'আটজন। অস্ত্র হবে খঞ্জর এবং কোমায় ব্যবহৃত জ্বালানী।'
ওসমান জুতা পরে চলে গেল।

সূর্য এখনো ডুবেনি। সাতজন বন্ধুর সাথে দেখা করলো ওসমান। ওদেরকে ইমাম সাহেবের কাছে যেতে বলে নিজেও মসজিদের দিকে পা বাড়ালো।

পাগলের সাথে কথা বলার পর ওসমান ইমাম সাহেবকে নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ করেছিল। দলের সবাই কাজ করছিল তার নেতৃত্বে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাড়ীতে দলের গোপন বৈঠক চলতো।

অপহৃত দু'জন যুবতীকে উদ্ধার করতে হবে, ওসমানের এ সিদ্ধান্ত ছিল আত্মহত্যার শামিল। মুচির পরামর্শ অনুযায়ী ওসমান ইমাম সাহেবের কাছে চলে এলো। তিনি অস্থিরভাবে বারান্দায় পায়চারী করছিলেন, থেমে গেলেন ওসমানকে দেখে।

'ওসমান! বন্দী ছেলেটার চিৎকার তুমি শুনেছো? সম্ভবতঃ মেয়ে দু'জন ওর বোন।'

'তার চিৎকারের জবাব দিতেই এখানে এসেছি সম্মানিত ইমাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার সাতজন বন্ধুও এখানে পৌঁছে যাবে।'

'কি করবে তোমরা? আর কিইবা করতে পারি।..... জানি, আমাদের অনেক মেয়েই ওদের কাছে রয়েছে। কিন্তু এ দু'টো মেয়ে আমাকে পরীক্ষায় ফেলে দিল।' পায়চারী করতে করতে বললেন ইমাম।

মুখ উপরের দিকে তুলে ইমাম সাহেব বেদনামাখা কণ্ঠে বললেন, 'খোদা, শুধু একটি রাতের জন্য আমার যৌবন ফিরিয়ে দাও। এক রাত পর আমার জীবন ছিনিয়ে নিয়ো। যদি বেঁচে থাকি মৃত্যু পর্যন্ত মেয়ে দুটোর অসহায় বিলাপধ্বনি আমার কানে বাজবে। আমি পাগল হয়ে যাবো।'

'আপনি আমাদেরকে পরামর্শ দিন। আশা করি আজকের এ রাতের পর আর আপনাকে মেয়েদের নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হবে না।'

ওসমানের দু'জন সঙ্গী ভেতরে ঢুকলো। পাশাপাশি তিনজন বসলো ইমাম সাহেবের বিছানায়।

ইমাম সাহেব বললেন, 'আজকে মনে হয় আমার বুদ্ধি গুলিয়ে ফেলেছি। এতটা অধৈর্য্য হওয়া আমার সাজে না। কিন্তু কোন বিবেকবান মানুষ এ চিৎকার শুনে বসে থাকতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই তার ভেতরের আবেগ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ আবেগকে কাজে লাগানোর জন্য যুবক হতে হয়। কিন্তু আমার সন্তানেরা! আমি অনেক বুড়ো হয়ে গেছি। সহ্য শক্তিও কমে গেছে। তোমরা যাই করতে চাও সাবধানে করো।'

একে একে সাতজন যুবক এসে পৌঁছলো। কিছুক্ষণ পরই এলো মুচি।

মুচির মাথার টুকরিতে পুরনো জুতা এবং জুতা মেরামতের যন্ত্রপাতি। টুকরিটা এক পাশে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই হেসে উঠলেন তিনি। এখন কে বলবে এই লোকটা সারাদিন কুঁজো হয়ে পৃথিবীর সাথে সম্পর্কহীনভাবে বসে বসে জুতো সেলাই করে।

ইমাম সাহেব দরজা বন্ধ করে দিলেন। বারজেস এখন আর মুচি নন, গোয়েন্দা সংস্থার একজন অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান গুপ্তচর।

বারজেস ইমাম সাহেবকে বললেন, 'এ যুবকরা আজ রাতেই যে মেয়ে দুটোকে ছাড়িয়ে আনতে চাচ্ছে, এ কাজে শুধু ধরা পড়ার ভয় নয়, নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকিও আছে।'

'আমরা জেনে বুঝেই মৃত্যুর এ ঝুঁকি নিচ্ছি সম্মানিত বারজেস।' বললো এক যুবক। 'আপনি এ পথের গুরু। আমাদের পথ দেখান।'

'আমার পরামর্শ চাইলে বলি, খৃস্টানদের কাছে আমাদের অনেক মেয়ে রয়েছে। কাউকে এনেছে চুরি করে। কাউকে আবার কাফেলা থেকে লুট করেছে। ওদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধেই গোয়েন্দাবৃত্তিতে ব্যবহার করছে। কাউকে পাঠাচ্ছে তোমাদের চরিত্র নষ্ট করতে। প্রতিটি মেয়েকে তো তোমরা ছাড়িয়ে আনতে পারবে না।

যদি আমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাও তো বলবো, দু'টি মেয়ের জন্য আটজন যুবককে উৎসর্গ করা ঠিক হবে না। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে ধৈর্য ধারণ করো।'

'এ অবস্থায় কি করে ধৈর্য ধরতে পারি?' ঝাঁঝের সাথে বললো ওসমান।

'আমার মতো।' বললেন বারজেস।

'আমি কি সত্যি সত্যি মুচি? মিশরে আমার রয়েছে উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া। রয়েছে নিজের বাড়ী, রয়েছে অনুগত চাকর-বাকর। একজন সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী ব্যক্তি হয়েও এখানে বসে সারাদিন আমি মানুষের ময়লা ছেঁড়া জুতা সেলাই করি।

তোমরা তোমাদের ঈমানী দাবী পূরণ করেছো দুটো মেয়ের মুক্তির জন্য নিজেদের জীবনকে পেশ করে। কিন্তু এ দু'জন মেয়েসহ অসংখ্য মেয়ের মুক্তি এবং ক্রাকসহ বিশাল এলাকা মুক্ত করার জন্য তোমাদের বেঁচে থাকা দরকার। এ জন্য ধৈর্যের সাথে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা উচিত তোমাদের।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'সম্মানিত বারজেস অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আমি মেয়েদের মুক্তি অবশ্যই চাই, তবে বারজেসের যুক্তিও এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শের বাইরে আমাদের কিছু করা উচিত নয়।'

ওসমান এবং তার সঙ্গীদের সহ্যের সীমা শেষ হয়ে গেল। বারজেস ও ইমাম সাহেবের কথাবার্তা শুনেও তাদের মনে কোন প্রবোধ এলো না। ইমাম ও বারজেসের কথা ছাপিয়ে তাদের কানে বাজতে লাগলো আশফাকের চিৎকার ও মেয়ে দুটোর করুণ চাহনি।

মেয়ে দু'জনকে উদ্ধার করার অভিযান থেকে বিরত থাকার শত যুক্তি তাদের কাছে মেয়ে দুটোর চাহনির তুলনায় নিষ্প্রভ মনে হলো। ওরা বললো, 'মেয়েরা যেখানেই থাকুক, যে অবস্থায়ই থাকুক, আর তাদের উদ্ধার অভিযান চালাতে যত বড় ত্যাগই স্বীকার করতে হোক, আমরা সেখানে আক্রমণ করবোই।'

'আপনাদের দেহের খুন বাসি হয়ে গেলেও আমাদের শিরায় তাজা খুনের অভাব নেই। আপনাদের খুনের দিকে তাকিয়ে নয়, সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের দিকে তাকিয়ে।' বললো আরেক যুবক।

ওসমান বললো, 'অপারেশনে আপনারা নন আমরা যাবো, আপনারা শুধু বলুন, কোন পথে গেলে আমরা বেশী সফলতার আশা করতে পারি।'

ইমাম সাহেব ও বারজেস তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারলো না।

কক্ষে দশ জন প্রাণী, কেউ মুখ খুলছে না। গুমোট নিরবতায় ছেয়ে গেল কক্ষ। এ যেন বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্ত। আটজন যুবকের চেহারায় আগুন ঝরা দৃঢ়তা। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ওরা।

অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙ্গে বারজেস বললেন, 'খৃষ্টান রাজাদের পানশালায় আমাদের দু'জন গোয়েন্দা সাধারণ চাকরের কাজ করে। সুবাক বিজয়ের পর খৃষ্টানদের ছদ্মবেশে ওরা চলে এসেছিল। এখানে এসে পানশালায় চাকরি নিয়ে গুপ্তচরের কাজ করছে।

বৃটেন, ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী এবং অন্যান্য দেশের সম্রাটরা যেখানে বসে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করে তোমরা নিশ্চয়ই সে প্রাসাদ দেখেছো। সে প্রাসাদের বিশাল এক কক্ষ ওদের পানশালা।

রাতে সেখানে নৃত্য গীতের আসর বসে। আনন্দ স্ফূর্তি করার জন্য মেয়ে থাকে। মাঝ রাত পর্যন্ত মদ পান ও আনন্দ স্ফূর্তির জলসা চলে।

কক্ষটা উপর তলায়। ওখান থেকে সমগ্র শহর চোখে পড়ে। কক্ষের চারপাশে কড়া সেনা পাহারা। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, সম্রাটরা ছাড়া অন্য কোন মহা সম্মানিত ব্যক্তিও সে কক্ষের কাছে যেতে পারে না। মেয়ে দু'জন রাতে কোথায় থাকবে আমি এ তথ্য সংগ্রহ করতে পারবো। কিন্তু ওরা সেখানে থাকলে সে পর্যন্ত যাওয়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'সেখানে পৌঁছার কোনই উপায় কি নেই?'

'না নেই। তবে বাইরে সেনাবাহিনী আক্রান্ত হলেই কেবল ওখান পর্যন্ত যাওয়া যাবে। সেনাবাহিনী আক্রান্ত হলে সম্রাটরা কক্ষের বাইরে চলে আসবে ব্যাপার কি দেখার জন্য। কক্ষের প্রহরীরাও হয়তো তখন সরে আসবে সেখান থেকে। কিন্তু আজ রাতে ক্রাকে কোন সেনা অভিযান হচ্ছে না। সুলতান আইয়ুবী কবে নাগাদ ক্রাক আক্রমণ করবেন তাও বলা যায় না।'

'বাইরের দিক থেকে শুধু আক্রমণ করা দরকার?' জানতে চাইল ওসমান।

'আপনি বলতে চাচ্ছেন, আক্রান্ত হলে লোকজন মেয়েদেরকে রেখে ওখান থেকে চলে আসবে। এ সুযোগে এ ছেলেরা মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে আসতে পারবে, এই তো?' বারজেসের কাছে ইমাম সাহেব জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। আমি তাই বলতে চাইছি।'

'শহরে বড় কোন ঝামেলা বা আক্রমণ হলে অথবা যুদ্ধের রসদে আগুন লাগলেও কি সবাই ওখানে ছুটে আসবে?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিলেন বারজেস।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন ইমাম সাহেব। ইসলামী ইতিহাসের একটি ঘটনা ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায়। একে একে বারজেস এবং আটজন যুবকের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, 'সম্মানিত বারজেস ও আমার মুজাহিদ বন্ধুরা! আমাদের সামনে আজ এক কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষার মোকাবেলায় আমাদের করণীয় কি সে ব্যাপারে আপনারা নিজ নিজ মতামত পেশ করেছেন।

বারজেসের বক্তব্যে আছে বাস্তবতা ও যুক্তি, যুবক বন্ধুদের বক্তব্যে আবেগ। কিন্তু কোন সচেতন মুসলমান কেবল যুক্তি বা আবেগ দিয়ে এ ধরনের সমস্যার ফায়সালা করে না। তার সামনে থাকে কোরআন ও সুন্নাহ। কোরআন ও সুন্নাহর মূলনীতিই এ ক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড হিসাবে আমাদের পথ দেখাতে পারে।

এ ধরনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলামী রীতি কি হতে পারে তা বুঝার জন্য আমি আপনাদের সামনে ইসলামী ইতিহাসের একটি ঘটনা তুলে ধরতে চাই। হয়তো ঘটনাটি আপনাদের সবার জানা, তবু এর উল্লেখ করছি এ জন্য যে, আজকের উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে এ ঘটনা হয়তো আমাদের নতুন করে দিকনির্দেশনা দিতে পারবে।

মদিনায় ইসলামের ছোট্ট রাষ্ট্রটির সবেমাত্র উদ্ভব ঘটেছে। অস্ত্রবল নেই, জনবল নেই। মক্কা থেকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় মুহাজিররা এসে আশ্রয় নিয়েছেন মদিনায়। তাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতেই হিমশিম খাচ্ছেন মদিনার গুটিকয় আনসার। মহানবী (সা.) আর তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সেই মুষ্টিমেয় সাহাবীদের সামনে তখন বেঁচে থাকার কঠিন পরীক্ষা।

একদিন তাঁরা খবর পেলেন, সিরিয়ার দিক থেকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বিপুল পরিমান মাল-সামানসহ এগিয়ে আসছে একটি বাণিজ্য কাফেলা। এর পরপরই খবর এলো, উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ মক্কা থেকে সশস্ত্র কাফেরদের এক বিশাল সেনাবাহিনী মদিনা আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে।

এ ধরনের নাজুক ও কঠিন পরিস্থিতিতে সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন মহানবী (সা.)। বললেন, 'একদিকে উত্তরে বাণিজ্য কাফেলা, অন্যদিকে দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসছে কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী। আল্লাহতায়ালা ওয়াদা করেছেন এর মধ্যে একটা তোমরা লাভ করবে। এখন তোমরাই বলো, কোনটার সাথে তোমরা মোকাবেলায় যেতে চাও?'

জবাবে বিপুল সংখ্যক সাহাবী বাণিজ্য কাফেলার ওপর হামলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাদের এ ইচ্ছায় যথেষ্ট বাস্তবতা ছিল। কারণঃ

১. মুসলমানরা ছিল সহায় সম্বলহীন, দুর্বল এবং সংখ্যায় মাত্র তিনশ জনের মতো।
২. যুদ্ধ করার মতো কোন অস্ত্রপাতি এবং বাহন তাদের হাতে নেই। ঘোড়া মাত্র দু'তিনটি, উট সত্তরটি, ষাটটি বর্ম, ঢাল তলোয়ারের অবস্থাও তথৈবচ।
৩. যুদ্ধ শুরু হলে মদিনার ইহুদীরা যে কোন ছুতায় কুরাইশদের সহযোগিতায় চলে যেতে পারে। কারণ, মদিনায় মুসলমানদের এ নব উত্থানকে তারাও খুব একটা ভাল চোখে দেখছে না।

৪. অপরদিকে কুরাইশ বাহিনীতে আছে আরবের নামকরা বীরেরা। মক্কার ঝানু ঝানু নেতা ও সমরবিশারদরা শামিল হয়েছে তাতে।
৫. মাত্র শ'তিনেক মুসলমানের মোকাবিলায় ওখানে সমবেত হয়েছে সহস্র যোদ্ধা। তারা প্রত্যেকেই তেজী বাহন ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত।

স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, এ অবস্থায় কুরাইশ বাহিনীর মোকাবিলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আর আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন পার্থক্য করার উপায় নেই। কোন বিবেকবান সুস্থ মানুষই এ ধরনের আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে না।

অন্যদিকে রয়েছে বাণিজ্য কাফেলা। মক্কার প্রায় সকল ব্যবসায়ীর মালামাল ছিল এ বাণিজ্য বহরে। ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায়, পঞ্চাশ হাজার আশরাফীর পণ্যদ্রব্যে বোঝাই ছিল এ বিশাল কাফেলা। অথচ কাফেলার সাথে রক্ষী ছিল মাত্র ত্রিশ-চল্লিশজন। এ ধরনের একটা কাফেলা কব্জা করা মোটেই কঠিন কিছু ছিল না। আর এ কাফেলা কব্জা করতে পারলে নিঃস্ব মুহাজিরদের অভাব ঘুচানো যাবে, আনসারদের দারিদ্র দূর করা সম্ভব হবে।

দারিদ্রের বদলে এ পরিমান অর্থ পেলে মদিনার প্রতিটি মুসলমান আরবের শ্রেষ্ঠ ধনীতে পরিণত হয়ে যাবে। শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় অর্থের কোন অভাব থাকবে না, উন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত করা যাবে। দ্বীনের তাবলীগ ও মানুষকে আকৃষ্ট করার কাজে এ অর্থ প্রভূত কাজে লাগবে। সবচেয়ে বড় কথা, যে অস্ত্র আর বাহনের অভাবে আজ যুদ্ধের ময়দানে পা বাড়াতে পারছে না মুজাহিদরা, সে অস্ত্র আর যুদ্ধের বাহন ক্রয়ের পথে আর কোন বাঁধা থাকবে না।

তাই বাণিজ্য কাফেলা মোকাবিলা করার সাহাবীদের এ চিন্তাকে সকলেই সঠিক ও নির্ভুল মনে করবে এতে অবাক হবার কি আছে?

কিন্তু মহানবী (সা.) চিন্তা করছিলেন অন্য রকম। তিনি চাচ্ছিলেন, বাণিজ্য কাফেলা নয়, মক্কা থেকে ধেয়ে আসা সামরিক বাহিনীটির মোকাবিলা করতে। এ কারণে প্রশ্নটি তিনি আবার করলেন। সাহাবীরা বুঝলেন তাঁদের দেয়া এ প্রস্তাবের সাথে রাসুল (সা.) পুরোপুরি একমত হতে পারছেন না।

মুহাজিরদের মধ্য থেকে তখন মিকদাদ ইবনে আমর (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার রব আপনাকে যেদিকে যেতে আদেশ করছেন আপনি আমাদের সেদিকেই নিয়ে চলুন। আপনি যেদিকেই যান আমরা আপনার সাথে আছি। বনি ইসরাইলের লোকদের মতো আমরা বলবো না, যেমন তারা মুসা (আ.)কে বলেছিলঃ 'তুমি আর তোমার খোদা গিয়ে লড়াই করো, আমরা এখানেই রইলাম।'

(আমরা কথা দিচ্ছি) ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনার সাথে প্রাণপণ লড়ে যাবো, যতোক্ষণ আমাদের একটি চোখও দেখতে পাবে।'

এবার আনসারদের দিকে তাকিয়ে মহানবী (সা.) প্রশ্নটি আবার করলেন। সাহাবীরা বুঝলেন, এবার তিনি আনসারদের মতামত জানতে চাচ্ছেন।

তখন আনসার সায়াদ ইবনে মুয়াজ (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'আমরা

আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তাই চিরন্তন সত্য। আপনার কথা শোনা ও তা মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতিও আমরা আপনাকে দিয়েছি।

অতএব হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই করুন। যে খোদা আপনাকে মহাসত্য সহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সাগরে গিয়ে পৌঁছেন এবং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন তবে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো এবং আমাদের একজনও পিছনে পড়ে থাকবে না।

আপনি যদি কাল আমাদের নিয়ে দুশমনের মোকাবেলায় যান তবে তা আমাদের জন্য মোটেই দুঃসহ হবে না। যুদ্ধে আমরা দৃঢ় ও অটল থাকবো। লড়াইয়ের ময়দানে অকাতরে বিলিয়ে দেবো আমাদের প্রাণ। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ আমাদের দ্বারা আপনাকে এমন কিছু দেখাবেন, যা দেখে আপনার চোখ খুশীতে শীতল হয়ে যাবে। কাজেই আল্লাহর বরকতের ওপর ভরসা করে আমাদের নিয়ে রওনা হোন।'

মুহাজির ও আনসারদের পক্ষ থেকে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোন সহজসাধ্য কাজ ছিল না। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে কখনো এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। মুসলমানরা যখন ঈমানের বলে বলীয়ান হয় তখনই কেবল এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। আর মুসলমানরা যখন এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখনই কেবল আল্লাহর সাহায্যের আশা করা যায়।

এসব বক্তৃতা-ভাষণের পর ঠিক হলো, বাণিজ্য কাফেলার পরিবর্তে শত্রু-সেনা বাহিনীরই মোকাবেলা করা হবে। এ সিদ্ধান্তের পর মুসলমানরা মক্কার দিকে রওনা হলো এবং বদর প্রান্তরে দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো। ইতিহাসে এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে মুষ্টিমেয় মুসলমানের হাতে বিশাল কুরাইশ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তাদের বাঘা বাঘা নেতাদের অধিকাংশই নিহত হয় এবং সত্তরজনের মতো বন্দী হয়।

এ ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, তুলনামূলকভাবে সহজ পথটি ধরে চলতে চায় মানুষ, কিন্তু রাসুলের সুন্নাহ হচ্ছে, বিপদ থেকে পালিয়ে বেড়িয়ে লাভ নেই, বরং বিপদ যত কঠিন আর দুরূহ হবে ততোই তাড়াতাড়ি তার মোকাবিলায় এগিয়ে যেতে হবে।

এটি শুধু রাসুলের সুন্নাহ নয়, আল্লাহও চান তাঁর প্রিয় বান্দারা যেন সহজ পথের পরিবর্তে ঝুঁকিপূর্ণ পথেই অগ্রসর হয়। সুরা আনফালে আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তোমাদের কাছে ওয়াদা করেছিলেন, দু'টি দলের মধ্যে একটি তোমরা পাবে। তোমরা চাচ্ছিলে দুর্বল দলটি তোমাদের হস্তগত হোক, কিন্তু আল্লাহ চাইলেন তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য রূপে প্রতিভাত করতে, কাফেরদের শিকড় কেটে দিতে ও বাতিলকে বাতিল বলে প্রমাণ করতে– পাপীদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন।'

আজকে আমরা যে সমস্যায় পড়েছি সেখানেও আমাদের জন্য দু'টো পথ খোলা রয়েছে। ইচ্ছে করলে হেকমতের কথা বলে আমরা চুপ করে যেতে পারি। তাতে এ আটজন মুজাহিদের জীবনই কেবল রক্ষা পাবে তা নয়, অভিযান পরিচালনা করলে এ

এলাকার মুসলমানদের ওপর যে বিপদ নেমে আসার সম্ভাবনা আছে তার থেকেও তারা রেহাই পাবে।

আবার আমরা ইচ্ছে করলে চূড়ান্ত আঘাত হেনে মেয়েদের উদ্ধার করার একটা প্রচেষ্টাও চালাতে পারি। ভাল করে ভেবে দেখুন কোন পথে আপনারা এগোবেন?' দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে থামলেন ইমাম সাহেব।

ওসমান বললো, 'আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দেখানো পথেই আমরা এগুবো। কোন রকম ঝুঁকিরই আমরা পরোয়া করি না। যদি বলেন, এ আত্মহত্যার ফয়সালা তবু আমরা পিছপা হবো না। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছ থেকেও আমরা এটাই শিখেছি, দুনিয়াতে ভীরু আর কাপুরুষের কোন জায়গা নেই। বরং যারা প্রতিদিন এমন করে একবার আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে পারে পৃথিবীতে বেঁচে থাকে শুধু তারাই।'

বারজেস বললেন, 'সে ক্ষেত্রে আমি বলবো, একটিমাত্র স্থানে আগুন লাগলেই কেবল মেয়েদেরকে উদ্ধারের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।'

'তাড়াতাড়ি বলুন!'

অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে ওসমান, 'কোথায় আগুন লাগাতে হবে? বলেন তো সমগ্র শহরে আগুন লাগিয়ে দেবো।'

বারজেস বললেন, 'সামরিক ঘোড়া কোথায় বাঁধা থাকে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। একই স্থানে রয়েছে ছয়শ' ঘোড়া। বাকিগুলো বিভিন্ন স্থানে। এর পাশেই রয়েছে সমপরিমাণ উট। আরেকটু এগিয়ে গেলেই দেখবে শুকনো ঘাস এবং খড়ের স্তূপ রয়েছে। তারও পরে সৈন্যদের তাঁবু। ওখানে ঘোড়া ছাড়াও রয়েছে যুদ্ধের সরঞ্জাম।

শুকনো ঘাস এবং খড়ের স্তূপে আগুন লাগার সাথে সাথেই সেগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। তবে ওতে আগুন লাগানো সোজা ব্যাপার নয়। পুরো এলাকা পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র সেন্ট্রি। রাতে ও পথে কেউ যেতে পারে না। তবে তোমরা যদি ঘাসের স্তূপে আগুন দিতে পারো আমি হলপ করে বলতে পারি, পৃথিবী ভুলে সম্রাটরা ওখানে ছুটে আসবেন। শুকনো ঘাস, যুদ্ধের সামান এবং কাপড়ের আগুন আকাশ পর্যন্ত উঠবে। আতংকিত হয়ে পড়বে শহরবাসী। আগুন লাগানোর সাথে সাথে ঘোড়ার রশি কেটে দিতে পারলে মহা প্রলয় ঘটিয়ে দেবে ঘোড়াগুলো। এখন কথা হলো, ওখানে কে যাবে আগুন লাগাতে, কে ঘোড়ার রশি কাটবে, ওখানে যাবেই বা কি করে?'

'মনে করুন আগুন লাগানো হলো।' একজন যুবকের প্রশ্ন, 'সম্রাটরা কক্ষ খালি করে ওখানে ছুটে গেলেন। তখন আমাদের করণীয় কি?'

'আমি তোমাদের সাথে থাকবো। আমাকে ছাড়া তোমরা ওখানে যেতে পারবে না। আমার যে দু'জন লোক ওখানে আছে ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবো মেয়ে দু'জন কোথায় আছে?'

তিনি আরো বললেন, 'কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে মেয়েদেরকে এনে লুকাবো কোথায়? তাছাড়া, এ অভিযান সফল হলে ক্রাকের মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাবে। খৃষ্টানরা নিশ্চিত ধরে নেবে মুসলমানরা ছাড়া আর কেউ এ কাজ করেনি। সে অবস্থায় আমাদের করণীয় কি তাও আমাদের ভেবে দেখা দরকার।'

'এখন মুসলমানরা কত শান্তিতে আছে!' আক্ষেপ মেশানো কণ্ঠে বললেন ইমাম সাহেব, 'আমার কথা হচ্ছে, এ কাজ আমরা করবো। ওদের বুঝিয়ে দিতে চাই মুসলমান অসহায় হলেও ওদের গোলাম নয়। ওদের আঘাত আমাদের কলিজায় বিদ্ধ হয়েছে।'

বারজেস ঝানু গোয়েন্দা হলেও নিয়মিত লড়াইয়ের ব্যাপারে তার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। তবু তিনি এ অভিযানের নেতৃত্ব নিলেন। কারণ, তিনিও মনে করছিলেন মুসলমানরা দুর্বল নয় একথা বুঝানোর জন্য এ অভিযানের যে প্রয়োজনীয়তার কথা যুবকরা বলছে, সে কথায় যুক্তি আছে।

কি করতে হবে তিনি সবাইকে বুঝাতে লাগলেন। দু'টি সমস্যা সামনে এলো। প্রথমতঃ আগুন লাগানো এবং দ্বিতীয়তঃ প্রমোদভবনে আক্রমণ করা।

বারজেস তাদের বললেন কিভাবে অভিযান করতে হবে। বললেন, 'এ অভিযানের সূত্রপাত ঘটাবে মেয়েরা। তারা সেখানে গিয়ে সেন্ট্রির কাছে কোন উর্ধতন সেনা কর্মকর্তার খোঁজ করবে। সুযোগ বুঝে গল্প জুড়ে দেবে সেন্ট্রির সাথে। তারপর কোন এক ফাঁকে তাকে হত্যা করতে হবে সেই মেয়েদেরই।

এই হত্যার কাজটা যদিও মেয়েদের জন্য কঠিন তবু এটা তাদেরই করতে হবে। কারণ, পুরুষরা সেখানে গেলে সেন্ট্রি অবশ্যই তাদের সন্দেহ করবে। সেন্ট্রিকে হত্যা করার পর তারা সেই খড়ের গাদার কাছে পৌঁছবে এবং সেখানে আগুন লাগাবে।'

এরপর আলোচনা হলো প্রাসাদে আক্রমণ ও মেয়েদের উদ্ধার করা নিয়ে। ইমাম সাহেব বললেন, 'এ কাজে বেশী লোক নেয়া ঠিক হবে না। এতে লোকের নজরে পড়ার যেমন ভয় আছে, তেমনি ধরা পড়ার আশংকাও রয়েছে।'

বারজেস এ প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন, 'এ কাজের জন্য বাছাইকরা নয়জন যুবক হলেই চলবে। আমি এর বেশীও চাই না, কমও নয়।

মেয়েদের প্রসঙ্গে ওসমান বললো, 'আমার ছোট বোন আল নূর অভিযানে অংশ নেবে।'

আরেক যুবক তার বোনের কথা বললো। অপর ছ'জনের কোন বোন নেই। সিদ্ধান্ত হলো, দুই বোন তাদের দুইজন বান্ধবীকে সঙ্গে নেবে। মেয়েদেরকে কাজ বুঝিয়ে দেবে ওসমান, বারজেস তার সঙ্গে থাকবেন।

আলোচনা শেষে ইমাম সাহেব বললেন, 'কামরা থেকে সবাই এক সাথে বেরোবে না। আগে বেরোবে যুবকরা, দু'জন এক সঙ্গে যেতে পারো।'

সেই ভাবেই জোড়ায় জোড়ায় বাইরে বেরিয়ে গেল ওরা। বারজেস বেরুলেন সবার শেষে। টুকরিটা মাথায় তুলে নিলেন তিনি। হাঁটতে লাগলেন মাথা নুইয়ে। ধীরে ধীরে। তাকে দেখে মনে হয় পৃথিবীর সকল দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে একটা লোক এগিয়ে যাচ্ছে।

ওসমান একাকী বাড়ীর পথ ধরলো। তার বাড়ী এখনো বেশ খানিকটা দূরে। হঠাৎই অন্ধকার ফুঁড়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো কেউ। ভয় পেয়ে দুপা পিছিয়ে গেল ওসমান। অন্ধকারে শোনা গেল কারো খিলখিল হাসির শব্দ। ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল ওসমানের পাশে। ওসমান দেখল একটি নারী মূর্তি।

ওসমান ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, 'কে?'

ছায়ামূর্তি ওসমানের আরো কাছে সরে এসে বললো, 'আমি।'

ওসমান তখনো তাকে চিনতে পারেনি। বললো, 'আমি কে?'

রিনি আলেকজান্ডার মুখের কাপড় সরিয়ে বললো, 'ওসমান, ভূত না, আমি রিনি।'

রিনি আলেকজান্ডার পাশের বাড়ীর সেই খৃষ্টান যুবতী যার সাথে আল নূরের বন্ধুত্ব। আশপাশের বাড়ীগুলোর চাইতে ওসমানদের বাড়ীতেই ওর যাতায়াত বেশী। যখন তখন হুটহাট চলে আসে।

ভাই বোন দু'জনের সাথেই রিনির খোলামেলা সম্পর্ক। বিশেষ কাজে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে ওসমান চাইছে, ও আর এ বাড়ীতে না আসুক। কিন্তু সরাসরি নিষেধ করে সন্দেহের পাত্র হতে চায় না বলে ইদানিং ওসমান তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে।

রিনি সব সময় ওসমানের সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করে। এতদিন এ নিয়ে ওসমানের মনে কোন প্রশ্ন দেখা দেয়নি। কিন্তু মুজাহিদের কাতারে যেদিন নাম লেখালো সেদিন থেকেই তার মনে ভয় ঢুকলো, মেয়েটা গোয়েন্দা নয়তো? কখনো তার মনে হতো, এ খৃষ্টান মেয়েটা তার নৈতিকতা নষ্ট করতে চাইছে নাতো? তার জাতীয় চেতনাবোধ বিনাশ করার জন্য কি একে তার পিছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে?

রিনিকে চিনতে পেরে মৃদু সৌজন্যের হাসি উপহার দিয়ে কিছু না বলেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইলো ওসমান। সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো রিনি। একজন খৃষ্টান যুবতীর সাথে কথা বলছে ওসমান, ধরা পড়লে শাস্তি পাবে, এমন কোন আশংকা নেই। বরং একজন সন্দেহভাজন মুসলিম যুবক এক যুবতীর ফাঁদে পা দিয়েছে ভেবে ইহুদী ও খৃষ্টানরা খুশীই হবে।

থেমে গেল ওসমান। বললো, 'আমার একটু তাড়া আছে রিনি।'

'তোমার কোন তাড়া নেই।' কলকলিয়ে উঠলো রিনির কণ্ঠ। 'এত সহজে আমাকে ছাড়াতে পারবে?'

'তোমাকে ছাড়ানোর কথা তো বলিনি!'

'মিথ্যে বলো না ওসমান।' রিনির কণ্ঠে অভিমানের সুর।

'এখন তোমাদের বাড়ী থেকেই আসছি। তোমার বোন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, 'তুমি আর এসো না। ভাইয়া রাগ করেন।' কেন ওসমান, এ কথা তো তুমিই আমাকে বলতে পারতে!'

ওসমান নিশ্চুপ। বোনটা খুব তাড়াহুড়া করেছে। কি জবাব দেবে তাই ভাবছে ওসমান। তাকে নীরব থাকতে দেখে রিনি বললো, 'বল তো, কেন তোমাদের বাড়ী যাবো না?'

এসব কথা বলার বা শোনার সময় ওসমানের হাতে নেই। তার হৃদয়ে ঝড় বইছে। এক অন্ধ আবেগ পিষে মারছে তার অন্তর। কি জবাব দেবে ভেবে পেলো না। হৃদয়ের সত্যি কথাটাই মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো।

'আমাদের বাড়ীতে আসতে কেন তোমায় নিষেধ করেছে জানি না। শোন রিনি, আমরা একজন আরেকজনকে যতোই ভালবাসি তবুও আমরা পরস্পর দুই শত্রু জাতির

অন্তর্ভুক্ত। তুমি ব্যক্তিগত ভালবাসার কথা বলবে। আমি বলবো জাতীয় চেতনার কথা। ক্রুশ এবং কোরআন কখনো এক হতে পারে না।

এটা আমার দেশ। তোমার জাতি এখানে কি করছে? তোমার জাতির শেষ ব্যক্তিটি যতোক্ষণ পর্যন্ত এখানে থাকবে আমাদের দু'জনের মধ্যে প্রেম তৈরী হতে পারে না। আমি আমার মনের কথাটাই তোমাকে বললাম।'

'তাহলে আমার হৃদয়ে কি আছে তাও শুনে নাও। আমার হৃদয়ে রয়েছে তোমার জন্য ভালবাসা। ক্রুশ বা কোরআন সে ভালবাসার অন্তরায় হতে পারবে না।

তোমাকে না দেখলে আমার ভাল লাগে না। তোমাকে হাসিখুশী দেখলে আমার মন আনন্দে ভরে উঠে। ওসমান, তোমাদের বাড়ীতে যেতে আমাকে নিষেধ করলে তা দু'জনের কারুর জন্যই ভাল হবে না।'

'ভয় দেখাচ্ছো? তা দেখাতেই পারো। কারণ তুমি যে শাসক জাতির মেয়ে।'

'আমার মনে শাসকের অহমিকা থাকলে এতোক্ষণে তুমি থাকতে জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। তুমি কি ভেবেছো তুমি কি করছো আমি কিছুই জানি না? বল তো তোমার গোপন তৎপরতার কথা বলে দিই আমি? আমার জাতি এবং দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য যে অস্ত্রসম্ভার তোমার ঘরের মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছো সে খবর কি তোমাকে বলবো? আল নূরকে তুমি সামরিক ট্রেনিং দিয়েছো। তোমার সঙ্গীদের অনেককেই আমি চিনি। তুমি জানো না ওসমান তোমার এবং জেলের মাঝে আমিই এখন একমাত্র বাঁধা হয়ে আছি।

তুমি জানো কে আমার পিতা। কতবার তিনি বলেছেন, 'ওসমানকে গ্রেফতার করা জরুরী হয়ে পড়েছে।' প্রতিবারই আমি অনুনয়-বিনয় করে বলেছি, 'ওসমানের বোন আমার বন্ধু। তা ছাড়া ওর পিতার একটা পা নেই।' আব্বা আমাকে শাসিয়ে বলেছেন, 'ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো। মুসলমানরা ভালবাসার পাত্র নয়।' আমি আমার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। এ জন্য তারা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছেন না। নইলে কবেই তুমি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঢুকে যেতে।'

রিনির কথা শুনে ওসমান পাথরের মতো জমে গেল। তার ঠোঁট দুটো যেন কেউ শক্ত আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে। সে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কিছুতেই ঠোঁট দুটো আলাদা করতে পারলো না।

রিনির চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রুর ফোটা পড়তে লাগলো। গলা বসে এলো তারও। আর কোন কথা না বলে সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ওসমান আবারও কথা বলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু এবারও তার গলা দিয়ে কোন স্বর বের হলো না।

সূর্য ডুবেছে অনেক আগে। জেঁকে বসে আছে রাতের আঁধার। পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দুই যুবক যুবতী। কারো মুখে কোন কথা নেই।

ওসমান বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর যখন সম্বিত ফিরে পেলো রিনিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। সে এক পা এগুতেই রিনি আবার তার সামনে এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

পলকে দু'জনের মাঝের সব ব্যবধান ঘুচে গেল। ওসমানের বুকের সাথে মিশে গেল রিনি। ওর দুটো হাত ওসমানের কোমর পেঁচিয়ে ধরলো। ওর শরীরের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়লো ওসমানের চারপাশে। দু'জনের নিঃশ্বাস মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ওসমানের গাল স্পর্শ করেছে রিনির রেশম কোমল চুল।

ওসমান মুক্ত হবার চেষ্টা করতেই রিনি ছেড়ে দিল তাকে।

'আমাকে মুক্তি দাও রিনি।' ওসমানের বিধ্বস্ত কণ্ঠ, 'আমায় পাথর হতে দাও। আমার আর তোমার পথ এক নয়। দু'জন কখনো একত্রে চলতে পারবো না। তোমার বাপ-মা যেমন এটা মেনে নেবে না তেমনি আমারও। আমরা নিরুপায় রিনি। আমাকে তুমি ক্ষমা করো, তোমার প্রেম-বন্ধন থেকে মুক্তি দাও আমায়।'

'ওসমান, এই কি তোমার মনের কথা? তুমি কি পারবে তোমার হৃদয়ের গোপন কুঠরীতে আমার যে ছবি আঁকা আছে তা মুছে ফেলতে? বলো, পারবে?'

'এ ছাড়া আমি আর কি করতে পারি রিনি! আবেগ দিয়ে তো জগত চলে না। বাস্তবতাকে অস্বীকার করবো সে শক্তি আমার কোথায়?'

'প্রেম উৎসর্গ চায়।' রিনির কণ্ঠে মাদকতা, 'বলো কি ত্যাগ চাও তুমি আমার কাছে?'

'এ মুহূর্তে তোমার কাছে আমার চাওয়ার কিছু নেই। শুধু চাই, আমাকে ভুলে যাও, ক্ষমা করো আমাকে।'

'অসম্ভব। তুমিই আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ মনের মানুষ। তোমাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে তুমি চাও বা না চাও, আমি কথা দিচ্ছি, আজ থেকে তোমার যা ইচ্ছে তুমি করে বেড়াও, এতে তোমার যে বিপদ আসবে সে বিপদ আমার। তোমাকে আমি কখনো গ্রেফতার হতে দেবো না।'

ওসমান গভীর হতাশা ছড়িয়ে বললো, 'আর বাস্তবতা আমাকে বলছে, ওসমান, এ মাদকতাময় দেহ আর রেশম কোমল চুলের ফাঁকে তুমি কোনদিন জড়াতে পারো না। এ অনুচিত, এ অসম্ভব। আর তাই আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, আমার মনে কি আছে তা তোমাকে কখনোই বলবো না। আর এটাও জেনে রাখো, প্রাণ গেলেও আমি এমন কোন যুবতীর প্রেমের ফাঁদে পা দিতে পারি না যে মেয়ে আমার জাতির শত্রুপক্ষের কন্যা।'

'ঠিক আছে ওসমান, তোমার প্রতিজ্ঞা তোমার কাছে জমা থাক। আমার ভালবাসার জন্য আমি কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারি আজ থেকে সে পরীক্ষাই আমি দিয়ে যাবো।' থামলো রিনি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'যাও ওসমান, তোমার খুব তাড়া। তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি বলে দুঃখিত। তবে তুমি চাও বা না চাও, তোমার বাড়ী আসা আমি কখনোই বন্ধ করবো না।'

পথ ছেড়ে দাঁড়ালো রিনি। দ্রুত পা চালালো ওসমান। তার অনেক সময় এরই মাঝে নষ্ট হয়ে গেছে। ওসমানের গমন পথের দিকে অনেকক্ষণ বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ওসমানের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেলে নিজেও বাড়ীর দিকে হাঁটা দিল রিনি।

ওসমান সালেম বাড়ীতে পৌছে দেখলো বারজেস বসে আছেন। অন্দরে ঢুকে পিতা-মাতা এবং আল নূরকে সব কথা খুলে বললো। বললো, 'আমাদের সাথে আল নূরকেও

যেতে হবে।'

ওসমানের পিতার একটা পা নেই। যৌবনে খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধে তিনি তার পা-টা হারিয়েছিলেন। তার দুঃখ ছিল আর কোন দিন জেহাদে যেতে পারবেন না বলে। সব শুনে তিনি ওসমানকে বললেন, 'তোমরা এক বিপজ্জনক অভিযানে যাচ্ছো। আমাকে যেন শুনতে না হয় তুমি বন্ধুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে গাদ্দারী করেছো নিজের ধর্ম ও জাতির সাথে। এ অভিযানে ধরা পড়ার ভয় সবচে' বেশী। তুমি ধরা পড়লে যদি তোমার সঙ্গীরা পালিয়ে আসতে পারে তবে জীবন দেবে কিন্তু সঙ্গীদের নাম বলবে না। আমি সুলতান আইয়ুবীর সেনাবাহিনীর জন্য তোমাকে বড় করছিলাম। ভাবছিলাম, আল নূরের বিয়ের কাজটা সমাধা করে তোমাকেও বিদায় করবো। যাও। আমার হৃদয় শান্ত করো। আবারো বলছি, শোন, কেউ যেন আমাকে বলতে না পারে, ওসমানের দেহে সালেমের রক্ত নেই।'

সালেম আল নূরকেও এ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য সানন্দে অনুমতি দিলেন।

ওসমান বললো, 'বারজেস বৈঠকখানায় রয়েছেন। এ অভিযানের নেতৃত্ব তিনি দেবেন।'

ওসমানের পিতা আনন্দের আতিশয্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সালেম বারজেসের কাছে চলে এলেন। তাকে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুক। এই সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'আল নূর!' ওসমান বললো, 'এ অভিযানে যেতে পারে তোমার এমন দু'জন বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এসো।'

বেরিয়ে গেল আল নূর। খানিক পর ফিরলো দু'জন বান্ধবীকে নিয়ে। ততোক্ষণে ওসমানের সঙ্গীর বোনও এসে গেছে। এরপর একজন একজন করে এসে পৌঁছলো সাত যুবক।

কোন পথে যেতে হবে মেয়েদেরকে বুঝিয়ে বললেন বারজেস। বললেন, 'পথে সেন্ট্রি তোমাদেরকে বাঁধা দেবে। তখন তোমরা সেন্ট্রিকে উপরে যাবার পথ জিজ্ঞেস করে বলবে, 'সম্রাট রিমাণ্ড ডেকে পাঠিয়েছেন।'

সেন্ট্রি বলবে, 'এটা সম্রাট রিমাণ্ডের কাছে যাবার পথ নয়।' তোমরা বলবে, 'তাহলে কোন দিকে?' এভাবে তার সাথে আলাপ জমিয়ে তাকে ঘিরে ফেলবে।

চারজনের একজন থাকবে চাকরাণী। মাথায় রেশমী রুমালে ঢাকা থাকবে একটি ঝাঁকা। ঝাঁকায় থাকবে জ্বালানী। সেন্ট্রিকে ঘিরে ফেলার পর এক ফাঁকে তাকে মেরে ফেলতে হবে। আগুন লাগাবে তারপর।

ওখানে তোমরা দেখতে পাবে, অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ে বাঁধা রশি একত্রিত করে একটা খুঁটির সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। ঐ রশি কেটে দিতে হবে। রশি কাটার পর কয়েকটা ঘোড়াকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করবে। এরপর সুযোগ পেলে উটের রশিও কেটে দেবে।'

বারজেস মেয়েদের পোশাক পাল্টে দিলেন। একজনকে চাকরাণী সাজিয়ে তার হাতে

মুখে ছাই মেখে দিলেন যাতে তাকে আসলেই চাকরাণী মনে হয়। এরপর বারজেস ওসমান এবং তার সঙ্গীদের সাথে কথা বললেন। তাদেরকে অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিলেন।

প্রত্যেককে একটি করে খঞ্জর দেয়া হলো। প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো।

অনেক সময় কেটে গেছে। ওসমানের সঙ্গীরা ছটফট করতে লাগলো। বারজেস বললেন, 'এখনো শহর জেগে আছে। শহর ঘুমুলেই কেবল জেগে উঠে প্রাসাদের পানশালা।'

রাত আরেকটু গভীর হলো। কমে এলো শহরের কোলাহল। এক সময় বারজেস বললেন, 'এবার উঠা যায়।'

একজন একজন করে বেরিয়ে পড়লো সবাই। ছেলে এবং মেয়েদের পথ ভিন্ন। ওরা যে যার পথে পা বাড়ালো। আগুন লাগানোর জন্য মেয়েদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দেয়া হলো। সে মুহূর্তে ওসমানরা থাকবে প্রাসাদের কাছে।

বিপজ্জনক অভিযান। সামান্য ভুল বা সময়ের ঈষৎ হেরফের হলেই অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবে। ওদের ভাগ্যে ঘটবে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। মেয়েদের কাজ ছিল আরো বিপজ্জনক। ধরা পড়লে ওদের কি অবস্থা হবে কল্পনাও করা যায় না।

আল নূর বললো, 'ধরা পড়লে আমরা আত্মহত্যা করবো। জীবিত থেকে কিছুতেই বেঈমানদের ভোগের সামগ্রী হবো না।'

সমগ্র শহরে নীরবতা নেমে এলো। কোন বাড়ীতে আলো নেই। সুনসান সড়ক। কেবলমাত্র সম্মিলিত সামরিক হেডকোয়ার্টারে এখনো আলো জ্বলছে। পানশালায় হাজির হয়েছেন খৃষ্টান সম্রাটরা। জমে উঠলো পানশালা। আজকের আলোচনার বিষয় অপহৃত দু'জন মুসলিম যুবতী এবং লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ। একজন প্রশ্ন করলো, 'মেয়ে দুটো কি কাজে আসবে?'

জবাবে একজন সেনা কমান্ডার বললো, 'মেয়েরা বুদ্ধিমতি এবং প্রাপ্তবয়স্কা। একজনের বয়স ষোল, দ্বিতীয় জনের বাইশ। ওদেরকে দিয়ে গুপ্তচরের কাজ করানো যাবে না। কিছুদিন আনন্দ উপভোগে ব্যবহার করা যায়।'

'এরপর কোন সেনা অফিসারের হাতে তুলে দিলেই হবে।' অন্য সেনাপতি বললেন। 'অফিসাররা তাদের বিয়ে করে নেবে।'

মেয়েদের নিয়ে অশ্লীল আলোচনা চললো দীর্ঘক্ষণ। ওরা তখন ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে। দু'জন মধ্য বয়েসী মহিলা ওদের গোসল করিয়েছে। মহিলা দু'জন এ বিষয়ে পারদর্শিনী। ওরা মেয়েদের কাপড় পরাচ্ছিল।

সকাল থেকে ওরা কিছুই মুখে তোলেনি। শুধু কাঁদছে। তাদের এমন খাবার দেয়া হয়েছে যা তারা কোনদিন দেখেনি। কিন্তু ওরা সে খাবার ছুঁয়েও দেখেনি। কে কোথায় আছে দু'জনের কেউই জানে না।

মহিলারা ওদেরকে এক স্বপ্নীল জগতের লোভ দেখাচ্ছিল। একজন বললো, 'ফ্রান্সের সম্রাট তোমাকে পছন্দ করেছেন। তুমি হবে ফ্রান্সের রাণী।' অন্যজন বলছে, 'তোমাকে

জার্মানীর রাজার মনে ধরেছে। কি সৌভাগ্য তোমার।'

কখনো আবার মিষ্টি করে ধমকাচ্ছিল, 'সম্রাটদেরকে নাখোশ করলে তোমাদেরকে সৈন্যদের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

মেয়ে দু'জন মরুচারী বেদুইন। ওরা ভীরু তাও নয়। কিন্তু অসহায়। নিজেকে রক্ষা করার শক্তিও নেই।

পিতামাতা ওদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই খৃষ্টান এলাকা থেকে হিজরত করছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের, শেষ পর্যন্ত খৃষ্টানদের হাতেই ধরা পড়তে হলো। পিতামাতা নিহত। ভাইটা বন্দী। এখন আল্লাহ ছাড়া ওদের সাহায্য করার আর কেউ নেই।

নিজেদের সম্ভ্রম ছাড়াও ভাইয়ের জন্য ওরা ছিল উদ্বিগ্ন। আশফাক তখন বেগার ক্যাম্পে কাৎরাচ্ছে। আহত ভাইটিকে পশুরা অনেক পিটিয়েছে।

সন্ধ্যায় ডিউটি শেষে বেগার ক্যাম্পে ঢুকেছে বন্দীরা। ওরা নতুন বন্দীদের দেখলো। শুনলো ওদের ধরা পড়ার কাহিনী। পনেরো জনের মধ্যে আশফাকই বেশী আহত।

লুকিয়ে রাখা ওষুধ দিয়ে বন্দীরা ওর ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

ব্যান্ডেজ বাঁধার পর আশফাক অনেকটা আরাম বোধ করলো। ক্ষতস্থানে এখন আর ব্যথা অনুভব করছে না সে। বোনদের কথা ওর বার বার মনে পড়ছে। বন্দীদের জিজ্ঞেস করলো, 'তার বোনেরা এখন কোথায়? এখান থেকে কিভাবে পালানো যায়?'

বোনেরা এখন কোথায় এবং তাদের সাথে কি ব্যবহার করা হচ্ছে বন্দীরা শোনালো তাকে সে খবর।

বললো, 'এখানে কোন প্রাচীর নেই। কারো পায়ে শিকলও পরানো হয়নি। তবুও পালানো সম্ভব নয়। পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? ধরা পড়তেই হবে। আর ধরা পড়লে মৃত্যু অবধারিত।'

কোন কোন বন্দী কয়েক বছর থেকেই এখানে আছে। পালিয়ে গেলে পরিবারের উপর নেমে আসবে অকথ্য নির্যাতন। এ জন্যই বন্দীরা পালাচ্ছে না। তবুও আশফাকের মনে বোনদের মুক্ত করার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। যদিও তার এখন চলার শক্তিও নেই।

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়েছে বন্দীরা। জেগে আছে শুধু আশফাক। ওর দু'চোখে ঘুম নেই। অসহায় বোনদের নানা বর্ণের ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে চোখের সামনে।

'মেয়েরা না আবার ধরা পড়লো!' ফিসফিসিয়ে বললো ওসমান।

'এমন অলক্ষুণে কথা বলো না।' বললেন বারজেস, 'আল্লাহকে স্মরণ করো। এখন আমরা মৃত্যুর মুখে আছি। মন থেকে সব ভয় দূর করে ওখানে খোদাকে বসাও। তোমার বন্ধুরা কি নির্ভরযোগ্য?'

'ওদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। আমি ওদের নিয়ে ভাবছি না। মেয়েদের নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।'

'আল্লাহর সাহায্য চাও। আমরা চুরি করতে আসিনি। অবশ্যই তিনি সাহায্য করবেন।'

সেনা হেডকোয়ার্টারের পাশে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ওরা। দৃষ্টি প্রাসাদের দিকে। কোন্ সংকেতে কি কাজ করতে হবে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বারজেস। ওসমানের মনে ঘুরে ফিরে উদয় হচ্ছিল চারজন তরুণীর কথা। মেয়েরা গিয়েছে অনেক আগে। এতোক্ষণে আগুন লাগানোর কাজ শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

ওদের অভিযান সফল হলে অগ্নিশিখা এখান থেকেও দেখা যাবে। প্রাসাদের সবাই তখন ছুটে যাবে আগুনের কাছে। কথা ছিল ওরা চলে গেলেই যুবকরা প্রাসাদে ঢুকবে। কিন্তু আগুনের কোন শিখা এখনো দেখা যাচ্ছে না। তবে কি সেন্ট্রি ওদের যেতে দেয়নি। ধরে রেখেছে না ফিরিয়ে দিয়েছে কে জানে।

মেয়েরা এখনো সেন্ট্রিকে পায়নি। নির্দিষ্ট স্থানে নেই সেন্ট্রি। সেন্ট্রির এই না থাকাটা বিপদের লক্ষণ। তাকে জীবিত রেখে আগুন লাগাতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশী।

ওরা সেন্ট্রিকে খুঁজতে লেগে গেল। খড়ের পালান অতিক্রম করছিল ওরা। অন্ধকারে সৈন্যদের তাঁবু নজরে আসছে না। একত্রে হাঁটছে চারজন।

সামনে একটা মশাল দেখা যাচ্ছে। মাটিতে পুতে রাখা হয়েছে মশালটি। মশালের দিকে এগুলো ওরা। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো সেন্ট্রি। মশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো মেয়েদের দিকে।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েরা। মশাল হাতে সেন্ট্রি মেয়েদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওদের ঝলমলে পোষাক দেখে ইতস্ততঃ করলো একটু। তাকিয়ে দেখলো একজন চাকরাণীর মাথায় কাপড়ে ঢাকা একটা ঝাঁকা।

'আপনারা কে? কোথায় যাচ্ছেন?' প্রশ্ন করলো সেন্ট্রি।

'সম্ভবত ভুল পথে এসেছি।'

বান্ধবীদের দিকে তাকিয়ে খিলখিলিয়ে উঠলো আল নূর। 'শাহ রিমাণ্ডকে কথা দিয়েছিলাম রাতে আসবো। একটু দেরী হয়ে গেছে। সামনে তো মনে হয় উট-ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে।'

সেন্ট্রিকে ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্য রিমাণ্ডের নাম উচ্চারণই যথেষ্ট ছিল। খৃষ্টান সম্রাটরা কি চরিত্রের জানতো সেন্ট্রি। হয়ত আনন্দ-স্ফুর্তি করার জন্য এদের ডেকে এনেছে, ভাবল সেন্ট্রি।

মেয়েদের পোষাক আশাক এবং কথা বলার ঢং দেখে সেন্ট্রি নিশ্চিত, রিমাণ্ডই এদেরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সে ওদেরকে পথ বলে দিতে লাগলো। কথা বলার ফাঁকে একজন যুবতী সেন্ট্রির পেছনে চলে এলো। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে পিঠে খঞ্জর ঢুকিয়ে দিল।

মশালটি পড়ে গেল সেন্ট্রির হাত থেকে। আল নূর পায়ে পিষে নিভিয়ে ফেললো মশাল। অন্য মেয়েরাও পড়ে থাকা সেন্ট্রির গায়ে পরপর কয়েকটি আঘাত করলো। চিৎকার করারও সময় পেল না সেন্ট্রি। তার আগেই মারা গেছে।

চাকরাণী বেশী যুবতী মাথা থেকে ঝাঁকা নামালো। চট জলদি খড়ের পালান এবং ঘাসের স্তুপে জ্বালানী ছড়িয়ে দিল। এরপর একে একে সব কটা স্তুপে আগুন ধরিয়ে দিল।

জ্বলে উঠলো শুকনো ঘাস।

এবার নজরে পড়লো তাঁবুর সারি। সৈন্যদের রসদ এবং পোযাক। একদিকে হাজার হাজার টাঙ্গা। ওরা তাঁবু এবং টাঙ্গায় জ্বালানী ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘাসের স্তুপ থেকে অগ্নিশিখা লকলকিয়ে আকাশ ছুঁইছে।

ঘোড়ার দিকে ছুটলো মেয়েরা। সৈন্যরা এখনো জাগেনি। খঞ্জর দিয়ে ঘোড়ার রশি কাটতে লাগলো ওরা। একেকটা রশিতে পঞ্চাশটা করে ঘোড়া বাঁধা। দু'জন ঘোড়ার রশি কাটা বাদ দিয়ে বাঁধা ঘোড়াগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কয়েকটা ঘোড়াকে পর পর খঞ্জর দিয়ে আঘাত করলো ওরা। হ্রেষা শব্দ তুলে ছুটতে লাগলো আতংকিত ঘোড়াগুলো।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে উটগুলো নিশ্চিন্তে জাবর কাটছিল। ওদের পায়ের রশিও কেটে দিল মেয়েরা। উট, ঘোড়া ছুটছে। পালাচ্ছে। আতংকে চিৎকার করছে। মেয়েরা ওদের ছুটোছুটির ভেতর পড়ে গেল। ছুটন্ত উট ও ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি ও খুরের শব্দে জেগে উঠলো সৈন্যরা।

অপহৃত দুই যুবতীকে কনের সাজে সাজানো হয়েছে। দুই কক্ষে একই সময় প্রবেশ করলো দু'জন লোক, দুটি খৃষ্টান রাজ্যের সম্রাট। মদে মাতাল।

চাকরাণীরা বেরিয়ে গেল। সম্রাটরা এগিয়ে গেল মেয়েদের দিকে। সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য কক্ষের এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো মেয়েরা। আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের রক্ষা করতে পারে না। একজন হাটু গেড়ে বসে পড়লো। হাত উপরে তুলে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে লাগলো। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন খৃষ্টান সম্রাট। পা বাড়লেন যুবতীর দিকে।

এ সময় হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে এলো সৈনিকদের ডাক-চিৎকারের শব্দ। যেন প্রাসাদে ডাকাত পড়েছে। বিরক্তিতে কুঞ্চিত হলো সম্রাটের কপাল। শোরগোলের অস্বাভাবিক শব্দে মেয়েদের দিকে এগোনো বন্ধ করে দরজা খুলে বাইরে তাকালেন সম্রাট। দেখলেন, আলোয় ভরে গেছে পুরো প্রাঙ্গণ। তার মনে হলো সমগ্র শহরে আগুন লেগে গেছে। দেখলেন, আতংকিত ও ছুটন্ত উট ও ঘোড়ার কয়েকটি প্রাসাদেও এসে ঢুকে পড়েছে।

নেশা ছুটে গেল সম্রাটের। দ্বিতীয়জনও বেরিয়ে এলেন। কয়েকজন লোক ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, 'ঘাস, তাঁবু এবং গাড়ীতে আগুন লেগেছে। ছুটন্ত পশুর পদতলে পিষে যাচ্ছে সৈন্যরা।'

সমগ্র শহর পুড়ে গেলেও সম্রাটরা এত চিন্তা করতেন না। কিন্তু জ্বলছে ফৌজি রসদ, সৈনিকদের পোষাক আশাক, শত শত টাঙ্গা। যুদ্ধের বাহন হাজার হাজার উট, ঘোড়া পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রাসাদের সবাই ছুটে বেরিয়ে গেল। দেখতে দেখতে জনশূন্য হয়ে গেল প্রাসাদ। প্রাসাদের চারপাশের সমগ্র প্রহরীরাও ছুটে গেছে আগুন লাগার স্থানে। বারজেস যুবকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রাসাদে ঢুকার এই সুযোগ, চলো।'

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো যুবকরা। ছুটে প্রাসাদে ঢুকে গেল আট জন

যুবক। বারান্দায় উঠেই দুই সঙ্গীর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন বারজেস। চাকর-বাকরদের মধ্যে পাওয়া গেল একজনকে। বারজেস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজকের অপহৃত মেয়ে দুটো কোথায়?'

ও ইশারায় কক্ষের একটা সারি দেখিয়ে দিল। বললো, 'এ সারিরই কোন ঘরে আছে ওরা।'

দৌড়ে কক্ষগুলোর দিকে এগোলো সবাই। প্রাসাদে কোন দায়িত্ববান পুরুষ নেই। ভালোই হয়েছে ওদের জন্য।

করিডোরে কয়েকজন অর্ধ উলংগ মেয়ে পাওয়া গেল। ওরা ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। পর পর কয়েকটা মেয়েকে থামিয়ে আজকের অপহৃত মেয়েদের সম্পর্কে যুবকরা ওদের কাছে জানতে চাইল। কিন্তু মেয়ে দুটো কোথায় আছে ওরা জানে না।

কয়েকটা কক্ষে খোঁজ করার পর একজনকে পাওয়া গেল এক রুমের ভেতর। মেয়েটি রুমের মাঝখানে বিহবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওসমান এবং তার সঙ্গীরা মেয়েটাকে দেখেই চিনতে পারলো। কারণ দিনের বেলা ওদের নিয়ে আসার সময় যুবকরা মেয়ে দুটোকে দেখেছিল।

মুখোশধারী আট-দশজন লোক দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো মেয়েটা। বারজেস বললেন, 'ভয় পেয়ো না, চিৎকার থামাও, আমরা মুসলমান। তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছি।'

কিন্তু মেয়েটা ওদের বিশ্বাস করলো না। সে রুমের একদিকে সরে গেল। বারজেস ওকে বললেন, 'বাঁচতে চাইলে এখুনি পালাতে হবে। জলদি এসো।'

ওরা দরজার দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু মেয়েটা তার জায়গা থেকে নড়লো না। ওরা আবার ডাকলো ওকে। কিন্তু মেয়েটা তাও সাড়া দিল না। বারজেস যুবকদের বললেন, 'এখানে সময় নষ্ট করা যাবে না। ওকে ধরে নিয়ে এসো।'

যুবকরা ওকে ধরতে গেল। কিন্তু মেয়েটি সরে গেল সেখান থেকে। যুবকরা আবার এগোলো, এবারও সরে গেল সে, কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। বারজেস বললেন, 'জলদি, তাড়াতাড়ি করো।'

শেষে আরো দু'জন যুবক এগিয়ে গিয়ে জোর করে ওকে তুলে নিল। আরো কয়েকটি কক্ষ পার হওয়ার পর পাওয়া গেল দ্বিতীয়জনকে। ওসমানরা তাকেও জোর করে তুলে নিল।

মেয়েরা হাত-পা ছুঁড়ছিল আর চিৎকার করছিল, 'ছাড়ো, ছাড়ো আমাদের।'

বারজেস ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'পাজী মেয়ে, বলছি না আমরা মুসলমান। তোমাদের চিৎকার শুনে খৃষ্টানরা এসে পড়লে আমরা সবাই মারা পড়বো। আল্লাহরওয়াস্তে চুপ করো, একটু শান্ত হও।'

'আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?' চিৎকার করতে করতেই বললো একটি মেয়ে।

'আপাততঃ শহরে কোন মুসলমানের বাড়ীতে লুকিয়ে রাখবো। তারপর সুযোগ বুঝে শহর থেকে বের করে যেখানে যেতে চাও পাঠিয়ে দেবো।'

বারজেসেরে কথায় শান্ত হলো মেয়ে দু'জন। মুখোশধারী দলটি বেরিয়ে এলো

প্রাসাদ থেকে। আশপাশ বা সদর দরজা কোথাও কোন খৃষ্টান সৈন্যের দেখা পেলো না ওরা। সবাই এখনো আগুনের কাছে। বিনা বাঁধায় মেয়ে দু'জনকে নিয়ে প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে এলো আট যুবক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সামনের রাস্তা পেরিয়ে ওরা একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

যুবকরা খুশী, কোন রকম লড়াই ছাড়াই, রক্তপাত ছাড়াই ওদের অভিযান সফল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছে দুই মুসলিম যুবতী।

মেয়েরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, যাক, আল্লাহ তাদের আবেদন কবুল করেছেন। খৃষ্টানদের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন তাদের জীবন ও সম্ভ্রম।

আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ ছুঁইছিল। আগুনে জ্বলছিল সেনাবাহিনীর সমস্ত রসদ-সামান। শহরের অলিগলি আর রাস্তায় ছুটছিল লাগামহীন ঘোড়া।

জেগে উঠেছে শহরবাসী। সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে অজানা আতঙ্ক। কি ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারছে না তারা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পথে পথে উট-ঘোড়ার ছুটাছুটি দেখে দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে রইলো মানুষ। কি ঘটেছে দেখার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে সাহস পেলো না কেউ।

উট ও ঘোড়ার লাফালাফি না থাকলে আগুন নেভানোর জন্য হয়তো বেরিয়ে আসতো লোকজন। কিন্তু একদিকে সেনা সদরে আগুন ও অন্য দিকে রাস্তায় রাস্তায় উট, ঘোড়ার দাপাদাপি দেখে লোকজন ভাবলো, তবে কি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী শহর আক্রমণ করেছেন?

এ ভাবনা মনে আসতেই খৃষ্টান পরিবারগুলো ভীত বিহবল হয়ে পড়লো। কেউ কেউ পালিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো।

আইয়ুবীর গোয়েন্দারা এ সুযোগ হাতছাড়া করলো না। তারা বিভিন্ন গলি ও মহল্লায় ছুটাছুটি শুরু করে দিল। লোকজন বাড়ীর গেট দিয়ে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, 'কি হয়েছে ভাই?'

'আইয়ুবীর বাহিনী শহরে আক্রমণ করেছে। ওরা খৃষ্টান বাহিনীর রসদপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে। উট, ঘোড়া সব ছেড়ে দিয়েছে। খৃষ্টান সৈন্যরা এখন শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। আমরাও পালিয়ে যাচ্ছি।'

মুহূর্তে সারা শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়লো, 'মুসলিম বাহিনী ক্রাক আক্রমণ করেছে। আগুন লাগিয়ে দিয়েছে শহরে।' এ গুজব মুসলমানদের সাহস বাড়িয়ে দিল। ইহুদী ও খৃষ্টানরা আতংকিত হয়ে পড়লো ভীষণভাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তায় নেমে এলো ভীত সন্ত্রস্ত লোকজন। ভয়ে পালাতে শুরু করলো ইহুদী ও খৃষ্টান পরিবারগুলো।

খৃষ্টান সম্রাট এবং সেনা কমাণ্ডাররা আগুন লাগার স্থানে গেলেন। কোন জন মানুষের চিহ্নও নেই সেখানে। তারা ভাবলো, মুসলিম ফৌজ হয়তো সিঁড়ি লাগিয়ে পাঁচিল টপকে ভেতরে চলে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর একটা অংশকে তারা শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিল। দ্বিতীয়

অংশ প্রস্তুত হয়ে বসে রইলো আইয়ুবীর বাহিনীর সাথে মোকাবিলার জন্য। কমাণ্ডার কয়েকজন সৈনিককে শহরের প্রাচীরের ওপর তুলে দিল। ভয়ে ভয়ে তারা তাকালো বাইরের দিকে।

বাইরে সুনসান নীরবতা। কোথাও কোন সৈনিকের নড়াচড়া চোখে পড়লো না ওদের। আইয়ুবীর আক্রমণের চিহ্নমাত্র নেই বাইরে।

খৃস্টান সৈন্যদের বাইরে যাবার জন্য দুর্গের পেছনের দরজা খুলে দেয়া হলো। রাতে কখনো এ ফটক খোলা হয় না। শহরের বাইরে গিয়ে সুলতান আইয়ুবীর আক্রমণ ঠেকানোর জন্য এসব সৈন্যদেরকে বাইরে পাঠানো হচ্ছে।

তারা ধারণা করলো, ভেতরে হয়তো আইয়ুবীর দু'একটা আত্মোৎসর্গকারী গ্রুপ ঢুকে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। এতে সৈনিকদের ভয় কিছুটা দূর হলো। সাহসে ভর করে অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল, আইয়ুবীকে তারা কিছুতেই দুর্গের কাছেও ঘেঁষতে দেবে না।

আতংকের মধ্যে ফটক খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। অমুসলিম পরিবারগুলো পেছনের ফটক খোলা দেখে এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগলো সেদিকে। দুর্গ থেকে বের হচ্ছিল সেনাবাহিনী। কিন্তু জনতার ভিড় তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। শহরের শান্তি শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষে পলায়নপর এসব লোকদের প্রচণ্ড ভিড় সামলানো কঠিন হয়ে পড়লো।

আগুন প্রসারিত হচ্ছে। খড়ের গাদা থেকে এসে আগুন লাগলো তাঁবুর সারিতে। সেখান থেকে সৈনিকদের মূল ব্যারাক, কিচেন, আস্তাবল আশপাশের সব কিছু গ্রাস করছে। অবিলম্বে এ আগুন নেভানো দরকার। নইলে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়বে আগুন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল পানির স্বল্পতা নিয়ে। শহরে কোন পুকুর নেই, আশপাশে নদীও নেই। শহরে লোকজন পাত কুয়ার পানি ব্যবহার করে। সব বাড়ীতে হাউজও নেই। কোত্থেকে কে পানি আনবে?

লোকজন যারা পালাচ্ছে তো পালাচ্ছেই, বাকীরা দরজা বন্ধ করে বাড়ীতে অবস্থান করতে লাগলো।

আগুন নেভানোর জন্য সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু আইয়ুবীর আক্রমণের ভয়ে সবাইকে এ কাজে লাগানো সম্ভব হলো না। সেনাবাহিনীর মুষ্টিমেয় সদস্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও আগুন আয়ত্বে আনতে পারছিল না। এ অবস্থা দেখে একজন সেনা কমাণ্ডার বললেন, 'বেগার ক্যাম্পের মুসলিম বন্দীদের দিয়ে পানি টানানো যায়।'

সাথে সাথে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হলো, 'আগুন নেভাতে পারলে কাল ভোরেই বন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে।'

বাইরের ডাক চিৎকারে জেগে উঠেছিল বন্দীরা। প্রহরী ওদেরকে সরকারী ঘোষণা শোনালো। বললো, 'সরকার ঘোষণা করেছে, আগুন নিভালে কাল সকালে সবাইকে মুক্তি দেয়া হবে।'

আশফাক একজন সঙ্গী বন্দীকে বললো, 'খৃস্টানদের গোটা দেশ পুড়ে গেলেও আমি আগুন নেভাতে যাবো না।'

'পাগলামী করো না আশফাক। ওরা বলছে আগুন নেভাতে পারলে কাল ভোরে মুক্তি

দেবে।' আশফাককে বুঝাতে চাইলো সেই বন্দী।

'ওরা মিথ্যাবাদী, ওরা আমাদের সাথে প্রতারণা করছে। আমি এখনি পালাবো, তুমিও আমার সাথে চলো। পানি দেয়ার ফাঁকে সুযোগ বুঝে ওখান থেকেই আমাদের পালাতে হবে, নইলে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না।'

'আমরা যেতে পারছি না। এরা আমাদের বাড়ীঘর চেনে। তোমার তো সে সমস্যা নেই, তুমি যাও।'

'কিন্তু পালিয়ে আমি যাবো কোথায়?'

বন্দীটি তার নিজের বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে আশফাককে বললো, 'পরিবেশ বুঝে আমাদের বাড়ী চলে যেতে পারো। মুক্তি পেলে আমিও ওখানেই উঠবো। কিন্তু সেখানে বেশী দিন থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। ধরা পড়লে ওরা যে কেবল তোমাকেই শাস্তি দেবে তা নয়, আমাদের পরিবারেরও কাউকে রেহাই দেবে না। তবু তুমি এসো, কতদূর কি করা যায় আমি দেখবো।'

বন্দীদেরকে বিভিন্ন কুয়া থেকে পানি টানার কাজে লাগানো হলো। সৈন্যরা পানি তুলে দিচ্ছে। বন্দীরা সে পানি এনে আগুনে ঢালছে।

কিছুক্ষণ বন্দীদের সাথে প্রহরী ছিল। কিন্তু একটু পরেই সৈন্য আর বন্দীরা সব একাকার হয়ে গেল। কমাণ্ডার দ্রুত কাজ করার জন্য সমানে সৈন্যদের গালিগালাজ করছিল।

হঠাৎ একদিক থেকে ছুটে এলো একপাল ঘোড়া। লোকজন এদিক ওদিক সরে গেল। ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেল কয়েকজন। আশফাক সঙ্গী বন্দীকে বললো, 'এই সুযোগ, চলো পালিয়ে যাই।'

সুযোগ পেয়ে বন্দীটিও আশফাকের সাথে সটকে পড়লো।

আইয়ুবীর ফৌজ দুর্গে ঢুকেছে এ কথা ভেবে মুসলমানরা বেজায় খুশী। তারা বাড়ীঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলো।

বেগার ক্যাম্পের বন্দী লোকটি আশফাককে নিয়ে তাদের বাড়ীতে ঢুকল। বন্দীর বাড়ীর সবাই জেগেই ছিল, বন্দীকে দেখে খুশীতে আবেগে জড়িয়ে ধরলো।

বন্দী লোকটি আশফাককে পরিবারের লোকজনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, 'ওকে লুকিয়ে রাখুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে শহর থেকে বের করে দেবেন। খৃষ্টানরা বলেছে, কাল আমাদেরকে ছেড়ে দেবে। ওকে এখনো কেউ চেনে না। আমি এখন যাই, থেকে গেলে হয়তো কখনো ছাড়া পাবো না।'

'মুসলিম ফৌজ কি দুর্গে প্রবেশ করেছে?' বন্দীর পিতা জিজ্ঞেস করলেন।

'জানি না। আগুনের অবস্থা ভয়াবহ। কখন যে নিভে ঠিক নেই।'

'আমাদের সৈন্যরা ভেতরে ঢুকে থাকলে ওকে লুকিয়ে রাখার ঝুঁকি নিতে পারি।'

'আগামীকাল ও নিজেই এখান থেকে চলে যাবে।'

'কিছুক্ষণ পূর্বে তোমার ছোট ভাই দু'জন মুসলমান মেয়েকে নিয়ে এসেছে। সালেমের ছেলে ওসমান প্রাসাদ থেকে ওদের উদ্ধার করে এনেছে।'

'ওদের পরিচয় কি?'

'গতকাল খৃষ্টান সৈন্যরা একটি মুসলিম কাফেলা লুট করেছিল। মেয়ে দুটো সে কাফেলায় ছিল। ওদের ভাইকেও না কি বন্দী করেছে খৃষ্টান সৈন্যরা।'

চমকে উঠলো আশফাক।

'মেয়ে দু'জন এখন কোথায়?' উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলো আশফাক।

'ভেতরেই আছে।' জবাব দিল বন্দীর পিতা।

একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর যুবতীদের কানে এলো। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল ওরা। অপরিচিত এক যুবকের সাথে আশফাককে সামনের ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবকিছু ভুলে ছুটে এলো দু'বোন। ছোট ভাইকে জড়িয়ে ধরলো বুকের সাথে।

তিনজনের চোখেই বইছে আনন্দের অশ্রু। পিতামাতা হারিয়ে বন্দী হয়েছিল ওরা। সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না দুনিয়ায়। ফরিয়াদ জানিয়েছিল খোদার কাছে। আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। অলৌকিক প্রাপ্তির আনন্দে কাঁদছে ওরা। বন্দী যুবকটি কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে এ আবেগময় দৃশ্য দেখে আশফাককে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো, 'তুমি থাকো, আমি যাচ্ছি।'

মেয়েদেরকে রেখে ওসমান এবং বন্দীর ছোট ভাই আবার বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু বন্দীর আর অপেক্ষা করার সময় ছিল না। ফলে বন্দী যুবকটি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বন্দী বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ ওসমান এসে ঘরে ঢুকলো। সাথে বারজেস এবং তার বন্ধুরা। ঘরে ঢুকেই বারজেস যুবতীদের ডেকে বললো, "শীঘ্র তৈরী হয়ে নাও। শহর থেকে বের হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখুনি আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাবো।"

ওসমান ও তার সঙ্গীরা আশফাককে দেখেই চিনতে পারলো। এ ছেলেটিই চিৎকার করে ওদের বিবেকের দুয়ারে আঘাত করেছিল। ওসমান দ্রুত আশফাকের কাছে গিয়ে বললো, 'তুমি এখানে! কি করে এখানে এলে তুমি?'

আশফাক তার মুক্তির কাহিনী বারজেস ও ওসমানের সঙ্গীদের কাছে বললো।

দুই বোন এবং আশফাককে নিয়ে আঙ্গিনায় নেমে এলো ওরা। তিনটে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে আঙ্গিনায়।

তিন ভাইবোনকে তিনটি ঘোড়ায় তুলে দিয়ে ওসমান বললো, 'এর থেকে বেশী কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দোয়া করি তোমাদের সফর নিরাপদ হোক। আর এক মুহূর্তও এখানে অপেক্ষা করো না। পেছনের ফটক এখনো খোলা আছে। যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি করো, খোদা হাফেজ।'

আশফাক ও যুবতীদের চোখ কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরে উঠলো। আশফাক বললো, 'সবকিছুই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এখনো আমি বুঝতে পারছি না আমি স্বপ্ন দেখছি, না আসলেই এ বাস্তব। যদি যা দেখছি তা সত্যি হয় তাহলে আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোন ভাষা আমার জানা নেই।'

আবেগে আশফাকের গলা বসে গেল। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ থেকে বললো,

'এ হয়তো আমাদের পূর্ব পুরুষের কোন মহত কাজের ফল। আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি এবং তার কাছেই আপনাদের এ কাজের বদলা দেয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি।'

'খোদা হাফেজ বন্ধুরা! বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। তোমরা সতর্ক থেকো।' বললো ওসমান।

বারজেস ও ওসমানরা হাঁটা দিল। কয়েক কদম গিয়ে পেছন ফিরে চাইলো একবার। দেখলো তিনটি ঘোড়া পেছন দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

ওসমান বন্ধুদের নিয়ে বাড়ীর পথ ধরলো, বারজেস শহরের পেছনের ফটকের দিকে এগিয়ে চললেন। গেটে পলায়নপর মানুষের প্রচণ্ড ভিড়। খানিক পূর্বে বারজেস এসে দেখে গেছেন এ ভিড়। ভিড় দেখেই তার মনে এলো, এদের সাথে তিনিও মেয়েদের নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন।

এ ভাবনা মনে আসতেই তিনি দ্রুত ওসমানদের কাছে গেলেন এবং সংগ্রহ করলেন তিনটি ঘোড়া। দুটো দু'বোনের জন্য, নিজের জন্য একটা। কিন্তু আশফাক অতিরিক্ত হওয়ায় তিনি হেঁটেই গেটের দিকে যাত্রা করলেন।

চারজনই এসে গেছে ফটকের কাছে। সেনা কমাণ্ডার যখন দেখলো শহরের লোকজন দলে দলে পরিবার পরিজন নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন ফটক বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি।

প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে ফটক বন্ধ করা যাচ্ছিল না। সৈন্যরা লোকজন সরিয়ে ফটক বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলো। লোকজনকে এদিক ওদিক হাকিয়ে ফিরতে লাগলো তারা।

সৈন্যদের হাক-ডাকে জনতার চাপ কিছুটা কমে এলো। সুযোগ পেয়ে ধীরে ধীরে ফটক বন্ধ করতে লাগলো সৈন্যরা। মানুষের মিছিল ফটকের কাছে আটকে পড়লো।

বারজেস, আশফাক এবং যুবতীরাও আটকা পড়লো সেই সাথে। ফটক বন্ধ হয়ে গেলে আর বের হওয়া যাবে না। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে এলে ওদের ধরা পড়ারও সমূহ সম্ভাবনা। বিপদ টের পেল বারজেস। সাথে সাথেই সে ছুটে গেল গেটের কাছে।

ওখানে পৌঁছেই বারজেস চিৎকার দিয়ে বললেন, 'পেছনে সৈন্যরা আসছে। তাড়াতাড়ি ফটক খুলে দাও। জলদি করো।'

বারজেসের চিৎকার শুনে বন্ধ হতে হতেও তা আর বন্ধ হলো না। আবার খুলে গেল গেট। সুযোগ পেয়ে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন হুড়মুড় করে পূনরায় বেরিয়ে যেতে লাগলো। বেড়ে গেল মানুষের চাপ। বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো জনতার স্রোত ছুটে চললো বাইরের দিকে। সে স্রোতের সাথে মিশে বাইরে বেরিয়ে এলো বারজেস ও তার সঙ্গীরা।

ফটকের বাইরে এসে বারজেস বললেন, 'আশফাক, তুমি তোমার কোন বোনের সাথে উঠে বসো। একটা ঘোড়া আমাদের দু'জন পুরুষের ভার বইতে পারবে না। নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে হলে আমাদেরকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।'

আশফাক নিজের ঘোড়া থেকে নেমে ছোট বোনের ঘোড়ায় গিয়ে উঠে বসলো। আশফাকের ঘোড়ায় উঠে বসলেন বারজেস। ছুটে চললো তিনটি ঘোড়া।

শহরের বাইরে খৃষ্টানদের টহল ছাউনিগুলো কোথায় জানতেন বারজেস। তাই ওদের চোখ বাঁচিয়ে চলার জন্য বড় রাস্তা ছেড়ে তিনি নেমে গেলেন অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ রাস্তায়। ঘুরতি পথে ছুটে চললেন সঙ্গীদের নিয়ে।

শহর থেকে বেরিয়ে আসা লোকজনও এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছুটে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে। দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে শহরের দাবানল।

মাঝ রাত পেরিয়ে গেছে। হিমেল বাতাস বয়ে চলেছে মরুভূমির বিশাল প্রান্তর জুড়ে। আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। হালকা শাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে মাথার ওপর। মিটিমিটি জ্বলছে ধ্রুবতারা। আদম সুরাত উঠে এসেছে মাথার ওপর। অপরূপ এক নৈসর্গিক পরিবেশে নির্জন পথ ধরে ছুটে চলেছে ছোট্ট একটি কাফেলা। যে কাফেলায় এখন মাত্র তিনটি ঘোড়ায় চারজন মানুষ।

অথচ গতকালও বিশাল এক কাফেলার সাথে পথ চলছিল ওরা। সে কাফেলায় ছিল প্রায় দুইশ সঙ্গী সাথী, ছিল প্রচুর মাল সামান, ছিল আত্মীয় পরিজন। কিন্তু কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সবই এখন অতীতের দুঃখময় স্মৃতি হয়ে আছে।

চুপচাপ পথ চলছিল ওরা। কারো মুখে কোন কথা নেই। আশফাকের মনে পড়লো তার বাপ-মায়ের কথা। গতকালও তার পিতা তাকে শান্তনা দিয়ে বলছিলেন, 'ফেলে আসা বাড়ী ঘরের কথা মনে করে মন খারাপ করো না। যেখানে যাচ্ছি সেখানে খৃষ্টানদের নির্যাতনের ভয় নেই। ওখানে গিয়ে আমরা নতুন করে ঘর বাঁধবো।'

তার মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'বেটা অনেক বড় হয়ে গেছে। এবার একটা বউ ঘরে আনতে হয়।'

আর আজ! আজ ওরা এতীম। দু'টো যুবতী বোনের দায়িত্ব এখন তার কাঁধে। কোথাও তাদের আশ্রয় নেই। কোন সম্পদ নেই। এই রাতটুকু কেটে গেলে কাল সকালে তারা কি খাবে তারও কোন খবর জানা নেই আশফাকের। বোন দুটোকে নিয়ে কোথায় চলেছে, কোথায় এ সফরের শেষ সে কথাটুকু জানা নেই তার। আশফাক জানে না বোনদের কিভাবে মুক্ত করা হয়েছে সে কাহিনী শোনারও সময় পায়নি সে।

বারজেসও নীরব। দু'একবার শুধু জিজ্ঞেস করছেন ওরা ভয় পাচ্ছে কি না। দাবানল পেছনে ফেলে তীব্র গতিতে ছুটে চলছে ঘোড়াগুলো। বারজেস ছাড়া বাকীরা জানে না তাদের গন্তব্য কোথায়। আশফাক বোনকে জিজ্ঞেস করলো, 'ভয় পাচ্ছো বুবু?'

'না।' ছোট্ট করে জবাব দিল বোন।

'দুশ্চিন্তা লাগছে?'

'না। আল্লাহ যখন খৃষ্টানদের কবল থেকে একবার বেরিয়ে আসতে দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি কোন নিরাপদ আশ্রয়েরও ব্যবস্থা করবেন।'

আর কোন কথা হলো না। শেষ রাতের বাতাস চিরে বারজেসের পিছু পিছু সমান তালে ছুটে চললো আশফাক ও তার বোনের ঘোড়া।

সূর্যোদয়ের পর পরই বারজেস মুসলিম সেনাবাহিনীর এলাকায় পৌঁছলেন। একটা পাহাড়ের মোড় ঘুরতেই আইয়ুবীর টহল বাহিনীর সামনে পড়ে গেল ওরা। টহল বাহিনী

ওদের থামতে বললো। ঘোড়ার বাগ টেনে ধরলেন বারজেস। সাথে সাথে বাগ টেনে ধরলো আশফাক এবং সামিরা। অজানা আতঙ্কে ছেয়ে গেল ওদের মন।

টহল বাহিনী এগিয়ে গেল ওদের কাছে। কমাণ্ডার সামনে বেড়ে ওদের পরিচয় জানতে চাইলো। বারজেস কমাণ্ডারের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলেন সুলতানের অবস্থান। বললেন, 'গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে। অবিলম্বে আমার সুলতানের কাছে পৌঁছা দরকার।'

তিনি খৃষ্টানদের সামরিক রসদ ধ্বংস হওয়ার সংবাদ সুলতানকে দিয়ে যতশীঘ্র সম্ভব ক্রাক আক্রমণের পরামর্শ দিতে চাচ্ছিলেন। কমাণ্ডার সবার ওপর দিয়ে একবার নজর ঘুরিয়ে বললো, 'আমার সাথে আসুন।'

ক্রাকের দাবানল নিভে গিয়েছিল। তবুও কোথাও কোথাও কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল ধোঁয়া। রাতভর ছুটাছুটি করে ক্লান্ত ঘোড়াগুলো ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। ফাঁকা ফটক দিয়ে কিছু ঘোড়া চলে গিয়েছিল শহরের বাইরে। এখানে সেখানে পড়েছিল উন্মত্ত ঘোড়ার পায়ে পিষে মরে যাওয়া মানুষের লাশ। সৈন্য এবং বন্দীরা মিলে এখনো কূপ থেকে পানি তুলে ক্লান্ত পায়ে সে পানি আগুনে ফেলছিল।

দুর্গের কোথাও মুসলিম ফৌজের চিহ্নও নেই। দুর্গের বাইরেও বিস্তৃত ময়দান জুড়ে খৃষ্টানদের সেনা ছাউনি। আগুন কিভাবে লাগালো, কে লাগালো, কিছুই জানে না কেউ। সম্রাটরা প্রাসাদের ভেতর পরামর্শ সভায় বসলেন। এক সম্রাট বললেন, 'এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। আইয়ুবীর বাহিনী আমাদের আক্রমণ করেনি অথচ আমাদের সমস্ত রসদ সামান তছনছ হয়ে গেছে। সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হয়েছে। যুদ্ধের বিপুল পরিমান উট ও ঘোড়া হারিয়ে গেছে। জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কার জন্য, কিভাবে এত বিপুল পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন আমাদের হতে হলো আগে তার তদন্ত হওয়া দরকার।'

উপস্থিত সম্রাটদের সম্মতির ভিত্তিতে গোয়েন্দা প্রধান হরমুনের নেতৃত্বে গঠিত হলো তদন্ত কমিশন। তিনদিনের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট পেশ করতে বলা হলো তদন্ত কমিশনকে। কালবিলম্ব না করে কমিশন তদন্ত কাজে নেমে পড়লো। সেন্ট্রির লাশ পাওয়া গেল খড়ের গাদা থেকে সামান্য দূরে। কেউ তাকে হত্যা করেছে এমন কোন আলামত পাওয়া গেল না তার লাশ দেখে। ঘোড়ার পায়ে পিষে মুছে গেছে খঞ্জরের আঘাতের দাগ। ইউনিফর্ম দেখেই শুধু বুঝা গেল সে ডিউটিরত সেন্ট্রি ছিল।

একটু দূরে পাওয়া গেল চারটি মেয়ের মৃত দেহ। দেহের কোন অংশ অক্ষত নেই। হাজার হাজার ঘোড়া ওদের দেহের উপর দিয়ে ছুটে গেছে। ওরা কার মেয়ে, কোন ধর্মের কিছুই বলার উপায় নেই। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কাপড়ের টুকরা থেকে ওদের মেয়ে বলে মনে হয়।

মেয়েদের লাশ দেখে আশ্চর্য হলো সবাই। এখানে মেয়েরা এলো কি করে? নিষিদ্ধ এ এলাকায় কোন সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। না কোন পুরুষ, না কোন মেয়ে। কেন এবং কোত্থেকে এ মেয়েরা এলো এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই কারো কাছে।

কতগুলো লাশ পাওয়া গেল রসদের আশপাশে। লাশগুলো সব সাধারণ সৈনিকদের। তদন্ত কমিশন মেয়েদের লাশগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। রাতে মেয়েরা কেন এখানে এসেছিল এর হদিস কেউ বের করতে পারলো না। তদন্ত কমিশন ধারণা করলো, এসব নিহত সৈন্যরা হয়তো পেশাদার মেয়েদেরকে এখানে নিয়ে এসে থাকতে পারে।

তাহলে আগুন লাগলো কিভাবে? চলাচলের পথ থেকে খড়ের গাদা বেশ দূরে। আগুন নিয়ে সেন্ট্রির তো খড়ের গাদার কাছে যাওয়ার কথা নয়! মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করলেও মশাল তো রাস্তায় রেখে যাওয়ার কথা!

আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে হরমুন মেয়ে চারটের লাশের ময়না তদন্ত করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। দলে যাওয়া চারটে লাশ তুলে আনা হলো ময়না তদন্তের জন্য। প্রথমেই ওদের চোখে পড়লো প্রতিটি লাশের গলায় ঝুলে আছে একটি করে ক্রুশ।

এরা তাহলে খৃষ্টান মেয়ে? তদন্ত অফিসার খৃষ্টান পরিবারগুলোতে অনুসন্ধান করার জন্য বললেন সহকারীদের। অনুসন্ধানের জন্য গোয়েন্দা বাহিনী ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। শহরের প্রতিটি খৃষ্টান পরিবারে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য এলাকা ভাগ করে নিল ওরা।

পরদিন তারা রিপোর্ট করলো, অধিকাংশ এলাকারই অর্ধেকের বেশী খৃষ্টান পরিবার শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ফলে মেয়েদের পরিচয় পাওয়ার কোন উপায় নেই এখন। পরিস্থিতি শান্ত হলে যদি সে সব খৃষ্টান পরিবারগুলো ফিরে আসে তবেই এর হদিস নেয়া সম্ভব।

আল নূর এবং অন্য তিনজন যুবতীর পরিজন উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাচ্ছিল। এখনো কেউ ফিরে আসেনি। তবে কি ধরা পড়লো ওরা?

ওসমান এবং তার সঙ্গীরা আগুনের পাশে দর্শকদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালো। চারটে মেয়ের মৃত দেহকেই সামনে দেখতে পেল ওরা। লাশগুলো এত বিভৎসভাবে থেতলানো যে দেখে চেনার কোন উপায় নেই। অন্যরা তো দূরের কথা, ওসমানের পক্ষেও সম্ভব হলো না তার নিজের বোনকে সনাক্ত করা।

ওসমানের চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়ে এলো। অশ্রুতে ভরে গেল বন্ধুদের চোখগুলোও। ওরা জানে এ লাশ কার, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে বোনের জন্য কান্নারও কোন উপায় নেই। সাবধানে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। বোনেরা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছে। ওদের দেহ কত ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়েছে কে জানে।

দু'জন যুবতীর সম্ভ্রব রক্ষার জন্য জীবন বিলিয়ে দিল চারজন তরুণী। ধরা পড়লে যেন আত্মরক্ষা করতে পারে এ জন্য বারজেস ওদের গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। সে ক্রুশ গলায় নিয়েই সেখানে পড়ে রইলো লাশগুলো।

ভাইয়েরা দেখলো বোনদের লাশগুলো কিন্তু সে লাশের জানাযা দিতে পারলো না ওরা। লাশগুলো সেখান থেকে তুলেও আনতে পারলো না। কারণ লাশগুলো যে খৃষ্টান মেয়েদের তার প্রমাণ ঝুলে আছে তাদের গলায়। সে পরিচয়কে মুছে দেয়ার সাধ্য নেই কারো।

খৃষ্টানদের কবরস্থানেই সমাহিত করা হলো চার মুসলিম তরুণীর মৃতদেহ। ওদের পরিবারের লোকজন গোপনে কোরানখানি করলো। গায়েবানা জানাযা পড়লো।

এ সব মেয়েদের পিতা-মাতারা ইসলামের জন্য ছেলেদের উৎসর্গ করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ ছেলেদের আগেই মেয়েদেরকে পছন্দ করে নিলেন। এ কোরবাণী বড়ই দুঃসহ, বড়ই বেদনাদায়ক।

অত্যন্ত গোপনে তাদের জন্য দোয়া অনুষ্ঠান হলো। অনুষ্ঠানে বাঁধ ভাঙ্গা কান্না শুরু হলে ইমাম সাহেব বললেন, 'আল্লাহর ফয়সালা বুঝার সাধ্য আমাদের নেই। আজ আপনারা নিজেদের মেয়ের জন্য কাঁদছেন, কিন্তু ইসলামের ইতিহাস পড়লে আপনারা দেখতে পাবেন, মহানবীর (সা.) নেতৃত্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন হয়েছিল সেখানেও প্রথম শহীদ ছিলেন একজন মহিলা। আজ আপনাদের সৌভাগ্য দেখে নিজেকে বড় দুর্ভাগা মনে হচ্ছে। না নিজে শহীদ হতে পারলাম, না শহীদের পিতা বা ভাই হতে পারলাম!'

মুসলমানদের বাড়ী বাড়ী তল্লাশী শুরু হয়ে গেছে। ধরা পড়ার আশংকায় ওসমানরা অস্ত্রশস্ত্র মাটির নীচে লুকিয়ে ফেললো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল মেয়েদের নিয়ে। প্রতিবেশীরা যদি মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করে কি জবাব দেবে তারা?

ওরা এ সমস্যা নিয়ে ইমাম সাহেবের কাছে গেল। দূরদর্শী ইমাম চারজন মেয়ের পিতাকে নিয়ে গেলেন পুলিশের সদর দফতরে।

পুলিশ অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমি এদের ইমাম। আমার কাছে এরা এক গুরুতর নালিশ নিয়ে এসেছে। সবাই যখন আগুন নেভাতে ছুটে গেছে তখন সৈন্যরা এদের যুবতী মেয়েদেরকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গেছে।'

'সেনাবাহিনীর নামে কোন অপবাদ দেয়ার পূর্বে ভাল করে ভেবে নাও।' বললেন পুলিশ অফিসার।

'মাননীয় পুলিশ সুপার, আমি একজন ধর্মীয় ইমাম। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারেন। সৈন্যদের অপরাধ ঢেকে তাদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন। এ ক্ষমতা আপনার আছে। কিন্তু আমি বলছি, আপনি শাসক হলেও খোদা নন। সৈন্যদেরকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য এরা সারা রাত আগুনের সাথে যুদ্ধ করেছে। আর এভাবেই আপনি তাদের সে সেবার প্রতিদান দিচ্ছেন? সৈন্যরা মেয়েদের তুলে নিয়ে গেছে, এ কথাটুকুও স্বীকারই করতে চান না?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি সৈন্যদের নির্দোষ বলিনি, আমি শুধু বলেছিলাম সেনাবাহিনীর নামে কোন কথা বলার আগে ভালভাবে ভেবে দেখতে। আপনি যদি তারপরও অভিযোগ করতে চান তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, আমরা এর তদন্ত করে দেখবো।'

পুলিশ প্রধানের মুখে এ কথাটিই শুনতে চাচ্ছিলেন ইমাম সাহেব। বাইরে এসে মেয়েদের পিতাদের বললেন, 'এখন এ কথা সর্বত্র ছড়িয়ে দাও যে, তোমরা যখন আগুন

নেভাতে ব্যস্ত, তখন সৈন্যরা এসে ওদের ধরে নিয়ে গেছে। এখনো সেই মেয়েরা ঘরে ফিরে আসেনি। তারা কোথায় আছে, কেমন আছে তোমরা কেউ তা জানো না।'

সাথে সাথে পরিবারের লোকজন এ কথা সবার কাছে প্রচার করে দিল।

শাহী ডাক্তার আশফাকের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করছেন। বারজেস তাকে ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে সুলতানের তাঁবুর দিকে পা চালালেন। একটু পরই সুলতানের তাঁবুতে এসে ঢুকলেন বারজেস। সুলতান তাকে বসতে বলে বললেন, 'এবার বলো কি খবর নিয়ে এসেছো?'

বারজেস সুলতানের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। ঘটনা বর্ণনা শেষ হলে বারজেস বললেন, 'সুলতান, এখনই ক্রাক আক্রমণ করা দরকার।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন সুলতান। একটু পর মাথা তুলে প্রহরীকে বললেন, 'উপদেষ্টাদেরকে ডেকে আনো।' প্রহরী বেরিয়ে গেলে তিনি তাকালেন বারজেসের দিকে। বললেন, 'মেয়ে দু'জন এবং ছেলেটাকে কায়রো পাঠিয়ে দাও। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ওদের থাকা খাওয়া ব্যবস্থা করা হবে।'

সামরিক উপদেষ্টাবৃন্দ এসে হাজির হলেন সুলতানের তাঁবুতে। উপদেষ্টারা সবাই এসে পৌঁছলে বৈঠক শুরু হলো। সুলতান বললেন, 'বারজেস, এদের সামনে ক্রাকের অবস্থা বর্ণনা করো।'

বারজেস নতুন করে ক্রাকের পরিস্থিতি আবার বর্ণনা করলেন উপদেষ্টাদের সামনে। বর্ণনা শেষ হলে আবারো ক্রাক আক্রমণ করার জন্য অনুরোধ রাখলেন তিনি। উপদেষ্টাদের কেউ কেউ এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে সুলতানকে পরামর্শ দিলেন, 'বারজেস ঠিকই বলেছে, অবিলম্বে আমাদের ক্রাক অবরোধ করা উচিত।'

অনেকক্ষণ ধরে অভিযানের ফলাফল কি হতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা হলো। আগু অভিযানের লাভ-ক্ষতি খতিয়ে দেখার পর দীর্ঘ আলোচনার শেষে উপদেষ্টাগণ অভিযানের স্বপক্ষেই তাদের মতামত ব্যক্ত করলেন।

সকলের মতামত শুনে সুলতান বললেন, 'ঠিক আছে, আমি শীঘ্রই ক্রাক আক্রমণ করবো। তবে আপনারা জানেন, তাড়াহুড়া আমি পছন্দ করি না। খৃস্টানদের সেনাবাহিনী এখন বাইরে ছড়িয়ে আছে। আমরা অবরোধ করলে ওরা বাইরে থেকে আক্রমণ করে আমাদের অবরোধ ব্যর্থ করে দিতে পারে।

তাছাড়া ক্রাকের মুসলমানদেরকে আরো প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তারা আল্লাহর মদদে এক আকস্মিক অভিযানে সফল হলেও সংঘবদ্ধ শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার মতো অবস্থায় তারা আসেনি।

আমি মনে করি, এ মুহূর্তে আমরা অভিযান পরিচালনা করলে, আমরা দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেও যুদ্ধ হবে বাইরে। কারণ, খৃস্টান বাহিনীর একটা বিপুল অংশ এখন শহরের বাইরে অবস্থান করছে। আমরা অবরোধ করার আগেই তারা আমাদের মোকাবেলায় ছুটে আসবে।

আমরা ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেও বাইরের শক্তিকে

একেবারে নিঃশেষ করে যাওয়া সম্ভব হবে না। ফলে আমরা ভেতর-বাহির দু'পক্ষের মাঝখানে পড়ে যাবো।'

'মাঝখানে হস্তক্ষেপ করার জন্য ক্ষমা চাইছি সম্মানিত সুলতান।' বললেন বারজেস, 'এ মুহূর্তে কিছু কমাণ্ডো সৈনিক ক্রাক পাঠানো যেতে পারে। যে সব লোক শহর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ওরা আবার ফিরে আসছে। ওদের সাথে কমাণ্ডো বাহিনীও ভেতরে ঢুকতে পারবে। পরে আর সম্ভব হবে না। যখনি অভিযান হোক এ সব কমাণ্ডোরা তখন কাজে দেবে।'

উপদেষ্টারা এবারও বারজেসকে সমর্থন করলেন। বললেন, 'সুলতানের কথাই ঠিক। আজই অভিযান চালালে আমরা দু'পক্ষের মাঝখানে পড়ে যেতে পারি। তবে কমাণ্ডো বাহিনী পাঠালে সে ভয় থাকে না।'

সুলতানও এ প্রস্তাবের পক্ষে একমত হলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, এ মুহূর্তে আক্রমণ না করে বারজেসের নেতৃত্বে একটি কমাণ্ডো বাহিনীকে ক্রাকে পাঠানো হবে।

বারজেস সুলতানকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিলেন। আশফাকের কাছে গিয়ে তাকে শোনালেন সুলতানের ইচ্ছার কথা।

'আমার বোনেরা কায়রো যাক।' আশফাক বললো, 'আমি আপনার সাথেই থাকবো। আমি আমার পিতা-মাতার খুনের বদলা নিতে চাই।'

'যুদ্ধ আবেগ দিয়ে হয় না। এ জন্য কঠোর অধ্যবসায় এবং কঠিন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তুমি তোমার পিতা-মাতার রক্তের প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছো, আর আমরা খৃস্টান পশুদের দ্বারা নির্যাতীত সকল পিতা এবং মেয়েদের ইজ্জতের প্রতিশোধ নিতে চাই। শান্ত হও বেটা, সুলতানের ফয়সালা মেনে নাও।'

কিন্তু আশফাক অটল। তার এক কথা, সে কায়রো যাবে না। শেষ পর্যন্ত বারজেস তাকে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আমার পরামর্শ শোন, যে কোন মুহূর্তে সেনাবাহিনী এ জায়গা ছেড়ে দিতে পারে। অসুস্থ অবস্থায় তাদের সাথে চলা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। এখন তুমি কায়রো চলে যাও, আমি কথা দিচ্ছি, সুস্থ হলে তোমাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবো।'

কমাণ্ডো বাহিনী গঠিত হলো। বারজেস যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ওদের বিদায় জানানোর জন্য সেনা অফিসাররা বেরিয়ে এলো তাঁবুর বাইরে।

সুলতান কমাণ্ডো সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা ক্রাকের মুসলমানদের মুক্তির জন্য ওখানে যাচ্ছো। ওরা তোমাদের সহযোগিতা করবে। কিন্তু ওদের ওপর নির্ভর না করে নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করবে।

কমাণ্ডো অভিযানের সফলতা নির্ভর করে শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের অবস্থান, শক্তি ও ক্ষমতা গোপন রাখার মধ্যে। ক্ষিপ্রতা ও সাহসিকতার মধ্যে। শত্রুর অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখার মধ্যে। আশা করি এসব বিষয়ে তোমরা সজাগ ও সচেতন থাকবে।'

সুলতানের কথা নিষ্ঠার সাথে পালন করার শপথ নিয়ে বারজেসের নেতৃত্বে কমাণ্ডো বাহিনী সন্ধ্যার একটু পরেই ক্রাকের পথ ধরলো।

আশফাক এখন মোটামুটি সুস্থ। আঘাতের ক্ষতগুলো শুকিয়ে এসেছে। তাঁবুর বাইরে বসে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে তাকিয়েছিল সে। পিতা মাতার রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ছটফট করছিল তার অশান্ত হৃদয়। আমিনা ও সামিনা কখন এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করেনি সে।

আমিনা এগিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলো। আশফাক চমকে উঠে মুখ তুলে চাইলো।

'আশফাক, এখন কেমন বোধ করছিস?'

'ভাল আপু। দুদিন থেকে জ্বর আসছে না। গায়ে ব্যথা বেদনাও তেমন নেই।'

'সেনাবাহিনী ক্রাকে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের অবিলম্বে কায়রো রওনা হয়ে যাওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'ওরা জানিয়েছে তুই চলতে পারলেই ওরা আমাদের নিয়ে রওনা হবে। আমাদের সাথে ছয়জন প্রহরীও যাবে।'

'আমি প্রস্তুত। তুমি ওদেরকে রেডি হতে বলো।'

সেদিনই রাতে সুলতান ওদের ডেকে পাঠালেন। ভাই বোন তিন জন সুলতানের তাঁবুতে পৌঁছলে তিনি তাদের বসতে দিয়ে বললেন, 'কাল সকালে ছ' জনের একটি কমাণ্ডো গ্রুপের সাথে তোমরা কায়রো যাত্রা করবে। বারজেস আমাকে জানিয়েছে, আশফাক পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধের ময়দানে থাকতে আগ্রহী। কিন্তু আমরা তো কেবল প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধ করছি না, আমরা লড়াই করছি দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। আমাদের লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, জালিমের বিরুদ্ধে। সেখানে ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটানোর কোন সুযোগ নেই। কেবল দ্বীনের জন্য লড়াই করতে চাইলেই তোমাকে আমরা সাথে নিতে পারি।'

আশফাক বললো, 'আমরা কি নির্যাতীত নই, আমাদের ওপর কি জুলুম করা হয়নি?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। কিন্তু এ জুলুমের হাত থেকে কেবল দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারলেই নিস্তার পাওয়া যেতে পারে। আল্লাহ মহান। সারা দুনিয়ার সব কিছুই তার সৃষ্টি। তার বিচারে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই বলেই আল্লাহর বিধানের বিজয় চাই আমরা। যেখানে জুলুমের কোন অবকাশ নেই।'

'আমি আপনার বাহিনীতে যোগ দিতে চাই।'

'আশফাক, ক্রাকের বাহিনীতে এ মুহূর্তে তোমাকে শামিল করতে পারছি না। তবে তুমি চাইলে তারচে গুরুত্বপূর্ণ কাজে তোমাকে পাঠাতে পারি।'

'আপনি আমাকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবেন। আমি আমার জীবন দ্বীনের কাজে আপনার হাতে তুলে দিলাম।'

'আশফাক, তোমার মতো যুবকদের চোখ, কান খুলে দেয়াই আমি আমার প্রথম কর্তব্য মনে করি। মুসলিম বিশ্বে আল্লাহর দ্বীনের পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার মতো যুবকের অভাব নেই। যে কোন মুসলিম জনপদে গিয়ে ডাক দিলে হাজার হাজার যুবক পাবে, যারা অকাতরে দ্বীনের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া।

আমাদের আসল অভাব উপযুক্ত নেতৃত্বের, আর প্রধান শত্রু শয়তান। শয়তান

আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে বিপথগামী করার শপথ নিয়েছিল। সে সব সময় আমাদের বিরুদ্ধে তৎপর। এখন তোমার যে আবেগ আছে কাল সে আবেগ নাও থাকতে পারে। সচেতন না থাকলে লোভ, ভয়, মোহ কখন তোমাকে তোমার পথ থেকে সরিয়ে নেবে তা তুমি টেরও পাবে না।'

'আমি সব সময় সচেতন থাকবো সুলতান।'

'কিন্তু কেবল নিজের ব্যাপারে সচেতন থাকলেই চলবে না। কায়রো পৌঁছে সেখানকার উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তা, আমলা ও আমীর ওমরাদের ওপর তোমাকে নজর রাখতে হবে। সেখানে গোয়েন্দা কাজের জন্য তোমাকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ট্রেনিং শেষে কায়রোয় অবস্থিত আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের সাথে কাজ করবে তুমি।'

'কিন্তু তাদের আমি কোথায় খুঁজে পাবো?'

'তোমাকে খুঁজে পেতে হবে না, আমাদের লোকই তোমাকে খুঁজে নেবে।'

আমিনা সুলতানের দিকে অনুনয় ভরা চোখে তাকিয়ে বললো, 'মাননীয় সুলতান, আপনি জানেন আমরা এতীম। সহায় সম্পদ বলতে আমাদের কিছু নেই।'

সুলতান বললেন, 'এ নিয়ে তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তোমাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ ইতিমধ্যেই আমার কাছ থেকে চলে গেছে।'

'মাননীয় সুলতান, আমরা এ কথা বলতে চাইনি। আমরা বলতে চাচ্ছি, আমরা কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি না?'

'কেন নয় বোন, কাজের কি কোন অভাব আছে? তোমরা চাইলে আশফাককে আমি বলে দেবো। সেই তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী কোন কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।'

'সুলতান, আমরা এমন কাজে জড়িত হতে চাই যাতে জাতি উপকৃত হয়। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে পুরুষের পক্ষে পৌঁছা কঠিন, অথচ মেয়েরা অনায়াসেই যেতে পারে। আমার মনে হয় গোয়েন্দা কাজে আপনার মেয়ে কর্মীও দরকার। আপনি কি আমাদেরকে এ জাতীয় কোন কাজে লাগাতে পারেন না?'

'প্রিয় বোন, এ খুব কঠিন ক্ষেত্র। এ কাজে জড়ানোর আগে ভালভাবে চিন্তা করে নাও। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে মেয়েদেরকে এ জাতীয় কাজে জড়ানোর বিপক্ষে তারপরও একেবারেই সুযোগ নেই তা আমি বলবো না। তবে তার আগে ভালভাবে ভেবে দেখো। যদি তোমরা তারপরও গোয়েন্দা বিভাগেই কাজ করতে চাও আমার আপত্তি নেই।'

'সুলতান, আমাদের কোন পিছু টান নেই। আমাদের হারাবারও কিছু নেই। আপনি আমাদের নিশ্চিন্তে এ কাজে ব্যবহার করতে পারেন।'

'তোমরা আল্লাহর পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে চাইলে তার থেকে নিবৃত্ত করার কোন অধিকার আমার নেই। আমি তোমাদের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। কিন্তু তোমাদের আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এ কাজ বড়ই কঠিন। প্রতিপক্ষের তৎপরতার প্রতি তোমাদের নজর রাখতে হবে, স্বপক্ষের সকল গুরুত্বপূর্ণ

ব্যক্তির তৎপরতাও থাকবে তোমাদের চোখের সামনে। নিজের প্রতিটি সহকর্মীর প্রতিও তোমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আস্থা ও সন্দেহের সম্পদে ভরা থাকবে তোমাদের হৃদয়।

কারো কোন কাজে সন্দেহ হলে তার অতীত বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ করে বা তার পদমর্যাদার কথা ভেবে সেদিক থেকে চোখ ফেরানোর কোন সুযোগ নেই তোমাদের। আবার নেতৃবৃন্দ ও সহকর্মীদের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা না থাকলেও তুমি কোন কাজই করতে পারবে না। এই আস্থা ও সন্দেহের সমন্বয় সাধন করা সবচে কঠিন কাজ। কিন্তু এই বিভাগে যারা কাজ করবে এ কঠিন কাজে তাদের স্বচ্ছ ও পারদর্শী হতেই হবে।'

সুলতানের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় হেদায়াত ও নির্দেশনা নিয়ে ভাই বোন বেরিয়ে এলো আইয়ুবীর কামরা থেকে।

পরদিন ভোরে ছয়জন কমাণ্ডোর সাথে কায়রোর উদ্দেশ্যে ঘোড়ায় চড়ে বসলো তিন ভাই বোন। দেখতে দেখতে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও তার সেনাবাহিনীর তাঁবুগুলো পেছনে ফেলে চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে। মরুভূমির ধূলি উড়িয়ে এগিয়ে চললো নয়টি ঘোড়া।

মরুভূমির সূর্য বেরিয়ে এলো একটা বালির পাহাড়ের আড়াল থেকে। তিন সারিতে পথ চলছে ওরা। সামনে তিন জন কমাণ্ডো, মাঝখানে তিন ভাই বোন, পেছনে বাকী কমাণ্ডো তিন জন।

মাথার ওপর রোদের তেজ বাড়ছে। উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মরুভূমির বাতাস। ঘন্টা দুই নির্বিঘ্নে চলার পর দলটির চোখে পড়লো প্রথম চৌকি। আরো বিশ মিনিট লাগলো তাদের সে চৌকিতে পৌঁছতে। ওখানে পৌঁছে তারা নাস্তা সারলো। আধঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার ঘোড়ায় চাপলো ওরা। আরো দু'ঘন্টা পথ চললে দ্বিতীয় চৌকিতে পৌঁছে যাবে ওরা। দুপুরের আগেই সেখানে পৌঁছতে চায় দলটি।

ধূলিঝড় তুলে এগিয়ে চললো ওরা দ্বিতীয় চৌকির উদ্দেশ্যে। আজকের মতো যাত্রা বিরতি করবে ওরা ওখানে। গরম লু হাওয়া ঝাপটা মারছে ওদের চোখে মুখে। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত বালির সমুদ্র। রোদ পরে চিকচিক করছে।

ঘন্টাখানেক চলার পর তারা একটি ওয়েসিসকে পাশ কাটালো, কিন্তু থামলো না ওখানে। ওয়েসিসের পাশে খেজুর গাছের ছায়ায় বসে আছে চারজন বেদুঈন। পাশে চারটি ঘোড়া বাঁধা। ছোট্ট কাফেলাটিকে চলে যেতে দেখলো ওরা। কেউ কোন মন্তব্য করলো না।

সূর্য মাথার ওপর উঠে আসার আগেই দ্বিতীয় চৌকিতে পৌঁছে গেল ওরা। কমাণ্ডার বললো, 'রোদ না কমা পর্যন্ত এখানেই বিশ্রাম নেবো আমরা। রাতে আকাশে চাঁদ থাকবে। পথ চিনতে অসুবিধা হবে না। সন্ধ্যার পর আমরা আবার যাত্রা করবো। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নিন সবাই। পারলে ঘুমিয়ে নেবেন যাতে রাতে বেশী পথ অতিক্রম করতে পারি।'

কায়রো তিন দিনের পথ। আরো দুটো রাত তাদেরকে মরুভূমিতে কাটাতে হবে।

আশফাক ও মেয়েদের কাছ থেকে ঘোড়ার বাগ হাতে নিল দু'জন কমাণ্ডো। ঘোড়াগুলোর যত্ন নিয়ে তাদের দানাপানি দিয়ে ফিরে এলো ক্যাম্পে। মেয়েরা খাওয়া দাওয়ার পর জোহরের নামাজ পড়ে শুয়ে পড়লো তাদের তাঁবুতে। দু'জনকে পাহারার জন্য রেখে আশফাক এবং কমাণ্ডোরাও ঢুকে গেল তাঁবুর ভেতর।

সূর্য ডোবার খানিক আগেই উঠে পড়লো সবাই। আছরের নামাজ শেষে প্রস্তুত হলো আবার যাত্রার জন্য। সামনে আরো একটা চৌকি পাওয়া যাবে আইয়ুবীর। তারপর পাড়ি দিতে হবে বিশাল উন্মুক্ত মরুভূমি। মাঝে মধ্যে দু একটা বেদুঈন পল্লী ছাড়া সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পুরোটাই ফাঁকা।

সন্ধ্যায় রক্তলাল সূর্যটা হারিয়ে গেল দূর বালিয়াড়ির আড়ালে। একটু পরেই পূর্ব দিক থেকে উঁকি মারলো গোলগাল চাঁদ। তারার মেলা বসলো চাঁদের হাটে। যেন মস্ত কোন পুকুরে কেউ শাপলার চাষ করেছে।

শরীর জুড়ানো মৃদুমন্দ কোমল হাওয়া বইছে। উজ্জ্বল রূপালী চাঁদের ঠাণ্ডা আলোয় ভেসে যাচ্ছে বিশাল মরুভূমির সমস্ত চরাচর। দীর্ঘ বিশ্রামের পর ঝরঝরে চাঙ্গা শরীর নিয়ে নিজ নিজ ঘোড়ায় চেপে বসলো ক্ষুদ্র দলটি। কমাণ্ডারের সাথে কায়রোর দিকে ঘোড়া ছুটালো সবাই।

ধীরে ধীরে চাঁদ উপরে উঠতে লাগলো। চাঁদের মায়াবী আলো গায়ে মেখে এগিয়ে চললো কাফেলা। একটানা তিন ঘন্টা চলার পর ছোট্ট একটা পাহাড় পড়লো সামনে। মেয়েরা একটানা পথ চলায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

কমাণ্ডার বললো, 'আধ ঘন্টার জন্য আমরা এ পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্রাম নেবো। এর মধ্যে প্রাকৃতিক ক্রিয়া ও এশার নামাজ সেরে নিতে হবে সবাইকে। রাতের খাবার সবাই চাইলে এখানেই হতে পারে, নইলে আরো দু'ঘন্টা চলার পর একটা ওয়েসিস পাবো, সেখানে হতে পারে।'

মেয়েরা বললো, 'আমরা এখন খাবো না। তাহলে ক্লান্তি এসে ভর করবে।'

কমাণ্ডার বললো, 'তাহলে সামান্য নাস্তা হতে পারে। সবাই খেজুর ও পানি খেয়ে নাও, তাহলে আরো দু ঘন্টা চললেও ক্ষুধায় কষ্ট পাবে না।'

ওরা যখন ওখান থেকে রওনা হলো তখন একজন কমাণ্ডোর মনে হলো চকিতের জন্য যেন পাহাড়ের চূড়ায় দুটো মুখ দেখতে পেল। আরো ঘন্টাখানেক চলার পর একটা বেদুঈন পল্লী সামনে পড়লো। পল্লীটাকে বায়ে রেখে দ্রুত ওরা সামনে বাড়লো।

ঘন্টা দুই চলার পর আরো একটা ওয়েসিস পড়লো ওদের সামনে। পাশে খেজুর বাগান। চাঁদ প্রায় চলে এসেছে মাথার ওপর। খেজুর গাছের ছায়াগুলো ছোট হয়ে এসেছে।

অভিযাত্রীর দলটি থামলো ওখানে। রাতটা এখানেই কাটাবে ওরা। নয় জন লোকের জন্য তিনটি তাঁবু খাটানো হলো। ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা নিয়ে একত্রেই খাওয়া সারলো সবাই।

একেক তাঁবুতে দুজন করে শোয়ার ব্যবস্থা হলো। কমাণ্ডার তিনজনকে পাহারার জন্য রাখলেন। তাঁবুর দু পাশে সশস্ত্র দু'জন সেন্ট্রি পায়চারী শুরু করলো। একজন চলে গেল

তাঁবু থেকে অনতিদূরে একটা বালির ঢিবির আড়ালে। বাকীরা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো তাঁবুর ভেতর।

নির্বিঘ্নে সময় বয়ে চললো। কোথাও কোন শব্দ নেই। বাতাস এখন অনেক বেশী ঠাণ্ডা। শীত শীত ভাব। দু'ঘন্টা পর ডিউটি পরিবর্তন হলো। পাহারারত কমাণ্ডোরা বন্ধুদের ডেকে দিয়ে ঢুকে পড়লো তাঁবুর ভেতর।

কমাণ্ডার আজীম সঙ্গী দু'জনকে তাঁবুর পাশে রেখে নিজে চলে গেলেন বালিয়াড়ির আড়ালে। কোন রকম বিপদের সম্ভাবনার কথা তার মনেও এলো না। কিন্তু কমাণ্ডোদের স্বভাবসুলভ সতর্কতা অটুট রেখে পাহারায় লেগে রইলো সবাই।

তাঁবুর পাশের সেন্ট্রি দু'জন পায়চারী থামিয়ে প্রায় আধঘন্টা যাবত বসে বসে পাহারা দিচ্ছে। বালির ঢিবির আড়াল থেকে তীর ধনুক প্রস্তুত রেখে পলকহীনভাবে তাঁবুর দিকে তাকিয়ে আছে কমাণ্ডার আজীম।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলো তার ইন্দ্রিয়। মনে হলো আশপাশে কোথাও একাধিক মানুষ খুব সন্তর্পনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সে বিন্দুমাত্র মাথা না নাড়িয়ে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না।

সে পিছনটায় একবার দৃষ্টি বুলানোর জন্য মাথাটা যেই ঘুরাবে ভাবলো, অমনি তার চোখ আটকে গেল খেজুর বাগানের মধ্যে। সে স্পষ্ট দেখতে পেলো তাঁবুর দুদিক থেকে দু'জন করে বেদুঈন শিকারী নেকড়ের মতো পায়ে পায়ে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে।

সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধের কথা চিন্তা করছিল কমাণ্ডার। তীর মেরে বড়জোর একজনকে কাবু করা সম্ভব। সাথে সাথে অন্য তিনজন সতর্ক হয়ে যাবে। বাগানের অন্ধকার ও গাছের আড়াল তাদের নিরাপদ আশ্রয় হতে পারে। কিন্তু ও সামান্য নড়াচড়া করলেই চাঁদের ফকফকা আলোয় পরিষ্কার ওদের চোখে পড়ে যাবে।

শত্রুরা তাঁবুর ত্রিশ গজের মধ্যে চলে এসেছে। দ্রুত চিন্তা চলছে কমাণ্ডারের মাথায়। সেন্ট্রি দু'জন এখনো উঠে দাড়াচ্ছে না কেন? ওরা কি কিছুই টের পায়নি এখনো? না কি ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা?

বেদুঈনরা আরো এগিয়ে এসেছে। ক্রমে তাঁবু ও ওদের মাঝের ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে। এখন বড়জোর আর বিশ গজ। না, আরো কমে আসছে ব্যবধান।

দশ গজ দূরে এসে খানিক থমকে দাঁড়াল ডাকাতরা। বোধ হয় সেন্ট্রিরা সজাগ না ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে চেষ্টা করলো। তারপর খাপ থেকে সাবধানে তরবারী বের করে সেন্ট্রি দু'জনের দিকে বা বাড়ালো।

ওদের চলাফেরা এতটাই নিঃশব্দ ছিল যে তখনো পর্যন্ত সেন্ট্রিরা কোন কিছু টের পায়নি। আততায়ীরা সেন্ট্রিদের দু'গজের মধ্যে এসে যখন তরবারী উপরে তোলা শুরু করলো তখন কমাণ্ডারের প্রথম তীরটি একজন বেদুঈনের বক্ষ ভেদ করলো এবং বলতে গেলে প্রায় একই সময়ে অন্য পাশের আরেক জনকেও ধরাশায়ী করলো তার তীর।

চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়াল সেন্ট্রি দু'জন এবং পাঁই করে ঘুরে তরবারীর প্রথম আঘাত ঠেকালো নিজের তলোয়ার দিয়ে।

দু'জোড়া তলোয়ারের ঠোকাঠুকির আওয়াজ শেষ রাতের মরুভূমির নিস্তব্ধতা বিনষ্ট

করে দিল। সতর্ক ও দুঃসাহসী বেদুঈনরা তীব্র আঘাত হানলো কমাণ্ডোদের ওপর। হতচকিত কমাণ্ডোরা কোন রকমে সে আঘাত ঠেকিয়ে পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করলো।

যখন ওরা বুঝলো শত্রু মাত্র দু'জন তখন পাল্টা আঘাত হানলো কমাণ্ডোরা। ততোক্ষণে কমাণ্ডার অন্যদের ডাকতে ডাকতে সেখানে এসে পৌঁছলো। কমাণ্ডারের ডাক চিৎকারে তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো অন্যান্য কমাণ্ডোরাও।

আহতদের মধ্য থেকে একজন বেদুঈন উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে তার তরবারী দিয়ে লড়াইরত কমাণ্ডো সৈন্যটিকে আঘাত করতে উদ্যত হতেই কমাণ্ডারের তলোয়ারের আঘাতে দেহ থেকে তার মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিসমাপ্তি ঘটলো এ লড়াইয়ের।

সৈন্যদের ডাক চিৎকারে আশফাক এবং যুবতী দু'জনেরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাঁবুর বাইরে এসে তারা দেখতে পেলো চারজন বেদুঈনের লাশ।

কমাণ্ডার ওদের শান্তনা দিয়ে বললো, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এরা সাধারণ ডাকাত মাত্র।'

সকাল হয়ে এসেছিল। কমাণ্ডার সবাইকে সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে বললো। হাত মুখ ধুয়ে সফরের পোশাক পরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো আমিনা ও সামিনা। কমাণ্ডার বললো, 'নামাজ সেরে নিন।'

ওরা নামাজ সেরে নিতে নিতে সৈন্যরা তাঁবু গুটিয়ে নিল। সবাই চড়ে বসলো যার যার ঘোড়ায়।

সূর্য উঠার আগেই বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গেল তারা। মরুভূমিতে কোমল আলো ছড়িয়ে সূর্য উঁকি দিল আবার। যেন মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে ঘনিষ্ট আপন জন। যাত্রীরা ঘোড়ার পিঠে বসে মিঠে রোদের আলতো পরশ অনুভব করলো সর্ব অঙ্গে।

বাকী পথটুকু নিরাপদেই কাটলো তাদের। পরদিন সন্ধ্যার একটু আগে ওদের চোখে পড়লো কায়রো শহর।

কয়েকদিন থেকেই ব্যাপকভাবে মুসলমানদের ধরপাকড় চলছে ক্রাকে। স্রেফ সন্দেহের বশে অনেককে বেগার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ক্রাকে শুরু হয়ে গেল মুসলিম নির্যাতনের নতুন অধ্যায়।

ওসমানের দু'জন বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শত নির্যাতনের পরও ওরা মুখ খোলেনি। ওদের কাছ থেকে কথা আদায় করার জন্য একদিন স্বয়ং হরমুন জেলে এলেন। একজন একজন করে সব বন্দীদের দিকে তাকালেন তিনি। তার চোখ এসে আটকে রইলো সেই দুই যুবকের ওপর। চরম নির্যাতন করেও ওদের মুখ থেকে কোন কথা বের করা যায়নি।

হরমুন ওদেরকে নিজের দপ্তরে নিয়ে গেলেন। ভাল ব্যবহার করলেন ওদের সাথে। ওদেরকে উন্নতমানের খাবার দেয়া হলো। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। তারপর তাদের শোবার জন্য দেয়া হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা। ধীরে ধীরে ঘুমের

ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো ওরা।

ঘুমন্ত দুই যুবকের মাঝখানে বসে রইলেন হরমুন। কিছুক্ষণ পর বিড়বিড় করে উঠলো একজন, 'আমার দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলো, আমি কিছুই জানি না। জানলেও আমি তোমাদেরকে কিছুই বলবো না। তোমরা গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখো আর আমি বাঁধি পবিত্র কোরআনের আয়াত।'

'তুমি সেনা ছাউনিতে আগুন লাগিয়েছিলে?' হরমুন প্রশ্ন করলেন। যুবক কোন জবাব দিল না।

হরমুন আবার বললেন, 'তোমরা খৃষ্টানদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছো। আমি স্বীকার করছি, তুমি অবশ্যই সাহসী। কিন্তু সাহস থাকলেই মরতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। এই বয়সেই মরে গিয়ে কি লাভ হবে তোমার?'

'মরে গেলে' বিড়বিড় করলো যুবক, 'যদি মরে যাই, এ দেহে যতোক্ষণ প্রাণ আছে, ঈমানও আছে। দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেলেও ঈমান যাবে না।'

'তাহলে তুমি কি চাও, দেহ থেকে তোমার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যাক? এই তোমার শেষ ইচ্ছা?'

'না, আমি আরো হাজার বছর বেঁচে থাকতে চাই। আর যতোদিন বেঁচে থাকবো ততোদিন জেহাদ করতে চাই। কিন্তু কারো দয়ার ওপর বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই আমার। মরণকে ভয় পাই না আমি।'

'কিন্তু এভাবে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়ার মাঝে কোন স্বার্থকতা নেই যুবক। আমরা যা জানতে চাই বলে দাও, কথা দিচ্ছি, তোমাকে আমরা মুক্তি দিয়ে দেবো।'

'আমাদের জীবনে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই হরমুন। জীবনেও লাভ, মরণেও লাভ। বাঁচলে বাঁচবো আল্লাহর দ্বীনের জন্য, মরবোও দ্বীনের পথে থেকে। ব্যর্থ তো তার জীবন, যে ভয়ে, লোভে বা মোহে পড়ে আপোষের পথ ধরে। নীতির সাথে আপোষ করে, সত্যের সাথে আপোষ করে, বিবেকের সাথে আপোষ করে। যত চেষ্টাই করো আমার কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারবে না তুমি।'

অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন হরমুন। তার মনের কথা যুবকের মুখ দিয়ে কিছুতেই বের করাতে পারলেন না।

এবার তিনি ফিরলেন দ্বিতীয় যুবকের দিকে। চেষ্টা করলেন কথা বের করার। কিন্তু দ্বিতীয় যুবকের মুখ থেকেও কোন কথাই বের করতে পারলেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত হরমুন সঙ্গী গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনর্থক চেষ্টা। ওদের মুখ থেকে কিছুই বের হবে না।'

'মনে হচ্ছে এরা ঘটনার সাথে জড়িত নয়। থাকলে কোন না কোন সূত্র পাওয়া যেতোই। তবে নিজের বিশ্বাসের ওপর এরা বড় বেশী দৃঢ়।'

'ওদের যে পরিমাণ হাশিশ খাইয়েছি একটা ঘোড়াকে খাওয়ালে ঘোড়াও কথা বলতো।'

'এদের ভেতর জাতীয় চেতনাবোধ অত্যন্ত প্রবল। সে চেতনাকে ওরা বলে ঈমান। এ যুবকদের মধ্যে ঈমানী দৃঢ়তা বেশী এ কথা ঠিক, কিন্তু আমারও মনে হয় এরা

নির্দোষ।' বললো আরেক অফিসার।

এই দুই যুবক ছিল ওসমানের দুই সঙ্গী। প্রাসাদ আক্রমণে ওরাও ওসমানের সাথে ছিল। কিন্তু এদের ঈমান ছিল এত দৃঢ় যে, সেখানে হাশিশও কোন কাজ করেনি।

অজ্ঞান অবস্থায়ই ওদের দু'জনকে অনেক দূরে নিয়ে মরুভূমির মধ্যে ফেলে দেয়া হলো। ওদের জ্ঞান ফিরলো পরদিন সকালে। জ্ঞান ফিরতেই পরস্পরের দিকে চাইলো ওরা। দেখলো, বেগার ক্যাম্প নয়, ওরা দু'জনই পড়ে আছে খোলা আকাশের নীচে। ওরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরলো। এরপর উঠে বাড়ীর দিকে হাঁটা দিল দু'জনেই।

ওসমানদের তৎপরতা আরো বেড়ে গেছে। পেছনে ছায়ার মতো লেগে আছে রিনি। একদিন পথে ওসমানের সাথে দেখা হলো রিনির। দাঁড়িয়ে পড়লো দু'জনই। রিনি জিজ্ঞেস করলো, 'ওসমান, আল নূর কোথায়?'

'তোমাদের জাতির কোন পাপীর কাছে। তার ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসুক।'

'গজব নয় ওসমান, বলো রহমত। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মারা গেলে তাকে তোমরা শহীদ বলো। আমি জানি, আল নূর শহীদ হয়ে গেছে।'

ওসমান নির্বাক হয়ে গেল। রিনিই আবার মুখ খুললো, 'সেই দুই যুবতীকে প্রাসাদ থেকে যারা বের করে এনেছে তার মধ্যে তুমিও একজন। গ্রেফতার হচ্ছো না কেন জানো? তোমার গ্রেফতারের পথে আমি বাঁধা হয়ে আছি। বলো, আর কতো ত্যাগ চাও ওসমান, আর কতো পরীক্ষা নিতে চাও আমার প্রেমের?'

'আমার কাছে কি চাও তুমি?'

'প্রথমে তোমার ভালবাসা চাই। এরপর চাই তুমি এই বিপজ্জনক তৎপরতা থেকে সরে দাঁড়াও।'

'তুমি তোমার জাতিকে ভালবাসো। আমাকে ভালবাসলে আমার জাতিকে কেন ভালবাসো না?'

'তোমার বা আমার কারো জাতির সাথেই আমার ভালবাসা নেই। বিপজ্জনক কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছি, কারণ, নইলে তুমি মারা যাবে। আমি কেবল তোমাকেই ভালবাসি ওসমান! তুমি মারা গেলে আমিও বেঁচে থাকবো না। আমি তোমায় জীবিত এবং হাসিখুশী দেখতে চাই।'

মাথা নিচু করে নিল ওসমান। এ কথার কোন জবাব ছিল না তার কাছে। কয়েক মিনিট সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। এরপর কোনকিছু না বলেই হাঁটা দিল ওসমান।

রিনি গভীর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়েছিল ওসমানের দিকে। ও যখন হাঁটা ধরলো রিনি পেছন থেকে বলে উঠলো, 'ওসমান। অন্য জাতির এক নারীর কথা মনে করে আমার প্রস্তাব উড়িয়ে দিও না তুমি। আমার শৈশব ও কৈশোরের স্বপ্নকে তুমি ভেঙ্গে দিও না।'

'আমি আবারও বলছি ক্রাক সুবাক নয়।' কমাণ্ডারদের সামনে শেষবারের মতো যুদ্ধনীতি ও রণকৌশল ব্যাখ্যা করছিলেন সুলতান আইয়ুবী। 'খৃষ্টানরা আগের চাইতে অনেক বেশী সতর্ক। গোয়েন্দারা আমাকে যা বলেছে তাতে আমি নিশ্চিত, ক্রাকের যুদ্ধ

হবে দুর্গের বাইরে। ভেতরে মুসলমানদের তৎপরতা আপনাদের কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না। ওরা বেশী নড়াচড়া করলে অহেতুক মারা পড়বে। আমি ওদেরকে এত বড় পরীক্ষায় ফেলতে চাই না। ওদের রক্ষা করার একটাই মাত্র পথ, আমাদেরকে প্রচণ্ড আক্রমণ করতে হবে।'

এভাবে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে সুলতান সূর্যাস্তের পর ক্রাকগামী সৈন্যদেরকে মার্চ করার নির্দেশ দিলেন। পরদিন ভোরে সৈন্যবাহিনী ক্রাকের সীমান্ত এলাকায় পৌছলো। এখান থেকেই দুর্গ অবরোধের প্রস্তুতি নিয়ে এগোতে হবে।

পথে খৃষ্টান সৈন্যদের কোন টহল বাহিনী বা সশস্ত্র প্লাটুন চোখে পড়েনি ওদের। গোয়েন্দারা জানিয়েছে, খৃষ্টান বাহিনী দুর্গের বাইরে তাঁবু গেড়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। কোথায় তারা তাঁবু গেড়েছে জেনে নিয়ে মুসলিম বাহিনী অন্য পথে অগ্রসর হলো। ফলে বিনা বাঁধায়ই এরা দুর্গ অবরোধ করতে সক্ষম হলো।

দুর্গ অবরোধ করার সাথে সাথে পাঁচিল থেকে শুরু হলো তীব্র তীর বৃষ্টি। মুসলিম বাহিনী জওয়াবী হামলায় কঠোর আক্রমণ করলো না, বরং হালকা চালে যুদ্ধ চালিয়ে ফাঁকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল ভেতরে ঢোকার কোন সম্ভাবনা আছে কি না। সাথের গোয়েন্দারা কমাণ্ডারকে ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বর্ণনা দিচ্ছিল।

মুসলিম বাহিনীর অবরোধের খবর দুর্গের অভ্যন্তরে এখনো প্রচার হয়নি। অবরোধকারীদের পেছনটাও এখনো অরক্ষিত। হঠাৎ অভ্যন্তরের সামরিক এলাকায় অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। পাঁচিলে উঠে এলো খৃষ্টান সৈন্যরা।

শহরে আতংক ছড়িয়ে পড়লো। ইহুদী ও খৃষ্টানরা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে ভেতরে বসে রইলো। মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের জন্য মুসলমানরা দোয়া করতে লাগলো। ওসমান ও তার সঙ্গীরা দুর্গের সদর দরজা খুলে দেয়ার বা পাঁচিল ভেঙ্গে ফেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

শহরের বিপুল সংখ্যক মুসলিম যুবক যুবতী কিভাবে আইয়ুবীর সহযোগিতায় আসতে পারে সে জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলাপ আলোচনায় মেতে উঠলো। মুসলমানদের মহল্লাগুলোতে লোকজন জোট বেঁধে জটলা করতে থাকলো।

কাঠের তৈরী মজবুত ফটক লোহার পাতে মোড়া, বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত অগ্নি গোলায় আগুন লাগলো না। পাঁচিলের ওপর থেকে ছোঁড়া তীরে কামানধারীদের কয়েকজন শহীদ হয়ে গেলেন। কমানাগুলো পেছনে সরিয়ে নেয়া হলো। শেষ পর্যন্ত মুসলিম সৈন্যদেরকে পাঁচিলের ওপর তীর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

খৃষ্টান সৈন্যরা উপরে থাকায় মুসলমানদের বেশী ক্ষতি হচ্ছিল। দেয়াল ভাঙ্গার যন্ত্র নিয়ে আটজনের একটা দল প্রাচীরের দিকে এগিয়ে গেল। পাঁচিলের তীর বৃষ্টি তাদের শহীদ করে দিল।

রাতের প্রথম প্রহর। ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছেন রিনির আব্বা। এসেই শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার ডিউটিতে যেতে হবে।

তিনি খবর পেয়েছেন শহরের মুসলমান অধিবাসীরা ভয়ংকর কোন ষড়যন্ত্র করছে। ওদের চলাফেরা এবং হাবভাব মোটেই সুবিধের নয়। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন

থেকে ওদের প্রতিটি বাড়ীতেই নজর রাখতে হবে। সেভাবেই তিনি চারদিকে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি শুয়ে পড়ার খানিক বাদে দরজায় নক করলো কেউ। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল রিনি। বাইরে একজন মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে। চেনে তাকে রিনি। খৃষ্টানরা তাকে ভীষণ পছন্দ করে। দরজা খুলতেই লোকটি বললো, 'আপনার আব্বা কোথায়? তাকে ডাকুন। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে, এখুনি আপনার আব্বাকে তা জানানো দরকার।'

'আব্বা তো এইমাত্র শুয়েছেন। রাতেই নাকি আবার বেরোবেন। তাকে তো এখন ডাকা যাবে না।'

'আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করুন। খুবই জরুরী সংবাদ, এখুনি তাকে বলা দরকার।'

'আমাকে বলো, আব্বা উঠলেই তাকে আমি তা পৌঁছে দেবো।'

'আজ রাতে কিছু মুসলিম যুবক ও যুবতী পাঁচিল ভেঙ্গে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছে।'

'তুমি কি করে জানলে এ কথা?'

রিনির প্রশ্নের জবাবে লোকটি বললো, 'আমি ওদের বন্ধু সেজে সব জেনে এসেছি। রাস্তার মোড়ে যে গরীব মুচিকে দেখতে পান সে আসলে মুচি নয়, সে আইয়ুবীর একজন গোয়েন্দা। ওরই পরামর্শে যুবকরা এ পরিকল্পনা নিয়েছে।'

'পাঁচিলের কোন দিকে আঘাত হানতে পারে সে ব্যাপারে বলেছে কিছু?'

'আস্তাবলের পেছনে উত্তর দিকের ময়লা ফেলার পাশের দেয়াল স্যাতস্যাতে হয়ে আছে। ওখানে যে বড় গাছটা আছে সেখানে বেশ অন্ধকারও থাকে রাতে। ওখান দিয়েই ওরা প্রথমে চেষ্টা করবে বলেছে।'

'তুমি এসব মুসলিম যুবকদের নাম জানো? কারা কারা আছে এ দলে না জানলে ওদের গ্রেফতার করবে কিভাবে?'

'আমি সব জেনে এসেছি।'

লোকটি অভিযানকারীদের নাম বললো রিনির কাছে। বললো, 'ওসমান এদের দলনেতা।'

ওসমানের নাম শোনামাত্র রিনির ভেতরটা কেঁপে উঠলো। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'সালেমের ছেলে ওসমান তো! ঠিক আছে, আমি বলবো আব্বাকে।'

'কিন্তু উনি যদি আরো কিছু জানতে চান? আমি কি একটু পর আবার এসে ঘুরে যাবো?'

'ঠিক আছে এসো।'

লোকটি বললো, 'তারচে বরং আমি একটু বসি, যাতে উনি উঠলেই দেখা করতে পারি।'

'আব্বা তো মাত্র শুয়েছেন, কতক্ষণ বসে থাকবে তুমি? তারচে বরং ঘুরেই আসো।'

কিন্তু লোকটা যেতে চাচ্ছে না। পুরস্কার পাবার এই সুযোগ সে কিছুতেই হারাতে

রাজি নয়। সে দরজার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

রিনি দেখলো, এ তো মহা বিপদ। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললো, 'এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বললে আব্বার ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। চলো বাইরে থেকে হেঁটে আসি।'

এত বড় অফিসারের সুন্দরী মেয়ের সাথে একটু সময় কাটানোর লোভ সংবরণ করতে পারলো না লোকটা। রিনি দরজা টেনে বাইরে বেরিয়ে আসতেই পোষা কুকুরের মতো সে রিনির সাথে সাথে চললো।

হাঁটতে হাঁটতে একটা কূপের কাছে চলে এলো ওরা। কূপটি গভীর করে খোঁড়া হয়েছিল। থামল রিনি। উঁকি দিয়ে দেখলো কুয়োর ভেতর। মুসলমানদের গোপন তৎপরতার সংবাদ বলে যাচ্ছিল লোকটি। সেও গলা বাড়িয়ে চাইলো কুয়োর ভেতর।

রিনি দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ধাক্কা দিল। সোজা কুয়োয় গিয়ে পড়লো তার দেহ। তার কলজে ফাটা চিৎকার 'ধড়াম' শব্দের সাথে শেষ হয়ে গেল।

রিনি ভীষণ খুশী। ওসমানের মৃত্যুর সংবাদ ও কূপের গহীনে ডুবিয়ে দিতে পেরেছে।

এক ছুটে ওসমানের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলো রিনি। তার মায়ের সাথে আল নূরের প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলো। ওসমানের কথা জিজ্ঞেস করলে তার মা বললেন, 'সেই যে সন্ধ্যায় বেরিয়েছে এখনো ফেরেনি।'

হয়তো অভিযানে চলে গেছে, ভাবলো রিনি। বেরিয়ে এলো ওসমানের বাড়ী থেকে।

তার আশংকা হলো অন্য কোন 'সোর্স' সেনাবাহিনী বা পুলিশকে সংবাদটি দিয়ে থাকতে পারে। যেখানে দেয়াল ভাঙ্গা হবে রিনি সেদিকে ছুটলো। ওসমানকে সে বাঁধা দেবে। বলবে, তোমাদের আজকের অভিযানের কথা সবাই জেনে গেছে।

রিনি পাঁচিলের কাছে গিয়ে দেখলো কেউ নেই। ও এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ তাকে জাপটে ধরে অন্ধকারে নিয়ে গেল। লোকটি ক্রাকের একজন সেনা সদস্য। ও পিতার পরিচয় দিয়ে নিজের নাম বললো। রিনিকে ওখান থেকে চলে যেতে বললো সৈন্যরা।

কিন্তু ও যাবে না। ও বুঝতে পারছে ওসমানদের ধরার জন্যই সৈন্যরা এখানে এসে লুকিয়ে আছে। রিনি সৈন্যদেরকে এখান থেকে যেতেও বলতে পারছে না। থাকতেও দিতে পারছে না। ওরা থাকলে ওসমানকে বাঁচানো কষ্টকর হবে। কিন্তু ও যে কোন মূল্যে ওসমানকে বাঁচাতে চায়।

একজন সৈন্য বললো, 'খবর মিথ্যে নয়। ওই যে ওরা আসছে।' চমকে উঠলো রিনি। চিৎকার দিয়ে বললো, 'ওসমান ফিরে যাও।' কমাণ্ডার ওর মুখ চেপে ধরে বললো, 'মেয়েটা মনে হয় ওদের গুপ্তচর। ওকে বন্দী করো।' কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না। ওসমানরা এসে পড়েছে। ওরা লড়াই করার জন্য দাঁড়িয়ে গেল।

পেছনে খৃষ্টান সৈন্য, সামনে ওসমানদের গ্রুপ। ওদের হাতে বর্শা, খঞ্জর এবং দেয়াল খোদাই করার যন্ত্রপাতি। ওসমানের এ অভিযানে যুবকরা ছাড়াও দলে ছিল এগারো জন যুবতী।

কমাণ্ডোদের মধ্য থেকে একজন চিৎকার দিয়ে বললো, 'মুজাহিদ, পালিয়ো না। প্রতিটি মেয়েকে রক্ষা করার জন্য একজন করে থাকো, বাকীরা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলো। খৃষ্টানরা ছিল সংখ্যায় অধিক। কমাণ্ডো সদস্যরা একজন একজন করে শহীদ হতে লাগলো। যুদ্ধের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ ধ্বনিত হচ্ছিল রিনির কণ্ঠ, 'ওসমান পালিয়ে যাও। পালিয়ে যাও ওসমান।'

খুব বেশী সময় লাগলো না। অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি খৃষ্টানদের আয়ত্বে চলে এলো। খৃষ্টান কমাণ্ডার বললো, 'মেয়েদের মেরো না, ওদের জীবিত গ্রেফতার করো।'

লড়ে যাচ্ছে ওসমান। এক খৃষ্টান সৈনিক তরবারী নিয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। ওসমানের হাতে খঞ্জর। আচম্বিত সৈন্যটার পিঠে একটা খঞ্জর আমূল বিদ্ধ হলো। মৃত সৈনিকের তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো রিনি। ওসমানের সাহায্যে এগিয়ে গেল দ্রুত। কিন্তু কয়েকজন সৈনিক তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ঘিরে ফেললো তাদের।

রিনি তরবারীটি এগিয়ে ধরলো ওসমানের দিকে। তরবারী হাতে পেয়েই ওসমান প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর। চোখের পলকে দু'জন সৈন্য লুটিয়ে পড়লো মৃত্যুর কোলে।

রিনিও তার হাতের খঞ্জর ফেলে দিয়ে একটি তলোয়ার তুলে নিল। আক্রমণকারীরা মুহূর্তে সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

এখানে ওখানে তখনো লড়ে যাচ্ছিল মুজাহিদরা। খৃষ্টান কমাণ্ডার পেছনে সরে পড়া মেয়েদের ধরার জন্য একটা গ্রুপকে পাঠিয়ে দিল। ওরা এগিয়ে গেল মেয়েদের দিকে।

দু'জন মেয়ে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ময়লার স্তুপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। সেখান থেকে ওরা দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকারে লুকিয়ে এক পা এক পা করে এগুলো খৃষ্টান কমাণ্ডার যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে।

কমাণ্ডার পাঁচিল থেকে হাত পাঁচেক দূরে একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। মেয়ে দু'জন সন্তর্পনে এসে কমাণ্ডারের ঠিক পেছনে পৌঁছে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নয়জন যুবতী ও এগারোজন যুবকের দলটির ওপর আঘাত হানলো খৃষ্টানরা। প্রথমে এগিয়ে গেল এগারোজন যুবক। লড়াই করতে করতে ওরা সবাই শহীদ হয়ে গেল। এবার এগিয়ে এলো মেয়েরা। ধরা না দিয়ে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়লো খৃষ্টানদের ওপর। দেখতে দেখতে ওদের সাতজন শহীদ হয়ে গেল।

ওসমান ও রিনি তখনো লড়ে যাচ্ছে একদল খৃষ্টানের সাথে। হঠাৎ একজন সৈনিকের তরবারীর আঘাত ঠেকালো সে নিজের তরবারী দিয়ে। এ সময় পাশ থেকে তাকে আঘাত করলো আরেকজন। রিনির হাত থেকে তরবারী ছুটে গেল। চিৎকার দিয়ে আহত রিনি এক দিকে কাত হয়ে পড়ে গেল।

রিনির চিৎকার শুনে ওসমান সামান্য সময়ের জন্য ঘাড় ফিরিয়েছিল সেদিকে। একটা তরবারী ওসমানের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। শহীদ হয়ে গেল ওসমান। খৃষ্টান কমাণ্ডার তাকিয়েছিল ওসমানের পড়ন্ত দেহের দিকে।

ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতী দু'জন বিদ্যুৎ বেগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। এক সাথে তার পিঠে আমূল বসিয়ে দিল দুটো খঞ্জর। কমাণ্ডার কোন রকম বাঁধা দেয়ার সুযোগই পেল না। তার আগেই দেহ থেকে প্রাণ বায়ু উড়ে গেল তার।

সব শেষ। বেঁচে আছে দু'জন আহত যুবতী।

খৃষ্টান সৈন্যরা তাদের ঘেরাও করে ফেললো। একজন বললো, 'অস্ত্র ফেলে দাও। যুদ্ধ শেষ। তোমাদের সবাই মারা পড়েছে। বাঁচতে চাইলে আত্মসমর্পন করো।'

যুবতী সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমরা অনেক আগেই আত্মসমর্পন করেছি, তবে তোমাদের কাছে নয়, আল্লাহর কাছে। তোমরা সরে দাঁড়াও। আমাদের চলে যেতে দাও।'

কমাণ্ডার সঙ্গীদের বললো, 'খবরদার, ওদের কেউ হত্যা করো না। ওদের নিরস্ত্র করে বন্দী করো। আমাদের জানতে হবে ওদের সাথে আর কারা আছে?'

সৈন্যরা তাদের ঘেরাও সংকুচিত করে আনলো। যুবতী দু'জন একজন তাকালো অন্যজনের দিকে। এরপর দু'জনই চোখের পলকে ছুটলো একদিকে। এক সৈনিক বর্শা ছুঁড়ে মারলো, পড়ে গেলো একজন। অন্যজন ছুটন্ত অবস্থায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। কিন্তু কিছুতে পা লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। সৈনিকরা যখন ওকে ধরে উঠাতে গেল, দেখলো তার হাতের খঞ্জর নিজের বুকে আমূল বিঁধে আছে। অভিযানকারীদের আর কেউ তখন বেঁচে নেই।

আহত রিনিকে গ্রেফতার করলো সৈন্যরা। তাকে নিয়ে আসা হলো সেনা হেডকোয়ার্টারে। তার ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়া শেষ হলে একজন সেনা অফিসার এসে কামরায় ঢুকলো।

'তুমি পাঁচিলের পাশে কি করছিলে? ওখানে গিয়েছিলে কেন?'

রিনি তার এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। অফিসার আবার তাকে একই প্রশ্ন করলে তার জবাবে ও আবোল তাবোল বকতে লাগলো। ডাক্তার এগিয়ে এলেন অফিসারের কাছে। বললেন, 'মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওকে কোন প্রশ্ন করে লাভ হবে না।'

দুর্গের দেয়াল ভাঙ্গার আশা শেষ হয়ে গেছে। শহীদ হয়ে গেছে অভ্যন্তরের মুসলিম কমাণ্ডো মুজাহিদরা। কিন্তু সুলতান দুর্গ পদানত করার সংকল্পে অটল। বললেন, 'আমরা আমাদের সর্বস্ব বাজী রেখেছি। কয়েকজন আত্মত্যাগী ভাইকে আমরা হারিয়েছি ঠিক, কিন্তু নিজেরা তো এখনো নিঃশেষ হইনি। ত্যাগের পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে বিজয় আমাদের হবেই। কারণ বিজয়ের মালিক আল্লাহ, আর আল্লাহ মোটেও দুর্বল নন। আমাদের ঈমানই আমাদের বিজয়ের গ্যারান্টি। কেবল তো অবরোধের দ্বিতীয় দিন গেল, আগামী কালও সূর্য উঠবে, এবং তারপর দিন, তারপর দিনও। বিজয়ের আগ পর্যন্ত আমরা আমাদের ধৈর্য ও ত্যাগের পরীক্ষা দিয়েই যেতে থাকবো।'

প্রাসাদের ভেতর যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসলেন খৃষ্টান সম্রাটরা। একজন বললেন, 'মানুষ যত হুঁশিয়ারই হোক, একবার না একবার ভুল সে করেই। এবার যে ভুল আইয়ুবী করেছে তার মাশুল তাকে দিতে হবেই।'

'কি ভুল করেছে সে?' প্রশ্ন করলেন অপর এক সম্রাট।

'অতীতের প্রতিটি লড়াইয়ে আইয়ুবী আমাদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়েছে। আমরা ঠিকমত প্রস্তুত হওয়ার আগেই বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে সে। কিন্তু এবার তাকে আমরা বাগে পেয়েছি। এবার তাকে মুখোমুখি লড়াই করতেই হবে।'

অন্য এক সম্রাট বললেন, 'আরে, শুধু কি তাই? এবার আমরা যে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছি সেটা বলবেন না?'

তিনি সুবিধাজনক অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, 'আমাদের যে ফৌজ বাইরে আছে তাদেরকে আমরা দু ভাগে ভাগ করে নেবো। এক ভাগ থাকবে আইয়ুবীর ফৌজের চোখের সামনে, আরেক ভাগকে সরিয়ে নেবো দূরে।

এরপর আইয়ুবী যখনি দুর্গে হামলা করবে তখন পাঁচিলের ওপর থেকে তার মোকাবেলা করবে আমাদের ভেতরের ফৌজ।

আইয়ুবীর চোখের সামনে বাইরে আমাদের যে ফৌজ আছে ওরা তখন পাশ থেকে আঘাত হানবে আইয়ুবীর বাহিনীর ওপর। ফলে সে সেদিকেও মনযোগ দিতে বাধ্য হবে। অন্যান্য বারের মতো বেপরোয়াভাবে একদিকে আর ছুটে যেতে পারবে না।

এরপর আমরা চালবো সেই চাল, যা সে এতদিন আমাদের ওপর চেলেছে। আইয়ুবী ভাবতেও পারবে না আমাদের আরেকটা বাহিনী তাদের ঠিক পেছনে ওঁৎ পেতে আছে। দু'পক্ষের সাথে লড়াই করে তারা যখন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়বে তখন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবে আমাদের মূল বাহিনী। তারা অতর্কিতে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে আইয়ুবীর সেই ক্লান্ত শ্রান্ত বাহিনীর ওপর। সে হামলার মোকাবেলা করার সাধ্য আইয়ুবীর কিছুতেই হবে না।'

ফ্রান্সের সম্রাট বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। জীবনে এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। সত্যি, এবার ওকে বাগে পাওয়া গেছে।'

জার্মানীর সম্রাট বললেন, 'ঠিক, বার বার ঘুঘু এসে খেয়ে যেতে দেবো নাকো আর ধান।'

এরপর সেনাপতিদের নিয়ে বসলেন সম্রাটরা। তাদেরকে বললেন এ পরিকল্পনার কথা। সেনাপতিরা একমত হলেন সম্রাটদের এ প্রস্তাবের সাথে।

সম্রাটদের সামনে তারা সম্মিলিতভাবে প্রতিজ্ঞা করলো, 'কিছুতেই আমরা এ দুর্গ সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর হাতে তুলে দেবো না। পবিত্র যিশুর কসম, এ দেহে প্রাণ থাকতে আইয়ুবীর সাধ আর পূরণ হতে দেবো না আমরা।'

একদিকে আইয়ুবীর সংকল্প আর অন্য দিকে খৃস্টানদের প্রতিজ্ঞা। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কইতে রাজি নয়। কেউ পিছু হটতেও রাজি নয়। এক নাজুক ও জটিল সময় উভয়ের সামনে। পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ ও সংঘাতপূর্ণ হতে পারে এ ধারণাও নেই কারো। সবাই অপেক্ষা করতে থাকল, দেখা যাক আগামী কাল কি ঘটে?

###

মহাকালের মহানায়ক

গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। অসামান্য এক সেনানায়ক। জীবনের অধিকাংশ সময়ে কেটেছে তাঁর ঘোড়ার পিঠে, পাহাড়ে আর মরুভূমিতে, যুদ্ধের মাঠে। আজ থেকে হাজার বছর আগে বিশ্বব্যাপী যে রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড শুরু হয়েছিল সে ক্রুসেডের মোকাবেলা করেছিলেন তিনি। বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও কুশলী সমরনায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্ব জুড়ে। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে মানুষের জন্য তাঁর দরদ ও মহানুভবতা ছিল কিংবদন্তীতুল্য।

কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়- কুটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী। ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল নাসারারা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। বেহায়াপনা ও চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র। একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা- এ দুয়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়িয়েছিলেন আইয়ুবী। তিনি মোকাবেলা করেছিলেন এমনসব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার- মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়। ক্রুসেড সিরিজ অবলম্বনে আসাদ বিন হাফিজ রচনা করেছেন গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সেই বর্ণাঢ্য জীবনকাহিনী নির্ভর অসামন্য উপন্যাস- **মহাকালের মহানায়ক**।

-প্রকাশক।

প্রীতি প্রকাশন